হজ্বের সফরনামা

বাইতুল্লাহর মুসাফির



প্রথম পর্ব

ফুল ফুটলো / ফুল ঝরলো

আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি কত যে মেহেরবান, বান্দাকে তিনি কত যে মুহাব্বাত করেন তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সৃষ্টিজগতের সর্বত্র, এমনকি মানবদেহের সর্বাঙ্গে। আকাশের মেঘ ও বৃষ্টি; নদী, ঝর্না ও সাগর-মহাসাগরের পানি, পশু-পাখী ও সবুজ বনানী, বাগানের ফুল, গাছের ফল ও মাঠের ফসল, চাঁদের জোসনা ও সূর্যের কিরণ, সবকিছু মানুষের জন্য আল্লাহর দান। আমাদের হাত-পা, চোখ-কান ও নাক-মুখ, হৃদয় ও মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধি-বিবেক; আমাদের ভাষা ও বাকশক্তি, এগুলো কার দান? কত বড় দান? আল্লাহর দান! অনেক বড় দান!

অনেক ভালোবেসে, অনেক যত্ন করে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। দিন-রাত আমরা ডুবে আছি তাঁর নেয়ামাত ও রহমতের মাঝে। এজন্য আমরা যদি আল্লাহর দরবারে সারা জীবন সিজদায় পড়ে থাকি তাহলেও কি শোকরের হক আদায় হবে? কখনো না, কিছুতেই না।

আল্লাহ বান্দাকে বড় ভালোবাসেন এবং আল্লাহ চান, বান্দা যেন তাঁকে ভালোবাসে; ভালোবেসে বান্দা যেন আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহর কাছে চায়। যে বান্দা যত বেশী চায়, তার প্রতি আল্লাহ তত বেশী খুশী হন।

আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক শুধু আবদিয়াত ও দাসত্বের নয়; বরং প্রেম ও ভালোবাসা এবং ইশক ও মুহাব্বাতেরও সম্পর্ক। মানুষ যদি আল্লাহর শুধু বান্দা ও দাস হতো তাহলে কি তার জন্য সৃষ্টিজগতের এত বিপুল আয়োজন হতো! 'কার্‌রামনা বানী আদামা'র মর্যাদা দান করা হতো! তাহলে কি আল্লাহ এত আদর-সমাদর করে বলতেন, 'ডাকো আমাকে, সাড়া দেবো আমি তোমাদের ডাকে!'

মুহাব্বাতের দাবী হলো মাহবূবের দীদার ও মিলন। কিন্তু দুনিয়ার যিন্দেগিতে কীভাবে সম্ভব তা! মানুষের ক্ষুদ্র দৃষ্টিশক্তি তো আল্লাহ তা'আলার অসীম সৌন্দর্য এবং তাঁর নূর তাজাল্লী বরদাশত করতে পারবে না! ঐ নূর তাজাল্লির সামান্য উদ্ভাসেই তো তূর পাহাড় সারখার হয়ে যায়, হযরত কালীমুল্লাহ-এর জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়! আল্লাহর দীদার এবং আল্লাহর সঙ্গে বান্দার পরম মিলন তো হবে জান্নাতে! আল্লাহকে

বান্দা তখন দেখতে পাবে যেমন নিঃসন্দেহে দেখতে পায় আকাশে পূর্ণিমার চাঁদকে! কিন্তু দুনিয়াতে! বান্দার ইশক ও মুহাব্বাত এখানে কীভাবে তৃপ্ত ও পরিতৃপ্ত হবে? তার হৃদয়ের আকুতি যে, আল্লাহর কাছে যাওয়া, আল্লাহকে কাছে পাওয়া!

বান্দার প্রতি আল্লাহ কত মেহেরবান! বান্দাকে আল্লাহ কত ভালোবাসেন! বান্দার দিলের ইশক ও মুহাব্বাতের জ্বলনকে শান্ত করার জন্য; তার হৃদয় ও আত্মার আকুতি ও মিনতিকে পরিতৃপ্ত করার জন্য দুনিয়ার একটি ঘরকে তিনি আপন সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক দান করেছেন। কালো গিলাফে ঢাকা আল্লাহর ঘর! বাইতুল্লাহ!

আহ! শুনতে কত মধুর লাগে, আল্লাহর ঘর! কলবের জাহানে ইশক ও মুহাব্বাতের কী আশ্চর্য ঢেউ জাগে! হৃদয়-জগতে প্রেম ও ভালোবাসার কী অপূর্ব তরঙ্গদোলা সৃষ্টি হয়! আল্লাহর ঘর! কী আশ্চর্য মধুর অনুভূতি! যেন ঐ ঘরের দুয়ারে দাঁড়ালেই আল্লাহকে দেখা যাবে! আল্লাহকে পাওয়া যাবে! ঘরের দীদার যেন স্বয়ং ঘরওয়ালার দীদারের কিছুটা স্বাদ, কিছুটা আনন্দ দান করে! জগতের আর কোন স্বাদ, আর কোন আনন্দের সাথে এর কোন তুলনা হয় না।

আল্লাহর ঘর ও বাইতুল্লাহর এ মহান নেয়ামত আমরা পেয়েছি কার মাধ্যমে, কার ওছীলায়? পেয়ারা নবী হযরত মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওছীলায়। তাহলে তাঁর প্রতি উম্মতের মুহাব্বাত ও ভালোবাসা কত গভীর হবে! তাঁর জন্য উম্মতের দিল কত ব্যাকুল বে-কারার হবে? তিনি শুয়ে আছেন সোনার মাদীনায় রওযা শরীফে সবুজ গম্বুজের নীচে। সুতরাং বাইতুল্লাহর যিয়ারাতের পর যিয়ারাতে মাদীনার আকুতি ও আকাঙ্ক্ষা প্রবল হওয়াই তো স্বাভাবিক। আর এটাই হলো যিয়ারাতে বাইতুল্লাহ এবং যিয়ারাতে মাদীনার হাকীকত ও তাৎপর্য।

***

পৃথিবীর সব মানুষেরই কোন না কোন স্বপ্ন থাকে, স্বপ্ন দেখেই মানুষ বেঁচে থাকে। স্বপ্নই মানুষের জীবন এবং স্বপ্নই জীবনের অবলম্বন।

মানুষের জীবন যেমন বিচিত্র তেমনি বিচিত্র তার জীবনের স্বপ্ন, কিন্তু মুমিনের সারা জীবনের স্বপ্ন শুধু একটি; দীদারে বাইতুল্লাহ এবং যিয়ারাতে মাদীনাহ। মুমিন স্বপ্ন দেখে কালো গিলাফের এবং সবুজ গম্বুজের। একদিন সে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে এবং নবীজীর রওযায় সালামের নাযরানা পেশ করবে– এই সুমধুর স্বপ্ন দেখেই মুমিন বেঁচে থাকে। এ স্বপ্নই মুমিনের জীবন, এ স্বপ্নই তার জীবনের অবলম্বন। তাই তো বাংলার কবি বলতে পেরেছেন– 'বক্ষে আমার কাবার ছবি নয়নে মুহাম্মাদ রাসূল!'

আবার অন্য দেশের কবি বলেছেন–

دولت نہ کوئی جاہ و حشم مانگ رہا ہوں

میں سایہ دیوار حرم مانگ رہا ہوں

'চাই না ধনসম্পদ, চাই না খ্যাতি ও সম্মান
তোমার ঘরের ছায়া মাওলা শুধু করো দান'

عاصی کو جو پہنچا دے مدینے کی زمین تک

داتا میں وہی نقش قدم مانگ رہا ہوں

'যে পথ পৌঁছে দেবে মদীনার পুণ্যভূমিতে

অভাগারে হে দয়াময়, দেখাও সে পথের পদচিহ্ন'।

কবিকে আল্লাহ ছন্দ দিয়েছেন, তাই তিনি প্রকাশ করতে পেরেছেন হৃদয়ের আকুতি ও মিনতি; তবে এটা শুধু কবিহৃদয়ের নয়; প্রতিটি মুমিনহৃদয়েরই আকুতি ও মিনতি। কেউ তা প্রকাশ করে ছন্দের ভাষায়, কেউ শুধু অশ্রুর ভাষায়, আর কারো বুকের ঢেউ শুধু বুকেই দোলা দেয়। দিন-রাত সে তার স্বপ্নের জগতে থাকে আত্মসমাহিত!

মানুষ শুধু স্বপ্ন দেখতে পারে; মানুষ শুধু হৃদয়ে স্বপ্ন লালন করতে পারে এবং স্বপ্নের তরঙ্গদোলায় দোল খেতে পারে, স্বপ্নকে পূর্ণতা দান করতে পারে না। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন, আল্লাহ যখন কারো কিসমতের সিতারা রওশন করেন তখনই শুধু পূর্ণ হয় তার দীদারে বাইতুল্লাহ এবং যিয়ারাতে মাদীনার স্বপ্ন, কখনো জীবনের প্রারম্ভে, কখনো জীবনের সায়াহ্নে। কখনো একবার, কখনো বারবার। আবার কত মুমিন বান্দার সারা জীবনের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যায়। প্রেমের দহনে হৃদয় তাদের শুধু দগ্ধ হয়, চোখ থেকে তাদের শুধু অশ্রু ঝরে, ইশকের আগুনে তারা শুধু জ্বলতে থাকে, আর বিরহের বেদনায় প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে থাকে, কিন্তু বাইতুল্লাহর ডাক আসে না; মৃত্যুর ডাক এসে যায়। স্বপ্নের বেদনা বুকে নিয়েই তারা মাটির নীচে চলে যায়। এভাবে কেউ লাভ করে স্বপ্নের আনন্দ, কেউ বহন করে স্বপ্নের বেদনা। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় আমরা স্বপ্নের প্রাপ্তি ও তৃপ্তির কবিতা যেমন দেখতে পাই তেমনি দেখতে পাই বিরহের বেদনা ও ব্যাকুলতার কবিতা। হাসির কল্লোল ধ্বনি যেমন শুনতে পাই তেমনি শুনতে পাই কান্নার তরঙ্গ-ধ্বনি। একজন বাইতুল্লাহর কাছে এবং সবুজ গম্বুজের পাশে দাঁড়িয়ে হৃদয়ের সবটুকু প্রশান্তি ছড়িয়ে বলে ওঠেন–

শান্ত হলো মন, ধন্য হলো জীবন,
এবার আসে যদি মৃত্যুর আলিঙ্গন,
হাসি মুখে দেখো তারে করিবো বরণ।
দু'দিনের জীবন ছেড়ে পাবো অনন্ত জীবন।

আরেকজন দূরে বহু দূরে সেই সাগর-পারে দাঁড়িয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন–

জীবনের দিনগুলো হায় ফুরিয়ে গেলো,
ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার নেমে এলো,
কবরের ডাক এসে গেলো,
এলো না তবু ঘরের ডাক।

তবে আমার বিশ্বাস, মুমিন বান্দার স্বপ্নের সফলতার আনন্দ এবং স্বপ্নের ব্যর্থতার বেদনা, দু'টোই আল্লাহর প্রিয়। তাই কারো স্বপ্ন তিনি পূর্ণ করেন, আর কারো স্বপ্ন আজীবন অপূর্ণই রেখে দেন। ইশক ও মুহাব্বাত এবং প্রেম ও ভালোবাসার জগৎ বড় রহস্যপূর্ণ। এখানে জীবনের সার্থকতা শুধু স্বপ্ন দেখার গভীরতায়, স্বপ্নের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে নয়। যে স্বপ্নের আবেদন যত গভীর এবং যে স্বপ্নের মিনতি যত মর্মস্পর্শী সে স্বপ্ন আল্লাহর তত প্রিয়, হোক তা প্রাপ্তির আনন্দে সিক্ত, কিংবা অপ্রাপ্তির বেদনায় তিক্ত। একজনের বারবার ডাক আসে, বারবার তিনি শামিল হন হজ্বের সফরে, হিজাযের কাফেলায়। বারবার তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক! আরেকজন সারা জীবন পথের কিনারে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন হাজীদের কাফেলার চলে যাওয়া এবং ফিরে আসা। দিলের পেয়ালা যখন উপচে পড়ে তখন তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, 'এ যন্ত্রণা আর কত হে আল্লাহ! কবে, কবে আমার ডাক আসবে হে আল্লাহ!

কেউ জানে না, এ দুই বান্দার মধ্যে কে আল্লাহর বেশি প্রিয়, ইহরামের সাদা লেবাসের মুসাফির, না পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এবং ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে থাকা আল্লাহর এই মজবূর বান্দা! সুতরাং আমার সালাম ও মোবারাকবাদ তাদের সবার জন্য; যারা সুন্দর করে স্বপ্ন দেখেন, যাদের স্বপ্নের ময়ূর পেখম মেলে তাদের জন্য এবং যাদের স্বপ্ন শুধু ডাহুকের ডাক ডেকে যায় তাদেরও জন্য। কারণ উভয়ের স্বপ্ন দেখা সার্থক, যদি আল্লাহ কবুল করেন।

আমার দাদী শুয়ে আছেন গ্রামের মাটিতে ছায়াঘেরা এক কবরে। দাদীর সঙ্গে আমার স্মৃতি দূর শৈশবের। দাদীর কবরে একটি বড় গাছ ছিলো। সে গাছের ছায়ায় দাদীর কবরকে মনে হতো অনেক প্রশান্ত! কখনো আমি ঘুমিয়ে যেতাম সেখানে গাছের ছায়ায়। দাদীর স্বপ্ন ছিলো দীদারে বাইতুল্লাহ এবং যিয়ারাতে মাদীনার। সহজ সরল এক পল্লী-অবলার সহজ সরল স্বপ্ন। তখন ছোট ছোট পয়সা ছিলো। তিনি একটি একটি করে পয়সা জমাতেন, আল্লাহর ঘরের জন্য; দাদী এবং তাঁর স্বপ্ন আজ কবরে মাটির নীচে।

দাদীর মৃত্যুর পর দাদার জীবন ছিলো বড় নিঃসঙ্গ। তিনিও স্বপ্ন দেখতেন। শৈশবে সে স্বপ্ন আমাকেও স্পর্শ করতো, কোমল স্পর্শ। তখন বুঝিনি, এখন অনুভব করি, কত ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা ছিলো তাঁর বুকে; কত আকুতি ও মিনতি ছিলো তাঁর পশ্চিম দিগন্তে তাকিয়ে থাকা চোখে! সাদা-কালো কত মেঘের আনাগোনা ছিলো তাঁর স্বপ্নের আকাশে। দাদারও কবর হয়েছে স্বপ্নের বেদনাকে সঙ্গে করে।

নানাকে আমি দেখিনি। আমার মায়ের হাত যখন মেহেদী-রাঙ্গা হবে ঠিক তখন মৃত্যুর ভেলা এসে ভিড়েছিলো তাঁর জীবন-নদীর ঘাটে। তাঁর আত্মার সঙ্গে আমার বন্ধন কলমের মাধ্যমে এবং তাঁর স্বপ্নের বেদনার কথা আমি জেনেছি কলম থেকে ঝরা কালির মাধ্যমে।

আমার আব্বা, তিনিও স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর স্বপ্নের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছি স্বপ্নের পূর্ণতা লাভের তৃপ্তি। কিন্তু এখনো আমি বলতে পারি

না, আব্বার জীবনের কোন সৌন্দর্য আমাকে বেশি মুগ্ধ করেছিলো; স্বপ্নের ব্যাকুলতার সৌন্দর্য, না স্বপ্নের তৃপ্তির সৌন্দর্য! আমার বিশ্বাস দু'টোই সুন্দর এবং দু'টোই আল্লাহর প্রিয়। সুতরাং যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে স্বপ্নের তৃপ্তির সরোবরে অবগাহন করে, কিংবা বুকে স্বপ্নের অতৃপ্তির বেদনা বহন করে তাদের সবার উদ্দেশ্যে আমার সালাম।

যাদের চোখ থেকে আনন্দের অশ্রু ঝরেছে কা'বার কালো গিলাফ ধরে এবং মাদীনার সবুজ গম্বুজের কাছে দাঁড়িয়ে তাদের অশ্রুকে আমার অভিনন্দন। কারণ সে অশ্রু হতে পারে জান্নাতের বাগানে ফুলের পাপড়িতে ঝরা শিশির।

যাদের চোখ থেকে বেদনার অশ্রু ঝরেছে শুধু হাজিদের কাফেলার আসা-যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে কালো-সবুজের বিরহে দগ্ধ হয়ে তাদেরও অশ্রুকে আমার অভিনন্দন। কারণ সে অশ্রু হতে পারে দাউ দাউ আগুনের উপর মেঘ থেকে ঝরা বৃষ্টি।

***

আমার ছোট্ট হৃদয়ে কখন অঙ্কুরিত হয়েছিলো দীদারে বাইতুল্লাহ এবং যিয়ারাতে মাদীনার স্বপ্ন? জানি না, শুধু মনে পড়ে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ-এর হজ্বের সফরে যাওয়া এবং ফিরে আসার দৃশ্য। তিনি ছিলেন দাদার বন্ধু, তাই আমাদের দাদা।

একবারের কথা স্পষ্ট মনে আছে, দাদা-দাদী হজ্ব থেকে ফিরেছেন। অবাক বিস্ময়ে আমি দেখছি, আর ভাবছি, এত সুন্দর কেন! এত ঝলমল কেন! তারা কি অন্য জগতের মানুষ! তখন অনেক কিছু মনে হয়েছিলো, এখন অনেক কিছু মনে নেই। আমাকে তাঁরা মদীনা শরীফের খেজুর দিয়েছিলেন, আর দিয়েছিলেন 'মক্কা শরীফের পানি'!

চল্লিশ বছরের কথা, তবু যেন কালকের কথা; আমার কণ্ঠে ছিলো করুণ আবদার, 'দাদা, আমাকে আল্লাহর ঘরে নেবেন না!' শিশুমনের অবুঝ আবদারে কী ভাব এসেছিলো সেদিন আল্লাহর ঘর থেকে ফিরে আসা মুসাফিরের মনে! তিনি কি দু'আ করেছিলেন সেই অবুঝ শিশুটির জন্য? ঘরের মালিক কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন ভুল ঠিকানায় অবুঝ শিশুর অবুঝ আবদারকে! হাদীছে যে হাসির কথা এসেছে তিনি কি সেই হাসি হেসেছিলেন এবং তাকদীরের কলমে নতুন কিছু লিখেছিলেন?

এটাই ছিলো আমার হৃদয়ে 'কালো-সবুজের' প্রথম স্বপ্ন, স্বপ্নের প্রথম অঙ্কুর। অবুঝ শিশুর অবুঝ স্বপ্ন, তবু তো স্বপ্ন! বড় হৃদয়ের বড় স্বপ্নের চেয়ে, আল্লাহর কাছে ছোট্ট হৃদয়ের ছোট্ট স্বপ্নের মূল্য কি কম!

তারপর 'দাদা' বহুবার আল্লাহর ঘরে গিয়েছেন এবং ফিরে এসেছেন। তাঁকে দেখেছি আর ভেবেছি, কত ভাগ্যবান তিনি! আমি কি হতে পারবো তাঁর মত? আমি কি যেতে পারবো আল্লাহর ঘরে তাঁর মত? এভাবে কোমল স্বপ্নের অঙ্কুর ধীরে ধীরে আমার হৃদয়ে সবুজের ছায়া বিস্তার করেছে। সে স্বপ্নের স্নিগ্ধ পরশে ছিলো সুখের অনুভূতি এবং আনন্দের শিহরণ। কিন্তু স্বপ্নের যে ব্যথা ও বেদনা আছে, স্বপ্নের যে ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা আছে, স্বপ্ন যে হৃদয়ে কান্নার ঢেউ তোলে এবং চোখ থেকে অশ্রু ঝরায় তখনো তা বুঝতে পারিনি।

জীবনের বিশটি বসন্ত পার হওয়ার পর সম্ভবত প্রথম আমি অনুভব করি স্বপ্নের মধুর বেদনা, যখন আমার প্রাণপ্রিয় উস্তায হযরত পাহাড়পুরী হুযূর বাইতুল্লাহর মুসাফির হলেন। সেটা ছিলো হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ-এর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ চারমাসের সফর। রামাযানের আগে বর্ষাকাল ছিলো। ঘরের দুয়ারে নৌকা বাঁধা ছিলো। মাগরিবের পর নৌকায় করে আমি তাঁকে, আল্লাহর ঘরের যাত্রীকে নদী পার করেছিলাম। হৃদয় তখন বিগলিত ছিলো এবং চোখে ছিলো অশ্রুর ধারা। সেই প্রথম আমি আমার প্রিয় উস্তাযের মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলাম সালামের নাযরানা এবং নিবেদন করেছিলাম মুলতাযামে দাঁড়িয়ে দু'আর তামান্না।

তিনি নৌকা থেকে নামলেন। আমি তাকিয়ে থাকলাম বাইতুল্লাহর মুসাফিরের দিকে। সে দৃশ্য এখনো চোখে ভাসে। তাঁর মুখে ছিলো হাসি, আমার চোখে ছিলো পানি। নৌকা নিয়ে ফিরে আসার সময় অনেক কান্না পেয়েছিলো। নদীর জলে সেদিন আমার চোখের পানি মিশেছিলো। একবার ভেবেছিলাম, নৌকা নিয়ে এই নদীপথে যদি চলতে থাকি তাহলে কি একদিন আমি পৌঁছে যাবো হিজাযের ভূমিতে! নাকি সাগরের উত্তাল ঢেউয়ে ভেঙ্গে যাবে আমার নৌকা! ডুবে যাবে আমার স্বপ্ন! সেদিন নদীর বুকে নৌকায় বসে আমার বুকে অপূর্ণ স্বপ্নের যে বেদনা জেগেছিলো, মনে হলে এখনো হৃদয়ে মধুর অনুভূতি জাগে। সেই বেদনা আবার আরো বেশি করে পাওয়ার ইচ্ছা জাগে। উপরে তারাভরা আকাশে তাকিয়েছিলাম ব্যাকুল নয়নে। তারকার ঝিলিমিলি ছাড়া কিছু দেখিনি, কিন্তু বিশ্বাস ছিলো, এই ঝিলমিল তারকার আলোক-সজ্জার আড়ালে যিনি আছেন তিনি দেখতে পান এবং শুনতে পান। তিনি দয়া করেন এবং দান করেন। তাই হৃদয়ের সবটুকু আকুতি ঢেলে সেদিন দু'আ করেছিলাম আম্মার জন্য, আব্বার জন্য এবং নিজের জন্য; সবার স্বপ্নের পূর্ণতার জন্য। এ স্বপ্ন তো নয় কোন বিলাস-জৌলুসের এবং জীবনের ভোগ-আনন্দের! এ স্বপ্ন তো শুধু কালো গিলাফের এবং সবুজ গম্বুজের! এ স্বপ্ন তো শুধু ইশক ও মুহাব্বাতের এবং আবে যামযামের, আবে কাউছারের!

তারপর আব্বার জীবনে পরম সৌভাগ্যের 'শুভলগ্নটি' যখন এলো, তিনি যখন হজ্বের সফরে আল্লাহর ঘরে রওয়ানা হলেন, আমি অবলোকন করলাম মুমিনের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের অন্য রকম এক সৌন্দর্য। তুমি যদি জানতে চাও সে সৌন্দর্যের কোন তুলনা, তাহলে বলবো, জীবন ও জগতের আর কোন সৌন্দর্যে আমি খুঁজে পাইনি তার তুলনা। তখন ছিলো লটারী নামের বেদনাদায়ক এক উৎকণ্ঠা, নাম আসবে কি আসবে না; কী আছে ভাগ্যে, হাসি, না কান্না! আব্বার মুখমণ্ডলে আশা ও আশংকার এক অপূর্ব আলো-ছায়া। একবার যেন চাঁদের আলো, একবার যেন মেঘের ছায়া। আব্বার নাম যখন ঘোষিত হলো, তিনি বসা থেকে উঠলেন এবং ওঠা থেকে বসলেন। তিনি হাসলেন এবং কাঁদলেন। মুখে হাসি, চোখে কান্না। হায়, তোমাকে যদি দেখাতে পারতাম বাইতুল্লাহর মুসাফিরের মুখমণ্ডলে আলো-ছায়া ও হাসি-কান্নার অপূর্ব মিলনের সে সৌন্দর্য! এখনো আছে হজ্বের মুসাফির, নেই শুধু সেই হাসি-কান্নার মিলনদৃশ্য!

আমার সৌভাগ্য, আব্বার মুখমণ্ডলেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম সে পবিত্র দৃশ্য। আমার হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের সবুজ বৃক্ষ তাতে যেন আরো সবুজ, আরো সজীব হলো। তখনকার জীবনে সেটাই ছিলো আমার শ্রেষ্ঠ আনন্দের মুহূর্ত। আল্লাহর ঘর থেকে আব্বার চিঠি এলো। কতবার কতভাবে পড়ি, তবু তৃপ্তি হয় না, আবার পড়ি, আবার পড়ি। এ চিঠি এসেছে আমার নামে আল্লাহর ঘর থেকে! প্রতিটি শব্দ যেন ফুল, প্রতিটি শব্দে যেন ফুলের সুবাস! তাতে ছিলো যামযামের পারে দাঁড়িয়ে যামযাম পান করার কথা; তাতেই যেন পেয়ে গেলাম আবে যামযামের স্বাদ!

আব্বা নেক মানুষ ছিলেন; আল্লাহর ঘর থেকে তিনি যেন 'নেককার' হয়ে ফিরে এলেন। তাঁর সমগ্র সত্তায় অপূর্ব এক আলোকময়তা, যেন কালো গিলাফের খোশবু এবং সবুজ গম্বুজের সুবাস। সেই আলোকময়তায়, সেই খোশবুতে-সুবাসে আমার আত্মা এমনই আলোকিত ও সুবাসিত হলো, যেন আমি নিজেই গিয়েছিলাম মক্কা-মদীনায় কালো-সবুজের সৌন্দর্যের কাছে!

যামযামের পানি পেলাম, মাদীনা শরীফের খেজুর পেলাম, আর পেলাম দশখণ্ডের একটি কিতাব, আব্বার পক্ষ হতে মক্কা-মদীনার হাদিয়া। কিতাবটি আছে আমার কাছে। কারো প্রতি যখন আমি হৃদয়ের ভালোবাসা প্রকাশ করি, তাকে কিতাবটির স্পর্শ গ্রহণ করতে বলি।

মক্কা-মদীনার কথা এবং মিনা-আরাফার ঘটনা আব্বা এমন আবেগের সঙ্গে শোনাতেন, চোখের সামনে সবকিছু যেন জীবন্ত হয়ে উঠতো। হৃদয়ের স্বপ্ন নতুন করে যেন প্রাণ পেতো। তখন নতুন বেদনা ও নতুন মিনতি নিয়ে প্রার্থনা জানাতাম, আমার হৃদয়ে লালিত স্বপ্ন যেন সত্য হয়, চোখের তারায় কালো-সবুজের ছায়াপাতের আগে আমার যেন মৃত্যু না হয়।

এভাবে আরো কিছু দিন। স্বপ্নের ব্যাকুলতা, হৃদয়ের অস্থিরতা এবং আত্মার আকুতি বৃদ্ধি পেলো দিনদিন। যে ঘর কখনো দেখিনি, অথচ প্রতিদিন পাঁচবার যে ঘরের অভিমুখী হই, সে ঘর দেখার এবং সে ঘরের কালো গিলাফের স্পর্শ লাভের ব্যাকুলতা; যে শহর দেখিনি, অথচ হৃদয়ের গভীরে যার প্রতি জন্মভূমির চেয়ে বেশি ভালোবাসা সে শহরের ধুলোবালির সুরমা মাখার এবং রওযা শরীফের সবুজ মহিমায় আত্মনিবেদনের আকুতি; এই ছিলো আমার তখনকার দিন-রাত এবং সকাল-সন্ধ্যা।

বিরহের মধুর বেদনার বড় প্রিয় দিন ছিলো সেগুলো। নিজেকে তখন সান্ত্বনা দিতাম, যত দূরে হোক আছে তো কালো গিলাফে ঢাকা আল্লাহর ঘর! আমি তো এখান থেকেও হতে পারি সে ঘরের অভিমুখী! সে ঘরের অভিসারী! আসমান থেকে প্রতিদিন যত রহমত নামে সে ঘরের উপর, আমি তো এখান থেকেও হতে পরি তার হকদার!

যত দূরে হোক সোনার মাদীনা, সেখানে সবুজ গম্বুজের নীচে আছে তো পেয়ারা নবীর রওযা! আমি তো এখান থেকেও পাঠাতে পারি দুরূদ ও সালামের নাযরানা। সেখান থেকে উৎসারিত নূরের যে ঝর্নাধারা, আমি তো এখান থেকেও অবগাহন করতে পারি সে নূরের নূরানিয়াতে! পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন মসজিদের হাযিরান যারা, তারা তো মসজিদুল হারামেরও হাযিরান! তারা তো মসজিদুন্-নবীরও মুছাল্লিয়ান! যদি অন্তরে

অনুরাগ এবং হৃদয়ে আকুতি থাকে; যদি কলবে ইশকের তড়প এবং সিনায় মুহাব্বাতের জাযবা থাকে।

কিন্তু ইশকের মউজ ও প্রেমের জোয়ার কখনো কখনো এমন জোরওয়ার হতো যে, সব সান্ত্বনা ভেসে যেতো এবং ব্যথার অস্থিরতা সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠতো। পশ্চিমের কবির ভাষায়–

শরাবের জলসায় যত পান করো উষ্ণ মদিরা/ তত তীব্র হবে তোমার প্রেম-পিপাসা/ বন্ধ করো জলসা, ত্যাগ করো মদিরা/ ঘুরে আসো প্রিয়ার নির্জন গলিতে।

প্রেমিক কবির উপদেশ মেনে তখন চলে যেতাম দূরের নির্জন কোন মসজিদে। আল্লাহর ঘরের নির্জনতা অশান্ত হৃদয়ে প্রশান্তির আশ্চর্য এক শীতল পরশ বুলিয়ে দিতো। কলবে অন্য রকম এক সুকূন ও সাকীনা অনুভব হতো। হয়ত ভালো হতো হৃদয়ের কথা হৃদয়ের ভাণ্ডারেই যদি জমা থাকতো, কিন্তু কলমের ঝর্নাপথে শব্দগুলো সব ঝরে গেলো, আর মনে হলো, এখনো যারা হৃদয়ের গভীরে লালন করছে অসম্পূর্ণ স্বপ্নের বেদনা, হয়ত এতে তারা পাবে কিছু সান্ত্বনা। বিরহী হৃদয়ের উত্তাপ-উষ্ণতা বিরহী হৃদয়ের জন্য হতে পারে প্রশান্তির শীতল প্রলেপ।

অস্থির হৃদয় একদিন যখন আর কোন সান্ত্বনা শোনে না এবং পেরেশান কলব যখন আর কোন তাসাল্লি মানে না তখন গভীর রাতে পাহাড়পুরী হুযূরের খিদমতে হাযির হলাম। তাঁকে কিছু বলতে হলো না। যাদের হৃদয় আছে তাদের কিছু বলতে হয় না। হৃদয়ের ব্যথা হৃদয় দিয়ে এমনিতেই তারা অনুভব করতে পারেন। ধীরে ধীরে তিনি এমন কিছু সান্ত্বনার কথা বললেন যা আমার জন্য ছিলো নতুন ও অশ্রুতপূর্ব। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা, ব্যথিত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে এই প্রিয় মানুষটির তুলনা নেই। এমন কি শেষ জীবনে হযরত হাফেজ্জী হুযূর যখন 'খুব কাছের আঘাতে' ক্ষত-বিক্ষত হতেন তখন এ মানুষটির কাছেই সান্ত্বনা চাইতেন এবং সান্ত্বনা পেতেন।

হুযূর আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'সময় যখন আসন্ন হয় বেদনা তখন তীব্র হয়, তবে বিরহের বেদনা যিনি যত বেশি গ্রহণ করেন মিলনের স্বাদ তিনি তত বেশি আস্বাদন করেন। সুতরাং বিরহের বেদনাই এ পথের সান্ত্বনা!

তিনি কতিপয় আকাবিরের নাম বললেন, যারা স্বপ্ন লালন করেছেন দীদারে বাইতুল্লাহ ও যিয়ারাতে মাদীনার। কিন্তু জীবন থেকে জীবনে তাঁরা পাড়ি দিয়েছেন স্বপ্নের বেদনা বুকে ধারণ করেই। তবে সেই বেদনার মাঝেও তাঁরা লাভ করেছেন ইশক ও মুহাব্বাতের স্বাদ ও লায্‌যাত। যদ্দুর মনে পড়ে, তিনি মুজাদ্দিদে আলফে ছানি রহ-এর ঘটনাও বলেছিলেন।

আরো কিছুদিন পর, ১৪০০ হিজরী ২৯ যিলকদ হযরত হাফেজ্জী হুযূর আমার 'দাদা' হলেন এবং পয়লা যিলহজ্ব আল্লাহর ঘরে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আশ্চর্য! আল্লাহ যেন তাঁর এই পেয়ারা বান্দার মনোবাঞ্ছা সবসময় পূর্ণ করতেন। তিনি হজ্বের নিয়ত করতেন, শরীর-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ-পরিস্থিতি হয়ত প্রতিকূল, কিন্তু গায়ব থেকে সব ইনতিযাম হয়ে যেতো এবং তিনি হজ্বের সফরে রওয়ানা হয়ে যেতেন।

সেবার সফরের বিদায়-মজলিসে তিনি এমন কিছু কথা বললেন যাতে কান্নার রোল পড়ে গেলো। সবাই ভাবলো, তাঁর হয়ত আর ফিরা হবে না, হয়ত এ সফরই তাঁর আখিরাতের সফর। এরপর ছিলো আমাদের মত নওজোয়ানদের অবাক হওয়ার পালা। তিনি বলে উঠলেন এবং মুখে স্নিগ্ধ হাসির উদ্ভাসকে সঙ্গে করে, 'আপনারা পেরেশান কেন? আমি তো এখনো মউতের ইরাদা করি নাই।'

মউতের ইরাদা! সুবহানাল্লাহ! তো মউতের সঙ্গে আল্লাহর যে বান্দার ইরাদা করার সম্পর্ক, তাঁর মনোবাঞ্ছা আল্লাহ পূর্ণ করবেন, তাতে আশ্চর্যের কী!

সফরের পূর্বরাত্রে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি অবাক হলাম, কখনো তো এভাবে ডাক আসেনি! গেলাম এবং কাছে বসলাম। তিনি হাসিমুখে তাকালেন। আহা, যারা তাঁকে দেখেনি তাদের কীভাবে বোঝাবো, কেমন ছিলো সে হাসির সৌন্দর্য এবং সে দৃষ্টির স্নিগ্ধতা। হাসি তো নয় যেন নূরের আভাস! দৃষ্টি তো নয় যেন মমতার শিশির! দেহ তাতে সিক্ত হয় এবং হৃদয় তাতে হয় আপ্লুত। তিনি কিছু হাদিয়া দিলেন, আর বললেন, এটা আমার পক্ষ হতে তোমার নিকাহের তোহফা, হজ্বের নিয়তে রেখে দাও।

আবেগে, আনন্দে, ভাবের তরঙ্গে চোখ দু'টো ছলছল করে উঠলো। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর 'তোহফা' গ্রহণ করলাম। তবে শৈশবের মত এবার ঠিকানা ভুল হলো না। সোজা মসজিদে হাযির হলাম। সেখানে কেউ ছিলো না, আমি ছিলাম, আমার আল্লাহ ছিলেন। দু'রাকাত নামায পড়ে দু'হাত প্রসারিত করে আবেগ উদ্বেলিত কণ্ঠে বললাম, কবে আসবে আমার ডাক হে আল্লাহ! আসবে তো! দু'চোখে যেন অশ্রুর জোয়ার এলো। আর অশ্রুর যখন জোয়ার আসে পাপের আবর্জনা তখন ভেসে যায়, হৃদয় তখন স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়। মুনাজাত ও প্রার্থনা তখন বড় মিনতিপূর্ণ হয়। আমারও সেদিনকার মুনাজাতে অন্য রকম আবেদন ও নিবেদন এবং অন্য রকম আকুতি ও মিনতি ছিলো। আমার বিগলিত হৃদয়ে আল্লাহ যেন এ আশ্বাস দান করলেন, 'আসবে বান্দা! অবশ্যই তোমার ডাক আসবে!' আমি আল্লাহর শোকর আদায় করলাম যে, তিনি এমন দু'আ করার তাওফীক দিয়েছেন।

কল্পনাশক্তি আল্লাহর অতি বড় দান। কল্পনার সাহায্যে তুমি ফিরে যেতে পারো অতীতের শৈশবে; এমনকি বিচরণ করতে পারো অনাগত ভবিষ্যতের অঙ্গনে। কল্পনায় মুহূর্তে তুমি চলে যেতে পারো বহু দূরে তোমার প্রিয় মানুষের সান্নিধ্যে এবং প্রিয় ভূমির সংস্পর্শে। বাধার বেড়াজাল আটকে রাখতে পারে তোমার মাটির দেহকে, কিন্তু হৃদয় ও আত্মা বাধাবন্ধনহীন। তাই বাজারে থেকেও তুমি থাকতে পারো মসজিদে এবং আরশের ছায়া পেতে পারো রোয হাশরে।

তাবুকের অভিযান থেকে ফেরার পথে আল্লাহর নবী যে বলেছেন, মদীনায় রয়ে গেছে কিছু মানুষ যারা এই সফরে প্রতিটি পথে, প্রতিটি উপত্যকায় আমাদের সঙ্গে ছিলো, ওযর ও মাজবূরি তাদের (জড়দেহ)কে মদীনায় আটকে রেখেছে।

এই যে মদীনায় পড়ে থেকেও তাবুকের সফরে শরীক থাকা এবং প্রতিটি পথে ও উপত্যকায় সঙ্গ লাভ করা, এটা তো আত্মার আকুতি এবং কল্পনা শক্তিরই কারিশমা!

তাই তো আজমের নাম নাজানা এক দিওয়ানা বলতে পেরেছেন–

তোমরা দেখো, আমি বসে আছি ইরানের গুলবাগিচায়।

ভুল, ভুল, আমি তো মদীনায়! খেজুর বাগানের ছায়ায়!

হযরত হাফেজ্জী হুযূর আল্লাহর ঘরে রওয়ানা হলেন, আর আমি পড়ে থাকলাম সুদূর বাংলাদেশে। কিন্তু আল্লাহর শোকর, মাজবূরির বেড়াজালে আবদ্ধ ছিলো শুধু জড়দেহ। হৃদয় আমার কল্পনার ডানা মেলে উড়ে গিয়েছিলো হিজাযভূমিতে। আমিও যেন শামিল ছিলাম তাঁর কাফেলার পথ চলাতে। আমার অন্তর্সত্তা যেন তাঁর সঙ্গে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করেছে, আরাফার ময়দানে এবং মিনার তাঁবুতে অবস্থান করেছে। আমার কলব যেন ইশকের সওয়ারিতে সওয়ার হয়ে মদীনার পথে সফর করেছে এবং রওযা শরীফে সালামের নাযরানা পেশ করেছে। কল্পনার স্বাদ ও আনন্দ এবং تصور এর লায্যাত ও ফারহাত সম্ভবত এই প্রথম আল্লাহ আমাকে দান করলেন। শোকর আলহামদু লিল্লাহ।

হজ্বের সফর থেকে হযরত ফিরে এলেন, সবার সঙ্গে আমিও বিমানবন্দরে গেলাম, কিন্তু কাছে না গিয়ে শুধু দূর থেকে দেখলাম বাইতুল্লাহর মুসাফিরের নূরানী চেহারা। কাছে কেন গেলাম না, কিংবা যেতে পারলাম না, সে রহস্য এখনো আমার অজানা। এমনকি পরে যখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সবাই গেলো, তুমি আমাকে ইস্তিকবাল করতে গেলে না? তখনো বলতে পারিনি তাঁকে সেই গোপন কথা। শুধু বললাম, হযরত, কল্পনার জগতে আমি যেন আপনার কাফেলায় শামিল ছিলাম।

শুনে তিনি শুধু মৃদু হাসলেন, আর কিছু রিয়াল আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এগুলা আপনার কাছে রাখেন, যখন খরচ করার ওয়াক্ত হবে তখন খরচ করবেন।'

ঐ সফরে তিনি আমার জন্য একটি কালো জুব্বা এনেছিলেন, আমি নাদান বুঝতে না পেরে বলেছিলাম, আমার জন্য ইহরামের লেবাস আনলে বেশি খুশী হতাম। তিনি কিন্তু হাসি মুখে বললেন, আমার ইহরামের লেবাস তোমাকে দিয়ে দেবো।

আমার শ্রদ্ধেয় প্রফেসর হামিদুর রহমান সাহেব অনেকবার বলেছেন, হযরত নিজে দোকানে এই কালো জুব্বা খরীদ করেছেন। তখন বুঝতে পারিনি, এখন মনে হয়, কালো জুব্বার মাঝে হয়তো ছিলো কালো গিলাফের ইশারা।

আহলে দিল যারা তাদের কথায় ও কাজে থাকে আসমানের অনেক ইঙ্গিত-ইশারা। অন্তর্চক্ষু যাদের দুর্বল তারা তা বুঝতে পারে না এবং ভিতরের রহস্য অনুধাবন করতে পারে না; যদি পারতাম তাহলে সেই কালো জুব্বাটি আমার কাছ থেকে কখনো হারিয়ে যেতো না। কালোর প্রতি কালোর এবং সবুজের প্রতি সবুজের ইঙ্গিতরহস্য

বুঝেছিলাম অনেক পরে। তখন আমি মদীনা শরীফ থেকে একটি সবুজ এবং মক্কা শরীফ থেকে একটি কালো ওড়না এনেছিলাম আমার দুই মেয়ের জন্য।

***

আল্লাহ যে বান্দাকে গায়ব থেকে তরবিয়াত করেন এ সময় আমি তা উপলব্ধি করলাম একটি কিতাব হাতে পেয়ে। সেই কিতাবে বাইতুল্লাহর মুসাফিরদের ইশক ও মুহাব্বাতের আশ্চর্য সব ঘটনা ছিলো। একটি করে ঘটনা পড়ি, আর আবেগে উদ্বেলিত হই; ভিতরে কান্নার ঢেউ জাগে, আর চোখে অশ্রুর বান ডাকে। ইশক ও মুহাব্বাতের নতুন নতুন রহস্য উন্মোচিত হয়, আর নিজের দীনতা ও হীনতায় কুণ্ঠিত হই। হায়! আল্লাহর ঘরের এই সব আশিকান যে সকল পথ অতিক্রম করে আল্লাহর ঘরে পৌঁছেছেন আমি যদি তাঁদের পথের ধুলো হতাম!

একটি ঘটনা ছিলো এরকম– হজ্বের কাফেলা রওয়ানা হয়েছে সুদূর খোরাসান থেকে। সে যুগের সফর ছিলো সে যুগের মত। কষ্টের উপর কষ্ট এবং বিপদের উপর বিপদ। পথে পথে, পদে পদে বিভিন্ন দুর্যোগ। সমস্ত বিপদ-দুর্যোগ উপেক্ষা করে এবং জানমালের খাতরা কবুল করেই তখন চলতো হজ্বের কাফেলা। সেই কাফেলায় ছিলো এক সওদাগরের ক্রীতদাসী। না, আমি ভুল বলেছি; সে ছিলো আল্লাহর প্রিয় দাসী। আল্লাহর মুহাব্বাতে তার কলব ছিলো বে-তাব, বে-কারার। কাফেলা বিভিন্ন মানযিলে থামে, আর আল্লাহর দাসী ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির দিকে। কোথায়, আর কতদূর আল্লাহর ঘর! কাফেলা যত আগে বাড়ে, আল্লাহর ঘর যত কাছে আসে দাসীর অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা তত বাড়তে থাকে। মরুভূমির তাপ এবং তার হৃদয়ের উত্তাপ যেন একাকার হয়ে যায়।

সুদীর্ঘ সফর শেষে কাফেলা অবশেষে মক্কা শহরে প্রবেশ করলো এবং পবিত্র হারামের নিকটবর্তী হলো। আল্লাহর দাসী তখন এমনই 'দিওয়ানা' যে, বুক যেন ভেঙ্গে যায়, কলব যেন ফেটে যায়। তার ব্যাকুল দৃষ্টিতে একই জিজ্ঞাসা, কোথায়! কোথায় আমার মাওলার ঘর! কাফেলা হয়রান পেরেশান। দাসীর অবস্থা তখন লবেজান! অবশেষে হাবশী দাসীকে দেখানো হলো কালো গিলাফে ঢাকা আল্লাহর ঘর। আর সে শুধু একটি চিৎকার দিলো, 'দেখেছি, আমার আল্লাহর ঘর আমি দেখেছি! পেয়েছি, আমার আল্লাহকে আমি পেয়েছি!' তারপর? তারপর কী হলো? আল্লাহর দাসী আল্লাহর ঘরের সামনে লুটিয়ে পড়লো এবং তড়পাতে তড়পাতে স্থির হয়ে গেলো। তার স্বপ্ন পূর্ণ হলো, একটি নয়, দুটি; ঘর এবং ঘরের মালিকের সঙ্গে মিলনের স্বপ্ন।

আরেকটি ঘটনা সে যুগের হিন্দুস্তানের। হাজীদের নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে চলেছে পালের জাহাজ। সাগরেই কেটে যায় দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। কত ভয়ংকর ছিলো সে যুগের সমুদ্রযাত্রা, এখন তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এককথায় সেটা ছিলো প্রাণের মায়া ত্যাগ করে প্রাণদাতার মায়ায় আকুল হয়ে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেয়া। কিন্তু আল্লাহর ঘরের আশিক যারা, আল্লাহর মুহাব্বাতের দিওয়ানা যারা জীবন-

মৃত্যুর পরোয়া না করে এভাবেই তারা সাগর পাড়ি দিতেন। একদিন সাগরে ঝড় উঠলো, পাহাড় সমান ঢেউ সৃষ্টি হলো, জাহাজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। মৃত্যু ছিলো অবধারিত; এমন সময় এক ডুবন্ত যাত্রী মৃত্যুর ভয়ে নয়, বঞ্চনার ভয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে উঠলো– 'তোমার ঘরের যিয়ারাতের আগে নয় হে আল্লাহ!

এরপর সে আর কিছু জানে না, যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন সে একা এক নির্জন দ্বীপে। তিন বছর পর গায়বি কুদরত তাকে পৌঁছে দিলো মক্কাভূমিতে, আল্লাহর 'বাড়ীতে'। কীভাবে? তা লেখা নেই কিতাবে, আছে শুধু এ কথা, হজ্বের পর আবার সাগরপথে শুরু হলো তার সফর। যেখানে জাহাজ ডুবেছিলো সেখানে যখন এসে পৌঁছলো তখন সে জাহাজের কিনারে দাঁড়িয়ে অন্যদের দেখাতে লাগলো, এখানে, ঠিক এখানে ডুবেছিলো আমাদের জাহাজ। আর তখন.... কেউ জানে না কীভাবে, সে পড়ে গেলো জাহাজ থেকে। সাগরের পানিতে ডুবেই তার মৃত্যু হলো, তবে আল্লাহর ঘর যিয়ারাতের আগে নয়, পরে, যেমন সে ফরিয়াদ করেছিলো আল্লাহর দরবারে। আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গে এমনই হয় আল্লাহর আচরণ। মাথায় তোমার পাপের বোঝা! নিরাশ হয়ো না। চাওয়ার মত যদি চাইতে পারো তাহলে তুমিও অনেক কিছু পেতে পারো। এ দুয়ার থেকে তো ডাক আসে দিন রাত, এসো হে নেককার, এসো হে গোনাহগার, লুটে নাও আমার দানের ভাণ্ডার।

আল্লাহর ইশকে দিওয়ানা বান্দাদের আল্লাহর ঘর যিয়ারাতের আরো বহু ঘটনা ছিলো সেই কিতাবে। প্রতিটি ঘটনা হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে, চিন্তায় নতুন জাগরণ আনে এবং কলবকে সজীবতা দান করে। এ কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কতবার পড়েছি তা বলতে পারবো না। শুধু বলতে পারবো, এর মাধ্যমে আমার অন্তরের লালিত স্বপ্ন শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে আজ নতুন জৌলুস ও সৌন্দর্য লাভ করলো। আমি নতুনভাবে অবগাহন করলাম আমার হৃদয়ে, আমার স্বপ্নের সরোবরে। এ কিতাবের লেখক যিনি আল্লাহ তাঁকে শান্তি দান করুন, কবরে, হাশরে এবং জান্নাতের নহরে, দুধের নহরে, মধুর নহরে।

আসমান থেকে সৌভাগ্য যখন নামে তখন নামতে থাকে। এ সময় আরেকটি সৌভাগ্য নেমে এলো আমার হাতে। হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবী রহ-এর লেখা 'আরকানে আরবা'আ' কিতাবটি পেলাম। স্বপ্নকে সবুজ সজীব রাখার জন্য যে জলসিঞ্চনের প্রয়োজন, এ যেন ছিলো তার দ্বিতীয় পর্যায়। হজ্বের হাকীকত ও রূহানিয়াত কী, তা আগেও বুঝিনি, এখনো 'বুঝি' বলার সাহস নেই; তবে এ কিতাব যেন দিলের অনেক পর্দা সরিয়ে দিলো এবং হৃদয়কে নতুন করে আলো দান করলো, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর আলো। আমি আপ্লুত হলাম, উদ্বেলিত হলাম এবং উদ্দীপ্ত হলাম এক নতুন চেতনায়, যা প্রকাশ করার ভাষা মুখের উচ্চারণে নেই, আছে হৃদয়ের অনুভবে। আমি যেন ডুবে গেলাম, হারিয়ে গেলাম এবং তলিয়ে গেলাম

সেই সাগরে যেখানে ডুবে গেলে শান্তি, হারিয়ে গেলে প্রাপ্তি এবং তলিয়ে গেলে মুক্তি– আল্লাহ যাকে করুণা করেন।

এরপর পেলাম তৃতীয় একটি কিতাব, মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরয়াবাদী রহ-এর 'হিজাযের সফরনামা।' এটা ছিলো আল্লাহর বিশেষ দান। আর আল্লাহ যখন দান করেন তখন অনুগ্রহ করেই দান করেন, কিন্তু মানুষ লেগে যায় কারণের সন্ধানে। তার লক্ষ্য হারিয়ে যায় উপলক্ষের ধাঁধায়। তাই আমি এখানে বইটির প্রাপ্তির উপলক্ষ বলবো না, শুধু বলবো, শৈশব থেকে লালিত আমার স্বপ্নকে সিঞ্চিত করার এটি ছিলো তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়।

এ কিতাব নিছক কোন সফরনামা ছিলো না, ছিলো আল্লাহর ঘরে আল্লাহর এক প্রেমিক বান্দার জীবন্ত সফর, জীবন্ত হজ্ব এবং জীবন্ত যিয়ারাত। অবশ্যই এ কিতাব ছিলো একটি জাদু, তবে অন্যদের মত আমি বলবো না, কলমের জাদু। এটি ছিলো প্রেম ও ভালোবাসার জাদু এবং ইশক ও মুহাব্বতের কারিশমা। এটি ছিলো ভাব ও আবেগের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস এবং হৃদয় ও আত্মার আলোক-উদ্ভাস। কলম শুধু কালি ঝরিয়েছে এবং আলো ছড়িয়েছে। আর হৃদয় থেকে হৃদয় সে আলো গ্রহণ করেছে, আল্লাহ যাকে যতটুকু তাওফীক দান করেছেন। হযরত আলী নদবী রহ. তাঁর জীবনের প্রথম হজ্বের সফরে এ সফরনামা সঙ্গে রেখেছিলেন ভাব ও আবেগের উত্তাপে হৃদয়কে উত্তপ্ত রাখার জন্য এবং ইশক ও মুহাব্বাতের তড়পে কলবকে বে-তাব রাখার জন্য। এ সফরনামাই ছিলো দরয়াবাদীর কলমের ও কলবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এবং শুভপরিচয়।

হৃদয়ে শৈশব থেকে লালিত স্বপ্ন পূর্ণ যৌবনে এসে এবার যেন একটু একটু করে পেখম মেলতে শুরু করলো। হৃদয়ের উদ্যানে স্বপ্নের ময়ূর যখন পেখম মেলতে শুরু করে তখন হৃদয় ও আত্মার আনন্দবিহ্বলতা কেমন হয় তা শুধু তারাই বুঝতে পারে যাদের হৃদয়ে কখনো কোন স্বপ্ন ছিলো এবং সে স্বপ্ন কখনো পেখম মেলেছিলো। স্বপ্নের ময়ূর যত সুন্দর হয় তার পেখম মেলার আনন্দবিহ্বলতা তত গভীর হয়। আমার হৃদয়ের স্বপ্নময়ূর আমাকে নিয়ে গেলো স্বপ্নের রাজ্যে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখি, মধুর মধুর স্বপ্ন। জেগে ওঠার পরও সে স্বপ্নের আবেশে পুলকিত ও শিহরিত হই। কখনো দেখি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা, কখনো উটের কাফেলায় মদীনার পথে চলা; কখনো দেখি পাল তোলা জাহাজে সাগরের বুকে ভেসে চলা, কখনো মক্কার পথে পথে এবং মদীনার খেজুর বাগানে বিচরণ করা। হিজাযের মরুভূমি ও পাহাড়-পর্বত, সব যেন আমার পরিচিত, সবকিছুর সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক এবং হৃদয়ের বন্ধন।

এভাবে দিন আসে, রাত যায়, আনন্দের উচ্ছলতায়। কারণ হৃদয়ের স্বপ্ন অন্তত নিদ্রার স্বপ্নে বাস্তবতা লাভ করতে শুরু করেছে। আবার সকালে-সন্ধ্যায় বুক দুরু দুরু করে আবেগে উৎকণ্ঠায়। ডাক আসবে তো! লাব্বাইক বলার সৌভাগ্য হবে তো! আল্লাহর ডাক যদি শুধু নেককারদের জন্য, গোনাহগার বান্দারা তবে যাবে কোথায়? মুলতাযামে দাঁড়িয়ে তাহলে চোখের পানি ফেলবে কারা? হাজারে আসওয়াদ আরো কালো হবে কাদের দ্বারা, আবে যামযামে বিধৌত হবে কাদের আত্মা?

হে কালো গিলাফ! হে সবুজ গম্বুজ! আমি আসতে চাই আলোকিত ও পবিত্র হওয়ার জন্য; আমি আসতে চাই মিলন-সরোবরে অবগাহন করে দগ্ধ হৃদয়ের যন্ত্রণা দূর করার জন্য, কিন্তু আর কত দেরী! রাত পোহাবার আর কত দেরী!!

***

অবশেষে রাত পোহালো এবং ভোরের আলো দেখা দিলো। পূর্বদিগন্তে রাঙ্গা সূর্যটি উদিত হলো আমার স্বপ্নের নতুন দিনের শুভবার্তা নিয়ে, আমাকে পুলকিত, শিহরিত এবং উদ্বেলিত করে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি কি ভুলতে পারবো সেদিনের সেই সুমধুর মুহূর্তটি! হায় যদি আমার কলমে সেই কালি থাকতো, যা আঁকতে পারে সুখের চিত্র এবং আনন্দের ছবি! যা তুলে ধরতে পারে হৃদয়ের অনুভব এবং অনুভূতি!

১৪০৩ হিজরী ২৬ শে শা'বান। ফজরের পর নূরীয়ার মসজিদে তিলাওয়াত করছি, এমন সময় হযরত হাফেজ্জী হুযূর ডাকলেন। তাড়াতাড়ি হাযির হলাম। মুখে সেই স্নিগ্ধ পবিত্র হাসি, যার সঙ্গে আমি পরিচিত আমার শৈশব থেকে, যে হাসিতে শৈশবে ও কৈশোরে পেয়েছি নির্ভয়তা, এখন পাই সান্ত্বনা ও নির্ভরতা।

তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে বললেন, 'মওলবী আবু তাহের, তৈয়ার হও।'

কিছু বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না; তবু সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'ইনশাআল্লাহ আমি তৈয়ার।'

মুখের স্নিগ্ধ হাসিকে আরো আলোকিত করে এবং চোখের প্রশান্ত দৃষ্টিকে আরো মমতাসিক্ত করে তিনি বললেন, 'কিসের জন্য?'

অন্তরের গভীরে অদৃশ্যলোক থেকে আমি যেন অনুভব করলাম এক পরম আশ্বাস ও আলোক-উদ্ভাস। তাই প্রশান্ত চিত্তে স্থির প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করলাম, 'দীদারে বাইতুল্লাহ এবং যিয়ারাতে মাদীনার জন্য!'

দু'হাত বাড়িয়ে তিনি আমাকে টেনে নিলেন তাঁর প্রশস্ত বুকে। আমি জানতাম, এ বুকে একটি আলোকিত হৃদয় রয়েছে এবং সে হৃদয়ে অন্য হৃদয় থেকে প্রাপ্ত অন্য রকম স্পন্দন রয়েছে। তাই পরম সৌভাগ্য মনে করে আমি সমর্পিত হলাম হৃদয় থেকে হৃদয়ে সেই স্পন্দন ও আলোক-কম্পনটুকু গ্রহণ করার জন্য। তিনি বললেন, 'জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ।'

এটা ছিলো আমার জীবনে হযরতের প্রথম আলিঙ্গন। সে আলিঙ্গনে কী ছিলো এবং কী ছিলো না, আমি জানি না। আমার শুধু মনে হয়েছে, এ আলিঙ্গন এখান থেকে শুরু নয় এবং এখানেই শেষ নয়।

আমি এখন সেই মহাভাগ্যবান, যার দীর্ঘ জীবনের লালিত স্বপ্নের ময়ূর পূর্ণ পেখম মেলে এক আলোকিত রূপ ধারণ করেছে। মনে হলো, এখন থেকেই আমি আল্লাহর ঘরের মুসাফির এবং সবুজ গম্বুজের অভিসারী। যুগে যুগে দেশে দেশে যত কাফেলা চলেছে হিজাযের অভিমুখে তাদের কাতারে আমিও শামিল হলাম আজ। শোকর আলহামদু লিল্লাহ।

মসজিদে এসে দু'রাকাত শোকরানা আদায় করলাম। তারপর দু'হাত উপরে উঠলো এবং আমি কাঁদলাম। শুধু কাঁদলাম আর অশ্রু ঝরালাম। অন্তরে ভাবের এমন তরঙ্গ সৃষ্টি

হলো যে, কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে কিছু বলতে চেয়েও কিছু বলা হলো না। আসলে মুখের উচ্চারণে বলার কিছু ছিলোও না। তখন তো শব্দের মুহূর্ত নয়, নৈশব্দ্যের মুহূর্ত। তিনি তো অন্তর্যামী। তিনি তো জানেন অন্তরের সব কথা ও ব্যথা, অন্তরের সব আকুতি ও মিনতি। আমার হৃদয় এবং হৃদয়ের স্বপ্ন সবই তো তাঁর। আমার চাওয়া ও পাওয়া, আমার মিনতি ও পরিণতি সবই তো তাঁর। হে আল্লাহ, এ যেন সত্য হয়! এ যেন পূর্ণ হয়! মধুর বেদনা এবার যেন মধুর আনন্দে পরিণত হয়!

সৌভাগ্যের প্রথম 'সন্দেশ' তাঁকেই নিবেদন করলাম যার পায়ের নীচে আমার জান্নাত। আব্বাও অবগত হলেন আম্মার কাছ থেকে। সন্তানের সৌভাগ্য-সন্দেশে দু'জনই 'মিষ্টিমুখ' হলেন, দু'জনই আনন্দে আপ্লুত হলেন। আম্মার অভিব্যক্তি ছিলো শান্ত সরোবরের মত, সব সময় যেমন দেখি; আব্বার অভিব্যক্তি ছিলো নদীর ঢেউয়ের মত, সবসময় যেমন দেখতাম।

পাহাড়পুরী হুযূর সম্ভবত জানতেন, তবু জানালাম। জীবনের চলার পথে যিনি আলোর মশাল ধরেন, এমন সুসংবাদ তিনি জানলেও জানাতে হয়। কবি যেমন বলেছেন–

ফুলফোটা এ বাগানের মাটি তো ভিজেছে তাঁর 'খুন পাসীনায়'।
মিথ্যে তোমার বাগানের বসন্ত হে বন্ধু,
তাঁকে যদি ফুলের সুবাস না দাও।

এরপর জানালাম আমার জীবনসঙ্গিনীকে, সেদিনই যিনি জীবন-মৃত্যুর মাঝে অবস্থান করে মাতৃত্বের প্রথম গৌরব অর্জন করেছেন এবং আমাকে দান করেছেন পিতৃত্বের প্রথম গর্ব। এমন সুসংবাদে এমন আনন্দ-উদ্ভাসই তার মুখমণ্ডলে আশা করেছিলাম। কোলের 'পুষ্পকলির' দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, আলহামদু লিল্লাহ, দেখো, আমাদের 'চাঁদকন্যা' আমাদের জন্য কেমন 'আকাশ-সৌভাগ্য' বয়ে এনেছে।

পরদিন হযরত ডাকলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন না, পাসপোর্ট আছে কি নেই। শুধু বললেন, তোমার পাসপোর্ট দাও। আল্লাহর শোকর, সেটা তৈয়ার ছিলো। কারণ কিছুদিন আগে হঠাৎ এ ভাবনা এসেছিলো, কিংবা যার হুকুম ছাড়া পাতা নড়ে না তিনি এ ভাবনা দান করেছিলেন যে, আল্লাহর ঘরের জন্য তোমার সাধ্যের কাজটুকু তুমি করে রাখো!

তখনকার কথা মনে হলে আপনা থেকেই এখন চোখে পানি এসে পড়ে। এখন আল্লাহ সচ্ছলতা দান করেছেন, কিন্তু তখন পাসপোর্টের প্রয়োজনীয় চারশটাকা জোগাড় করা আমার জন্য অনেক কঠিন ছিলো। তবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে পাসপোর্ট তৈরী হয়েছিলো এবং তা সঙ্গে রেখেছিলাম, যেন চাওয়ামাত্র পেশ করতে পারি। বিসমিল্লাহ বলে সেটা হযরতের হাতে তুলে দিলাম। তিনি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাশাআল্লাহ, দিলমে বহুত শাওক হায়!'

হৃদয় তখন আবেগের তরঙ্গে এমন উদ্বেলিত হলো যা প্রকাশ করার যথাশব্দ আমার জানা নেই। আমি যেন মিশরের বাজারে সেই খরিদ্দার যার হাতে নেই একমুঠ গমের দানা, অথচ দিলে রয়েছে ইউসুফকে পাওয়ার তামান্না! কিন্তু তিনি যখন ইচ্ছা করেন

তখন তো গায়বের পর্দার আড়াল থেকে সব আয়োজন সম্পন্ন হতে থাকে; আমারও সব আয়োজন সেভাবে সম্পন্ন হতে লাগলো।

প্রথমে সিদ্ধান্ত হলো হযরত দীর্ঘ চার মাসের জন্য বাইতুল্লাহর সফরে যাবেন, আমরা তিনজন হবো তাঁর 'সফর-অনুগামী'। হযরতের ছাহেবযাদা মাওলানা হামীদুল্লাহ, হযরতের ভাতিজা মাওলানা ফারূক আহমদ এবং ..।

কী সৌভাগ্য! আল্লাহর ঘরে জীবনের প্রথম সফর, দীর্ঘ চার মাসের জন্য, তদুপরি হযরতের ছোহবত ও তারবিয়াতের ছায়ায়! আমার প্রাণপ্রিয় উস্তায পাহাড়পুরী হুযূর, তাঁরও জীবনের প্রথম সফর ছিলো চার মাসের এবং হযরত হাফেজ্জী হুযূর-এর খাদেমরূপে। এমন করে তো চাইনি কখনো! কিন্তু দয়াময় যখন দান করেন বান্দার চাওয়া ও চাহিদার সীমা ছাড়িয়েই দান করেন। বান্দা চায় জান্নাত, তিনি দান করেন জান্নাতুল ফেরদাউস। সত্যি, নিজের সৌভাগ্যে সেদিন নিজেরই যেন ঈর্ষা হলো! মাটির মানুষ যদি আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে যায়, তখন নিজের উপর নিজেরই তার ঈর্ষা তো হতেই পারে!

হযরত হাফেজ্জী হুযূর-এর পাসপোর্ট যে দূতাবাসে যায় সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে যায়। পাকিস্তান, আরব আমিরাত ও সৌদী আরবের ভিসা হয়ে গেলো ধারণার চেয়েও দ্রুত সময়ে। বাংলাদেশ বিমানের 'সদর দফতরে' মধুর এক অভিজ্ঞতা হলো। বিমানের পাকিস্তানগামী ফ্লাইটে টিকেট নেই। এক পদস্থ কর্মকর্তা– হাফেজ্জী হুযূরকে যিনি দেখেছেন শুধু ছবিতে– যখন শুনলেন, কার জন্য টিকেট চাই, বলে উঠলেন, 'যে বিমানে হাফেজ্জী হুযূর-এর টিকেট পাওয়া যাবে না সে বিমান আকাশে ডানা মেলবে না।' এরপর ত্রিশ মিনিটে হাতে টিকেট এসে গেলো।

কী বিপুল সম্ভাবনা ছিলো এই 'বটগাছের' নিরাপদ ছায়ায় এদেশের মাটিতে দ্বীনের শতমুখী কাজ করার! অথচ সে সম্ভাবনার কী নির্দয় অপচয় হলো! এদেশে আমাদের চেয়ে হতভাগা আর কারা আছে! হয়ত আমাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে–

قسمت بڑی ظرف چھوٹا (ভাগ্য বড়, পাত্র ছোট)

মাদরাসায় এসে হযরতকে ঘটনা শুনিয়ে বললাম, বিমানের ঐ কর্মকর্তার নামে যদি আপনার পক্ষ হতে একটি শোকরানা চিঠি যায়, ভালো হয়। কথাটা তিনি পছন্দ করলেন। সেই চিঠি ফারূক ভাই নিয়ে গিয়েছিলেন। তার মুখে শুনেছি, চিঠি পেয়ে ভদ্রলোক আনন্দে এমনই আত্মহারা হয়েছিলেন যে, ডেকে ডেকে সবাইকে বলছিলেন, দেখো, হাফেজ্জী হুযূর ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে চিঠি লিখেছেন!

এতটুকু কাজ আমরা অনেক সময় করি না। সবকিছুকে প্রাপ্য ভেবে সহজেই হযম করে ফেলি, অথচ আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ

(যে মানুষের শোকর আদায় করে না সে আল্লাহরও শোকর আদায় করে না।)

দুনিয়ার কোন উপকার যদি নাও থাকে তবু আমাদের এটা করা উচিত, অথচ এতে দুনিয়ারও বিরাট ফায়দা রয়েছে; বিশেষত যারা সামাজিক ও দ্বীনী কাজ করতে চায় তাদের জন্য। আর হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বলেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য 'শোকরিয়া, ধন্যবাদ' ইত্যাদির চেয়ে جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا বলাই উত্তম।

যাই হোক, সবকিছু ঠিক ছিলো, কিন্তু হঠাৎ সবকিছু বদলে গেলো। 'কী কারণে যেন' নতুন সিদ্ধান্ত হলো, হযরত এখন যাবেন না, শুধু আমরা তিনজন যাবো। নূরিয়া মাদরাসার প্রয়োজনে পাকিস্তান ও আবুধাবীতে দশদিন করে অবস্থান করে মক্কা শরীফে আমরা হযরতের ইনতিযার করবো এবং তাঁর সঙ্গে হজ্ব আদায় করবো।

আনন্দের মাঝে হঠাৎ যেন ছন্দপতন হলো। মনটা বিষণ্নতায় ছেয়ে গেলো। মেঘের ছায়া সরে যেন প্রখর রোদ মাথায় লাগলো। কিন্তু সেটা সামান্য সময়ের জন্য। গায়ব থেকেই যেন এ বুঝ এসে গেলো যে, আল্লাহর যা ইচ্ছা আমার তাতে অনিচ্ছা হবে কেন? আল্লাহর ঘরের মুসাফিরের জন্য তো পয়লা সবকই হলো, তোমার কোন ইচ্ছা নেই; আল্লাহর ইচ্ছার সামনে তোমার সব ইচ্ছাকে তুমি বিসর্জন দিয়েছো এবং খুশিমনে তোমার ইচ্ছার মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছো।

এ চিন্তা অন্তরে আমার সান্ত্বনার শীতল পরশ বুলিয়ে দিলো। আমি বললাম, হে আল্লাহ, তোমার ঘরে তুমি যেভাবে নেবে, আমি রাজি। তুমি শুধু কবুল করে নাও।

কবির ভাষায়–

মজনু চায় না কিছু, চায় শুধু যেতে লায়লার দেশে,
ডানায় উড়ে, ঘোড়ায় চড়ে, পায়ে হেঁটে, হামাগুড়ি দিয়ে।
মজনু শুধু পেতে চায় লায়লার মুখের মধুর হাসি,
তার মূল্য যদি হয় প্রাণ, তুলে নাও তবে তরবারি।

পশ্চিম আকাশে যেদিন সন্ধ্যায় রামাযানের নতুন চাঁদ উদিত হলো সেদিন আমার তাকদীরের আসমানেও উদিত হলো 'নও হেলাল'। আমাকে বলা হলো, হে ভাগ্যবান, তিনদিন পর শুরু হবে তোমার বাইতুল্লাহর মোবারক সফর! জান্নাত ছাড়া এর চেয়ে খোশখবর আর কী হতে পারে মুমিনের জীবনে!

প্রায় তিন যুগ সময় নিয়ে সেই তিন দিন পার হলো। তৃতীয় রামাযানের তারাবী নূরিয়ায় পড়লাম। পাহাড়পুরী হুযূরের খিদমতে দীর্ঘ সময় থাকলাম। তিনি তাঁর জীবনের প্রথম হজ্ব-সফরের বিভিন্ন ঘটনা শোনালেন। বাইতুল্লাহর প্রথম দীদারের অনুভূতি তাঁর মুখে অনেকবার শুনেছি, তবু মনে হলো, আজ প্রথম শুনছি।

হুযূরের উর্দূ কবিতার আবৃত্তি বড় মর্মস্পর্শী। সেই ছাত্রজীবন থেকে শুনে আসছি, কখনো তাঁর কামরায়, কখনো জোসনা রাতে নদীতে নৌকায়। তিনি স্বরচিত যে কাসীদাটি রওযা শরীফে নিবেদন করেছিলেন সেটি অনেকবার শুনেছি, আজ আবার শোনালেন। কবিতা তো নয়, যেন অশ্রুর তরঙ্গ! বিরহী হৃদয়, দরদী কণ্ঠ এবং ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুর বর্ষণ–এই তিনে মিলে সেই না'তে রাসূলের আবৃত্তি এমন মর্মস্পর্শী

হলো যে, আমারও চোখে অশ্রুর জোয়ার এলো। না'তে রাসূল অনেক শুনেছি, কিন্তু এমন আর কখনো নয়। হয়ত এ জন্য যে, তখন আমার 'বক্ষে ছিলো কা'বার ছবি, নয়নে মুহাম্মাদ রাসূল'।

বাসায় রওয়ানা হলাম রাত এগারটায়। সঙ্গে আমার আত্মীয় ওবায়দুল হক। তখন কামরাঙ্গীর চরে এগারটা মানে গভীর রাত, তদুপরি দেশে ছিলো 'সামরিক পরিস্থিতি'। পথে মানুষ ছিলো না, ছিলো তিনজন পুলিশ। তারা পথ রোধ করে ভীতিকর রকমে উত্তক্ত করতে লাগলো। কামনা করি, মানুষ যেন মানুষকে এমন কষ্ট না দেয়। যতই আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করি, তাদের মেজাজ ততই উত্তপ্ত হয়। তাদের এক কথা, এত রাতে কেন? ফাঁড়িতে চলো, সেখানে যা বলার বলো।

বাসা থেকে নূরিয়া; কামরাঙ্গীর চরের এই সোজা পথটুকুই শুধু আমার চেনা, তখনো যেমন এখনো তেমন। ফাঁড়ি কোথায়; সেখানে যাওয়া মানে কোন্ বিপদ, কে জানে! হায় আল্লাহ, হঠাৎ এ কোন্ পেরেশানি! এ কী 'জুলমানি'! রাত পোহালেই আল্লাহর ঘরের সফর, এমন সময় এমন বিপদ! মাত্র দু'শ গজ দূরে আমার মা-বাবা, অথচ তাঁদের জানা নেই, এখানে আমার কী হাশরের অবস্থা। নিরুপায় বান্দা শুধু আল্লাহকে ডাকতে পারে এবং ডাকে। আমিও ডাকলাম এবং আল্লাহ শুনলেন। হঠাৎ তাদের একজনের মন কিছুটা নরম হলো। অর্থাৎ যতটা নরম হলে জানের পরিবর্তে মালের দিকে নযর পড়ে। পকেটে সামান্য যা ছিলো তা রেখে তারা আমাদের ছেড়ে দিলো। নির্জন পথে অল্প সময়ে ছোট্ট একটি হাশর যেন গুজরে গেলো আমাদের উপর। তবে শান্তি পেলাম এই ভেবে যে, নিশ্চয় এটা আল্লাহর ঘরের সফরের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে গায়বী তারবিয়াত। নইলে হঠাৎ কেন এমন বিপদ নেমে আসবে, আবার হঠাৎ কেন এভাবে উঠে যাবে! কত কিছু হতে পারতো, অথচ কিছুই হলো না; এটা গায়বি তারবিয়াত এবং গায়বি নুছরাত ছাড়া আর কী!

বাসায় পৌঁছলাম রাত একটায়। আম্মা-আব্বা পেরেশান। তারা এ বিলম্বের এমন কারণ ভাবলেন যাতে আমার কিছুটা দোষ হয়। তবু পথের হাশরের কথা বললাম না; নীরবেই তাঁদের বকা খেলাম এবং রাতের খাবার খেলাম।

বাকি সময় দু'চোখের পাতা আর এক হলো না। সময়ও যেন পার হতে চায় না। মনের ভিতরে থেকে থেকে জেগে ওঠে বিভিন্ন শংকা, আশংকা ও উৎকণ্ঠা। হঠাৎ যদি আসমান থেকে কোন বিপদ নেমে আসে! কিংবা যমীন থেকে কোন আপদ উঠে আসে! হঠাৎ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি! হঠাৎ যদি 'অসুস্থ দেশ' আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে! মুহূর্তে কত কিছু হয়; কত কিছু হতে পারে! তাকদীরের কাছে মানুষ কত অসহায়, তবু মানুষের অহংকার ও দম্ভ থেকে যায়।

হে আল্লাহ, আজকের এ রাত পোহাবে তো? তাকদীর আমাকে সঙ্গ দেবে তো? আগামীকাল তোমার ঘরের সফর শুরু হবে তো? পথের শেষে মানযিলের দেখা পাবো তো?

অবশেষে রাত পোহালো, ভোরের আলো দেখা দিলো এবং পূর্বদিগন্তে লাল সূর্য উদিত হলো; আমার জীবনের প্রথম লাল সূর্য! এ সূর্যোদয়ের মাধ্যমেই তো শুরু হলো নতুন জীবনের নতুন দিন; আমার স্বপ্নের বাগানে ফুল ফোটা প্রথম বসন্তের শিশিরধোয়া প্রথম দিন। সূর্যের লালিমায় যেন আমার জন্য লেখা ছিলো পবিত্র সফরের প্রথম শুভেচ্ছা, *'আহলান ওয়া সাহলান'*।

***

পঁচিশ বছর আগে নানী জীবিত ছিলেন, আল্লাহর রহমতে এখনো জীবিত আছেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম, তারপর অন্যদের থেকে। সবার শেষে আম্মার সামনে। সে বড় মর্মস্পর্শী দৃশ্য! ঝরঝর করে আম্মার চোখ থেকে অশ্রু ঝরলো। সে অশ্রুর রহস্য বোঝার অনুভূতি আমার ছিলো, তাই বললাম, 'বাইতুল্লাহর গিলাফ ধরে দু'আ করবো, আল্লাহ যেন আপনার স্বপ্ন পূর্ণ করেন। আম্মা শুধু বলতে পারলেন, 'আমার সালাম..' তারপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন; কথা শেষ করা সম্ভব হলো না; দরকারও ছিলো না। বলতে পারা এবং বলতে না পারা দু'টোই গৃহীত হয়, হৃদয়ের মিনতি যদি 'আকাশের ঠিকানায়' প্রেরিত হয়।

সফরের দু'আ পড়ে ঘর থেকে রাস্তায় বের হলাম। যাবো পূর্ব দিকে, তাকালাম পশ্চিম দিকে, দু'শ গজ দূরে গত রাতে যেখানে ঘটেছিলো গায়বের 'লীলাখেলা'। নিজের অজান্তেই সেদিকে এগিয়ে গেলাম। কিছুটা অবাক হয়ে আব্বাও সঙ্গে এলেন। আমার মনে অন্যরকম এক ভাবের উদয় হলো। আসমানের দিকে তাকিয়ে বললাম, এখানে রাতের আঁধারে যেমন রক্ষা করেছো, তোমার ঘরের সফরে রাতের আঁধারে এবং দিনের আলোতে তেমনি রক্ষা করো হে আল্লাহ!

হঠাৎ দেখি, অদূরে স্কুল ঘরের পাশে টুলে বসে 'সেই তিনজন' ঢুলছেন। কাছে গেলাম এবং সালাম দিয়ে বললাম, চিনতে পেরেছেন? গত রাতে এখানে কথা হয়েছে আমাদের। আমি আল্লাহর ঘরে চলেছি। আপনারা আমার অনেক উপকার করেছেন। আমার জন্য দু'আ করবেন, আমিও দু'আ করবো।

জোর করে তাদের হাতে কিছু হাদিয়া 'গুঁজে' দিলাম। আব্বা একবার তাকান তাদের দিকে, একবার আমার দিকে। তাঁকে বললাম গত রাতের ঘটনা। তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি ভেবেছিলেন, গত রাতে স্ত্রী-কন্যার কাছ থেকে আসতে আমার বিলম্ব হয়েছিলো।

***

পায়ে হেঁটে পশ্চিমের পথে রওয়ানা হলাম। এখন ঘরের দুয়ার থেকে গাড়ীতে উঠি, তখন নৌকা পার হয়ে কিল্লার বাজার পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতাম। তখন মনে হয় আমরা সবল ছিলাম, এখন মনে হয় 'আমরা' দুর্বল হয়ে পড়েছি। কিল্লার মোড়ে হযরত হাফেজ্জী হুযূরের বাড়ীতে 'দাদীর' দু'আ নিতে গেলাম। তিনি দু'আ ও দাওয়া দু'টোই দিলেন। বিমানবন্দরে 'ভ্রমণকর' দিতে হয়, লন্ডনের যাত্রী ও মক্কার মুসাফির, উভয়কে। আমার কাছে কোন ইন্‌তিযাম ছিলো না। দাদী শুনে খুশিমনে নিজের সঞ্চয়

থেকে প্রয়োজনীয় টাকাটা দিলেন। দাদা ও দাদীর কবর এখন নূরিয়ায় মসজিদের ছায়ায়। আমার আব্বাও শায়িত সেখানে, আর শায়িত আমার সফরসঙ্গী মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেব। জীবনের মেলা ও ঝামেলা কত বিচিত্র, অথচ জীবনের পথ কত সংক্ষিপ্ত! কে জানে আমার কবর আর কত দূর! সবার কবরকে আল্লাহ ঠাণ্ডা রাখুন। মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবী (রহ) তাঁর প্রিয়জনদের কবর স্মরণ করে যে কবিতাটি প্রায় বলতেন, আমারও ইচ্ছে করে বলি–

আসমান উনকি লাহদ পে শবনম আফশানী করে
সবযায়ে নওরাস্তা উস ঘর কী নেগাহবানী করে

(তাঁদের সমাধিতে আকাশ যেন শিশির বর্ষণ করে/ সবুজের আবরণ যেন সেই ঘরকে স্নিগ্ধ রাখে।)

***

হযরত হাফেজ্জী হুযূর 'ফী আমানিল্লাহ' বলে কিল্লার মোড় থেকে বিদায় দিলেন, আর আব্বা বিমানবন্দর পর্যন্ত সঙ্গে এলেন।

বিমানবন্দরের পথ আমার পরিচিত, কিন্তু আজ পথ এবং পথের দু'পাশের সবকিছু যেন নতুন। আমি নিজেই তো নতুন! আমি যে বাইতুল্লাহর মেহমান! তাই আমার যাত্রাপথ ফুলে ফুলে সুসজ্জিত! বর্ণে বর্ণে সুশোভিত!

আবার আল্লাহ গায়বি কুদরতে আমাদের রক্ষা করলেন। বিমানবন্দরে প্রবেশের মুখে চোখের পলকে ঘটে গেলো ঘটনাটা। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি। মনে হলো, গাড়ীটা উল্‌টে যেতে যেতেও উল্‌টে গেলো না। একটি রিক্‌শা নিয়ম ভঙ্গ করে সামনে এসে পড়েছিলো। পুরুষযাত্রীটি লাফ দিয়ে সরে যেতে পারলেও তার সঙ্গিনী ও চালক গুরুতর আহত হলো। গাড়ীর চালক যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে দুর্ঘটনা এড়াতে। নইলে একটি মর্মান্তিক মৃত্যুর দৃশ্য ছিলো অনিবার্য। তারপর কী হতো আল্লাহ জানেন। মুহূর্তে কত কিছু ঘটে যায়! কত অনিশ্চিত আমাদের জীবন!

সারা সফর এবং সারা জীবন আল্লাহ যেন হিফাযত করেন জিসমানি ও রূহানি সমস্ত মুছীবত থেকে। সফরের দু'আ পড়েছিলাম তো? হাঁ, হযরত নিজে আমাদের সফরের দু'আ পড়িয়েছেন; আবার পড়লাম। জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। মুমিনের জীবনে দু'আই হলো বড় অবলম্বন, অথচ আমরা দু'আ ভুলে যাই। নিঃসন্দেহে দু'আর বরকতেই আল্লাহ আজ তাঁর ঘরের মুসাফিরদের হিফাযত করেছেন।

বিদায় মুহূর্তে বে-ইখতিয়ার আমি আব্বার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আব্বার সঙ্গে আমার এ দৃশ্য আর মনে পড়ে না। আমার বাবার দিল বড় নরম। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন এবং চোখের পানিতে ভিজলেন। আমার না পেলো কান্না, না এলো চোখের পানি। আমি যে তখন অন্য জগতে। সেখানে কখনো আনন্দ, কখনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব, কখনো শিহরণ, কখনো কম্পন, কখনো উৎকণ্ঠা। পশ্চিমের কবি বলেছেন–

প্রেমিকের হৃদয়াকাশে কখনো মেঘ ঝরে, কখনো রোদ হাসে।

এ যেন প্রেমাস্পদের রহস্যঘেরা মুখের ছায়া।
এ রহস্যের স্বাদ যদি পেতে চাও,
প্রেমিক হও, কিংবা প্রেমিকের সঙ্গী।

বাবা তার সন্তানকে, আল্লাহর ঘরের মুসাফিরকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিলেন এই দু'আ পড়ে- أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكَ

(আল্লাহর হাতে অর্পণ করছি তোমার দ্বীনকে, তোমার আমানতকে এবং তোমার আমলের সুপরিণতিকে।)

কী গভীর মর্মসমৃদ্ধ দু'আ! কত নির্ভয়তা ও নির্ভরতা সৃষ্টি করে মুমিনের অন্তরে এ দু'আ! বান্দার দ্বীন ও দুনিয়া, বান্দার জিন্দেগির শুরু ও শেষ সব যখন আল্লাহর হাওয়ালা তখন তার ভয় ও ভাবনা কিসের! আল্লাহর হাওয়ালা ও হিফাযত থেকে কোন কিছু কি নষ্ট হতে পারে!

বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। জীবনের প্রথম সফর। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা জানা নেই, তবু সবকিছু সহজেই সম্পন্ন হলো। পাসপোর্টে বাইতুল্লাহর সফরের সিলছাপ দেখে সংশ্লিষ্ট সকলে অন্তরঙ্গ আচরণ করলেন, আমরা শুধু দাঁড়িয়ে থাকলাম। আল্লাহর ঘরের মেহমান নিজে যদি নিজেকে অসম্মান না করে, কেউ তার সম্মান ক্ষুণ্ন করে না, এমন কি অমুসলিম দেশেও না।

সিঁড়ি বেয়ে বিমানের দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। পিছনে ফিরে তাকালাম, আব্বা হাত নাড়ছেন। হঠাৎ মনটা হুহু করে কেঁদে উঠলো, কেন? জানি না, আমিও হাত নাড়লাম। নিজের অজান্তেই উচ্চারণ করলাম,

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً

(হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাঁদের প্রতি রহম করুন যেমন তাঁরা ছোট অবস্থায় আমাকে প্রতিপালন করেছেন।)

মা-বাবা সন্তানকে ভালোবাসেন, এটা স্বাভাবিক এবং এটা সত্য যে, সে ভালোবাসার তুলনা নেই। কিন্তু আমার প্রতি আম্মা-আব্বার ভালোবাসা তুলনাহীনের মাঝেও অতুলনীয়। হয়ত পৃথিবীর সবসন্তানের একই অনুভূতি এবং সে অনুভূতিকে আমি শ্রদ্ধা করি। তবু বলতে ইচ্ছা করে, আমার মা অন্য রকম মা এবং আমার বাবা ভিন্ন রকম বাবা।

আমি তখন এক বছরের শিশু। গ্রামে নানীর বাড়ীতে ভীষণ ঝড় হলো, সে ঝড় নাকি ছিলো রোজ কিয়ামতের চেয়ে কিছু কম। আমাকে নানীর কোলে রেখে আম্মা গিয়েছিলেন পাশের গ্রামে কোন আত্মীয়ের বাড়ী। সন্ধ্যায় দশদিক অন্ধকার করে হঠাৎ যখন ঝড় শুরু হলো, আমার মা রোজ কিয়ামতের সেই ঝড় উপেক্ষা করে ছুটে এসেছিলেন আমার চিন্তায় অস্থির হয়ে। সেই ঝড়ের রাতে আমার মায়ের নাকি একমাত্র ভাবনা ছিলো, জীবনের বিনিময়ে হলেও কীভাবে আমাকে বাঁচানো যায়!

মায়ের প্রশান্ত মুখ দেখে এখনো আমি বুঝতে পারি তাঁর মমতা ও ব্যাকুলতার গভীরতা।

আর আব্বা! ঐ যে দূরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন আমার আব্বা! আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তাঁর চোখ থেকে নিশ্চয় অশ্রু ঝরছে। জীবনের সবকিছু তিনি কোরবান করেছেন আমাদের জীবন গড়ার জন্য। তিনি বলতেন, তোমাদের লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনে আমি আমার রক্ত বিক্রি করবো। বিক্রি করেননি, তবে আমাদের জন্য তিনি তাঁর রক্ত পানি করেছেন।

দূর থেকে আব্বাকে হাত নাড়তে দেখে আমি খুব কাতর হয়ে পড়লাম। আজ আল্লাহর ঘরে রওয়ানা হওয়ার পবিত্র মুহূর্তে মনে হলো, এক ফোঁটা আমিও হয়ত ভালোবাসি আমার আম্মাকে, আব্বাকে।

বিমানের ভিতরে প্রবেশ করলাম। যেন পিছনের জগৎ ত্যাগ করে সামনের জগৎকে বরণ করে নিলাম। অবশ্য সামনের জগৎ এখনো অনেক দূরে, তবে আমার মনে হলো অনেক কাছে, একেবারে চোখের সামনে। ঐ তো আশিক মজনুর দল ঘুরছে; কালো ঘর প্রদক্ষিণ করছে। আমি আসছি, হে আল্লাহ, আমি আসছি। তোমার কুদরতে হে আল্লাহ, আমাকে পৌঁছে দাও তোমার ঘরের দুয়ারে।

সকাল আটটা। বিমান চলতে শুরু করেছে; বিমানের চাকা ঘুরছে। আমার বুক দুরু দুরু করছে। বিমানের চাকার সঙ্গে আমার ভাগ্যের চাকাও যে ঘুরছে! কী আছে আমার ভাগ্যে? মানুষ কি বলতে পারে তার ভাগ্যের কথা? এক মুহূর্ত পরের কথা? তবু জীবনের চাকা ঘুরছে, তবু জীবনের গতি সচল রয়েছে এবং মানুষ এগিয়ে চলেছে; কেউ সত্যের পথে, কেউ মিথ্যার পথে; কেউ আলোর পথে, কেউ অন্ধকারের পথে। এক সময় সময়ের চাকা থেমে যায় এবং জীবনের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর হয় চিরঅন্ধকার, না হয় অনন্ত আলো। হে আল্লাহ, সত্যের আলোকে অনুসরণ করে আমি যেন অনন্ত আলোর জগতে প্রবেশ করতে পারি।

বিমানের চাকা আরো জোরে ঘুরছে; সেই সঙ্গে ঘুরছে আমার ভাগ্যেরও চাকা। ভাগ্য আমাকে নিয়ে যাবে তো আমার প্রিয় গন্তব্যে? জানি না; আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তবে আমি জানি, আমি মদীনার পথিক, আমি মক্কার মুসাফির। আমি আল্লাহর ঘরের মেহমান। আমার ভয় কি? তাঁর যা ইচ্ছা, আমারও তাই ইচ্ছা।

বিমান ছুটছে; বিমান থরথর করে কাঁপছে। আমি আমার ভিতরে ভাবের তরঙ্গে দুলছি এবং অজানা ভবিষ্যতের মধুর উত্তেজনায় কাঁপছি। বিমান থামলো এবং দৌড় শুরু করলো। বিমান এক সময় ডানা মেলে আকাশে উড়লো। গতি তার পশ্চিমের অভিমুখে। বিমান নয়, আমি নিজেই যেন ডানা মেলে উড়ে চলেছি আকাশে, পশ্চিমে। আমি যে পশ্চিমের যাত্রী! সময় যত পার হচ্ছে পশ্চিমের পথে আমি তত এগিয়ে চলেছি, দূরত্ব তত কমে আসছে। হে কালো গিলাফ! হে সবুজ গম্বুজ! আমি আসছি, আরো কাছে আসছি।

দশদিন পাকিস্তানে

ভুলেই গিয়েছিলাম, আমি হিজাযের যাত্রী হলেও বিমানের গন্তব্য পাকিস্তান। তাই আমাকে নামতে হলো পাকিস্তানের মাটিতে, করাচী বিমানবন্দরে। তবু সান্ত্বনা, যে পথ ধরে আমি চলেছি তা তুর্কিস্তানের পথ নয়, হিজাযেরই পথ। সুতরাং পথ যত দীর্ঘ এবং সময় যত প্রলম্বিত হোক হিজাযভূমিতে একসময় পৌঁছে যাবে আমাদের কাফেলা। বরং এ দীর্ঘ পথ ও দীর্ঘ সফর, আমার মনে হলো আল্লাহর নেয়ামত। এ যেন আমাদেরই কল্যাণের জন্য গায়বের তারবিয়াতি ইনতিযাম। ঢাকা থেকে জিদ্দা, হয়ত একদিনেই পৌঁছে যেতাম আল্লাহর ঘরে, কিন্তু পাপ-পংকিলতায় ডুবে থাকা জীবনের প্রথম সফরে আল্লাহর ঘর যিয়ারাতের জন্য জিসমানি, কলবানি ও রূহানি যে শোধন ও সংশোধনের প্রয়োজন তা সম্পন্ন হতো কীভাবে? মুসাফিরের জন্য সফর হলো এক গায়বি তারবিয়াত, এ সত্য আমি উত্তমরূপে উপলব্ধি করেছি আল্লাহর ঘরে হাযির হওয়ার আগে বিশদিনের দীর্ঘ এই সফরে। নিজের দেশ নেই, পরিচিত পরিবেশ নেই, কাছের এবং পাশের মানুষগুলো নেই। সবকিছু অজানা, অচেনা; সবকিছু আজনবী; আমি ও আমার চারপাশের সবাই আজনবী। শুধু উপরে আকাশের দিকে তাকালে মনে হতো, এ আমার চিরপরিচিত, চিরআপনার। কারণ আকাশের কোন 'ভূগোল' নেই। দিনের সূর্য এবং রাতের চাঁদ-তারাদের কোন ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। তাই তো দূর দেশের মুসাফির চাঁদকে মিনতি জানিয়ে বলতে পারে, 'আয় চান্দ, উন্‌সে যা কার মেরা সালাম কাহনা।' (হে চাঁদ, আমার মিনতি শোনো, তাঁকে আমার সালাম নিবেদন করো।)

জানি না, কবির হৃদয়ে কাকে সালাম নিবেদনের আকুতি ছিলো; তবে অনেকবার আমি চাঁদকে মিনতি জানিয়েছি আল্লাহর ঘরকে এবং সবুজ গম্বুজকে আমার সালাম নিবেদন করার জন্য। পরে হিজাযের আকাশে পরিচিত চাঁদকে দেখতে পেয়ে আমার মনে হয়েছে, হয়ত চাঁদ আমার মিনতি রক্ষা করেছে।

মুসাফিরের দিল থাকে কোমল, চোখ থাকে সজল; আর কোমল হৃদয় ও সজল চোখ আল্লাহর প্রিয়। তাই মুসাফিরকে আল্লাহ নিজে সঙ্গ দান করেন; মুসাফিরের চোখের পানি আল্লাহ নিজের হাতে মুছে দেন; দীর্ঘ সফরে বারবার এ সত্য আমি

অনুভব করেছি। ধীরে ধীরে আমার দেহসত্তা যেন পবিত্র হয়েছে; একটু একটু করে আমার হৃদয় ও আত্মা যেন পরিশুদ্ধ হয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে আমার ভিতরের 'আমি' যেন পরম সত্তার সংস্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়েছে। এভাবে আমার সমগ্র অস্তিত্ব যেন কালো গিলাফের এবং সবুজ গম্বুজের 'বর্ণসৌন্দর্য' অনুভবের কিছুটা হলেও উপযোগী হয়েছে।

***

পাকিস্তানে আমাদের প্রথম দিনটি ছিলো শুক্রবার। করাচীর নাযিমাবাদে যেখানে আমরা ছিলাম সেখান থেকে কিছু দূরে এক শানদার মসজিদ ছিলো। সেখানে আমরা জুমু'আর নামায পড়েছিলাম। লালবাগ-জীবনের সহপাঠী ভাই আবদুর-রহমান আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। দশদিন তিনি ছায়ার মত সঙ্গ দিয়েছেন এবং প্রিয়জনের মত আনন্দ দিয়েছেন। আজ পঁচিশবছর পর জানি না তিনি কোথায়, তবে তার ছবি আছে আমার অন্তরে।

এমন সুন্দর মসজিদ এবং এমন নূরানী চেহারার খতীব জীবনে কম দেখেছি। আরো আনন্দের বিষয়, খতীব সেদিন হজ্ব-ওমরা ও যিয়ারাতের ফাযায়েল বয়ান করেছিলেন। কারণ মসজিদের মুতাওয়াল্লী ছাহেব বাইতুল্লাহর সফরে রওয়ানা হচ্ছেন। খতীব ছাহেবের হৃদয়ের উত্তাপ এবং কণ্ঠের উচ্ছ্বাস আমাদের অভিভূত করেছিলো। বাইতুল্লাহর মুসাফিরকে সম্বোধন করে আবেগ-উদ্বেলিত কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, আপনি কি ভাবছেন, আল্লাহর ঘরে আপনি একা যাচ্ছেন? না, বরং আমাদের সবার দিল আপনার সঙ্গে যাচ্ছে। আমাদের জিসিম মজবূর, কিন্তু দিল শাওকে ভরপুর, আর দিলের শাওক হলো সেই ডানা যা উড়িয়ে নিতে পারে দূরে, বহু দূরে। মসজিদে তখন কান্নার রোল পড়েছিলো। আমরাও কেঁদেছিলাম, কান্নার জন্য এর চেয়ে সুন্দর উপলক্ষ আর কী হতে পারে!

নামাযের পর আমরা বাইতুল্লাহর মুসাফিরের সঙ্গে মুসাফাহা করলাম। কোনদিন যার সঙ্গে চোখের দেখা ছিলো না, মনের জানা ছিলো না, তাকেই মনে হলো হৃদয় ও আত্মার কত নিকটের! মানুষ মানুষের নিকটে হয় কিভাবে, মানুষ মানুষ থেকে দূরে হয় কিভাবে, এ প্রশ্নের জবাব কি আছে তোমার কাছে?

একদিন তারাবীর পর গেলাম আরব সাগরের পারে ক্লিফটনে। জোসনা রাত ছিলো, আকাশে শুভ্র মেঘের আনাগোনা ছিলো। সাগরের ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ছে। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছি। সাগরের ঢেউ এবং আমার ভিতরের ঢেউ যেন একাকার হয়ে গেলো। শুভ্রস্নিগ্ধ জোসনায় সৈকতের বালু চিকচিক করছে এবং সাগরের পানি ঝিলমিল করছে। 'আরব' শব্দটি যেন সাগরের মাঝে এবং আমার হৃদয়ের মাঝে অপূর্ব এক বন্ধন সৃষ্টি করলো। আরবভূমি এবং আরবসাগর আমার কাছে অভিন্ন মনে হলো। আরবসাগরের নোনা বাতাসে আমি যেন পেলাম আরবের মরুভূমির অন্যরকম বাতাসের স্পর্শ। এই প্রথম আমি এমন কিছুর সান্নিধ্য লাভ করলাম যার সঙ্গে রয়েছে আরবের নাম। এই সাগর পাড়ি দিয়েই তো আরবভূমি এবং আরবের বন্দর!

সাগর পাড়ি দিয়ে যারা হজ্বের সফরে যায় তাদের সফরনামা আমি পড়েছি। দূর থেকে আরবভূমির তীর এবং আরবের পাহাড়-পর্বত দেখে তাদের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, যে অনুভব-অনুভূতি তাদের আন্দোলিত করে, ইশক ও মুহব্বত এবং প্রেম ও ভালোবাসার যে অপূর্ব তরঙ্গদোলা তাদের উদ্বেলিত করে তা আমি তাদের লেখা থেকে জেনেছি। আরবসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে সেই সব অনুভব-অনুভূতি আমারও হৃদয়ে অপার্থিব এক তরঙ্গদোলা সৃষ্টি করলো। আমার হৃদয়-সাগরের পালতোলা জাহাজ যেন ঢেউয়ের বাঁধা ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগিয়ে চললো এবং আরবের বন্দরে গিয়ে নোঙ্গর করলো।

আরবসাগরের তীরেই সেদিন আমাদের রাত ভোর হলো। খোলা আকাশের নীচে কাগজের দস্তরখান বিছিয়ে খুব সামান্য সেহরী খাওয়া হলো, কিন্তু আমার জীবনে সেটা ছিলো অসামান্য। এমন সেহরী জীবনে এই প্রথম। আমি যার মেহমান, এ যেন তাঁরই দস্তরখান। বিশ্বাস করো, পৃথিবীর সব রাজা-বাদশাহর দস্তরখান আমি কোরবান করে দেবো আরবসাগরের তীরে বিছানো সেহরীর সেই দস্তরখানের জন্য।

***

পাকিস্তানে দশদিনের সফরে আমরা বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য ব্যক্তির সাথে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। মাদরাসার প্রয়োজনে দূর-দারাজের সফরও হয়েছে। এ সময় যা দেখেছি, শুনেছি এবং চিন্তা-ভাবনার যে সকল উপাদান পেয়েছি তাতে আমার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে বিপুল এবং আমি মনে করি, অন্যদের জন্যও তাতে রয়েছে শিক্ষার মূল্যবান উপকরণ। কিন্তু এখানে যদি সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণও তুলে ধরি, পথেই আমার সফরনামা হয়ে যাবে অনেক দীর্ঘ। তাই কোন উপযুক্ত সময়ের জন্য সেগুলোকে মুলতবি রেখেই আমি আগে বাড়তে চাই। এখানে শুধু বলে রাখি, পূর্ব ও পশ্চিমের পার্থক্য আমি দেখতে পেয়েছি সমাজের সর্বস্তরে, এমনকি দু'দেশের আলিমসমাজেরও মধ্যে। ওখানে বিত্তশালীরাও সাধারণভাবে অনেক বিনয়ী এবং দ্বীনের খিদমতের ক্ষেত্রে নিজেদের কাছেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; আবার আহলে ইলমও যথেষ্ট সমাজসচেতন।

এখানে আমি এমন দু'টি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই, যা আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে, যা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। তাছাড়া ঘটনাদু'টো আমার হজ্বের সফরেরই অংশ এবং সম্ভবত এর মাধ্যমে গায়ব থেকে আমার তারবিয়াত করা হয়েছিলো বাইতুল্লাহর যিয়ারাতের জন্য।

সম্ভবত আটই রামাযান, মাদরাসার প্রয়োজনে আমাদের যেতে হলো অনেক দূরের সফরে। সকাল আটটায় রওয়ানা হয়ে পথে এক নির্জন ভূমিতে গাড়ী থামিয়ে আমরা যোহর আদায় করলাম। সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম 'পাকিস্তানী' গরম কাকে বলে! একবার ইচ্ছা হলো সফরের সুবিধা নিয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলি, কিন্তু লজ্জা হলো কালো ঘরকে স্মরণ করে। এই সামান্য কষ্টে যদি এমন কাতর হয়ে পড়ি তাহলে সেই ঘরের

দরজায় মুলতাযামে গিয়ে দাঁড়াবো কী করে? আবে যামযামের কিনারে গিয়ে বলবো কীভাবে, দাও, শীতল পানি দাও, আমি পিপাসার্ত!

তাই শুকনো ঠোঁটের সামনে পানির বোতল এনেও মুখে শুধু পানির ঝাপটা দিয়ে বোতল নামিয়ে রাখলাম। আছরের সময় গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম। দৌড়ঝাঁপ হলো, মাদরাসার কাজ হলো না তেমন কিছু। এর কারণ কিছুটা অভিজ্ঞতার অভাব, কিছুটা পরিচয়ের সংকট, আর কিছুটা দায় আত্মসম্মানবোধের। পুরো সফরেই এ তিন 'উপসর্গ' আমাদের যথেষ্ট ভুগিয়েছে। ফলে মাদরাসার কাজ আমাদের দ্বারা, বিশেষ করে আমার দ্বারা বলতে গেলে কিছুই হয়নি।

ফেরার পথে কিছু দূর এসে ইফতারের সময় হয়ে গেলো। সঙ্গে ছিলো সামান্য পানি। আমরা মসজিদ তালাশ করলাম। নিজের দেশে হোক কিংবা পরদেশে, মসজিদের চেয়ে আপন ও নিশ্চিন্ত ঠিকানা আর কী হতে পারে! হোক তা আলিশান ইমারতের, কিংবা 'সামান্য' খেজুর পাতার। কিন্তু মসজিদের ঠিকানা খুঁজে পেলাম না।

কাঁচা পথ ধরে হাঁটছি, আর ভাবছি, কোথাও রুমাল বিছিয়ে বসে পড়ি। এলাকাটা মনে হলো বেশ দারিদ্র্যপীড়িত। একটি বাড়ীর বাইরের অঙ্গনে ছেঁড়া শতরঞ্চি পেতে কয়েকজন রোযাদার সামান্য ইফতার নিয়ে বসে আছেন। আমরা পরদেশী, বোঝাই যায়। আমাদের তারা ইফতারে শরীক হওয়ার দাওয়াত দিলেন। ইফতারের সময় মুমিন রোযাদার মুমিন রোযাদারের কত আপন হয় তা নিজের দেশে পুরোপুরি অনুভব না করলেও যত পশ্চিমে গিয়েছি তত বেশি উপলব্ধি করেছি। তবু এই রোযাদারদের দাওয়াত কবুল করতে আমাদের সংকোচ বোধ হলো, (অন্তত আমার সংকোচের কারণ ছিলো ইফতারের শুধু গরিবানা নয়, বরং এতিমানা হালত) কিন্তু তারা উঠে এসে এমন অন্তরঙ্গভাবে টেনে নিলেন যে, আমরা সত্যি অভিভূত হলাম। আজ পঁচিশ বছর পরও সে দৃশ্য আমার স্মৃতিতে অম্লান। 'বিত্তে দরিদ্র, চিত্তে ধনাঢ্য' কথাটা বইয়ের পাতায় পড়েছি, জীবনের পাতায় সেদিন প্রথম পড়ার সুযোগ হলো।

তাদের সঙ্গে আমাদের জীবনে এই প্রথম দেখা। আগে না ছিলো সাক্ষাৎ, না পরিচয়। অথচ কয়েক টুকরো রুটি ও খোরমা খেজুরের সামান্য ইফতারে এমন সাদরে বরণ করে নিলেন, কিসের টানে! কিসের বন্ধনে!! তারপরও কি থাকতে পারে ভাষার ব্যবধান! ভূগোলের দূরত্ব!! আসলে রাজনীতির খেলা বড় বিচিত্র!

জীবনের স্মরণীয় 'ইফতার মাহফিল' শেষে মাগরিব আদায় করলাম। সুন্নাতের পর আমি সামনের খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিগন্তের সৌন্দর্য-শোভা উপভোগ করছিলাম এবং কিছুটা তন্ময় অবস্থায়। আকাশ-দিগন্তের লালিমা হৃদয়দিগন্তে যেন ছড়িয়ে দিয়েছিলো ভাবের লাল আবির। আমি তো যাবো আরো পশ্চিমে। সেখানে দিগন্তের লালিমা নিশ্চয় আরো সুন্দর, আরো মনোহর!

ভাবের তন্ময়তা ছিন্ন হলো কারো উপস্থিতির শব্দে। পিছনে ফিরে দেখি, 'জীর্ণশীর্ণ' এক বৃদ্ধা দুধের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, দু'কদম এগিয়ে তিনি বললেন, 'বেটা. ইয়ে দুধ, পী লো।'

কী ছিলো তার অনুরোধের কণ্ঠে! আন্তরিকতা! স্নেহ!! মমতা!!! মনে হলো এ কণ্ঠ আমার চিরপরিচিত! এ কণ্ঠের দেশ, কাল নেই; নেই কোন ভাষা ও গোত্র! এ কণ্ঠ চিরকালের, সকল দেশের, সকল ভাষা ও গোত্রের!

কুণ্ঠিত হাতে দুধের গ্লাস নিলাম। কৃতজ্ঞতার শব্দ বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। মনে হলো, তাতে মমতার এ মাতৃমূর্তিকে অসম্মান করা হবে।

গ্লাস ফিরিয়ে দেয়ার পরও তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি ইতস্তত করে বললাম, কিছু বলবেন? গলার আওয়াজে দ্বিধার জড়তা এবং অদ্ভুত এক বিষণ্নতা নিয়ে তিনি বললেন, বেটা, শুনেছি তোমরা বাইতুল্লাহর মুসাফির! আমাদের মত গরীবদের কি সে কিসমত হবে! যিন্দেগী পার হয়ে গেলো, দিলের তামান্না দিলেই রয়ে গেলো, এখন তো আফসোস নিয়েই কবরে যেতে হবে। বেটা, তুমি কাবা শরীফের গিলাফ ধরে দু'আ করো, আর পেয়ারা নবীর হুযূরে আমার সালাম পেশ করো।

সেদিন আল্লাহর সেই বান্দীর সামনে দাঁড়িয়ে আমি যেন ইশক ও মুহাব্বাতের এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পেলাম। দিলের আরযু ও তামান্না এবং দিলের দরদ ও হাসরাতের এক নতুন রূপ আমার সামনে প্রকাশ পেলো। মনে পড়লো দাদীর কথা। তিনিও কি আল্লাহর ঘরের কোন মুসাফিরকে সালাম ও দু'আর মিনতি জানিয়েছিলেন? কে বেশি ভাগ্যবান, সালাম বহনকারী, না সালামের নাযরানা প্রেরণকারী? কে যাও সোনার মদীনায়! আমার সালামখানি পৌঁছে দিও নবীজীর রওযায়– এ আবদার ও মিনতি তো চিরকালের এবং সকল দেশের সকল মাজবূর আশিকানের। তুমি যদি এমন সালাম বহন করে নিয়ে যেতে পারো তাহলে ভালো মজুরি আশা করতে পারো। মজনুর সালামের বাহক ভিখারী যেমন লায়লার কৃতজ্ঞতা লাভ করেছিলো!

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের ঘটনা, কিন্তু আমার স্মৃতিতে এখনো তা সমুজ্জ্বল। মুলতাযামে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সেই মাজবূর বান্দীর জন্য আমি দু'আ করেছিলাম এবং নবীজীর রাওযায় তার সালামের নাযরানা পেশ করেছিলাম।

আল্লাহর সেই বান্দী কি এখনো বেঁচে আছেন দুনিয়ায়? তার দিলের তামান্না কি পূর্ণ হয়েছিলো? না আমার দাদীর মত স্বপ্নের বেদনা সঙ্গে করে তিনি এখন কবরের বিছানায়! মাটির উপরে কিংবা নীচে যেখানেই থাকুন আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন।

***

করাচীর নাযিমাবাদে যেখানে আমরা মেহমান ছিলাম, সেটা ছিলো হযরত হাফেজ্জী হুযূরের খাছ মুহাব্বাতের মানুষ হাজী হাবীব ছাহেবের বাড়ী। তিনি ঢাকায় থাকতেন। তাঁর কন্যা ও জামাতা পরম যত্নের সঙ্গে আমাদের মেহমানদারি করেছেন। তাদের আন্তরিকতা ভোলার মত নয়। অকৃতজ্ঞ বান্দা ভুলে যেতেও পারে, কিন্তু 'কৃতজ্ঞ' মনিব ভোলেন না, ভুলতে পারেন না।

বিদায়ের আগের দিন তাদের ছোট ছেলে– নাম মনে নেই, আমার সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়েছিলো– সে চুপি চুপি আমার কাছে এলো; ভাবখানা; কেউ যেন দেখে না ফেলে। আমি কিছুটা অবাক, সে আমাকে আরো অবাক করে দু'টো চকলেট হাতে

দিয়ে বললো, 'আল্লাহ মিয়াঁকো দে দেনা।'
আমি তার হাদিয়া নিয়ে গিয়েছিলাম আল্লাহ মিয়াঁর কাছে। সে যদি বেঁচে থাকে, এখন নিশ্চয় বেশ জোয়ান হয়েছে। আমার বড় জানতে ইচ্ছা করে, তার কি মনে পড়ে আল্লাহ মিয়াঁর কাছে পাঠানো হাদিয়ার কথা! আল্লাহ যেন তার হাদিয়া কবুল করেন, আল্লাহ যেন তার দিলের তামান্না পূর্ণ করেন। জীবনের অনেক বড় একটি সৌভাগ্য যে, এক অবুঝ শিশুর অবুঝ হাদিয়া আল্লাহ মিয়াঁর কাছে আমি বহন করে নিয়েছিলাম।

***

পাকিস্তানে আমাদের দশদিন শেষ হয়ে এলো। এ দশদিনে হৃদয়ের জগতে অর্জন কিছু হলো কি না বলতে পারি না, তবে শাওক ও তামান্না এবং আকুলতা ও ব্যাকুলতা যে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে তা অনুভব করতে পারছিলাম। হায়, আজ পঁচিশবছর পর তার ছিটেফোঁটাও যেন নেই এ অভাগা অন্তরে। বসন্ত কি জীবনে একবারই আসে! বারবার আসে না! বারবার আসতে পারে না!

বিদায়ের আগের রাতটি আমরা যাপন করলাম জামেয়া ফারুকিয়ায়। এর প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তানের সর্বজনমান্য আলিম হযরত মাওলানা সালীমুল্লাহ খান ছাহেব। তিনদিন আগে একবার আমরা তাঁর খিদমতে হাযির হয়েছিলাম দু'আ নেয়ার জন্য। তখন তিনি খুব শাফকাতের সঙ্গে বলে দিয়েছিলেন, শেষ রাতটি যেন আমরা এখানে থাকি এবং এখান থেকে বিমানবন্দরে যাই। আমাদের মেযবান একটু আপত্তি করলে। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'ভাই, হাম ফাকীরোঁ কো ভী কুছ মাওকা মিলে।'
এরপর একজন শরীফ মেযবানের আর কী বলার থাকতে পারে! এটাই ছিলো হযরত মাওলানার 'আন্দাযে কালাম' ও 'বাকভঙ্গি'। তাঁর মুখের মৃদুহাসি এবং সহজ সরল অভিব্যক্তি যে কাউকে মুগ্ধ করে। আমরা তো ছিলাম এক রাতের মেহমান। কিন্তু পুরো দশদিন আমরা আলিম ও তালিবে ইলম সবার অন্তরেই তাঁর প্রতি আযমত ও মুহাব্বাত দেখেছি।

তারাবী থেকে সেহরী পর্যন্ত দীর্ঘ সময় আমরা তাঁর খিদমতে ছিলাম। অন্যদের জন্য এটা বিস্ময়ের বিষয় ছিলো। কারণ তাঁর 'সময়যাপন' ছিলো সুশৃঙ্খল। কিন্তু সেদিন আমাদের জন্য তিনি ব্যতিক্রম করেছিলেন। আর বলাবাহুল্য, হযরত হাফেজ্জী হুযূরের নিসবতই ছিলো এর কারণ। তদুপরি তাঁর প্রতিটি আচরণে ও উচ্চারণে ছিলো ফিতরী শারাফাত ও স্বভাবভদ্রতা, বিনয়, ইখলাছ ও আন্তরিকতার ছাপ। তাঁর ছোহবত ও নছীহত আমার জন্য ছিলো আবে হায়াত। বাইতুল্লাহর সফর তো বটেই, পরবর্তী জীবনেও আমি তা দ্বারা উপকৃত হয়েছি।

বিনিদ্র রাতের ঐ মজলিসে যেন নেমে এসেছিলো বসন্তের বাহার। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ভাবনার কথা বলেছিলেন। বিশেষ করে যুগের দাবী এবং দ্বীনী শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিলো খুবই সুচিন্তিত। বাংলাদেশে নূরীয়া মাদরাসায় হযরত হাফেজ্জী হুযূরের তত্ত্বাবধানে তালীমের ক্ষেত্রে,

বিশেষত আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তা সবিনয়ে তাঁর খিদমতে নিবেদন করা হলো। আমাদের মত নওজোয়ানদের কথা তিনি যে মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে শুনেছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন, এককথায় আমার জন্য তা ছিলো পরম বিস্ময়ের বিষয়।

হজ্ব ও যিয়ারাতে বাইতুল্লাহ সম্পর্কে তাঁর নছীহতগুলো ছিলো লিখে রাখার মত। আফসোস, তা করিনি। কে জানতো, আজ পঁচিশ বছর পর আমার হাতে কলম ওঠবে এবং সেই কলম থেকে কালি ঝরবে! তখন যদি সংক্ষিপ্ত আকারেও লিখে রাখতাম, খুব কাজে আসতো। তাঁর একটি উপদেশ এখনো আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। তিনি বলেছিলেন, 'হামেশা ডরতে রাহনা, মাকাম কি আযমত কা খায়াল রাখনা আওর মাকামে আবদিয়াত কা ইসতিহযার রাখনা।' (ভয় করতে থেকো। আল্লাহর বড়ত্ব ও আযমতের মাকাম স্মরণে রেখো এবং নিজের আবদিয়াত ও দাসত্বের অনুভূতি অন্তরে জাগরূক রেখো)। আকাবিরীনের হজ্ব ও যিয়ারাতের বিস্ময়কর বহু ঘটনা তিনি বলেছিলেন, আর নিজের জীবনের প্রথম হজ্ব ও যিয়ারাত এবং বাইতুআল্লাহর প্রথম অবলোকনের অনুভব-অনুভূতির সুমধুর স্মৃতিচারণ করেছিলেন। তখন তাঁর চেহারায় ইশক ও মুহাব্বাতের যে অপূর্ব উদ্ভাস দেখেছিলাম এখনো তা আমার চোখের তারায় ভাসছে।

বড়রা সত্যই বলেছেন, কিতাবের হাজার পাতার চেয়ে আল্লাহর কোনো নেক বান্দার ক্ষণিকের ছোহবত অনেক বেশী উপকারী। কিতাব হয়ত জ্ঞান দান করে, কিন্তু ছোহবত দান করে অন্তর্জ্ঞান। অধ্যয়ন যদি হয় প্রদীপ, সান্নিধ্য হলো হৃদয়ে সেই প্রদীপের প্রজ্বলন।

নতুন দেখা এবং নতুন পরিচয়, কিন্তু বিদায়কালে মনে হলো, তাঁর কলিজার ভিতরে কোথাও টান পড়ছে, তাঁর কষ্ট হচ্ছে। 'খোদা হাফিয' আমাদের অনেকেই বলেছেন, তবে এমনভাবে নয়। আজ এত বছর পরো তাঁর সেদিনের সজল চোখের দৃষ্টি আমাকে আপ্লুত করে। আগে ও পরে এ অভিজ্ঞতা জীবনে আর কখনো হয়নি। সেদিন তিনি দু'আ করেছিলেন, 'পবিত্রভূমির সকল রূহানী নেয়ামত দ্বারা আল্লাহ যেন তোমাদের মালামাল করেন'।

তাঁর নির্দেশে তাঁর পুত্র মাওলানা খালিদ নিজে গাড়ী চালিয়ে আমাদের বিমানবন্দরে পৌছে দিলেন। সেখানেই আমরা ফজর পড়লাম। তারপর পিতার মত পুত্রের সঙ্গে আলিঙ্গন এবং একই রকম আলিঙ্গন!

আশ্চর্য! এঁদের পয়দায়েশ যে মাটি থেকে, এটা কি সে মাটিরই গুণ! শুনেছি জমির মাটি পরীক্ষা করার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায় রয়েছে। মানুষের শরীরের মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা কি হবে কোনদিন! আমার জানতে ইচ্ছে করে, কী পার্থক্য পূর্বদেশের এবং পশ্চিমদেশের মাটিতে? কেন তারা আমাদের মত নয় এবং কেন আমরা তাদের মত নই? দশদিনে এখানে যা দেখলাম, যা পেলাম পঁচিশবছরে আমার-দেশে কেন তা পেলাম না?

বিমানবন্দরে খালিদ যখন বিদায়-আলিঙ্গন করলেন এবং তার হৃদয়ের উষ্ণতা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করলো, এ প্রশ্নগুলো তখন কাঁটা হয়ে বারবার বুকে বিঁধল। আমার দেশে বহু খালিদের সঙ্গে আরো বেশী করে আমার পরিচয় হয়েছে এবং আমরা আলিঙ্গন করেছি, কিন্তু সেই খালিদের সেই আলিঙ্গন-উষ্ণতা ছিলো অন্যরকম। খালিদ যখন খোদা হাফিজ বললেন তখন বাবার মত তারও চোখ দু'টো ছিলো অশ্রুসিক্ত। সন্তান সেদেশে আসলেই বাবার প্রতিচ্ছবি। খালিদ, আশা করি আপনি বেঁচে আছেন এবং শান্ত-সুন্দর জীবন যাপন করছেন। এত দূর থেকে আমার হৃদয় আপনাকে দিতে পারে শুধু শিশিরভেজা এক টুকরো শুভকামনা।

পাকিস্তানের আলিমসমাজ যা পারেন, আমরা কেন তা পারি না, এর জবাব আমি পেয়েছি সেখানে কিছু তিক্ত, কিছু মধুর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। এখন থাক সে প্রসঙ্গ।

***

বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতার পর আমরা যখন আবুধাবীগামী পিআইএ বিমানের উদ্দেশ্যে বাসে উঠছি তখন অভিভূত দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম সেই পোশাক, যাতে পরিচয় থাকে না দেশ, ভাষা ও গোত্রের, পরিচয় থাকে শুধু একটি, 'বাইতুল্লাহর মুসাফির'। অন্যএক নির্গমনপথ দিয়ে ইহরামের শুভ্র পোশাকে কয়েকজন বের হলো এবং বাসে আরোহণ করলো। দূরে দাঁড়িয়ে আছে সউদিয়ার বিমান। আহা, বড় ভাগ্যবান মুসাফির! আজই তারা দেখতে পাবে 'কালো গিলাফের দুলহান'! আজই তারা লাভ করবে হাজারে আসওয়াদের চুম্বনস্পর্শ!

আমরা আমাদের বিমানে আরোহণ করলাম। সাউদিয়ার বিমান যাত্রা করলো আগে। জানালা পথে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম। কিছুক্ষণ পর আমাদের বিমান উড়লো আকাশে এবং পশ্চিমেরই উদ্দেশ্যে। আমরাও যে পশ্চিমের যাত্রী! সফরের শুরুতে কলবের যে হালাত ছিলো, মনে হলো, দশদিনে তাতে আরো পরিবর্তন এসেছে। আমি যেন এখন নতুন সত্তার, নতুন অস্তিত্বের অন্য এক মানুষ। অন্তর যেন আরো স্থির, আরো শান্ত; হৃদয় যেন আরো কোমল, আরো বিগলিত; অনুভব-অনুভূতি যেন আরো নিবিড়, আরো গভীর। অন্যদিকে আশংকা ও উৎকণ্ঠার মেঘ যেন আরো ঘনীভূত।

অবশ্যই এটা বাইতুল্লাহর সফরের বরকত। এ সফর যত দীর্ঘ হবে, পথে পথে প্রাণে ও সম্পদে যত কষ্ট হবে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য তা তত কল্যাণকর হবে। আগের যুগে হজ্বের সফরে পথেই পার হতো দিন, মাস, এমনকি বছর। পথও ছিলো কষ্টবহুল ও বিপদসংকুল। কিন্তু পথের সকল বিপদ-দুর্যোগ পাড়ি দিয়ে সুদীর্ঘ সফর শেষে আল্লাহর বান্দা যখন হাযির হতো আল্লাহর ঘরে তখন সে হতো সত্যিকারের মুসাফির, বাইতুল্লাহর মুসাফির, তার তখনকার অবস্থা যেন ফুটে ওঠে কবির ভাষায়-

মজনু হাযির দুয়ারে তোমার কংকাল দেহে,
স্বাস্থ্যের জৌলুস! সে তো বিলিয়ে এসেছি পথে পথে!
আর যাবো না ফিরে,

থাকবো পড়ে তোমার দুয়ারে,
এখন শুধু মৃত্যুর সেতু মিলনের মাঝে।

এমন সফরের পর যখন বাইতুল্লাহর দীদারে কেউ ধন্য হতো তখন বাইতুল্লাহর ফায়য ও ফায়যান লাভের জন্য তাঁর হৃদয় ও আত্মার প্রস্তুতি হতো চূড়ান্ত। সে তখন পৌঁছে যেতো ইশক ও মুহাব্বাতের সেই স্তরে, যেখানে কোন ব্যবধান থাকে না মিলনের ও বিরহের।

এমন বান্দা যখন ফিরে যেতেন নিজের দেশে নিজের পরিবেশে তখন তিনি হতেন অন্য মানুষ। মাটির পুতলা হয়েও তিনি হতেন নূরের ফিরেশতা। একজন হাজী একটি জনপদের জন্য হতেন আলোর মিনার। মাটির উপরে বিচরণ করেও তিনি হতেন মাটির নীচের বাসিন্দা। কিন্তু এখন! হজ্বের কাফেলা আছে, নেই হজ্বের মুসাফির। আকার আছে, আকৃতি আছে, নেই শুধু সজীব প্রাণ। এখনো লাব্বাইক ধ্বনি শোনা যায়, শোনা যায় না শুধু প্রতিধ্বনি।

আমরা দুর্বল বান্দা, আল্লাহর কাছে আমরা মেহনত চাই না, শুধু নেয়ামত চাই এবং আমার মনে হলো, বাইতুল্লাহর পথে কষ্ট-ক্লেশহীন এ দীর্ঘ সফর আমাদের জন্য ছিলো আল্লাহর বিরাট নেয়ামত। সফরের দীর্ঘ পথে বিনা মেহনতে আমাদের কলব ও রূহ এবং হৃদয় ও আত্মা দীদারে বাইতুল্লাহর জন্য কিছুটা হলেও প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছে। তোমার শোকর হে আল্লাহ, তোমার শোকর।

কিন্তু হায়, একটি ভুল যেন সবকিছু করে দিলো ভণ্ডুল। এখনো বুঝতে পারি না, কীভাবে হলো এমন ভুল! আসল কথা, পাত্র যদি ছোট হয়, কিসমত কি বড় হতে পারে! আমার পাত্র ছিলো ছোট, তাই বড় কিসমত হয়ে গেলো ছোট। অবুঝ মন তবু আশা করে তোমার কাছে হে আল্লাহ, ক্ষমা করে ও দয়া করে তোমার দান তুমি পূর্ণ করবে।

داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ
দাতা তোমার দয়া ও করুণার, নেই কোন কূল কিনার।

বিমানে জানালার পাশে বসেছিলাম। মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেব জানালার পাশে বসতে দিয়েছিলেন। নীচে তাকালাম, নীল সমুদ্র, উপরে তাকালাম, নীল আকাশ। আর দূরে শুভ্র মেঘের অপূর্ব লীলাখেলা! যেন সৃষ্টির সৌন্দর্যে স্রষ্টার অপার সৌন্দর্যের ছায়া। এতদিন মেঘের সৌন্দর্য দেখেছি মাটিতে দাঁড়িয়ে উপরের আকাশে। আজ মেঘের সৌন্দর্য দেখলাম আকাশের উচ্চতা থেকে মাটির দিকে তাকিয়ে। এতদিন মেঘের ছায়া আড়াল করেছে সূর্যের আলো, আজ সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে মেঘের রাজ্য। দূর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত শুধু তুষারশুভ্র মেঘের চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য। কে তিনি সব সৌন্দর্যের আড়ালে, সব সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বে?! তিনি আল্লাহ। আজ বিমুগ্ধ হৃদয়ে সমর্পিত চিত্তে তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা– হে সকল সৌন্দর্যের আধার! সকল 'জামাল ও কামালে' তোমারই একক অধিকার। আমি যেতে চাই তোমার ঘরে, আমি পেতে চাই তোমাকে আপন করে। সৃষ্টির সকল সৌন্দর্য ছাপিয়ে আমাকে তোমার

ঘরের সৌন্দর্য দেখাও এবং তাওফীক দাও ঘরের সৌন্দর্যে তোমার, শুধু তোমার সৌন্দর্য অনুভব করার।

এখনো অনেক দেরী। এখনো অনেক পথ বাকি। সাগর শেষ হলো, মরুভূমি পার হলো, আকাশের উচ্চতা থেকে আরব জনপদ দেখা গেলো। জীবনে এই প্রথম কোন আরব জনপদের অবলোকন। সমগ্র সত্তায় আনন্দের শিহরণ বয়ে গেলো। এ যেন পরম আনন্দের পূর্বাভাস, কিংবা পূর্বপ্রস্তুতি।

দশদিন আবুধাবিতে

আকাশ থেকে আবুধাবী শহর মনে হলো ছবির মত সুন্দর। দেখতে দেখতে বিমান 'ভিড়লো' 'বিমানঘাটে'। করাচীতে একজন ছিলেন আমাদের অপেক্ষায়, এখানেও কথা ছিলো, কিন্তু কেউ ছিলো না। যখন কেউ থাকে না তখন আল্লাহ্ বেশী করে থাকেন। 'ঠিকানাহীন মুসাফির' কথাটার স্বাদ ও গন্ধ সাহিত্যের পাতায় এবং জীবনের পাতায় ভিন্ন, তা এই প্রথম অনুভব করলাম। সত্যি সত্যি আমরা তখন ঠিকানাহীন মুসাফির। পথের ঠিকানা, ঘরের ঠিকানা কিছুই জানি না। যিনি আসবেন, তিনি আসেন নি। ফোন নম্বর সঙ্গে ছিলো, কিন্তু নেই। বোধ হয় এরই নাম চারদিকে অন্ধকার দেখা। বড় দিশেহারা অবস্থা। বুঝতে পারছি না, কী করবো, কোথায় যাবো, কাকে ডাক...।

আচ্ছা! এতক্ষণ কেন মনে পড়েনি তাঁকে ডাকার কথা! মানুষের ভিড় এড়িয়ে কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং দু'রাকাত সালাতুল হাজাত পড়লাম। সে নামায ছিলো অন্য আবেগের, ভিন্ন অনুভবের। জীবনে খুব কম পাওয়া যায় এমন নামাযের স্বাদ। আব্বাকে সারা জীবন দেখেছি; বিপদ এসেছে, সমস্যা প্রকট হয়েছে, আর তিনি জায়নামাযে দাঁড়িয়েছেন। বিপদ ও সমস্যা দূর হয়ে গেছে, কখনো স্বাভাবিকভাবে, কখনো অকল্পনীয়ভাবে। সারা জীবন দেখেছি, কিন্তু অনুসরণ করতে শিখিনি। বিপদে পড়েই আমরা শুরু করি দৌড়ঝাঁপ, কিংবা হা-হুতাশ। হয়রানি ও পেরেশানি তাতে কমে না, বাড়ে। আব্বা বলতেন, যখন তোমার কোন ঠিকানা থাকে না, নামাযকে বানাও তোমার ঠিকানা। যখন তোমার কোন আশ্রয় থাকে না তখন নামাযের আশ্রয় ভুলে যেয়ো না। নামাযের মাধ্যমে যাকে ডাকবে তিনিই তোমাকে দেবেন নিশ্চিত আশ্রয় ও ঠিকানা।

আমি ডাকলাম। পথের দিশা হারিয়ে ফেলা এবং ঠিকানা খুঁজে না পাওয়া মুসাফিরের ডাক কত করুণ হতে পারে তা ঘরের ছায়ায় বসে আমি বুঝিনি, হে বন্ধু, তুমিও বোঝবে না।

আমি ডাকলাম এবং... এর পরেরটুকু শুনতে চাও? বলতে আমি তো আনন্দই পাবো। আমার গল্প তোমার বিশ্বাসের উদ্যানে যদি একটু জলসিঞ্চন করতে পারে, আমি কেন কার্পণ্য করবো! শোনো—

ফোন নম্বর তখন তো খুঁজে পাইনি কাগজের পাতায়, এখন মুনাজাতের মধ্যে ভেসে উঠলো মনের পাতায়। আবছা আবছা, কিছুটা মনে পড়ে, কিছুটা মনে পড়ে না। প্রিয় পাঠক, দয়া করে হাসবে না, মুনাজাত ছেড়েই আমি দৌড়ে গেলাম বিমানবন্দরের কর্মকর্তা পাকিস্তানী ভদ্রলোকের কামরায়, যিনি আমাদেরকে সেদিন তার দিলের হামদর্দি দান করেছিলেন। সেই হামদর্দি এখন প্রতিদিন একটু একটু করে কমছে মানুষের দিল থেকে। অনুমানের উপর নাম্বার বললাম, তিনি ডায়াল ঘুরালেন, হলো না।

আমার চারপাশে হতাশা আবার জমাট বাঁধে। কিন্তু ভিতর থেকে যেন আওয়ায এলো, হতাশ হয়ো না, যা কিছু হয় তোমার কল্যাণের জন্যই হয়।

কুণ্ঠিতভাবে বললাম, ৯৩ এর বদলে ৩৯ করুন। তিনি প্রসন্নতার সাথেই করলেন। অপর প্রান্তে সম্ভবত প্রসন্নতা ছিলো না। তিনি 'আফওয়ান' বলে রেখে দিলেন। আমি 'হায় আল্লাহ' বলে বসে পড়লাম। এখন যত সহজে বলছি, তখন তত সহজ ছিলো না। আমার দুই 'হামসফর' কিছুটা ক্ষুব্ধ এবং তা স্বাভাবিক। কারণ যোগাযোগের দায়িত্ব ছিলো আমার, এখন ভুলের ভোগান্তি সবার। ডুবন্তের শেষ চেষ্টারূপে, এখন মনে নেই, অন্য একটি সংখ্যা বললাম। পাকিস্তানী ভদ্রলোক, আল্লাহ তাকে 'জাযা' দান করুন, কোন বিরক্তি প্রকাশ না করে নাম্বার ঘুরালেন এবং আল্লাহর শোকর! রহমতের ফিরেশতার আওয়ায পাওয়া গেলা। পাকিস্তানী ভদ্রলোকের চেহারা খুশিতে যাকে বলে, গোলাব হয়ে উঠলো, 'লীজিয়ে, বাত কীজিয়ে' বলে তিনি রিসিভার এগিয়ে দিলেন।

আনন্দ এবং ক্ষোভ, দুইয়ের মিশ্রণে আমার গলার আওয়ায নিজের কাছেই অদ্ভুত মনে হলো। সালাম দিলাম, কি দিলাম না, বললাম, নিতে এলেন না যে! তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তোমরা না আগামীকাল আসছো!

সুবহানাল্লাহ! এতক্ষণে মনে পড়লো ফ্লাইট পরিবর্তনের কথা, এবং তা ঘটেছিলো আমাদের আমীর ছাহেবের 'সৌজন্যে'। কী কারণে যেন তিনি ভেবেছিলেন, বাংলাদেশ বিমানের চেয়ে 'পাকিস্তানের বিমান' আরামদায়ক। সে খবর তো আবুধাবী আসেনি! কিন্তু আমি মোটেও দমে না গিয়ে বললাম, আজই তো আগামীকাল, এখন কী করি বলুন! তিনি বললেন, রাস্তার দিকে তাকাও এবং কানমলার জন্য প্রস্তুত হও। আমি আসছি।

উপকারটুকু করতে পেরে পাকিস্তানী ভদ্রলোক মনে হলো আমাদের চেয়ে খুশী। আল্লাহর ঘরের মুসাফির শুনে আরো খুশী হলেন। বললেন, আরদে মুকাদ্দাসা মে ইয়াদ রাহে গা না মেরা নাম?' (পবিত্রভূমিতে মনে থাকবে তো আমার নাম!) বললাম, আমাদের দেখে কি এতটা অকৃতজ্ঞ মনে হয়? তিনি মৃদু হেসে বললেন, কঠিন পেরেশানির মধ্যেও আপনার 'পুরসুকূন' আন্দায আমার ভালো লেগেছে।

বিমানবন্দরের মূল ভবন থেকে বের হয়ে কাঁচঘেরা একটি বিরাট হলঘরে উপস্থিত হলাম। এটিও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এবং আরো শীতল। ভিতর থেকেই বাইরের রাস্তা

দেখা যায়। পায়চারি করছি আর রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি কিছুটা অস্থিরতার সঙ্গে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে হয় চাতকপাখী, রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলে! কোন উপমা খুঁজে পাওয়ার আগেই তিনি গাড়ী নিয়ে হাজির। কানমলার বদলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এখন তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত; আমার পরম প্রিয় মাওলানা হারূন ইসলামাবাদী (রহ)।

দশদিন ছিলাম আবুধাবীতে। উদ্দেশ্য ছিলো মাদরাসার কাজ। কিন্তু তিনদিনের অভিজ্ঞতায় বোঝা গেলো, এখানে সবার পড়ে থেকে কাজ নেই। মশওয়ারা হলো; দু'জন রওয়ানা হয়ে গেলেন মক্কা শরীফে; আমি রয়ে গেলাম আবুধাবীতে।

মাওলানা হারূন ছাহেবের ছোহবতে আবুধাবীর দশটি দিন ছিলো আমার জীবনের স্মরণীয় সময়। পাকিস্তানে কিছুটা হলেও সফরের 'কসর' ছিলো, কিন্তু এখানে তাঁর স্নেহছায়া ঘরের ও সফরের পার্থক্য-রেখা মুছে দিয়েছিলো। তিনি যেমন চিন্তা করেছেন আমার জিসমানী আরামের কথা তেমনি চিন্তা করেছেন কলব ও রূহের খোরাকের কথা।

ওমরা ও হজ্ব কীভাবে করবো, আল্লাহর ঘর কীভাবে তওয়াফ করবো, কীভাবে মদীনার যিয়ারাত করবো এবং কীভাবে দীর্ঘ সফরের আদব রক্ষা করে চলবো সে সম্পর্কে অনেক মূল্যবান নছীহত তিনি করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যা পড়েছো এবং যা শুনেছো, সেখানে গিয়ে দেখবে সব ভুলে গেছো, মনের পাতা থেকে সব মুছে গেছে। শুধু আছো তুমি, আর তোমার সামনে আছে আল্লাহর ঘর। তখন শুধু বলবে, কিছু জানি না, কিছু বুঝি না, তোমার দয়া ছাড়া আমি কোন উপায় দেখি না; তখন গায়বের মদদ নেমে আসবে এবং তোমার অজান্তে তোমার কাজ হতে থাকবে। বস্তুত হজ্বের সফরে আল্লাহর মদদ ছাড়া বান্দার কিছুই করার নেই।

তিনি আরো বলেছিলেন, মসজিদে নববীতে তোমার আব্বার নামায আমি দেখেছি, খুব কম মানুষেরই হয় এমন নামায। যেন 'কামা রাআইতুমূনী' ওয়ালা নামায। সেই নামায তুমিও হাছিল করার চেষ্টা করো।

তিনি তাঁর কর্মস্থল থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়েছিলেন আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। আরো সত্য করে বলি, আমাকে আল্লাহর ঘরের জন্য প্রস্তুত করার জন্য। এ এমন এক সৌভাগ্য, যা কল্পনায়ও ছিলো না কখনো। সফরের মানযিলে মানযিলে আমি অনুভব করেছি তাঁর ছোহবতের বরকত।

আবুধাবীর সর্বমহলে মাওলানা হারূন ছাহেবের বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা ছিলো, যেমন হিন্দুস্তানী, পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী মহলে তেমনি আরবদের মহলে। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও দাওয়াত, ইফতার মাহফিলে কিংবা তারাবীর পর নৈশভোজে আজ কোন বাংলাদেশীর ঘরে, কাল কোন পাকিস্তানী বা হিন্দুস্তানীর 'মাকানে'। অন্যদিন কোন আরব শায়খের দস্তরখানে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে এবং আবুধাবীর প্রধান বিচারপতি শায়খ আবদুল আযীয আলমোবারকের বালাখানায়ও দাওয়াত ছিলো। আমাকে তিনি সঙ্গে নিতেন। সেই সুবাদে আবুধাবীর চলমান জীবন ও সমাজের অনেক কিছু দেখার, শোনার এবং অনুভব করার সুযোগ হয়েছিলো।

সুখের অনুভূতি ছিলো কিছু দুঃখের অনুভূতি ছিলো অনেক। এখানে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণেও এ সফরনামা পথেই হয়ে যাবে অনেক দীর্ঘ, তাই তা এড়িয়ে যাচ্ছি, যদিও তাতে রয়েছে শিক্ষার বহু উপকরণ।

তবে এতটুকু বলতে পারি, আরব বলো, অনারব বলো, সবাই শুধু ছুটে চলেছে ব্যস্ত জীবনের পিছনে। দ্বীনের প্রতি দায়-দায়িত্ব এবং উম্মতের প্রতি দরদ-ব্যথা– এগুলো যেন জীবনের কোন অংশ নয়। জীবন যেন শুধু উপার্জনের প্রয়াস এবং আনন্দ ও ভোগবিলাস। সম্মানজনক ব্যতিক্রম অবশ্যই দেখেছি; তবে এটাই ছিলো সমাজের সাধারণ চিত্র। সবকিছু চলছে শুধু বস্তুজীবনকে কেন্দ্র করে, এমনকি ইরাক-ইরান ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ সম্পর্কেও কোন মাথাব্যথা নেই, এবং সম্ভবত এটা কোন একটি মাত্র মুসলিম জনপদের চিত্র নয়। কায়রো-দামেস্ক সব অভিন্ন।

আরেকটি বিষয় আমাকে খুব বিচলিত করেছে; অপচয়। এবং তা আমি দেখেছি বিশিষ্ট-সাধারণ সর্বমহলে। শুধু একটি ঘটনা বলি, মাওলানা হারূন ছাহেবের কর্মস্থল ছিলো আবুধাবীর বিচারমন্ত্রণালয়। বিচারকদের এক ইফতার মাহফিলে তাঁর দাওয়াত ছিলো। আমি যথারীতি বিনা দাওয়াতের মেহমান। প্রথা অনুযায়ী ইফতারের পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো রোযার শিক্ষা ও তাৎপর্য সম্পর্কে। দ্বীনের জন্য ছাহাবা কেরাম কত কোরবানী করেছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুধার যন্ত্রণায় কীভাবে পেটে পাথর বেঁধেছেন সে আলোচনাও উঠে এলো আবেগপূর্ণ ভাষায়। ১৭ই রামাযান উপলক্ষে গাযওয়াতুল বদরের কথাও বাদ গেলো না। আগাগোড়া সুন্দর আলোচনা এবং যথেষ্ট শিক্ষার খোরাক। তবে কবি জিগার মুরাদাবাদীর ভাষায়–

واعظ کا ہر اک ارشاد بجا تقریر دلچسپ مگر *

آنکھوں میں سرور عشق نہیں * چہرے پہ یقین کا نور نہیں

তোমার সবকথা সত্য ও বক্তব্য অনবদ্য, কিন্তু হায়, চোখের তারায় নেই প্রেমের উদ্ভাস, চেহারায় নেই বিশ্বাসের আলোক-আভাস।

ইফতারের সময় দেখা গেলো সেই আলোচনা ও শিক্ষার বাস্তব নমুনা! খাদ্যের স্তূপ থেকে সামান্য খাওয়া হলো; বাকি সব গেলো পলিথিনের উদরে। অপচয়ের এমন দৃশ্য জীবনে এই প্রথম দেখা। বড় কষ্ট হলো, অক্ষম কষ্ট। মনে পড়লো আমার দেশের ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর কথা। এসব খাবার যদি ঢাকা শহরের ডাস্টবিনেও ফেলার ব্যবস্থা করা যেতো, কঙ্কালসার বহু শিশু ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যেতো।

চেহারার আয়নায় দিলের প্রতিফলন দেখে মাওলানা হারূন ছাহেব বললেন, তুমি তো প্রথম দেখেছো, আমি দেখছি বহুদিন। যখন বলার সুযোগ হয় বলিও। কিন্তু প্রাচুর্য দারিদ্র্যের চেয়ে বড় অভিশাপ, এ বড় নির্মম সত্য। আমার তো আশঙ্কা, এদের পরবর্তী প্রজন্ম না এ অপচয়ের ফল ভোগ করে। তবে সবচে' মর্মান্তিক হলো, এখানে বাংলাদেশী পরিবারগুলোও অচপয়মুখী, (দু'একটি নমুনা আমিও দেখেছি) অথচ দেশে এরা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বীভৎস রূপ দেখে এসেছে।

এবার অন্যরকম একটি ঘটনা বলি, যা সম্ভবত, বাইতুল্লাহর মুসাফিরের জন্য ছিলো গায়বী তারবিয়াত। আবুধাবীর দ্বিতীয় দিন আছরের পর মাওলানা হারূন ছাহেব আমাকে ও ফারূক ভাইকে পাঠালেন এক ভদ্রলোকের কাছে, মাদরাসার কাজে। চট্টগ্রামবাসী, বড় ব্যবসায়ী, বিরাট দোকান। ফোনের যোগাযোগে ভদ্রলোক আমাদের যেতে বলেছেন। আমরা গেলাম, ঠিকানামত অনেক দূর পথ হেঁটে। ইফতারের সময় প্রায় হয়ে এসেছে।

ব্যস্ত দোকান। আমরা সালাম দিয়ে একপাশে দাঁড়ালাম। তিনি তাকালেন না এবং বসতে বললেন না। অপ্রস্তুত অবস্থায় আমরা অপেক্ষায় থাকলাম। হঠাৎ তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন এবং যে ভাষা তার মুখে সাজে সে ভাষায় বললেন, কী জন্য এসেছেন? ভিক্ষা করতে? দেশে 'বটগাছের' ভিক্ষা নাই? ....

মধুবর্ষণ হলো একটানা অনেক ক্ষণ । মধু শব্দটি ব্যবহার করছি। কারণ প্রতিটি শব্দ আমার কাছে সত্যি সত্যি মনে হয়েছে ফোঁটা ফোঁটা মধু এবং তাতে ছিলো 'তায়েফের স্বাদ'। এমনই হয় বান্দার প্রতি দয়াময়ের দয়া! পাথরের পরিবর্তে শুধু কথার আঘাতে যখম করে, চৌদ্দশ বছর পরের এক আদনা উম্মতকে জুড়ে দেওয়া হলো তায়েফের জনপদে যখমী নবীর পবিত্র জীবনের সঙ্গে। এর চে' বড় দয়া, এর চে' বড় মায়া আর কী হতে পারে! বাইতুল্লাহর মুসাফিরের জন্য এর চে' বড় পাথেয়ই বা আর কী হতে পারে! তাই সেদিন সেই অপরিচিত মানুষটিকেই মনে হয়েছিলো পরম বন্ধু। আল্লাহ তাকে জাযা দান করুন; অন্তরে সেদিন যে স্বাদ ও শান্তির অনুভূতি হয়েছিলো এখনো যেন তার আমেজ রয়ে গেছে। দ্বীনের জন্য যলীল হওয়ার ইযয্যত সবার জোটে না এবং সবসময় জোটে না; শুধু আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন এবং যাকে করুণা করেন।

ফারূক ভাই সান্ত্বনা দিলেন এবং আশ্চর্য! তিনি আমাকে তায়েফের ঘটনা স্মরণ করতে বললেন। দুই দিলের একচিন্তা আমাকে বড় আনন্দ দিলো।

আমরা সালাম দিয়ে নীরবে চলে এলাম। আযান হয়ে গেলো। আযানের আওয়ায এবং অন্য একটি আওয়ায একসঙ্গে কানে এলো, 'আইয়ে মওলবীজী, ইফতার লীজিয়ে।'

কাছের এক দোকান থেকে দাওয়াত এলো এবং আমার চোখে পানি এসে গেলো। হাতের ইশারায় শুকরিয়া বলে এগিয়ে যেতে চাইলাম; পারলাম না। দোকানের মালিক নেমে এসে আমাদের নিয়ে গেলেন। পাকিস্তানী বা হিন্দুস্তানী। আমি আমার ভিতরে আবার প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম, এটা কি মাটির পার্থক্য? এটা কি রক্তের ব্যবধান? আল্লাহ ভালো জানেন।

***

সম্ভবত উনিশে রামাযান। শুনতে পেলাম বিশিষ্ট দ্বীনী ব্যক্তিবর্গের এক কাফেলা আগামীকাল রওয়ানা হবে আল্লাহর ঘরে ওমরার উদ্দেশ্যে। স্থলপথের কাফেলা। আমার চেহারায় হয়ত কোন অভিব্যক্তি ছিলো এবং মাওলানা হারূন ছাহেব তা বুঝতে

পেরেছিলেন। আল্লাহপ্রদত্ত তাঁর বহুগুণের একটি হলো, মুখের আয়নায় মনের ছবি তিনি দেখতে পেতেন। অবশ্য মাঝে মধ্যে ভুলও হতো। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। যেখান থেকে কাফেলা রওয়ানা হবে তা বেশ দূরে। তবু সকালে যথাসময়ে আমরা পৌঁছলাম। প্রায় সকলে তাঁর পরিচিত এবং তিনি সবার অন্তরঙ্গ। আমার পরিচয় দিলেন একটু আড়ম্বর করে আমি বিব্রত হলাম। অতি ব্যস্ততার মধ্যেও প্রায় প্রত্যেকে কুশলবিনিময় করলেন। আল্লাহর ঘরের মুসাফিরদের বিদায় জানাতে এসেছি জেনে খুশী হলেন, শুকরিয়া জানালেন। একজন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে মূল্যবান আতর হাদিয়া দিলেন। এই প্রথম আরবের আলিমদের সংস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য হলো এবং আমি অভিভূত হলাম। আচরণে ও উচ্চারণে এঁরা অকৃত্রিম। এঁদের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি দু'টোই নির্ভেজাল। তাকাল্লুফ এঁদের স্বভাবে নেই। ঈমান ও আকীদায় সুদৃঢ়। কোরআন ও সুন্নাহর দলীল পেশ করো, যে কোন সময় যে কোন সত্য মেনে নিতে প্রস্তুত। কূটতর্ক এঁদের জানা নেই। একজন কী কারণে একটু ক্ষুব্ধ হলেন। অন্যজন বললেন, ছাল্লি আলান্-নবী (নবীর উপর দুরূদ পড়ো)। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দুরূদ পড়লেন এবং শান্ত হয়ে গেলেন।

সময়ের আয়তন ছিলো মাত্র দু'ঘণ্টা। কিন্তু এই সামান্য সময়ের আয়নায় আমি যেন দেখতে পেলাম অতীতের আলোকিত যুগেরও কিছু ছবি। আরবদেশে আরবদের মাঝে আল্লাহর নবী কেন প্রেরিত হলেন? ইসলামের আবির্ভাবকেন্দ্র কেন হলো জাযীরাতুল আরব? এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে আমাকে এখন আর কিতাব খুলতে হবে না। এঁরা যদি হন এ যুগের আরব, তাহলে কেমন ছিলেন সে যুগের আরব?! মক্কা-মদীনার আরব?! কোরায়শ ও আউস-খাযরাজের আরব?! কেমন ছিলেন তাঁরা, মুহূর্তের জন্য হলেও যারা লাভ করেছিলেন সর্বোত্তম নবীর সঙ্গগৌরব ও সান্নিধ্যসৌরভ!?

মর্মস্পর্শী মুনাজাত হলো। বৃদ্ধ শায়খ কাঁদলেন এবং কাঁদালেন, তবে যাকে বলে কান্নার রোল, তা নয়। শান্ত কান্না এবং নীরব অশ্রুবর্ষণ। আরবদের মুনাজাতে, কান্নায় এবং অশ্রুবর্ষণেও রয়েছে নিজস্ব সৌন্দর্য। আপনজনদের সঙ্গে বিদায়ের কোলাকুলি হলো। আমিও পেলাম কিছু উষ্ণ আলিঙ্গন। কেন? আমি কি তাঁদের আপনজন! কিসের বন্ধন! দেশের! ভাষা ও গোত্রের! না এ হলো 'ইন্নামাল মু'মিনূনা ইখওয়াতুন' এর বন্ধন, সময়ের ব্যবধানে হয়ত আরবরা অনেক নেমে এসেছে, তবে সবসময়ের মত এখনো তারা সবার উপরে এবং অনেক উপরে।

কাফেলা রওয়ানা হলো, আল্লাহর ঘর দীদারের এবং নবীর রাওযা যিয়ারাতের কাফেলা। যত দূর দেখা যায় তাকিয়ে থাকলাম, বেদনার্ত হৃদয়ে, তৃষ্ণার্ত চোখে। এ কাফেলার যাত্রাপথে তাকিয়ে থাকাও সৌভাগ্য। তারাই পথচলার সৌভাগ্য অর্জন করে যারা পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হে আল্লাহ! আমি পারবো তো পথ চলতে! পারবো তো মানযিলে পৌঁছতে! হে আল্লাহ, আমার স্বপ্ন যেন সত্য হয়, তোমার করুণা ও রহমত যেন সঙ্গী হয়!

***

একবার এশা ও তারাবী পড়লাম আবুধাবীর কেন্দ্রীয় মসজিদে, যদ্দুর মনে পড়ে প্রেসিডেন্ট যায়দ বিন সুলতান আলে নাহিয়ান-এর নামে মসজিদ। পাকিস্তানে অনেক শানদার মসজিদ দেখেছি, কিন্তু এ মসজিদ অনন্য, যেমন আয়তনে তেমনি অবয়বে। মুছল্লী কিন্তু এককাতার এবং তারাবী আলামতারার দশরাকাত। তার চেয়ে মসজিদ যদি হতো খেজুর পাতার, কিন্তু নামায ও নামাযী দ্বারা হতো আবাদ!

তারাবীর পর মাওলানা হারূন ছাহেব আমাকে নিয়ে গেলেন সমুদ্রতীরে। অবাক হলাম এদের পয়সা খরচের বহর দেখে! তীর থেকে বহুদূর দিয়ে পানি থেকে সামান্য উঁচু করে তৈরী হয়েছে নিরাপত্তাপ্রাচীর। ব্যয় কয়েকশ' কোটি ডলার! খুব বেশি প্রয়োজন ছিলো এর! প্রায় দেখা যায়, পশ্চিমা শোষকরা আমাদের শাসকদের মাথায় প্রয়োজনের কিছু কল্পনা এবং অর্থব্যয়ের বড় বড় পরিকল্পনা ঢুকিয়ে দেয়। তারা প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ হয়। তাতে জনকল্যাণ হোক না হোক, প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত পশ্চিমা কোম্পানীগুলোর মুনাফা হয় হাজার হাজার কোটি ডলার। রাতের বেলা দূর থেকে দেখা সমুদ্রতীরের নিরাপত্তাপ্রাচীরকে মনে হলো তেমনি কোন কল্পনা ও পরিকল্পনার ফসল। এখন মনে নেই, সম্ভবত ঐ প্রাচীরের উপর দিয়ে গাড়ী চলাচলেরও ব্যবস্থা ছিলো।

বেড়াবার জন্য সেটা বেশ মনোরম স্থান ছিলো, কিন্তু মন আমার বিনোদনের অবস্থায় ছিলো না। মনের শান্তি তো এখন অন্যখানে, অন্য কিছুতে। আমি শুধু ভাবছি, আর কত দূরে আমার মানযিল! পশ্চিমের মুসাফির পূর্বদিগন্তকে জিজ্ঞাসা করে– রাত পোহাবার আর কত দেরী!

দিনের বেলা মাওলানা হারূন ছাহেব আমাকে নিয়ে যেতেন বিভিন্ন ইসলামী ও দাওয়াতী সংস্থার দফতরে। তিনি বলতেন, ঘুরে ঘুরে দেখো, সবার সঙ্গে কথা বলো এবং সবার কথা শোনো, তোমার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হবে। তোমার কাজের ময়দানে কাজ দেবে। আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি এবং কিছু অনুভব করার চেষ্টা করেছি। একটা বিষয় খুব উপলব্ধি করেছি, গোরবত ও দারিদ্র্যের সঙ্গে দ্বীনী মেহনতের যে হৃদ্যতা রয়েছে প্রাচুর্যের সঙ্গে তা নেই। প্রাচুর্য দ্বারা সাজ যতটা হয় কাজ ততটা হয় না। পরে আমি এ অনুভূতি হযরত হাফেজ্জী হুযূরের খিদমতে আরয করে বলেছিলাম, আমাদের দেশে দ্বীনী কাজের জন্য আরবদের পয়সার প্রয়োজন নেই। গোরবতের মাঝে যে কাজ হবে, প্রাচুর্যে তা হবে না। আজ এত বছর পরো আমার সে বিশ্বাস অটুট রয়েছে। আমাদের দেশে আল্লাহ এই পরিমাণ সম্পদ রেখেছেন যা দ্বারা দ্বীনের সব প্রয়োজন পূর্ণ হতে পারে, প্রয়োজন শুধু মালদারদের দ্বীনদার হওয়া, আর আহলে ইলমের দুনিয়া-বিমুখ হওয়া। আরবদের কাছে আমাদের যাওয়া উচিত দ্বীনের দাবী নিয়ে, অর্থের চাহিদা নিয়ে নয়।

বিচার, ধর্ম ও ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা আলমানারের দফতরে গেলাম একদিন; শানদার ইমারত, বিপুল আয়োজন। এর ভগ্নাংশ দ্বারা আমাদের দেশে একটি দ্বীনী পত্রিকা স্বচ্ছন্দে চলতে পারে এবং পাঠকদের দ্বীনী প্রয়োজন পুরা করতে পারে। আলমানারের সম্পাদকের সাথে কথা হলো। মিসরীয়,

জামে আযহারের 'ছাত্র' এবং যথারীতি শ্মশ্রুমুক্ত। ইসলামী দাওয়াতের কথা বললেন খুব জোশ ও জাযবার সঙ্গে। তার মতে, শুধু ফিকরী জিহাদের অভাবেই মুসলিম উম্মাহর এত দুর্গতি সুতরাং ...।

আরেকদিন গেলাম আরব আমিরাতের জাতীয় দৈনিক আল ইত্তিহাদের কার্যালয়ে। আগেই সময় নেয়া ছিলো, সেদিন মাওলানা হারূন ছাহেব ছিলেন না। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেন। নিজে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। বিশাল মুদ্রণবিভাগও দেখলাম। এই প্রথম ছাপার 'ফোরকালার' মেশিন দেখা হলো। তিনি বললেন, এগুলো হচ্ছে মুদ্রণজগতের আধুনিকতম ও সর্বশেষ মডেল। আমাদের দেশের জাতীয় দৈনিক হলো ইত্তেফাক। প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনকালে ইত্তেফাকভবনে যাওয়া হয়েছিলো। দু'দেশের দুই জাতীয় পত্রিকা সম্পর্কে একটা উপমাই শুধু চিন্তায় এলো, 'ধনীর দুলাল ও গরীবের বাচ্চা'।

ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক, এক 'বাবের' এবং কাছাকাছি অর্থের দু'টি আরবী 'মাছদার'। দু'দেশের দু'টি জাতীয় পত্রিকার শিরোনাম। কিছুক্ষণের জন্য আমি নিমগ্ন হলাম আমার চিন্তার জগতে। ইত্তেফাক তো জানা কথা, আমাদের সম্পদ নয়। ইত্তেহাদও কি আমাদের? বাংলাদেশে, আবর দেশে, বা অন্যকোন দেশে আলিমসমাজের হাতে আসলে আছে কী? খুব সাধারণ মানের হোক, তবু বাংলাদেশে ওলামায়ে হকের একটি দৈনিক পত্রিকার ভীষণ প্রয়োজন। কবে পূর্ণ হবে এ স্বপ্ন!

আল ইত্তেহাদ প্রকাশনাসংস্থা থেকেই প্রকাশিত হয় ছোটদের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মাজিদ', আরববিশ্বে ছোটদের সবচে' প্রিয় পত্রিকা। কয়েক বছর থেকে আমি পত্রিকাটির সঙ্গে পরিচিত। ঢাকার আমিরাত-দূতাবাস থেকে পত্রিকাটি নিয়মিত পাই। আমার কাজের জন্য বেশ সহায়ক।

ঘুরে ঘুরে প্রতিটি বিভাগ দেখলাম। এর সম্পাদক আহমদ ওমর আমাকে সঙ্গ দিলেন। বাংলাদেশ থেকে গরীবানা হালাতে ছোটদের একটি আরবী পত্রিকা বের হয় এবং আমি তার সম্পাদক, শুনে খুশী হলেন। তাকে ইকরা পত্রিকার কয়েকটি নোসখা দিলাম। বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি বুঝতে পারলেন, আরবী মাতৃভাষা নয়, এমন ছোটদের জন্য এ পত্রিকার কেন প্রয়োজন? তিনি আমাকে 'মাজিদ' পত্রিকার পিছনের একশ'টি সংখ্যার বড় একটা প্যাকেট উপহার দিলেন। এটা ছিলো আমার প্রত্যাশার বাইরে। তাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম।

***

আবুধাবীতে আজ শেষ দিন। শৈশব থেকে লালিত আমার হৃদয়ের স্বপ্ন আলোর আরো নিকটবর্তী হলো। আমার স্বপ্নের মানযিল থেকে আমি আর মাত্র একদিনের দূরত্বে রয়েছি। আজকের সূর্যাস্ত এবং আগামী দিনের সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে ইনশাআল্লাহ আমি দেখতে পাবো আমার স্বপ্নের তা'বীর। মাওলানা হারূন ছাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ইহরামের কাপড় আছে তো। জিজ্ঞাসার সঙ্গত কারণ আছে। কেননা তিনি জানতেন, নাসীরুদ্দীন হোজ্জার কিছু স্বভাব আমার মধ্যে আছে। আমি

হাসিমুখে ব্রিফকেস খুলে দেখালাম এবং বললাম, ইহরামের এ লিবাসের পরিচয় বলবো? হযরত হাফিজ্জী হুযূর এই ইহরাম পরে হজ্ব করেছেন। তিনি বললেন, তুমি ভাগ্যবান।

তেইশে রামাযান বিকেল চারটায় মাওলানা হারূন ছাহেব আমাকে আবুধাবী বিমানবন্দরে পৌঁছে দিলেন। রিয়াদের বাসিন্দা আবুধাবীর শরীয়া আদালতে বিচারক-পদে কর্মরত জনৈক আলিম ছুটিতে সস্ত্রীক রিয়াদ যাচ্ছেন একই বিমানে। মাওলানা হারূন ছাহেব তাকে বললেন আমার দিকে খেয়াল রাখতে। এখানে বিদায়ের মুহূর্তে তিনি অন্যরকম এক স্নেহের প্রকাশ ঘটালেন, যাতে ছিলো পিতৃস্নেহের ছায়া। এরকম স্নেহের বন্ধন নিঃসন্দেহে আসমানের দান। যারা এর মর্যাদা রক্ষা করে তাদের জীবন-উদ্যানে আসে সৌভাগ্যের বসন্তবাহার। যারা এর অমর্যাদা করে তাদের জীবনে কখনো না কখনো, কোন না কোনভাবে নেমে আসে ...।

এক সফরে বারবার আমি গ্রহণ করছি অশ্রুসজল বিদায়ের আলিঙ্গন। এ যেন পরম মিলনের অব্যাহত প্রস্তুতি। ফলে সফরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রতিটি বিদায়ে আমি মিলনেরই স্বাদ পেয়েছি। আজ যেন সে স্বাদ আরো ঘন ও ঘনীভূত হলো। বিমানবন্দরভবনের অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশের মুহূর্তে পিছনে ফিরলাম। আমার গমন-পথের দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টিতে। এত দূর থেকে চোখের অশ্রু দেখা যায় না, তবে বোঝা যায়। একবার রুমালে চোখ মুছতে দেখলাম। অন্যরা আপনজনদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে ; প্রতিউত্তরে এদিক থেকেও হাত নড়ছে। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে আছেন স্থির! আমার বড় জানতে ইচ্ছে করছিলো তাঁর হৃদয়ের তখনকার অনুভূতি! আল্লাহর ঘরের মুসাফিরকে বিদায় জানাতে গিয়ে সবার মনে, সব হৃদয়ে কি একই অনভূতি হয়, না যেমন হৃদয় তেমন অনুভূতি? বাইতুল্লাহর মুসাফির যারা তাদের হৃদয়ের কথা যেমন আমার জানতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে তাদের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে যারা বাইতুল্লাহর মুসাফিরকে বিদায় জানান অশ্রুর উষ্ণতা এবং আলিঙ্গনের উত্তাপ দিয়ে।

প্রিয় পাঠক! তুমি যদি বাইতুল্লাহর কোন মুসাফিরকে বিদায় জানাবার সুযোগ পাও তাহলে খুব মহাব্বাতের সঙ্গে বিদায় জানিয়ো। কারণ আগামীকাল তার দু'টি চোখ কালো গিলাফের এবং সবুজ গম্বুজের সৌন্দর্য দেখতে পাবে; সেই চোখদু'টি তুমি আজ দেখতে পারো! তার দু'টি হাত আল্লাহর ঘরের গিলাফ স্পর্শ করবে; তুমি সেই হাতদু'টির স্পর্শ গ্রহণ করতে পারো! আল্লাহর ঘরের ডাক পাওয়া মানুষটি, আহা কত ভাগ্যবান! সেই ভাগ্য তোমারও হতে পারে এমন মানুষকে চোখের পানিতে বিদায় জানিয়ে। বাইতুল্লাহর মুসাফির তো আল্লাহর এত প্রিয় যে, তাকে যারা বিদায় জানায় তাদেরও আল্লাহ ভালোবাসেন; বিদায়জ্ঞাপনের সৌভাগ্য থেকে তাদেরও আল্লাহ মিলন-সৌভাগ্য দান করেন। বাইতুল্লাহর কত মুসাফিরকে কতবার আমি বিদায় জানিয়েছি, আর আসমানের দিকে তাকিয়েছি নীরব জিজ্ঞাসা নিয়ে, 'পিপাসা আর কত তীব্র হলে তুমি পানি দান করো হে আল্লাহ!'

হয়ত চোখের অশ্রুতে এবং হৃদয়ের ভালোবাসায় সিক্ত সেই সব বিদায়জ্ঞাপনেরই এটা আজ পুরস্কার।

মাওলানা হারূন ছাহেব একইভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাকিয়ে ছিলেন। শেষে আমি হাত নেড়ে ভিতরে চলে এলাম। তাঁর মুখের 'আল্লাহ হাফিয' আমি কানে শুনিনি, তবে হৃদয়ে অনুভব করেছি । আজ পঁচিশবছর পর এ সফরনামা লেখার সময় আমার এ প্রিয় মানুষটি পৃথিবীতে নেই, তবে তিনি আছেন আমার হৃদয়ের জগতে এবং থাকবেন। এখনো আমি দেখতে পাই আমার গমনপথের দিকে তাঁর সেদিনের ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। এখনো আমি অনুভব করি তাঁর সেদিনের সেই বিদায়-আলিঙ্গনের 'উষ্ণতা'! আল্লাহ তাঁকে চিরশান্তি দান করুন।

***

বিমানে আরোহণ করলাম। আমাদের সফরে ঢাকা থেকে পাকিস্তান ছিলো বাংলাদেশবিমান। আবুধাবী পর্যন্ত ছিলো পি আই এ। এখন জিদ্দা পর্যন্ত হলো সাউদিয়া। রিয়াদে এক ঘণ্টার যাত্রাবিরতি। তারপর লোহিত সাগরের তীরবর্তী শহর জিদ্দা। সেখান থেকে...! সেখান থেকে আল্লাহর ঘর, দয়াময় আল্লাহ যদি দয়া করেন; মেহেরবান আল্লাহ যদি কবুল করেন!

জীবনের পান্থপথে চলতে গিয়ে কতজনের সাথে দেখা হয়! কখনো একবার, কখনো বহুবার। কেউ হারিয়ে যায় স্মৃতির পাতা থেকে, কারো স্মৃতি সঞ্চিত থাকে হৃদয়ের গভীরে। কোন স্মৃতি হয়ে পড়ে ম্লান, কোন স্মৃতি হয়ে থাকে চিরঅম্লান। আমার হৃদয়ের পাতায় যাদের স্মৃতি আজো সমুজ্জ্বল তাদের একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো বিমানে। আমার পাশের আসনে ছিলেন তিনি। তাঁর শুভ্রসুন্দর, আলোকিত মুখমণ্ডল প্রথম দর্শনেই অন্তরে সশ্রদ্ধ অনুভূতি সৃষ্টি করলো।

বিমান তখন আকাশে উঠেছে এবং ডানা মেলে ওড়ছে। হঠাৎ দেখি, অপলক দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে দৃষ্টিতে কী ছিল, বেদনা! বিষণ্ণতা! মমতা! স্মৃতির ব্যাকুলতা ও কাতরতা! জানি না, তবে কিছু একটা ছিলো, যা বৃদ্ধের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করলো। আমি সালাম দিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করতেই অপরিচয়ের বাঁধ যেন ভেঙ্গে গেলো। তিনি নাম জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম, আবু তাহের। বৃদ্ধ যেন চমকে উঠলেন, 'আবু তাহের!' তোমার ছেলের নাম তাহের!

বুঝিয়ে বললাম, তাহের নামে আমার কোন ছেলে নেই। এভাবেই আমার নাম রাখা হয়েছে। তিনি একটু বিষণ্ন হাসি হেসে বললেন, ওহ! আমাকেও সবাই আবু তাহের ডাকে। আমার একমাত্র ছেলের নাম ছিলো তাহের। বেঁচে থাকলে তোমার বয়সের হতো। তোমাকে দেখে কেন জানি মনে হচ্ছে, আমার তাহের বেঁচে থাকলে দেখতেও তোমার মত হতো! এতটুকু বলতেই বৃদ্ধের চোখ ছলছল করে উঠলো। এরপর তিনি তাঁর জীবনের যে দীর্ঘ কাহিনী শোনালেন তা যেমন রক্তভেজা তেমনি অশ্রুভেজা.

যেমন লোমহর্ষক তেমনি মর্মস্পর্শী। শুনতে শুনতে সেদিন আমারও চোখ থেকে অশ্রু ঝরেছিলো।

প্রিয় পাঠক! বুঝতে পারছি, পথেই আমার সফরনামা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি মনে করি, সেদিন বিমানে নূরানি চেহারার সেই মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়েছিলো গায়বেরই ইশারায়, যার উদ্দেশ্য ছিলো বাইতুল্লাহর মুসাফিরের তারবিয়াত। তাই তাঁর কাহিনী তোমাকে না বলে এগিয়ে যেতে পারলাম না। তিনি ছিলেন ফিলিস্তীনের অধিবাসী। তাঁর জীবনের মর্মন্তুদ ঘটনায় আমাদের ঈমানী গায়রাতের জন্য রয়েছে যথেষ্ট খোরাক। বিপদগ্রস্ত মুসলিম ভাইদের আমি দু'ফোঁটা রক্ত হয়ত দিতে পারবো না, দু'ফোঁটা অশ্রু তো দিতে পারি; সেই দু'ফোঁটা অশ্রুর জন্যই আমি তোমাকে শোনাতে চাই তাঁর কাহিনী।

১৯৪৮ থেকে ফিলিস্তীনে ইহুদী পশুদের নিষ্ঠুর উচ্ছেদ-অভিযান শুরু হয়েছিলো। কয়েক লাখ ফিলিস্তীনী মুসলিমকে তখন তাদের হাজার বছরের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে বিভিন্ন আরব দেশে হিজরত করতে হয়েছিলো। তিনি ছিলেন পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক। তিনিও বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং জর্দানে আশ্রয় নিয়েছিলেন সহায়-সম্পদ, এমনকি স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে। তাঁর মা-বাবা দু'জনই ছিলেন ফিলিস্তীনী মুজাহিদ। উভয়ে অস্ত্রহাতে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন।

তিনি তাঁর আম্মার সাহস ও নির্ভীকতা এবং ঈমানী গায়রাত ও জিহাদী জাযবার এমন সব ঘটনা শুনিয়েছিলেন, যা আমার দেশের কোন 'মর্দে মুমিন' সম্পর্কেও কল্পনা করা যায় না। শাহাদাতের পূর্বমুহূর্তেও ফিলিস্তীনের বীরাঙ্গনা সেই মুসলিম নারী শুধু খঞ্জর হাতে একটা ইহুদী জানোয়ারকে 'জাহান্নাম রাসীদ' করেছিলেন।

আম্মা-আব্বার শাহাদাতের পর অটল প্রতিজ্ঞা ছিলো, যে কোন মূল্যে তিনি পিতৃভূমির মাটি কামড়ে পড়ে থাকবেন। পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটা ইহুদীদের হাতে ছেড়ে দেবেন না, কোন ভাবেই না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসে গেলো সেই ভয়াবহ রাত। সেটা ছিলো রামাযানের মাঝামাঝি সময়। গভীর রাত। ছয় বছরের শিশু তাহির ও তার মা ঘুমিয়ে আছেন। পালা করে পাহারা দিতে হয়। তিনি বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছেন। এমন সময় ইহুদী পশুরা হানা দিলো তাদের বস্তিতে। একদল হায়েনা অস্ত্র হাতে ঢুকে পড়লো তাঁর বাড়ীতেও। তিনি প্রতিরোধ করতে চাইলেন, কিন্তু একা একটি বন্দুক হাতে কতক্ষণ! শেষ পর্যন্ত তিনজন ইহুদীকে খতম করে তিনি আহত ও বন্দী হলেন। বাকী ছয়-সাত ইহুদী হায়েনা উল্লাসে মেতে উঠলো। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তার স্ত্রী সাহস হারাননি। তিনি জানতেন, ইহুদীদের কবলে যাওয়ার পরিণতি কী? তিনি আত্মহননের পথ বেছে নিলেন, তবে দুই ইহুদী হায়েনাকে জাহান্নামের খোরাক বানিয়ে তার পর। চোখের সামনে স্ত্রীর শহীদী লাশের বে-হুরমতি হলো। তিনি কিছুই করতে পারেননি, কিছুই করার ছিলো না। কারণ তিনি তখন পশুদের হাতে বন্দী আহত ব্যঘ্র। এমনকি যখন পশুরা ছয়বছরের শিশুকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করলো তখনো কিছু করতে পারেননি। প্রাণপণে শুধু ভিতরের চিৎকারটুকু

রোধ করার চেষ্টা করেছেন, যাতে পশুগুলোর সামনে মুমিনের দুর্বলতা প্রকাশ না পায়।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাহিরের পিতা বললেন, খুব ভালো মায়ের দুধ পান করেছিলো আমার বেটা। সহজে তার জান বের হয়নি। পশুরা যখন অতটুকু নিষ্পাপ শিশুকে বেয়নেটের মাথায় বিদ্ধ করে শূন্যে তুলে রেখেছিলো তখনো সে চেয়েছিলো আমার দিকে এবং শান্ত দৃষ্টিতে। ধীরে ধীরে তার মাথাটা ঝুলে পড়লো, আর জানটা বের হয়ে গেলো। এ দৃশ্য দেখে পশুগুলোও অবাক না হয়ে পারেনি। আমার বেটার বড় শক্ত জান ছিলো। বেঁচে থাকলে জানবাজ মুজাহিদ হতো।

বৃদ্ধ এমনভাবে বলছিলেন যেন গতকালকের ঘটনা; যেন স্ত্রী-পুত্রের তাজা লাশ তাঁর চোখের সামনে। চোখ থেকে ঝরা অশ্রু যেন অশ্রু নয়, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত যেন ঝরছে তাঁর কলিজার যখম থেকে। তিনি বললেন, ' আমাকে গুলি করে মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে পশুরা চলে গেলো। কিন্তু আমার তাকদীরে ছিলো বেঁচে থাকা। হাঁ, স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুর বীভৎসতার অসহনীয় স্মৃতি বুকে ধারণ করে বেঁচে থাকা; অবশ্য যদি এটাকে বেঁচে থাকা বলতে চাও। কীভাবে বেঁচে গেলাম এবং পিতৃভূমি থেকে প্রাণ হাতে পালিয়ে জর্দান সীমান্ত পার হলাম, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। শুধু এইটুকু বলতে পারি, পদে পদে আল্লাহর কুদরত আমাকে সাহায্য করেছে এবং কয়েকবার মৃত্যুর ঘেরাও পার হয়ে আমি জর্দানে পৌঁছতে পেরেছি।'

ফিলিস্তীনে ইহুদীদের পাশবিকতা ও বর্বরতার অনেক ঘটনা আমার জানা ছিলো। বিভিন্ন পত্রিকা ও বইপত্রে পড়েছি। কিন্তু আজ আমার সামনে ছিলো একটি জীবন্ত কাহিনী। দুর্ভাগা ফিলিস্তীনের রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত মানচিত্র যেন আমি দেখতে পেলাম বৃদ্ধের বেদনাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে।

এরপর তিনি শোনালেন তার জীবনের প্রথম আল্লাহর ঘর যিয়ারাতের কথা। বললেন, ১৯৫২ সালের রামাযান মাসে আমার সুযোগ হলো চাকুরী নিয়ে সউদী আরব আসার। দিল ছিলো যখমী এবং তা থেকে লাগাতার রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো। আমার শহীদ আম্মা-আব্বার জানাযা আমি পড়িয়েছি এবং নিজের হাতে দাফন-কাফন করেছি। তাই আমার সান্ত্বনা ছিলো। কিন্তু আমার স্ত্রী! আমার মাসুম বাচ্চা! তাদের ক্ষত-বিক্ষত লাশ তো পড়েছিলো সেই ঘরে! একটা চাদর দিয়েও ঢেকে রেখে আসতে পারিনি! আমি যেন আমার স্ত্রী ও মাসুম বাচ্চার লাশ বুকের ভিতরে দাফন করে রেখেছি। আমার যখমী দিলের তখনকার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই। সেই রামাযানে আমি ওমরা করলাম এবং জীবনে প্রথম আল্লাহর ঘর যিয়ারাত করলাম। বাইতুল্লাহর প্রথম দীদারের স্মৃতি আমি কোনদিন ভোলবো না। কালো গিলাফের খুবসুরতির উপর নযর পড়ামাত্র দিলের সমস্ত যখমের উপশম হয়ে গেলো। আমি সব ভুলে গেলাম, আমি সব ফিরে পেলাম। আমি যেন আমার রবের কুদরতি হাতের 'ঠাণ্ডক' অনুভব করলাম। চোখ থেকে নেমে আসা 'আঁসুর সয়লাব' যেন সবকিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে গেলো। যখন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ শুরু করলাম তখন খুব স্পষ্টভাবে

অনুভব করলাম, আমার স্ত্রী পাশে রয়েছে; আমার মাসুম বাচ্চা হাত ধরে আমার সঙ্গে তাওয়াফ করছে!

সে বছরই আল্লাহ হজ্ব করার তাওফীক দিলেন। তারপর থেকে প্রতি রামাযানে ওমরা করি। যখনই আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করি, আমি আমার পাশে স্ত্রী-পুত্রের উপস্থিতি অনুভব করি, যেন একেবারে শরীরী উপস্থিতি। আমার স্ত্রী তেমনি জোয়ান, আমার বেটা সেই নিষ্পাপ শিশুটি। তাদের মাঝে কোন পরিবর্তন নেই, আমারই শুধু বয়স বেড়ে চলেছে এবং আমি বুড়ো হয়ে চলেছি। আমার বিশ্বাস, জান্নাতে আমি ওদেরকে পাবো এবং আমি আমার স্ত্রীর মত জোয়ান হবো, আর আমার বেটা তেমনি শিশু থাকবে এবং গেলমানদের সাথে ঘুরে বেড়াবে।

ফিলিস্তীনের সেই বৃদ্ধ, আমার ধারণা, এখন দুনিয়াতে নেই; এখন তিনি জান্নাতে এবং স্ত্রী-পুত্রের সান্নিধ্যে; অন্তত আল্লাহর রহমতের কাছে এটাই আমি আশা করি।

মনে পড়ে, বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি আবার শাদী করেছেন? তিনি এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যে, আমি কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম। তাঁর দুই ঠোঁটের মাঝে তখন যে নূরানী হাসি খেলা করছিলো তা আমি এখনো ভুলিনি। এমন হাসি কারো ঠোঁটে আর কখনো দেখিনি। তিনি বললেন, 'শাদী! কেন? স্ত্রী তো আমার পাশেই রয়েছে ! আমার পুত্র তো এখনো আমার হাত ধরে হাঁটে।'

শায়খের প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে সেদিন আমি কামনা করেছিলাম, পৃথিবীর সব-পুরুষ যেন হৃদয়ের গভীরে এমন ভালোবাসা পোষণ করতে পারে স্ত্রী-সন্তানের প্রতি।

আরো মনে পড়ে, জিদ্দা বিমানবন্দরে তিনি আমার হাতে কিছু রিয়াল দিয়ে বলেছিলেন, এটা নাও, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো। আমি ইতস্তত করায় বলেছিলেন, আমার শহীদ বেটার স্মরণে এই হাদিয়াটুকু কবুল করো। আমি আর কিছু বলতে পারিনি। আল্লাহর ঘর পর্যন্ত আমাদের একসঙ্গে সফর করা হয়নি। জিদ্দা থেকে তাঁর আত্মীয় তাঁকে নিতে এসেছিলেন এবং তিনি জিদ্দা শহরে চলে গিয়েছিলেন।

ফিলিস্তীনের ভূমিতে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা কতশত ঘটেছে কে জানে, কিংবা এখনো ঘটছে! আমরা ক'জন সে খবর রাখি; অন্তত হাত তুলে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ফরিয়াদ করি! আমাদের সেই লাল রক্ত এখন হয়ত সাদা হয়ে গেছে। আমাদের চোখের পানির উৎসমুখ হয়ত এখন শুকিয়ে গেছে। একশ কোটিরও বেশী জনসংখ্যার মুসলিম উম্মাহ রক্তপিপাসু হিংস্র হায়েনাদের কবলে এখন এতীম অসহায়; মুসলিম উম্মাহ এখন প্রতীক্ষায় আছে একজন গাজী সালাহুদ্দীনের। জানি না, মুসলিম উম্মাহর মায়েদের বুকের দুধে এখনো সেই গুণ আছে কি না! কিংবা এখনো তারা তাদের গর্ভে এমন সন্তান কামনা করে কি না, যারা বাঁচবে গাজী হয়ে, মরবে শহীদ হয়ে!

***

হারামাইনের খাদিম বলে গৌরব করে যারা সেই খাদিম ছাহেবদেরই বিমানের যাত্রী আমরা এবং আমাদের গন্তব্য আল্লাহর ঘর। কিন্তু বিমানে সেবকের চেয়ে সেবিকাই বেশী এবং বিদেশিনী, অমুসলিম তো অবশ্যই। বিষয়টা শুধু আমাকেই নয়; পীড়া

দিয়েছে ফিলিস্তীনের শায়খকেও। সেবিকার কাছে পানি চাইতে দেখে তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, 'নযরের হেফাযত করো এবং পুরুষ সেবকের অপেক্ষা করো।' তাঁর উপদেশ আমি এখনো ভুলিনি এবং এ ভুল আর কখনো করিনি।

একটু আগে বিমান হিজাযের আকাশ-সীমা অতিক্রম করেছে। সামনের স্ক্রীনে তীরচিহ্ন দ্বারা সে দৃশ্য দেখানো হয়েছে। জানালাপথে কিছু দেখা যায় না, তবে ঘোষণা থেকে জানা গেল, আমরা মরুঅঞ্চল পাড়ি দিচ্ছি। একটু আগে বিমানের পক্ষ হতে ইফতার সরবরাহ করা হয়েছে। আমি একা মাগরিব পড়তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ফিলিস্তীনের শায়খ নাছোড়বান্দা। বিমানক্রুদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি আমাকে নিয়ে জামা'আত করলেন। আরবদের দ্বীনী জোশ ও জযবার কথা জানতাম; সেটা এখন প্রত্যক্ষ করলাম। তিনি বললেন, 'দ্বীনের বিষয়ে শিথিলতা করো না। তুমি অবিচল থাকলে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য পাবে।'

এই জাযবা শ্রদ্ধার যোগ্য, তবে এখনো আমি একাই নামায পড়ি এবং সম্ভব হলে ক্রুদের দৃষ্টি এড়িয়ে খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে।

***

বিমান যখন রিয়াদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের প্রস্তুতি ঘোষণা করলো তখন অর্জিত হলো জীবনের সবচে' বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা। শাব্দিক অর্থেই কিছুক্ষণ আমরা জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে অবস্থান করেছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গর্বে গর্বিত মানুষের অসহায়ত্বের এমন মূর্তরূপ আমি আর কখনো দেখিনি।

বিমান বারবার বিমানবন্দরের আকাশে চক্কর দিচ্ছে, কিন্তু অবতরণ করছে না। বিষয়টি প্রথমে কেউ খেয়াল করেনি। যে যার মত বসেছিলো, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। কেউ কথা বলছে, কেউ জানালাপথে রিয়াদের আলোক-সৌন্দর্য অবলোকন করছে। পরে যখন জানা গেলো, বিমানের সামনের চাকা নামছে না এবং শেষ পর্যন্ত জরুরী অবতরণ হতে পারে তখন মুহূর্তে ভিতরের পুরো দৃশ্য পাল্টে গেলো। মৃত্যুর ছায়া যেন নেমে এলো সবার চেহারায়, আমারও। এদিকে কান্নার রোল, ওদিকে কালিমার আওয়ায। কেউ কেউ সিটবেল্ট খুলে পাগলের আচরণ শুরু করেছে। বিমানের নারী ও পুরুষকর্মীরা নিজেদের ভীতি চেপে রেখে যাত্রীদের অভয় দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ককপিট থেকে বারবার ঘোষণা আসছে; কিন্তু তা শোনার বা বোঝার উপায় নেই। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য।

দৃশ্য হলো দেখার এবং অনুভব করার বিষয়, বলার এবং শোনার বিষয় নয়। শুধু বলতে পারি, সেটা ছিলো কিয়ামতের ক্ষুদ্র এক নমুনা। এখনো সে দৃশ্য ভেসে উঠলে বুকটা কেঁপে ওঠে। এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে, মৃত্যু-আশঙ্কার সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মাঝে একটি চেহারায় ছিলো পূর্ণ প্রশান্তি। তিনি ফিলিস্তীনের শায়খ। হাতে তাসবীহ, মুখে যিকিরের শান্ত উচ্চারণ। এখনো আমার কানে বাজে তার একটি আয়াত তিলাওয়াতের আবেগকম্পিত কণ্ঠ–

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

(কিংবা কে বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেয় যখন সে তাঁকে ডাকে, এবং (কে) বিপদ দূর করে!... আছে কি আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহ! খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করো তোমরা)

তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহর উপর ভরসা রাখো এবং আল্লাহকে ডাকতে থাকো, বিপদে তিনি ছাড়া কোন সাহায্যকারী নেই। জীবনের কোন সংকটমুহূর্তে এমন নূরানিয়াতের অধিকারী মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া সত্যি বড় কিসমতের বিষয়।

আমি মৃদু উচ্চারণে কালিমা তাইয়েবা পড়ছি, আর মনে মনে স্মরণ করার চেষ্টা করছি, মৃত্যুর হালাত কিতাবে কী কী পড়েছিলাম! হাদীসে কী কী বয়ান এসেছে! ভয়-ভীতি যখন ঘিরে ধরে, উপায়-আসবাব যখন গায়ব হয়ে যায়, সামনে যখন মৃত্যুর ছায়া দেখা যায়, 'বে-বাসী ও বে-কাসী' যখন চরমে পৌঁছে যায় তখন বান্দা যেভাবে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেয়, যেভাবে আকুল হয়ে আল্লাহকে ডাকে এবং যেভাবে আল্লাহর কাছে দু'আ করে তার সত্যি কোন তুলনা নেই। সে সময় আল্লাহ আমাকে যে দু'আ করার তাওফীক দিয়েছিলেন তাতে আমার অন্তরে তখন এ প্রশান্তি এসেছিলো যে, যদি মৃত্যু আসে ইনশাআল্লাহ আসানির সাথেই আসবে এবং শাহাদাত-সৌভাগ্য নছীব হবে।

আমার জন্য তখনকার অবস্থা আরো মর্মন্তুদ ছিলো এ কারণে যে, তিন বছর আগে এই রিয়াদ বিমানবন্দরেই ঘটেছিলো শতাব্দীর সবচেয়ে শোকাবহ বিমানদুর্ঘটনা। সেটাও ছিলো সাউদিয়ার এবং হজ্ব-কাফেলার বিমান। বিমানবন্দরে অবতরণের পর অজ্ঞাত কারণে বিমানে আগুন ধরে গিয়েছিলো এবং দরজা খোলার স্বয়ংক্রীয় ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়েছিলো। তাই বিমান থেকে একজনও যাত্রী বের হতে পারেনি। বিমানবন্দরকর্তৃপক্ষের তখন যাত্রীবোঝাই জ্বলন্ত বিমানের অসহায় দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিলো না।

সে দুর্ঘটনায় চারশতাধিক হজযাত্রী জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। হযরত হাফেজ্জী হুযূরের মেঝো ছাহেবযাদা আলহাজ্ব ক্বারী ওবায়দুল্লাহ ঐ বিমানের ভিতরে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

বারবার মনে পড়ছিলো সে ঘটনা। কিছুই জানা নেই, কী ঘটতে যাচ্ছে! আমাদের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে! তাকদীরের হাতে ইনসানের মজবুরির এর চেয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে! তবে আল্লাহ্ যাকে দয়া করেন তার অন্তরে সাকীনা ঢেলে দেন এবং কালিমার সাথে মওত নছীব করেন। এগুলো বড় কঠিন পরীক্ষা! আমাকে, তোমাকে, আমাদের সবাইকে, আপন-পর সবাইকে আল্লাহ্ যেন সর্বপ্রকার পরীক্ষা থেকে হেফাজত করেন; আল্লাহ যেন ঈমানের সাথে আসানির সাথে মওত নছীব করেন, আমীন।

সত্য কথা যদি বলতে চাই তাহলে বলবো, ঐ কঠিন সময়ে মায়ের কথা, বাবার কথা, স্ত্রীর কথা, কারো কথাই আমার মনে পড়েনি; শুধু মনে পড়েছে আমার ছোট্ট মেয়েটির কথা, আমার অস্তিত্বের ছায়া হয়ে মাত্র যে দুনিয়াতে এসেছে, যাকে আমার এখনো ভালো করে দেখা হয়নি, ভালো করে কোলে নেয়া হয়নি; আমার হৃদয়ে যার স্পষ্ট কোন ছবিও নেই। তবু তার কথা মনে পড়েছিলো; সেই কঠিন অবস্থার মধ্যেও মেয়ের জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়েছিলো। আল্লাহর কাছে তখন ফরিয়াদ করেছিলাম, আমার মেয়েকে তুমি এতীম করো না হে আল্লাহ!

এটাই মানুষের স্বভাব, এটাই সত্য। নীচের থেকে উপরে নয়, ভালোবাসা সব সময় উপর থেকে নীচে প্রবাহিত হয়। মানুষ তার গর্ভধারিণী মাকে এবং জন্মদাতা বাবাকে অবশ্যই ভালোবাসে, কিন্তু সন্তানের প্রতি ভালোবাসা অনেক নিবিড় এবং গভীর, আমার ক্ষেত্রে এটা যেমন সত্য আমার মা-বাবার ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। অনেক বছর পর আল্লামা আলী তানতাভীর আত্মজীবনীতে এ 'ফালসাফা' পড়েছিলাম। আততায়ীর গুলিতে শাহাদাতবরণকারিণী তাঁর মেয়ের প্রসঙ্গে তিনি মুহাব্বতের এ ফালসাফা ও দর্শন উল্লেখ করেছিলেন। পড়ে আমি অবাক হইনি। কারণ আমার মনে পড়েছিলো ঐ দিনের ঐ মুহূর্তটি এবং আমি ছিলাম এ ফালসাফার বাস্তব নমুনা।

অবশেষে আল্লাহর রহমতে বিপদ কেটে গেলো। ত্রিশ মিনিটেরও বেশী সময় পর বিমানের চাকা নামলো এবং বিমান স্বাভাবিকভাবেই অবতরণ করলো। মৃত্যুর ছায়াপড়া মুখগুলোতে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠলো। হামদ ও শোকরের সুমধুর আওয়াযে বিমানের অভ্যন্তর মুখরিত হলো। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেখানেই ফিলিস্তীনী শায়খের দেখাদেখি আমি এবং আরো কয়েকজন দু'রাকাত শোকরানা আদায় করলাম। বাসে করে আমাদের বিমানবন্দরভবনে আনা হলো। একঘণ্টা পর বিমান আবার যাত্রা করবে জিদ্দার উদ্দেশ্যে।

রিয়াদের বাসিন্দা যে ভদ্রলোককে মাওলানা হারুন ছাহেব আমার প্রতি খেয়াল রাখার জন্য বলে দিয়েছিলেন তিনি খুঁজে খুঁজে আমাকে বের করলেন। দেখামাত্র অদম্য আবেগে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, হু হু করে কাঁদলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ঠিক আছো তো? ভয় পাওনি তো? আমি তোমার কথা ভেবেছি। আল্লাহর কুদরতে আমরা সবাই রক্ষা পেয়েছি।

একটু আগের যে ভীতিকর পরিস্থিতি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো এখন তা দূর হয়ে গেলো। আমি যেন আবার আমাকে, বাইতুল্লাহর মুসাফিরকে ফিরে পেলাম। আহ! শৈশবের অবুঝ হৃদয়ে যিয়ারাতে বাইতুল্লাহর স্বপ্নের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিলো এবং ধীরে ধীরে লালিত হয়ে যৌবনে এসে যা হৃদয়ের ভূমিতে সবুজ ছায়া বিস্তার করেছে, স্বপ্নের সেই সবুজ বৃক্ষে এই কিছুদিন আগে একটি কলিও এসেছে; বিশদিনের দীর্ঘ সফরে স্বপ্নের সেই কলি যেন একটু একটু করে ফুটছে; আলোর পরশ পেয়ে পেয়ে একটু একটু করে যেন মুখ খুলছে; সেই কলিটি পূর্ণ ফুল হয়ে ফোটার

পরম মুহূর্তের এখন যেন শুভ উদ্বোধন হলো। অজু করে আমি ইহরামের লেবাস ধারণ করলাম। এশার নামায থেকে ফারিগ হয়ে ইহরামের দু'রাকাত আদায় করলাম। তারপর! তারপর দুরু দুরু বুকে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে উচ্চারণ করলাম সেই শব্দ ক'টি, চৌদ্দশ বছর আগে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব যা উচ্চারণ করেছিলেন মদীনা থেকে বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে যাত্রার সময়–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

(আমি হাযির, তোমার দুয়ারে হে আল্লাহ আমি হাযির! তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাযির, নিঃসন্দেহে সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও তোমারই, তোমার কোন শরীক নেই।)

ফিকাহর কিতাবুল হজ্ব পড়াতে গিয়ে কতবার এ শব্দ উচ্চারণ করেছি, অর্থ বুঝিয়েছি এবং মর্ম ব্যাখ্যা করেছি! কিন্তু আজকের উচ্চারণ, এ যেন অন্য কিছু! শব্দগুলো তখন যেন উচ্চারণ থেকে অনুভবে গিয়েছে, এখন তা অনুভব থেকে উচ্চারণে আসছে; তখন মর্ম ব্যাখ্যা করেছি, এখন মর্ম উপলব্ধি করছি, (বলা ভালো, উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি।) তখন ইহরামের আলোচনা করেছি এখন ইহরাম গ্রহণ করছি। এতদিন হৃদয়ে স্বপ্ন লালন করেছি; হৃদয়ে লালিত সেই স্বপ্নকে এখন হৃদয়ে বরণ করছি। মনে হলো, আমি গান্দেগির নীচতা থেকে বান্দেগির উচ্চতায় উপনীত হলাম। আমার মনিব যেন বান্দাকে বান্দার আসল লেবাস পরিয়ে দিলেন। জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে মানুষের বিভিন্ন রকম 'পরিচয়-পোশাক' থাকে। ইহরাম হলো বান্দার সারা যিন্দেগির বান্দেগির পরিচয়-পোশাক। সেই পাক-পবিত্র ও সাদা-শুভ্র পোশাক আল্লাহ তাঁর অধম বান্দাকে আজ পরিয়ে দিলেন; শোকর আলহামদু লিল্লাহ।

ইহরামের লেবাস পরার তরীকা জানা ছিলো না। আমার পেরেশান অবস্থা দেখে আল্লাহর এক বান্দা সাহায্য করলেন। নিজের হাতে আমাকে ইহরামের লেবাস পরিয়ে দিলেন। তার নাম তখনো জানা হয়নি, এখনো জানা নেই। তখনো তাকে মনে হয়েছিলো পরম উপকারী বন্ধু, এখনো মনে হয় এবং আরো বেশী করে মনে হয়। আল্লাহ তাকে, আমার জীবনের প্রথম লিবাসুল ইহরাম ধারণে সাহায্যকারী সেই উপকারী বন্ধুকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

রিয়াদের সেই ভালো মানুষটি আমার জন্য মাকবূল সফর কামনা করে বিদায় নিলেন। সফর শুরু হয়েছিলো তিনজনের কাফেলায়। তাই যাকে বলে সফরের নিঃসঙ্গতা, সেটা তখন ছিলো না, আর আবুধাবীতে তো রীতিমত ঘরের ছায়া লাভ করেছিলাম। আবুধাবী থেকে যখন বিমানে আরোহণ করলাম তখন থেকেই শুরু হয়েছিলো প্রকৃত সফর, একজন মুসাফিরের নিঃসঙ্গ সফর। তারপরও ছিলো পরিচয়ের ক্ষীণ একটি সূত্র, রিয়াদ পর্যন্ত। সেটা এখন ছিন্ন হলো।

জিদ্দার উদ্দেশ্যে বিমানের সিঁড়িতে যখন আরোহণ করলাম, মনে হলো এই পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ একা; আল্লাহ ছাড়া আমার কোন সঙ্গী নেই। আল্লাহ ছাড়া আমার কোন

সঙ্গীর প্রয়োজনও নেই। এই পৃথিবীতে কারো সাথে আমার পরিচয় নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন পরিচয়ের আমার চাহিদাও নেই।

মানুষ যখন একা ও নিঃসঙ্গ হয় তখনই সে পূর্ণরূপে অনুভব করতে পারে আল্লাহর সঙ্গ এবং সেই সঙ্গের আত্মিক স্বাদ ও রূহানী লয্যত। মানুষের যখন কোন পরিচয় থাকে না তখনই সে লাভ করে আল্লাহর পরিচয়। ইহরামের লিবাস ধারণ করে মানুষ আসলে তার ক্ষণস্থায়ী সমস্ত পরিচয় বর্জন করে এবং একমাত্র আল্লাহর পরিচয় গ্রহণ করে; আল্লাহর বান্দা হওয়ার পরিচয়, তার সৃষ্টির মূল পরিচয়। মানুষ তখন ধন্য হয়, তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

হজ্ব বা ওমরা শেষে যখন তুমি ইহরামের লিবাস খুলে ফেলো তখন যদি এই লিবাসের শুভ্রতাটুকু ধরে রাখতে পারো জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাহলেই তুমি কামিয়াব ও খোশনছীব। জীবনে অহরহ আমরা পোশাক বদল করি; ইহরাম যদি হয় তেমনি সাধারণ কোন পোশাক পরিবর্তন তাহলে সত্যি সত্যি আল্লাহর প্রয়োজন নেই বান্দার এই প্রাণহীন ইহরাম ধারণের। আমাকে, তোমাকে, আমাদের সবাইকে আল্লাহ তাওফীক দান করুন লিবাসুল ইহরামের পবিত্রতা ও শুভ্রতায় জীবনকে, জীবনের সকল কর্মকে শুভ্র ও পবিত্র রাখার।

প্রিয় পাঠক! তুমি তো আমার দেশের, আমার ভাষার! তুমি কি কাশবনে কাশফুল দেখোনি! সেই চিরচেনা কাশবনের কাশফুলের শুভ্রতা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো জিদ্দার উদ্দেশ্যে বিমানে আরোহণ করার পর। শুভ্রতা, পবিত্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। আমারও হৃদয়ে পবিত্রতার অপূর্ব এক অনুভূতি সৃষ্টি হলো। আমার চারপাশে ইহরামের আরো অনেক শুভ্র লেবাস, আল্লাহর ঘরের আরো অনেক মুসাফির। সামনে পিছনে নতুন পরিচয়ে পরিচিত অনেক মানুষ! মাঝে মাঝে সমবেত কণ্ঠে শুনি তালবিয়ার সুমধুর ধ্বনি, কলবে ইশকের মউজ এবং হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ সৃষ্টিকারী লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ধ্বনি।

আল্লাহর রহমতে ছহী-সালামতে বিমান জিদ্দায় অবতরণ করলো। বিমানের সিঁড়ির পাটাতনে এসে দাঁড়ালাম। আহ! হিজাযভূমির ঝিরঝির বাতাস দেহ-প্রাণ জুড়িয়ে দিলো। এই প্রথম হিজাযের পবিত্র বাতাসে আমি শ্বাস গ্রহণ করলাম। আলী তানতাভী যে লিখেছেন - نَفَحَاتُ الْحَرَمِ তা যেন আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম। বাংলায় ঠিক কোন শব্দে نَفَحَاتُ الْحَرَمِ এর ভাব ও মর্ম প্রকাশ করা যায়, আমার জানা নেই। এটা বাংলাভাষার দৈন্য, কিংবা আমার অক্ষমতা, তবে আল্লাহ মেহেরবান তাওফিক দিয়েছিলেন, তখন আমি তা অনুভব করেছিলাম। যদিও সাধারণ মানুষের অনুভব এবং আল্লাহর যারা পেয়ারা বান্দা তাদের অনুভব এক হতে পারে না! নাম না জানা এক কবির ভাষায়–

লায়লার গলিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা / কতজন আসে যায়, কিন্তু বলো বন্ধু / মজনু ছাড়া কে পায় লায়লার ঘ্রাণ!

আমি মজনু নই, মজনুর অনুসারীও নই; তবু আমি সামান্য কিছু পেয়েছিলাম এবং সেই অনুভবের, সেই স্বাদ ও লয্‌যতের সামান্যটুকুরও কোন তুলনা নেই।
'ইশক ও মুহব্বতের 'আন্দায' বড়ই নিরালা। আকল ও বুদ্ধির শাসন এখানে চলে না। যারা আশিক তারা দিওয়ানা। তাই আকল-বুদ্ধির বিচার দিয়ে তাদের তিরস্কার করো না।' একথাগুলো আমার নয়, আমাকে সেদিন বলেছিলেন বাইতুল্লাহর এক আশিক দিওয়ানা, যখন আমি তাকে বললাম, তুমি এমন করছো কেন? এটা তো সঙ্গত নয়!
আমি তার আচরণকে অনুমোদন করিনি, তবে ইশকের মউজে ডুবে যাওয়া তার কলব থেকে বের হওয়া কথাগুলো অস্বীকারও করতে পারিনি। মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী (রহ.) তাঁর হজের সফরনামায় যা বলেছেন এ ধরনের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সেটাই অনুসরণযোগ্য; তিনি লিখেছেন, 'মানুষের সামনে স্বেচ্ছায় এমন কিছু করো না যা অন্যের জন্য ফেতনার কারণ হতে পারে'।

হিজাযের পবিত্র ভূমিতে

জিদ্দা থেকে বাস রওয়ানা হলো, কোনদিকে?! মক্কাভূমির দিকে, আল্লাহর ঘর যেদিকে; যে ঘর যিয়ারাতের স্বপ্ন দেখেছি আজীবন, সে ঘরের দিকে।
বাসের ঊনপঞ্চাশজন যাত্রী, ইহরামের লিবাসে সবাই আল্লাহর ঘরের যাত্রী। পুরো বাসে ক্ষণে ক্ষণে লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ধ্বনি। সমবেতকণ্ঠের সেই সুমধুর ধ্বনি সময়ের প্রাচীর অতিক্রম করে আমাকে নিয়ে যায় সুদূর অতীতে, চৌদ্দশ বছরের আলোকময় অতীতে। পর্বত, উপত্যকা ও মরুভূমি পার হয়ে নূরের কাফেলা এগিয়ে চলেছে মক্কার পথে, বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে। উটের পিঠে, এমনকি কেউ কেউ পায়ে হেঁটে। সালারে কাফেলাকে অনুসরণ করে সবার মুখে লাব্বাইক ধ্বনি। নূরানী যবান থেকে উচ্চারিত এ ধ্বনি সৃষ্টি করছে নূরের কম্পন, আলোর তরঙ্গ। সে কম্পন ও তরঙ্গ অনুভূত হচ্ছে সৃষ্টির অণুতে অণুতে। তারপর থেকে যুগের পথ ধরে এবং শতাব্দীর সিঁড়ি বেয়ে যত কাফেলা পথ অতিক্রম করেছে; যত কাফেলা মরুভূমি পার হয়েছে; সাগর পাড়ি দিয়েছে এবং আকাশে উড্ডয়ন করেছে তারা সব এই নূরানী কাফেলারই অনুগামী, এই নূরানী কাফেলার নূরে তারাও স্নাত।
আমাদের বাস চলছে। পথ কখনো পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, কখনো মরুভূমির বুক চিরে। রাতের অন্ধকারে আলোর হালকা আভাস। কিছু দেখা যায়, কিছু দেখা যায় না; তবু আমি তাকিয়ে আছি দূর দিগন্তের দিকে, যেখানে দেখা যায় পর্বত শ্রেণীর অস্পষ্ট ছায়া। আমার মনে, আমার কল্পনায় বারবার ভেসে আসছে সেই নূরানী কাফেলার ছবি। জানি, মাঝখানে আছে সময়ের দূরত্ব এবং যুগের ব্যবধান; আছে বহু শতাব্দীর

প্রাচীর; তবু তো সেই নূরানী কাফেলারই অনুসারী এ কাফেলা। আমাদের দৃষ্টি তো সেই আলোরই দিকে। আমরা চলেছি তো সেই আলোকেই অনুসরণ করে।

আমরাও তো বলছি লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক! জানি; তাতে ধ্বনি আছে, মর্ম নেই; তবু এটা তো তাদেরই অনুসরণ, সেই লাব্বাইক ধ্বনিরই অনুরণন।

আমরাও তো পরেছি ইহরামের সাদা লেবাস! জানি, আমাদের লেবাসে সে শুভ্রতা ও পবিত্রতা নেই, তবু তো এ লেবাস সে লেবাসেরই ধারাবাহিকতা! নাম তো এখানেও লিবাসুল ইহরাম! স্বীকার করি, এ কাফেলার কোন কিছুতেই সেই কাফেলার দৃশ্য নেই, কিন্তু সাদৃশ্য তো আছে! যাত্রা তো একই দিকে, আল্লাহর ঘর অভিমুখে!

এসব চিন্তায় আমি পুলকিত হলাম এবং বিগলিত হলাম। অদৃশ্যলোক থেকে আমি যেন এই সান্ত্বনা পেলাম, বান্দা! আমার রহমত ও করুণা সময়ের বাধা মানে না। যে যুগের হোক, যে দেশের হোক, যে ভাষা ও বর্ণের হোক, যারা অনুসরণ করবে আমার হাবীবের নূরানী কাফেলা, যত ক্ষুদ্রতা ও অসম্পূর্ণতা থাকুক, তাদের সবার উপর বর্ষিত হবে আমার রহমত ও করুণা।

আমার পাশের আসনে বসেছিলেন যিনি, দেহের বর্ণে তিনি বিলাল হাবশীর (রা.) সমগোত্রীয়। তিনি তার ভাষায় আমাকে কিছু বলতে চাইলেন। আমি বুঝতে পারলাম না, তিনিও আমার কথা বুঝলেন না। আমি অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম আর মনে মনে বললাম, তবু আমাদের লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য অভিন্ন। আমাদের লেবাস সাদা, আমরা আল্লাহর ঘরের যাত্রী। তোমার মুখের ভাষা আমি বুঝিনি, কিন্তু আমার অন্তরে রয়েছে তোমার প্রতি ভালোবাসা ও শুভ কামনা। ঈমানের বন্ধনে তুমি যে আমার ভাই!

একটু পরে অবশ্য বুঝলাম! ব্রিফকেস থেকে ছোট্ট বোতল বের করে পানি পান করতে যাবো তখন তিনি পানির দিকে ইশারা করে বুঝালেন, তার খুব পিপাসা পেয়েছে। পানি ছিলো অল্প, আমারও পিপাসা ছিলো সামান্য। তাই নিজের প্রয়োজন চিন্তা না করে পানির বোতল আমি আমার হাবশী ভাইকে দিলাম এবং পিপাসার মাঝে অদ্ভুত এক তৃপ্তি লাভ করলাম।

আলোর শহর মক্কা এসে গেলো। দূর থেকে দেখা গেলো অসংখ্য বাতি এবং তার ঝলমল আলো। সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। সে ধ্বনিতে কী আবেগ-উচ্ছ্বাস! কী উত্তাপ-উদ্দীপনা! আমি রোমাঞ্চিত হলাম। আমার সমগ্র অস্তিত্বে অপার্থিব এক শিহরণ অনুভূত হলো। আল্লাহর পেয়ারা হাবীবের প্রিয় জন্মভূমি এ মক্কাভূমি! সত্যি সত্যি আমি তাহলে দেখতে পেলাম এ পবিত্র ভূমি! এ সৌভাগ্য তাহলে লেখা ছিলো আমার ভাগ্যে! হে আল্লাহ, তোমার শোকর।

ভিতরে আমার পবিত্রতা ছিলো না, তবে পবিত্রতার অনুভূতি ছিলো। সেই অনুভূতিকে সম্বল করে আমরা পবিত্র মক্কা শহরে প্রবেশ করলাম এবং.....এবং দেখতে পেলাম! দূর থেকে হারামের আলোকিত মিনারগুলো দেখতে পেলাম! আবার ধ্বনিত হলো,

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। (তোমার দুয়ারে আমি হাযির হে আল্লাহ, তোমার বান্দা হাযির!)

সব কিছু যেন চোখের পলকে ঘটে যাচ্ছে। হৃদয়ের স্বপ্নকলির পাপড়িগুলো একে একে বিকশিত হচ্ছে, কিন্তু খুব দ্রুত। এতদিন যেন সময়ের গতি ছিলো ধীর, আর মন ছিলো অধীর। এখন সময়ের গতি এত দ্রুত যে, কিছু অনুভব করার আগেই যেন দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চলে যায়!

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর শহর! হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর শহর! এবং আমাদের পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শহর! এ শহরেই তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন! এখানেই কেটেছে তার শৈশব, কৈশোর! এখানেই তিনি যৌবনের পবিত্রতা দিয়ে মুগ্ধ করেছেন, এমন কি শত্রুদেরও হৃদয়! সেই শহর, আমার সারা জীবনের স্বপ্নের মক্কা শহর আজ আমার চোখের সামনে! আমি এখন মক্কা শহরে, মক্কার আলো ঝলমলতার মাঝে!

এত দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন এত সহজে সত্য হয়ে যায়! তোমার শোকর হে আল্লাহ, তোমার শোকর!

হারামের আলোকিত মিনার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো, কিছুক্ষণ পর দৃষ্টি আবার আলোকিত হলো। আবার লাব্বাইক আলাহুম্মা লাব্বাইক-এর উচ্ছ্বাস ধ্বনিত হলো। হারাম শরীফের খুব নিকটে এসে বাস থামলো।

বাস থেকে নামলাম। ইমামুল হারামের সুমধুর তিলাওয়াত কানে এলো। এখন মনে নেই, কোন আয়াত ছিলো, কিন্তু মনে আছে অনেকক্ষণ আমি ভাবাচ্ছন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলাম। তিলাওয়াতের সুমধুর ধ্বনি হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে হৃদয়কে বিগলিত করেছিলো। এ যেন নয় মানুষের কণ্ঠস্বর, এ যেন আসমান থেকে নেমে আসা সুর ! এ যেন আসমান থেকে নেমে আসা নূর!

ধারণা করলাম, হারাম শরীফে কিয়ামুললায়ল শুরু হয়েছে। এক দোকানে গিয়ে অনুরোধ করলাম ব্রিফকেসটা আমানত রাখার জন্য, তিনি রাজি হলেন। ব্রিফকেস রেখে প্রয়োজন থেকে ফারিগ হলাম। অজু করে পাক-ছাফ হলাম। হে আল্লাহ, আমি তো শুধু বাইরে পাক-ছাফ হলাম তোমার হারামে প্রবেশ করার জন্য। তুমি কবুল করো হে আল্লাহ! তোমার ঘর যিয়ারতের জন্য, তোমার ঘর তাওয়াফের জন্য এবং তোমার ঘরের আনওয়ার ও বারাকাত লাভের জন্য তোমার বান্দাকে তুমি ভিতর থেকে পাক-ছাফ করে দাও হে আল্লাহ! কলবকে পাক করে দাও, হৃদয়কে পবিত্র করে দাও এবং সমগ্র অস্তিত্বকে আলোকিত করে দাও।

***

অবশেষে আমার জীবনে এলো শৈশব থেকে হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের কলি পূর্ণ প্রস্ফুটিত হওয়ার পবিত্রতম মুহূর্ত। ধীর পদক্ষেপে আমি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলাম এবং দৃষ্টি অবনত রেখে দুরু দুরু বুকে অগ্রসর হলাম। আমার চারপাশে যেন নূরের ঢেউ। আমি যেন সাঁতার কেটে কেটে এগিয়ে চলেছি। আমি যেন নূরের সাগরে ডুবে যাচ্ছি,

তলিয়ে যাচ্ছি। সময়ের সব কিছু যেন হারিয়ে গেলো। চারপাশের উঁচু উঁচু ভবন, এমনকি হারামের সুরম্য ইমারত সব হারিয়ে গেলো। আধুনিক সবকিছু মুছে গেলো। নূরের বন্যায় সময়ের সব চিহ্ন ভেসে গেলো এবং আমি ডুবে গেলাম।

এখন আমি চোখ মেলে তাকাবো। এখন আমার স্বপ্ন দেখার ব্যথা ও বেদনার উপশম হবে। এখন হৃদয়ে আমার স্বপ্নের পূর্ণতার শান্তি ও প্রশান্তি অর্জিত হবে। এখন আমি দেখতে পাবো আমার আল্লাহর ঘর। কতদিন স্বপ্ন দেখেছি! কত রাত জেগে পশ্চিমের আকাশে তাকিয়েছি! বিগলিত হৃদয় থেকে কত অশ্রু ঝরিয়েছি! সফরে সফরে কত পথ পাড়ি দিয়েছি! কতদূর থেকে কত ব্যাকুলতা নিয়ে এসেছি আল্লাহর ঘর দেখবো বলে। হে আল্লাহ! সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতা সত্ত্বেও তুমি আমাকে তোমার পাক হারামে তোমার পবিত্র ঘরের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছো। হে আল্লাহ! করুণা করো, আমার দৃষ্টির মলিনতা দূর করো, আমি তোমার ঘর দেখবো। আল্লাহর ঘরের দীদার লাভের সময় পড়তে হয় - لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ আমি পড়লাম। আবারো পড়লাম–

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ عِزًّا وَ شَرَفًا ('হে আল্লাহ তোমার ঘরের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করো')

ধীরে ধীরে দুরু দুরু বুকে চোখ তুলে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম! আমার আল্লাহর ঘর আমি দেখতে পেলাম! কালো গিলাফে এবং নূরের পর্দায় ঢাকা বাইতুল্লাহ আমি দেখতে পেলাম! সৃষ্টির সকল সৌন্দর্য যেন কেন্দ্রীভূত হলো কা'বাতুল্লাহর মাঝে। কালো গিলাফের সৌন্দর্যের মাঝে আমি যেন সৃষ্টিজগতের সমগ্র সৌন্দর্য অবলোকন করলাম, সমগ্র সৌন্দর্যে আমি যেন অবগাহন করলাম।

সময়ের প্রাচীর ভেঙ্গে শত শত শতাব্দীর পথ পাড়ি দিয়ে আমি পৌঁছে গেলাম সেই সুদূর অতীতে, সেই নূর ও নূরানিয়াতের যুগে! আমি যেন দেখতে পেলাম সেই নূরানী কাফেলাকে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে! আমিও শামিল হলাম সেই কাফেলায়। আমি ধন্য হলাম। আমার জীবন ধন্য হলো। আমার অস্তিত্ব সার্থক হলো। হে আল্লাহ, কীভাবে, কোন ভাষায় তোমার শোকর আদায় করবো! কী করে, কোন উপায়ে তোমার সমীপে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করবো! হে আল্লাহ! আমার তো সাধ্য নেই তোমার প্রশংসা করার। তুমি নিজে তোমার যে প্রশংসা করেছো সে-ই তো তোমার যোগ্য প্রশংসা।

এই যে হাজারে আসওয়াদ! হস্ত প্রসারিত করলেই যেন স্পর্শ পাবো। কিন্তু হে আল্লাহ, তোমার বান্দাদের যে কষ্ট হবে! আমি তো চাই শুধু তোমার সন্তুষ্টি! হে আল্লাহ, আমার অন্তরের আকুতি ও হৃদয়ের ব্যাকুলতা তুমি জানো। তোমার হাবীব যে প্রস্তর স্পর্শ করেছেন, তোমার হাবীব যে প্রস্তরে চুম্বন করেছেন তার একটু স্পর্শের জন্য, একটি চুম্বনের জন্য আমি প্রাণ উৎসর্গ করতে পারি, কিন্তু তোমার সন্তুষ্টির জন্য হে আল্লাহ, আমি বিসর্জন দিলাম আমার হৃদয়ের লালিত আকাঙ্ক্ষা।

আল্লাহু আকবার বলে দূর থেকে শুধু হাতের ইশারায় সম্মান জানালাম নবীজীর চুম্বনধন্য হাজারে আসওয়াদকে।

এই যে আল্লাহর ঘরের দুয়ার! এই যে বাইতুল্লাহর মুলতাযাম! আল্লাহ সুযোগ করে দিলেন। ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হলাম এবং দু'হাত উঁচিয়ে দুয়ারের চৌকাঠ ধরলাম। মুলতাযামে বুক লাগালাম। আহ, কী শান্তি! কী প্রশান্তি! আবার যেন সময়ের ব্যবধান মুছে গেলো। শতাব্দীর প্রাচীর আবার যেন ভেঙ্গে গেলো। মুলতাযামের স্পর্শে আমি যেন সেই পবিত্র স্পর্শের পরশ অনুভব করলাম। আমার সর্বসত্তা যেন নূরানিয়াতে পূর্ণ হলো। আবার আমি ভেসে গেলাম নূরের বন্যায়।

হে আল্লাহ, তোমার ঘরের মুলতাযামে দাঁড়িয়ে জানি না কী আমি বলবো এবং কীভাবে বলবো! কী আমি চাইবো এবং কীভাবে চাইবো! তুমিই বলে দাও, তুমিই শিখিয়ে দাও। হে আল্লাহ, তুমি আমার হয়ে যাও এবং আমাকে তোমার করে নাও। হে আল্লাহ, দয়া করে খুলে দাও, তোমার ফকীর বান্দার জন্য তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডারের দুয়ার খুলে দাও।

এই যে মাকামে ইবরাহীম! ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হলাম। চোখ দু'টোকে ধন্য করে দেখলাম, আল্লাহর খালীলের পাক কদমের ছাপ দেখলাম। এ পাক কদমের ছাপ আল্লাহর পেয়ারা হাবীব দেখেছেন, এ কথা কি সত্য নয়! আমি জানি, এ দেখা সেই দেখা নয়, তবু তো দেখা! দৃশ্য নেই, সাদৃশ্য তো আছে! مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে! সাদৃশ্যেরও মূল্য আছে। দৃশ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য যদি অর্জন করতে পারো তাহলে তুমিও জামাতে শামিল হতে পারো।

আল্লাহর পেয়ারা হাবীব (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহীমের নিকটে দু'রাকাত নামায পড়েছেন। এ দু'রাকাত উম্মতের উপর ওয়াজিব করা হয়েছে; কেন? আল্লাহর পেয়ারা হাবীবের সঙ্গে সাদৃশ্য গ্রহণের জন্যই তো! মারেফাতের জ্ঞানে অন্তর্জ্ঞানী আল্লাহর কোন এক বান্দা তো বহু যুগ পূর্বে কিছু না কিছু অবলোকন করে এবং কিছু না কিছু উপলব্ধি করে বলে গেছেন-

رحمت حق بہا نمی جوید * رحمت حق بہانہ می جوید

আল্লাহর রহমত আমলের বাহার দেখে না, দেখে আমলের বাহানা।

আল্লাহর রহমত নেমে আসার পথে সেই 'বাহানাটুকু' পেশ করার নিয়তে চৌদ্দশ বছর পরের এক গোনাহগার উম্মতি, গোনাহের গান্দেগিতে ডুবে থাকা উম্মতি নামাযে দাঁড়ালো, গোনাহের সিয়াহি ও কালো দাগ বুকে নিয়ে, কালো গিলাফের নূরানিয়াত সামনে রেখে। হায়, আফসোসে, অনুতাপে কলজে কি আমার ফেটে যাবে! কিংবা আমি কি পাগল হয়ে যাবো আনন্দের আতিশয্যে! সারা জীবনের নামায ছিলো এ ঘরের গায়েবানা, আজ এই প্রথম নামাযে দাঁড়ালাম, এই প্রথম সিজদায় মাথা রাখলাম এ ঘরের 'হাযিরানা'! নামাযে এত স্বাদ, এত শান্তি! সিজদায় এত স্বস্তি, এত প্রশান্তি! আবার, আবার আমার দৃষ্টি থেকে মুছে গেলো সময়ের সীমানা, বর্তমানের সব নিশানা। আমি দেখলাম অন্যরকম মানুষের অন্যরকম কাফেলা। এঁরা উম্মতের

শ্রেষ্ঠতম কাফেলা। নূর! নূর!! চারদিকে শুধু নূর!!!! নূরের সাগর! নূরের জোয়ার!! আমি যেন ভেসে গেলাম নূরের জোয়ারে! আমি যেন ডুবে গেলাম নূরের সাগরে!!
সালাম ফিরিয়ে চারদিকে যখন তাকালাম, দেখি, সবকিছু বর্তমান, সব কিছু বিদ্যমান। আধুনিক বিদ্যুতের আলোয় সবকিছু প্লাবিত। কিন্তু মনে হলো, অতীত যেন কিছু দিয়ে গেলো। আলোর উজ্জ্বলতায় নূরের পরশ যেন পাওয়া গেলো! যুগে যুগে অতীত এভাবেই মনে হয় ফিরে ফিরে আসে বর্তমানকে নূরস্নাত করার জন্য, কিংবা বর্তমান এভাবেই ফিরে ফিরে যায় অতীতের কাছে নূরস্নাত হওয়ার জন্য।
যখন হাত তুললাম মুনাজাতের জন্য, বিগলিত হৃদয় থেকে কান্না উথলে উঠলো। চোখ থেকে অশ্রুর ধারা নেমে এলো। এ কান্না আনন্দের! এ অশ্রু প্রশান্তির! সকল দাতার বড় দাতা যিনি, ভিখারীকে ডেকেছেন তিনি, কী জন্য! সকল দয়ালুর বড় দয়ালু যিনি, কাঙ্গালকে এনেছেন তিনি, কী জন্য! দান করার জন্যই তো! অনুগ্রহে ও করুণায় সিক্ত করার জন্যই তো!
এবার আবে যামযাম! বিবি হাজেরার ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার আবে যামযাম! পিপাসায় কাতর শিশু ইসমাঈলের আবে যামযাম! সর্বোপরি আল্লাহর পেয়ারা হাবীবের পবিত্র থুথু মিশ্রিত আবে যামযাম! দয়াময়ের দয়া তা থেকেও আমাকে বঞ্চিত করলো না! আমার ঠোঁট দু'টা অপবিত্র বলে করুণাময়ের করুণা তা থেকে আমাকে দূরে রাখলো না। আমি সিঁড়ি বেয়ে নামলাম এবং কাছে গেলাম। আমি যামযামের কূপ দেখলাম এবং পান করলাম। যামযামের শীতল পানি প্রাণভরে পান করলাম এবং তৃপ্ত হলাম। আমি আরো পান করলাম এবং পরিতৃপ্ত হলাম। আমি আকণ্ঠ পান করে কোষে কোষে সুসিক্ত হলাম।
হে আল্লাহ, তোমার 'মুসাফির' মেহমান তোমার প্রতি খুশী হয়েছে। তার পিপাসা আজ দূর হয়েছে। হে আল্লাহ, তোমার হাবীব বলেছেন, যে মাকছুদে এবং যে উদ্দেশ্যে যামযামের পানি পান করা হবে তুমি তা পূর্ণ করবে। হে আল্লাহ, আখেরাতের কঠিন পিপাসার দিনে তোমার পেয়ারা হাবীবের হাতে একটি পেয়ালার জন্য আজ এখানে যামযামের পারে নাম লিখিয়ে গেলাম। তুমি কবুল করো হে আল্লাহ!
আবে যামযামের তৃপ্তি ও পরিতৃপ্তির পর আরো সৌভাগ্য আমাকে নিয়ে গেলো ছাফা-মারওয়ার মাঝে। আমার স্বপ্নের ছাফা ও মারওয়া আজ আমার চোখের সামনে! কীভাবে সম্ভব হলো তা? আমলের গুণে? যোগ্যতার বলে? না, আমার ইহরাম, আমার লাব্বাইক, এই তাওয়াফ, এই সাঈ শুধু আল্লাহর দান; 'জীবনে-মহাজীবনে' বান্দার যা কিছু প্রাপ্তি তা শুধু আল্লাহর মেহেরবানি।
ছাফা-মারওয়ার কেন এত বড় শান? এত বড় সম্মান? কারণ, ছাফা ও মারওয়া আল্লাহর মুহব্বতের নিশান। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন–

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

নিশ্চয় ছাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য, সুতরাং যে (আল্লাহর) ঘরের হজ্জ বা ওমরা করবে সে যেন ঐ দু'টির মাঝে সাঈ করে।

সকল মর্যাদা ও মহিমা একমাত্র আল্লাহর। তিনি যখন ইচ্ছা করেন পাথরের পাহাড়কেও এভাবে মর্যাদা দান করেন।

সময়ের প্রয়োজনে ছাফা ও মারওয়া যদিও কেটে কেটে সমান করা হয়েছে, তবু তা চার হাজার বছর আগের ছাফা-মারওয়া; এখনো দাঁড়িয়ে আছে মা হাজেরার পুণ্যস্মৃতি ধারণ করে। যত দিন আসমান আছে, যমীন আছে তত দিন থাকবে ছাফা-মারওয়া আল্লাহর ইশক ও মুহব্বতের নিশান হয়ে।

যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্রোত চলছে ছাফা ও মারওয়ার মাঝে, যত দিন চাঁদ-সূর্যের উদয়াস্তের পরিক্রমা অব্যাহত থাকবে, তত দিন ছাফা-মারওয়ার এই জনস্রোত চলতেই থাকবে মা হাজেরার মমতা ও ব্যাকুলতাকে স্মরণ করে।

ছাফা-মারওয়ায় আশিকানের এই যে নূরানি জামাত, তাতে শামিল হবো বলেই তো আমি হাযির হয়েছি ইহরামের পাক-সফেদ লিবাস ধারণ করে! তাই আমি প্রস্তুত হলাম সাঈর আমল শুরু করার জন্য এবং তনু-মন একত্র করে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম ছাফা পাহাড়ের দিকে।

এই ছাফা পাহাড়ে আল্লাহর ঘরকে সামনে রেখে আল্লাহর নবী একদিন দাঁড়িয়েছিলেন হকের আওয়ায নিয়ে। এখান থেকেই সত্যের পথে ডেকেছিলেন তিনি মক্কার কোরায়শকে। এখানে আবু জেহেল ছিলো, আবু লাহাব ছিলো, উতবা ছিলো, উমাইয়া ছিলো; ছিলো আরো অনেক দুর্ভাগা। তারা শুনেনি আল্লাহর নবীর দরদ-ভরা ডাক। বাতিলের শোরগোলে হকের আওয়াযকে তারা চাপা দিতে চেয়েছে। আল্লাহর নবী তখন ছাফা পাহাড় থেকে নেমে এসেছিলেন ব্যথিত হৃদয়ে। চৌদ্দশ বছর পর সেই ছাফা পাহাড় আজ আমার সামনে। ছাফা পাহাড়ের সেই দরদী ডাকেরই তো ফসল আমি অধম উম্মতি! দুরু দুরু বুকে, বিগলিত হৃদয়ে আরোহণ করলাম ছাফা পাহাড়ে। এখান থেকেই শুরু হবে আমার সাঈ। কারণ আল্লাহর কালামে রয়েছে মারওয়ার আগে ছাফা। অনুসরণ ও আনুগত্যই হলো ইসলামের দাবী। আদমের পরিচয় সিজদা, ইবলিসের পরিচয় যুক্তি।

আমি দাঁড়ালাম ছাফা পাহাড়ে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে। দেখতে পেলাম কালো গিলাফের সামান্য আভাস। তাতে হৃদয়ের গভীরে ভাবের ও আবেগের যে জোয়ার এলো তা সবকিছু যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। এখন দু'আ কবুলের মুহূর্ত, এখন তুমি যা চাবে তাই পাবে, কিন্তু কী চাইবো এখানে আমি আমার আল্লাহর কাছে! হৃদয়ে ভাবের জোয়ার আছে, কিন্তু মুখে নেই ভাষা। এখানে দাঁড়িয়ে সবাই কি হয়ে পড়ে এমনই নির্বাক! হারিয়ে ফেলে ভাষা ও শব্দের অবলম্বন! সাঈ শুরু করার আগে এখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নবী কী দু'আ করেছিলেন! মাওলার দরবারে উম্মতের জন্য কী চেয়েছিলেন! হে আল্লাহ, তোমার পেয়ারা হাবীবের সেই দু'আর, সেই চাওয়া ও পাওয়ার সামান্য কিছু অধম এ উম্মতিকেও দান করো; তোমার শান মোতাবেক দান করো।

মানুষ উঠছে, আর নামছে! খুব সাধারণ দৃশ্য, কিন্তু কী অপূর্ব দৃশ্য! এখানে সবকিছু সাধারণ, তবু সবকিছু অসাধারণ!

আমার চারপাশে শুধু শুভ্রতা, আর শুভ্রতা! যত দূর দৃষ্টি যায়, যেন শুভ্রতার এক অন্তহীন স্রোত! এতদিন শুধু শুনেছি, আর স্বপ্ন দেখেছি; আজ সৌভাগ্য হলো এ শুভ্রতা অবলোকন করার, এবং এ শুভ্রতায় অবগাহন করার। তুমি হে আল্লাহ, তাওফীক দাও, জীবন-চলার পথে এ শুভ্রতাকে ধারণ করার।

ছাফা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলাম এবং চলতে শুরু করলাম যেন সময়ের প্রাচীর ভেঙ্গে অতীতের দিকে। একেক সময়ে একেক কাফেলার সঙ্গ লাভ করে করে আমি যেন পৌঁছে গেলাম সেই নূরানী কাফেলার পিছনে! সেখানে মাথার উপর ছাদ নেই, আছে নীল আকাশে মেঘের ছায়া; সেখানে পাখার বাতাস নেই, আছে রহমতের শীতলতা; সেখানে বিদ্যুতের ঝলমলতা নেই, আছে নূরের স্নিগ্ধতা। সেখানে আধুনিক যুগের কিছু নেই, কিন্তু আছে আসমানের সবকিছু। যখন কিছু থাকে না বন্ধু! তখনই সব থাকে। যখন সব থাকে তখনই সবকিছু হারাতে থাকে। পাওয়ার ঘোরে হারানোর কথা একেবারেই ভুলে যায় মানুষ।

হঠাৎ আমি পড়ে গেলাম হোঁচট খেয়ে এবং ধন্য হলাম আল্লাহর বান্দাদের পদচাপে। এক বান্দা আমাকে টেনে উঠালেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম; তখন দেখি, সবকিছু বর্তমান, সবকিছু বিদ্যমান। ছাদ আছে, বাতি আছে, পাখা আছে; তবু মনে হলো, মুহূর্তের জন্য অতীতের যেন ছায়া পড়েছিলো! যুগে যুগে এভাবেই অতীত ছায়া দেয় বর্তমানকে, কিংবা বর্তমান ছায়া গ্রহণ করে অতীত থেকে। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এই বন্ধন যত দিন থাকবে তত দিন খুব সামান্য হলেও আলোর পরশ আমাদের জীবনে থাকবে।

সাঈ চলতে থাকলো ছাফা ও মারওয়ার মাঝে। বারবার ছাফা থেকে নামলাম, বারবার মারওয়ায় উঠলাম। বারবার আমি দৌড়ে পার হলাম সবুজ আলোর সীমানা, মাতৃত্বকে, মায়ের মমতা ও ব্যাকুলতাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য।

সেদিন পাহাড়-ঘেরা এ নির্জন মরু-উপত্যকায় মা ও সন্তান ছাড়া কেউ ছিলো না, কিছু ছিলো না। সবুজ আলোর এই সীমানা তখন ছিলো এক ঢালুভূমি।

কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম, এখন যেখানে যামযাম সেখানে শুয়ে আছেন ফুলের মত সুন্দর ছোট্ট শিশু ইসমাঈল। পিপাসায় কাতর, কিন্তু পানি নেই একফোঁটা। কী করবেন মা হাজেরা! অস্থির হয়ে একবার তিনি ছুটে যান ছাফা পাহাড়ে, যদি দূরে কোথাও দেখা যায় কোন কাফেলার ছায়া! আবার গিয়ে ওঠেন মারওয়ায়। আর ফিরে ফিরে দেখেন, পিপাসায় ছটফট করা কলিজার টুকরো তাঁর বেঁচে আছে কি না! ঢালুতে এসে কলিজার টুকরো তাঁর চোখের আড়াল হয়ে যায়, তাই তিনি তা দৌড়ে পার হন। এই হলো সবুজ সীমানার মাঝে দৌড়ের কাহিনী।

এখন কিছু নেই। সব সমান, মসৃণ, সমতল। তবু এখানে এসে তোমাকে দৌড়তে হবে মা হাজেরার মমতা ও ব্যাকুলতার পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করে। আল্লাহর নবী

দৌড়েছেন, তাঁর নূরানী কাফেলার সকলে দৌড়েছেন। যুগে যুগে এ পুণ্যভূমিতে যারাই এসেছেন, দৌড়েছেন। তোমাকেও দৌড়তে হবে। কেন? না, কোন প্রশ্ন করো না। তোমাকে দৌড়তে হবে শুধু অনুকরণের জন্য, শুধু সাদৃশ্য গ্রহণের জন্য। যেন হাশরের মাঠে বলতে পারো, মাওলা গো! আমার আমলনামায় গোনাহ ছাড়া এবং বদআমলের অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। তবে, তবে আমি দৌড় দিয়েছিলাম তোমার বান্দীকে অনুকরণ করে, তোমার হাবীবের সাদৃশ্য গ্রহণ করে!

মারওয়ায় এসে সাঈ শেষ হলো, ফজরের আযানও শুরু হলো। হারামের মাঝে হারামের সুমধুর আযানধ্বনি জীবনে এই প্রথম শোনা হলো। আযান তো শুনেছি জীবনভর! আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! কিন্তু কী ছিলো হারামের আযান-ধ্বনিতে! হয়ত সেই আযানের প্রতিধ্বনি! হে ভাই, তুমি যদি ইচ্ছা করো, তুমি যদি হৃদয়কে উন্মুক্ত করো তাহলে আজকের আযানের মাঝেও শুনতে পারো অতীতের নূরানী আযানের সুমধুর আসমানী সুর!

আলহামদু লিল্লাহ! তাওয়াফ ও সাঈর মাধ্যমে আমার ওমরা সম্পূর্ণ হলো। এখন আমি ইহরাম থেকে মুক্ত হবো, তবে শুধু ইহরামের লিবাস থেকে, ইহরামের শিক্ষা থেকে নয়। ইহরাম তো ধারণ করাই হয় এর শিক্ষাকে সারা জীবন ধারণ করে রাখার জন্য।

মারওয়ার পিছনে আল্লাহর বান্দারা দাঁড়িয়ে ছিলো ক্ষুর-কাঁচি হাতে। একজন জিজ্ঞাসা করলো, ছেঁটে দেবো, না কামিয়ে দেবো? বললাম, একেবারে কামিয়ে দাও। জীবনের যা কিছু জঞ্জাল সব যেন সাফ হয়ে যায়। আজকের এই পবিত্র মুহূর্ত থেকে জীবনের পথচলা আমি নতুন করে শুরু করতে চাই। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, নফসের গান্দেগি থেকে কলবের বান্দেগির দিকে।

***

সমগ্র হারাম তখন লোকে লোকারণ্য। আমার ভাষার দৈন্যকে ক্ষমা করো হে ভাই! হারামের যে স্বর্গীয় সৌন্দর্য সেদিন দেখেছিলাম তা শুধু শব্দের ফুল সাজিয়ে তোমার সামনে তুলে ধরার সাধ্য আমার নেই। আমি শুধু বিমুগ্ধ চোখে তা অবলোকন করেছিলাম, আর অভিভূত হৃদয়ে উপভোগ করেছিলাম। মনে হয়েছিলো সময় শুধু পিছিয়ে চলেছে একেবারে দূর অতীতের দিকে।

মাতাফের এক কাতারে জায়গা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আহ, কী শান্তি! রহমতের ফিরেশতারা যেন নেমে আসছে আসমান থেকে ঝিরঝির করে 'নূরের শিশির' ঝরিয়ে। এমন পবিত্র মুহূর্তের জন্যই তো মুমিনের সারা জীবনের স্বপ্ন দেখা! সেই স্বপ্নকে হৃদয়ের গভীরে লালন করে যাওয়া! তুমি হতে পারো গোনাহগার, হতে পারে তোমার গোনাহ বেশুমার, তবু তুমি নিরাশ হয়ো না। তুমিও আজ হতে পারো স্নাত, নূরের এই শিশির-স্নানে; তুমিও যে শামিল হয়েছো হারামের জামা'আতে! তুমি তো আসো নি, তোমাকে তো আনা হয়েছে। আর দাতা ডেকে আনেন তো দান করারই জন্য!

ইকামাত হলো, ফজরের জামা'আত শুরু হলো। জীবনের অনন্য এক ফজর! আল্লাহর ঘরকে সামনে রেখে আদায় করা ফজর! সারা জীবনে কি আমি এক লক্ষ ফজর আদায় করেছি! অথচ আজ! হায়, তবু কেন আমি শোকর আদায় করি না আমার মেহেরবান মাওলার!

ইমাম সিজদায় গেলেন, আমিও সিজদায় গেলাম। সিজদায় বান্দা আল্লাহর সবচে' নিকটবর্তী হয়। তবে আজকের নৈকট্য যেন অন্য রকম; আরো গভীর, আরো নিবিড়। আল্লাহর ঘর যে আমার সামনে! আমি যে ঘরওয়ালার মেহমান! ঘরের তাওয়াফ করা মেহমান! যামযামের পেয়ালায় চুমুক দেয়া মেহমান!

শৈশব থেকে যে স্বপ্ন হৃদয়ে লালন করেছি; যে স্বপ্নের পুলকে, শিহরণে, ব্যথায়, আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছি সে স্বপ্ন আজ আমার পূর্ণ হলো। স্বপ্ন যিনি দান করেছেন তিনি আজ সে স্বপ্ন পূর্ণ করেছেন মায়া করে এবং কৃতার্থ করে।

সময়ের গতি দ্রুত, এটা সত্য, কিন্তু এখানে সবকিছু যেন আরো দ্রুত ঘটে গেলো! ইহরাম, তাওয়াফ, সাঈ সব যেন সময়ের চেয়ে দ্রুত ঘটে গেলো! স্বপ্ন যেন পূর্ণ হলো স্বপ্নেরই মাঝে! সামান্য কিছু অনুভব করার সুযোগ হলো, আর বহু অনুভব যেন সুপ্তই রয়ে গেলো হৃদয় ও আত্মার বিহ্বলতার মাঝে। জীবনের এত বড় সৌভাগ্য এত সহজে কীভাবে সত্য হলো! এত মলিনতার মাঝে এমন শুভ্রতা, এত আবিলতার মাঝে এমন পবিত্রতা কীভাবে সম্ভব হলো! এ শুধু দয়াময়ের দয়া এবং করুণাময়ের করুণা। যিনি বলেছেন, সত্য বলেছেন– 'যা কিছু দান সব দাতার, আর যা কিছু ত্রুটি সব বান্দার। তিনি দয়াশীল এবং ক্ষমাশীল। তিনি দয়া করে দান করেন এবং দয়া করে ক্ষমা করেন।'

সুখের সময় যদি ঘুমের প্রয়োজন না হতো! আনন্দের মুহূর্তগুলো নিদ্রার গহ্বরে হারিয়ে গেলে আর আনন্দ কোথায়! কিন্তু মাটির মানুষ মাটির মতই দুর্বল। সুখের দিনেও সে ঘুমিয়ে পড়ে। আনন্দের মাঝেও সে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। ফজরের পর খুব ক্লান্তি বোধ হলো। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম হারাম শরীফে। তবে সে ঘুম ছিলো বড় শান্তির ঘুম। মুমিনের ঘুমকে বলা হয়েছে ইবাদত। অতীতের জীবনে ঘুমকে কখনো ইবাদত মনে করার সুযোগ হয়ত আসেনি; সেদিন হারাম শরীফের ঘুমকে মনে হয়েছিলো অনেক বড় ইবাদত। সে ঘুমের মাঝে যে মধুর স্বপ্ন দেখেছিলাম তা এত বছর পরো স্পষ্ট মনে আছে। সেখানে ফুলের বাগান ছিলো, ফলের বাগিচা ছিলো, ঝিরঝির ঝরণা ছিলো। পাখীদের কলতান ছিলো। আর ছিলো ...!

আহা, কী সৌভাগ্যের ঘুম ঘুমিয়েছিলাম সেদিন! মধুর স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হলাম। চোখ মেলেই দেখি আল্লাহর ঘর এবং তার কালো গিলাফের সৌন্দর্য! যতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, আল্লাহর ঘর যেন আমাকে দেখছিলো স্নেহে মমতায় সিক্ত করে। অবাক হও কেন বন্ধু! আমি যে সে ঘরের মেহমান! মনে পড়ে না তোমার, কবি ইকবালের কথা! 'বাইতুল্লাহর আমরা 'পাসেবান', বাইতুল্লাহ পাসেবান আমাদের!'

বাইতুল্লাহকে আমরা দেখতে এসেছি কত দীর্ঘ জীবন বুকে স্বপ্নের বেদনা লালন করে, তাহলে বাইতুল্লাহ কি দেখবে না আমাদের, তার কালো গিলাফে আসমানের মমতা মেখে! হাশরের মাঠে যখন দুলহানের সাজে হাযির করা হবে বাইতুল্লাকে আমাদের সামনে তখন তাহলে সে চিনবে কিভাবে আমাদের!

***

হারাম শরীফ থেকে বের হয়ে জরুরত সেরে নিলাম। তারপর আমার দুই সফরসঙ্গী মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেব ও ফারুক ভাইয়ের সন্ধানে বের হলাম। তালাশ করে করে আমি যেখানে গেলাম সেটা হলো মিসফালা। সেখানে বেশুমার বাঙ্গালী, কিন্তু আমি যে দুই বাঙ্গালীর খোঁজে বের হয়েছি তারা আছেন কিদওয়া অঞ্চলে। একজন বললেন, কিদওয়া হলো ঐদিকে।

হেঁটে হেঁটে গেলাম সেখানে। আল্লাহর এক বান্দা সাহায্য করলেন, তাই সহজেই ঠিকানাটা পাওয়া গেলো। নইলে একা একা তালাশ করে সঠিক স্থানে পৌঁছা কঠিন হতো। বেশ পুরোনো বাড়ী। ভিতরে অন্ধকার এবং শুঁটকির গন্ধ। মালিকের নাম শামসুদ্দীন বাঙ্গালী। প্রথমেই তার সঙ্গে দেখা। আমাদের দেশে শুঁটকির গন্ধটা যে অঞ্চলের তিনি সে অঞ্চলেরই মানুষ। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে তালাশ করছি। এ ভাষার সঙ্গে পরিচয় ছিলো, তাই বুঝতে সমস্যা হলো না। তিনি আমাকে পৌঁছে দিলেন আমার সঙ্গীদ্বয়ের কাছে।

খুব অল্প সময় ছিলাম তার ঠিকানায়। তিনি যে অন্তরঙ্গ আচরণ করেছিলেন এখনো তা মনে পড়ে। পরে আর কখনো তার দেখা পাইনি। হয়ত এখন তিনি এই দুনিয়ার বাসিন্দা নন, হয়ত তিনি এখন সেই নীরব শহরের বাসিন্দা, যেখানে আমারও জন্য রয়েছে একটি ঘর, যে ঘর আমাকে সাজিয়ে যেতে হবে এখান থেকে আমলের ফুল দিয়ে। আল্লাহ যেন ঐ ভালো মানুষটিকে কবুল করেন এবং তার ও আমাদের সবার 'ঘর' সাজিয়ে দেন মাগফিরাতের সজ্জা দিয়ে।

মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেব ও ফারুক ভাই হারামে জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমাকে দেখে তারা খুশী হলেন; ওমরা থেকে ফারিগ হয়ে এসেছি শুনে আরো খুশী হলেন। জীবনের প্রথম সফরে একা একা কীভাবে কী করলাম, ভেবে তারা অবাক হলেন এবং মোবারকবাদ জানালেন।

মনে মনে বললাম, একা কোথায়! 'তিনি' তো সঙ্গ দিয়েছেন এবং পথ দেখিয়েছেন! আর তিনি যখন পথ দেখান কঠিনতম পথও সহজ হয়ে যায়।

আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম, কিন্তু আমি উচ্ছ্বসিত হওয়ার সুযোগ পেলাম না। আমার মনে কিসের যেন একটা ছায়াপাত ঘটলো। মনে হলো, আমাদের আলিঙ্গনে আরেকটু উষ্ণতার প্রয়োজন ছিলো। অবশ্য এটা ছিলো মুহূর্তের ভাবনা, যা তখনি মন থেকে ঝেড়ে ফেললাম এই ভেবে যে, হয়ত এটা আমার ভুল চিন্তা।

আশা ছিলো, হারামে যাওয়ার পথে অনেক কথা হবে। কিছু বলবো, কিছু শোনবো। কিন্তু হলো না। কারাণ তারা কোন চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলেন। সেই ছায়াটা মনের আকাশে আবার ফিরে এলো। উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম, আপনাদের পেরেশান মনে হচ্ছে! মৃদু হাসির আবরণ দিয়ে তারা বললেন, না তো!

আমি আর কিছু বললাম না, তবে মনের ভিতরে সেই ছায়াটা আরো ঘনীভূত হলো, আকাশে কালো মেঘ জমলে যেমন হয়। কী হতে পারে! এমন কী সমস্যা, যা বলতে অসুবিধা! আল্লাহ যেন ভালো করেন! আল্লাহ যেন ভালো রাখেন!

***

হারাম শরীফে যোহর পড়লাম। আযানের আগে এসেও ভিতরে জায়গা পেতে কষ্ট হলো। দূর থেকে দেখলাম, এই 'কাঠফাটা' রোদেও মাতাফ পরিপূর্ণ। অর্ধেক অংশে কাতারে কাতারে নামাযের ইনতিযার, বাকি অংশে তাওয়াফের তরঙ্গ-জোয়ার। নামায শেষে একটু একটু করে এগিয়ে গেলাম। মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেব বললেন, এই একতালা অংশটি তুর্কী আমলের। আর এই যে, এই স্থানটি হলো উম্মেহানি। আব্বাজান (হযরত হাফেজ্জী হুযূর) এখানে বসেন। এটা ছিলো নবীজীর চাচা আবু তালিবের কন্যা হযরত উম্মেহানি (রা)-এর ঘর। এই যে, দুই খুঁটির মাঝখানে একটু উঁচু স্থান, মেরাজের রাত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে শয্যারত ছিলেন। এখান থেকেই শুরু হয়েছিলো তাঁর বাইতুল মাকদিসের ইসরা (নৈশযাত্রা) ...

তিনি বলে গেলেন, আমি তন্ময় হয়ে শুনলাম, আর হৃদয়ে অপার্থিব এক প্রশান্তি অনুভব করলাম। আমরা তিনজন উম্মেহানিতে গিয়ে বসলাম। উঁচু স্থানটিতে একজন মাত্র মানুষ শয়ন করতে পারে। এক বৃদ্ধ, সম্ভবত পাকিস্তানী (অথবা হিন্দুস্তানী) শুয়ে আছেন। মুখমণ্ডলের জ্যোতির্ময়তা যে কাউকে ভক্তি-আপ্লুত করবে। নিমীলিত চোখ, তবে জাগ্রত, হাতে তাসবীহ। মনে হলো তাসবীহ পড়ছেন, তবে মুখে নয়, দিলে। আমলের ফলাফল নিয়তের উপর, আর নিয়ত হলো দিলের বিষয়। সুতরাং কারো সম্পর্কে কিছু বলার নেই। কোন মুমিন সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করাই উত্তম। তবে উম্মেহানির এ দৃশ্য দেখে আমার মনে হলো, মুহব্বতের আদব এরকম নয়, অন্য কোন রকম। আমাদের হযরত হাফেজ্জী হুযূর এখানে এভাবে কখনো শয়ন করেন নি এবং তা পছন্দ করেন নি। কারণ মুহাব্বাত শুধু কাছেই আনে না, দূরেও রাখে।

অপলক দৃষ্টিতে অনেক্ষণ আমি ঐ স্থানটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম এবং হৃদয়ের গভীরে তরঙ্গ-দোলার অপূর্ব স্বাদ অনুভব করতে লাগলাম।

ইতিহাসের সত্যতা ইতিহাস জানে। কলবের ইশক, দিলের মুহব্বত এবং হৃদয়ের প্রেম ও ভালোবাসার জন্য আমাদের তো প্রয়োজন শুধু একটুখানি অবলম্বনের। ইতিহাস যদি আমাদের সেই অবলম্বনটুকু সরবরাহ করে তাহলে চুলচেরা তদন্তের কী প্রয়োজন! আমাদের তো বরং ইতিহাসের প্রতি কৃতজ্ঞই থাকা উচিত। আল্লাহর নবী এখানে শয়ন করেছেন, এখানে জিবরীল আমীন বোরাক নিয়ে এসেছেন, এখান থেকে শুরু হয়েছে মি'রাজের মহাযাত্রা, – অন্তরে মুহব্বতের মউজ এবং প্রেমের তরঙ্গ সৃষ্টি

করার জন্য এর চেয়ে সুন্দর অবলম্বন আর কী হতে পারে! তবে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, প্রকৃত প্রেমের সুন্দরতম প্রকাশ হলো সংযমের মাঝে। সংযমের অভাব থেকেই ইশক ও মুহব্বত কলঙ্কিত হয় বিদ'আতের পঙ্কিলতায়। এ বেদনাদায়ক সত্য এখানে এই উম্মেহানিতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম বহু বছর পর। পরবর্তী কোন সুযোগের অপেক্ষায় এখন থাক সে আলোচনা।

উম্মেহানি থেকে আল্লাহর ঘরের রোকনে ইয়ামানি ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখা যায়। এখান থেকে বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকতে অন্যরকম একটি ভালো লাগা অন্তরকে আপ্লুত করে। বাইতুল্লাহর দুয়ার থেকে একটু আড়ালে। যেন বান্দার পক্ষ হতে লাজ-কুণ্ঠার একটুখানি আড়াল! প্রেমিক-হৃদয়ে ভাবের কত রকম রংধনুর উদ্ভাস যে ঘটে! এক প্রেমিক বান্দাকে বলতে শুনেছি, 'আমার তো ভালো লাগে ঐখানে বসে আল্লাহর ঘর দেখতে যেখান থেকে ঘরের দুয়ার দেখা যায়। ভিক্ষুক তো মনিবের দুয়ারের দিকেই তাকিয়ে থাকে!'

কবি সত্যই বলেছেন–

প্রেমিক হবে ফুলের মত/ কেউ কস্তুরি, কেউ গোলাব/ নানা বর্ণের, কিন্তু ছড়াবে সুবাস/ কিংবা যেমন বিভিন্ন রঙের শরাব।

মাতাফে তখন তাওয়াফের অকল্পনীয় এক দৃশ্য! এমন কঠিন রোদ ও গরম উপেক্ষা করে আল্লাহর বান্দারা কিসের টানে, কিসের আকর্ষণে এমন উতালা! কার প্রেমে, কার মুহব্বতে এমন দিওয়ানা! চারদিক থেকে মানুষ শুধু মাতাফে নামছে এবং তাওয়াফের ঢেউ-তরঙ্গে শামিল হচ্ছে। শুধু নামছে, কেউ তো উঠে আসছে না! অন্তত আমি দেখতে পাচ্ছি না কাউকে উঠে আসতে! যারা তাওয়াফ করে রোদও কি তাদের ছায়া দান করে! না হলে এমন রোদে, এমন গরমে কীভাবে সম্ভব লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রশান্ত ও আত্মসমাহিত এমন তাওয়াফ! ঢেউ আছে, তরঙ্গ আছে, তবে অশান্ত নয়, প্রশান্ত। রোদের গরম তাপকে যেন শুষে নিচ্ছে ভিতরের উত্তাপ। এ শুধু সম্ভব তাদেরই পক্ষে, আল্লাহর ইশকে দিওয়ানা মাজনু যারা। যদিও মাজনু নই, তবু লোভ হলো, আমিও মিশে যাই আল্লাহর মাজনুদের তরঙ্গ-স্রোতে। কিন্তু হযরত হাফেজ্জী হুযূর উপদেশ দিয়েছেন, জোশের সঙ্গে হুশ করে চলার। কারণ দীর্ঘ চার মাসের সফর। তাই তখন প্রেম-দৃশ্যের শুধু দর্শক হয়ে থাকলাম। কিন্তু হায়, আমি যদি জানতাম আগামী কালের খবর! কেউ যদি আমাকে বলে দিতো, তুমি আর মাত্র দুদিনের মেহমান! সেই যে কবি বলেছেন–

মিলনের সুখে ভেবেছি বিভোর আমি/ ফুরাবে না রাত, হবে না ভোর/ কিন্তু হায়, নিভলো না মোমের আলো/ অথচ তারকার আলো নিভে গেলো!

তাকিয়ে থাকি বাইতুল্লাহর দিকে। চোখের দৃষ্টি যেন স্নিগ্ধ থেকে স্নিগ্ধতর হয়ে আসে। এমন ঝলসানো রোদে তো চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার কথা! কিন্তু আশ্চর্য! কালো গিলাফে ঢাকা আল্লাহর ঘর যেন সুশীতল ছায়াঘেরা এক মরুদ্যান। এ ঘরের দিকে তাকাও, তাকাতে থাকো এবং তাকাতেই থাকো; তোমার চক্ষু শীতল হবে, হৃদয় জুড়িয়ে যাবে,

আত্মার গভীরে প্রশান্তি নেমে আসবে। নামায পড়া যেমন ইবাদত, তাওয়াফ করা যেমন ইবাদত তেমনি আদব ও মুহব্বতের সঙ্গে আল্লাহর ঘরের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকাও ইবাদত।

একটি ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকা ইবাদত, এ শুধু আল্লাহর ঘরেরই শান! চোখ জুড়িয়ে, হৃদয়-মন তৃপ্ত করে আমরা তাকিয়ে থাকলাম আল্লাহর ঘরের দিকে। ঘরের গিলাফের কালোতে এবং আমাদের চোখের তারার কাঁলোতে যেন মাখামাখি হলো। কাল রাতে প্রথম দেখেছিলাম, এখন মনে হলো, আল্লাহর ঘর এই প্রথম দেখা হলো। হজের সফরনামায় আল্লাহর আশিক বান্দারা বলেছেন, আল্লাহর ঘর তুমি যত বার দেখবে মনে হবে, প্রথম বার দেখা হলো। প্রতিবারই হৃদয় তোমার স্পর্শ লাভ করবে নতুন ভাবের এবং নতুন অনুভবের।

পৃথিবীর সুন্দরতম ইমারত দেখো, সবচে' আলোঝলমল অট্টালিকার সৌন্দর্য অবলোকন করো, এক সময় তোমার চোখে তার সৌন্দর্য ম্লান হয়ে আসবে। তোমার দৃষ্টি নতুন কোন সৌন্দর্যের প্রতি আকুল হবে। কিন্তু এ ঘরের সৌন্দর্য কখনো ম্লান হবে না। যত দেখবে, এ ঘরের নতুন সৌন্দর্যে তুমি আরো মুগ্ধ হবে, এ ঘরের নতুন জ্যোতির্ময়তায় হৃদয় তোমার আরো উদ্ভাসিত হবে।

কী আছে এ ঘরের মাঝে! এই কালো গিলাফের আবরণে! এমন সাধারণ, অথচ এত অসাধারণ! কী রহস্য এর! শুধু এই যে, এ আমার আল্লাহর ঘর! আচ্ছা, তুমি আল্লাহর ঘর বলে তোমার এত সৌন্দর্য ও মহিমা! তোমার এত মর্যাদা ও গরিমা! তাহলে আমি যদি আল্লাহর বান্দা হতে পারি! যদি আল্লাহর রঙে নিজেকে রাঙাতে পারি! হে আল্লাহ! তোমার ঘর দেখে দেখে, চোখে তোমার ঘরের কৃষ্ণতার সুরমা মেখে মেখে আমি যেন হতে পারি তোমার ...!

আছরের আযান হলো, আছরের জামাত হলো। কিছুক্ষণ পর রোদ কিছুটা 'নরম' হলো, আমারও একটু সাহস হলো। তাই নেমে এলাম মাতাফে, ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম হাজারে আসওয়াদের দিকে। নিজেকে সমর্পণ করলাম আল্লাহর প্রেমিক বান্দাদের তরঙ্গ-জোয়ারের মাঝে। তাওয়াফ সমাপ্ত হলো, কিন্তু যামযামের পানি পান করা হলো না। এখন তো আমি রোযাদার; এখন যামযামের চেয়ে বেশী স্বাদ পিপাসার! তাই শুধু নীচে নেমে যামযামের নিকটে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। খুব শীতল স্থান। এ যেন যামযামেরই শীতলতা! যামযাম পান করলাম ইফতারের সময় এবং তাওয়াফের দু'রাকাত আদায় করলাম মাগরিবের পর।

এশার আযান হলো। এশার পর তারাবী। হারাম শরীফে জীবনের প্রথম তারাবী পড়ার সৌভাগ্য হলো। সে সৌভাগ্যের কথা কীভাবে কোন ভাষায় প্রকাশ করবো? মুখের শব্দ তো হৃদয়ের অনুভবকে কখনো সঙ্গ দেয় না, তাই অনুভবকে শুধু অনুভব করা যায়, প্রকাশ করা যায় না। শুধু বলতে পারি, সবকিছু এখানে অন্য, সবকিছু এখানে অনন্য। সবকিছু এখানে নূরে নূরানি। তিলাওয়াতে, সিজদায় এবং মুনাজাতে শুধু তৃপ্তি আর তৃপ্তি! শুধু প্রশান্তি আর প্রশান্তি!

তুমি যদি বন্ধু হও, আমি কামনা করবো; তুমি যদি শত্রু হও তবু আমি কামনা করবো, হারাম শরীফের একটি তারাবীর সৌভাগ্য যেন আল্লাহ তোমাকে দান করেন। কারণ এমন সৌভাগ্যে শত্রুর প্রতিও কৃপণতা সাজে না।

আমার জন্মভূমিতে, আমার দেশের মসজিদে অনেক তারাবী পড়েছি, কিন্তু তারাবীর স্বাদ যেন মাত্র আজ অনুভব করলাম। জানি না, এ তিলাওয়াত যমীনের, না আসমানের! মানুষের, না ফিরেশতার! এ তিলাওয়াত যদি চলতে থাকে তাহলে দিলগুলো তো গলে গলে শেষ হয়ে যাবে!

ইমামুল হারাম যখন সিজদায় গেলেন, লক্ষ লক্ষ বান্দার অবনত মস্তকের সঙ্গে আমার কপালও হারামের পবিত্র ভূমি স্পর্শ করলো। সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা। ভিতর থেকে আমার, কে যেন বলে উঠলো, হে আল্লাহ! সিজদায় যদি পাওয়া যায় তোমাকে তাহলে তো আমি আজ পেয়েছি তোমাকে! সুতরাং এ সিজদার মাঝেই কেটে যাক আমার জীবন। সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।

ধীরে ধীরে আমি যেন নূরের সাগরে ডুবে গেলাম। হে আল্লাহ! চিরজীবন যেন ডুবে থাকি তোমার মারেফাতের নূর-সাগরে! সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।

আহ, জীবনে আরেকবার যদি নছীব হতো এমন একটি সিজদা!

বিতিরের কুনূতের সাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য এক মুনাজাত হলো। এ মুনাজাতও আমার জীবনে প্রথম। মুনাজাতে মানুষ কাঁদে, মুনাজাতে চোখের পানি ঝরে– এ দৃশ্য আমি দেখেছি, তুমিও দেখেছো। এ হলো মুনাজাতের কান্না, কিন্তু আজকের মুনাজাত ছিলো কান্নার মুনাজাত! এ মুনাজাত ছিলো আল্লাহর ঘরে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে। এ মুনাজাত যেন একবার দিলকে জখম করে, একবার শীতল প্রলেপ দেয়। একবার কান্নার জোয়ার আনে, একবার আনে আনন্দের উচ্ছ্বাস। ইমামের সঙ্গে সমগ্র হারামে যখন কান্নার রোল ওঠে তখন নিজেকে নিজের মাঝে ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভিতরের আমি যেন তখন আমাকে এই বলে আশ্বাস দান করে–

'এ মুনাজাত সব কিছু ধুয়ে ফেলার এবং সবকিছু মুছে ফেলার মুনাজাত। এখন আসমান থেকে অবশ্যই নেমে আসবে কবুলিয়াত ও মাগফেরাত।'

আমি শুনছি, ইমামুল হারাম তাঁর কলবের ইযতিরাব ও হৃদয়ের আকুতি নিয়ে ফরিয়াদ করছেন, 'হে আল্লাহ! আমরা আজ বড় অসহায়, তুমি আমাদের সাহায্য করো। এ ঘোর অন্ধকারে মুসলিম উম্মাহকে তুমি হে আল্লাহ, রক্ষা করো। আফগানিস্তানে, কাশ্মীরে, ফিলিস্তীনে মুজাহিদীনদের তুমি মদদ করো।

হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার দ্বীনের দুশমনদের 'নিস্তনাবুদ' করো।

হে আল্লাহ! আমাদের শাসকদের তুমি সঠিক পথে পরিচালিত করো। আমাদের প্রতি তাদের নির্দয় করো না, সদয় করো।'

কোন সন্দেহ নেই, সবভাষার সবমুনাজাত আল্লাহ শোনেন এবং কবুল করেন, তবে ইমামুল হারামের আরবী মুনাজাতের যে জ্যোতির্ময়তা সেদিন আমার অন্তর অনুভব করেছে তার সত্যি কোন তুলনা নেই। মনে হয়েছে, আরবী ভাষাই যেন মুনাজাতের

নিজস্ব ভাষা। ভাবের তরঙ্গে ইমামুল হারাম বারবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন। মুনাজাতের প্রতিটি মিনতির সঙ্গে লক্ষ কণ্ঠের আহাজারি ও আমীন, আমীন ধ্বনি যেন আল্লাহর আরশেও কম্পন সৃষ্টি করছে।

তারাবীর পর আমি যখন ভাব ও অনুভবের অন্য এক জগতে আত্মসমাহিত; সৃষ্টিজগতের সকল সৌন্দর্য এক কালো গিলাফের সৌন্দর্যে অবলোকন করার আনন্দে, পুলকে ও শিহরণে আমি যখন শিহরিত এবং স্বপ্ন-সৌভাগ্যের প্রস্ফুটিত গোলাবের সৌরভে আমার অন্তর যখন পূর্ণ সুরভিত তখন, ঠিক তখন মনে হলো আমার কলজের ভিতরে খঞ্জরের আঘাত হলো। লাল রক্তে ভিতরটা যেন ভিজে উঠলো। কবির ভাষায় আমাকে যেন বলা হলো–

তোমার স্বপ্নের গোলাব পিষে ফেলতে হবে/তোমাকে তোমারই পায়ের তলে এবং/ পেয়ালা থেকে ঠোঁট সরিয়ে এখন তোমাকে/ উঠে যেতে হবে শরাবের জলসা থেকে!

হে আল্লাহ, একি হলো! একি ঘটলো! বড় কোন অপরাধ হয়েছে নিশ্চয়! তোমার ঘরের আদব লঙ্ঘিত হয়েছে নিশ্চয়! বান্দার গান্দেগি দ্বারা তোমার হারামের পবিত্রতা বিনষ্ট হয়েছে নিশ্চয়! হে আল্লাহ, একি তারই শাস্তি! সেজন্যই কি এ মাহরূমি! হে আল্লাহ, তোমার মাগফিরাত তাহলে কার জন্য! কখনকার জন্য!

আমার চোখ থেকে তখন ঝরঝর করে শুধু পানি ঝরতে লাগলো। ঘটনা এই–

মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেব আমাদের ছোট্ট কাফেলার আমীর। তারাবির পর তিনি বললেন, আমরা এসেছি মাদরাসার ফায়দার জন্য, অথচ তা হচ্ছে না। তাই এখানে আমাদের তিনজনের দীর্ঘ অবস্থান মাদরাসার জন্য উপকারী মনে হয় না, বরং ভালো হয় যদি শুধু ফারূক থেকে যায়, আমরা দু'জন ফিরে যাই।'

শুরুতে যেমন বলেছি, হঠাৎ যেন কলজের ভিতরে খঞ্জর বিঁধলো এবং তা থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হলো। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত যেন ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়লো। কাঁদছি না, শুধু অশ্রু ঝরছে। কিছুক্ষণ পর কিছুটা আত্মস্থ হলাম। আমীর ছাহেব আবার যুক্তি তুলে ধরলেন। অস্বীকার করার উপায় আছে, মনে হলো না, যদিও তা আমার জন্য চরম মর্মবিদারক। ফারূক ভাইকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন, তিনি জোরালোভাবে একসঙ্গে থাকার কথা বললেন।

আমার ভিতরের ব্যথা ও কষ্ট আমিই শুধু বুঝতে পারছিলাম। একটি মধুর স্বপ্ন শুরু না হতেই শেষ হয়ে যাবে! সৌভাগ্যের দুয়ার খুলতে না খুলতেই মাহরূমির ঝাপটায় বন্ধ হয়ে যাবে! একি হলো! একি ঘটলো! হে আল্লাহ, এ সৌভাগ্য তো আমি অর্জন করিনি, তুমি দান করেছো। অযোগ্যকে দান করে অযোগ্যতার কারণে সেই দান তুমি ফিরিয়ে নেবে!

এখন আমার কী করণীয়! হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ব্যথা-বেদনার মাঝেও মনে হলো, মাদরাসার কল্যাণ-চিন্তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ফারুক ভাই বললেন, আমাদের একত্র অবস্থানেই মাদরাসার কল্যাণ। কিন্তু আমীর ছাহেব তার যুক্তিতে অটল। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন, আগামীকাল বিকেলে আমরা দু'জন মদীনা শরীফ যাবো এবং পরদিন ফিরে এসে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করবো।

আসলে এটা ছিলো আমার জীবনের এক মর্মান্তিক ভুল, যা তখন বুঝতে পারিনি; পারলাম দেশে ফিরে যখন হযরত হাফেজ্জি হুযূরের সামনে দাঁড়ালাম, কিন্তু যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।

দুর্ভাগ্য, নইলে একবারও কেন মনে হলো না, হযরতের তো পরিষ্কার আদেশ ছিলো হজ্ব পর্যন্ত অবস্থান করার এবং হযরতের সঙ্গে হজ্ব করার! হযরত তো বলেছিলেন, তোমরা হলে আমার মুকাদ্দামাতুল জায়শ! (অগ্রগামী বাহিনী)

অন্তত এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে হযরতকে জানানো কি আমাদের উচিত ছিলো না? কিন্তু তখন এসব কিছু মনে হয় নি; শুধু মনে হয়েছে, মাদরাসার কল্যাণ চিন্তা করেই আমাদের দু'জনের ফিরে যাওয়া উচিত।

যাই হোক, এই কঠিন সিদ্ধান্তের পর তারা দু'জন কিদওয়ার ঠিকানায় ফিরে গেলেন, আমি হারাম শরীফে রাতযাপনের জন্য থেকে গেলাম।

সেদিন আমার ইফতার ছিলো শুধু খেজুর-পানি। তাই বেশ ক্ষুধা অনুভব হলো। হারাম থেকে একটু দূরে এক খাবারের দোকানে গেলাম। প্রথমেই নযরে পড়লো ভিতরে দেয়ালের গায়ে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা কোরানের আয়াত –

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ

তোমরা যা চাও তা হবে না, যদি না আল্লাহ তা চান।

নির্বাক বিস্ময়ে আয়াতটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এখানে এই আয়াত যেন আমারই জন্য! শুধু আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার এবং আমাকে আলো দান করার জন্য! আমি সান্ত্বনা লাভের এবং আলো গ্রহণের চেষ্টা করলাম।

প্রায় সব টেবিলে পাকিস্তানী হাজীরা পাকিস্তানীদের মতই খানাপিনা করছিলেন, নামটাও ছিলো 'করাচী হোটেল'। টেবিলে টেবিলে খাবার পরিমাণে এত যে, অর্ধেক থেকে যায়। তাই ভাবলাম, এই যে খাবার নষ্ট হচ্ছে, এগুলো থেকেই আমি প্রয়োজন সেরে নেবো। স্বভাব-সংকোচ বাধা হয়ে দাঁড়ালো, তবু টেবিল থেকে উঠে যাওয়া একজনকে কুণ্ঠিতভাবে বললাম, আপনার অনুমতি হলে এই উচ্ছিষ্ট খাবার আমি খেতে পারি। তিনি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, কেন! আমি আপনাকে নতুন খাবার আনিয়ে দেই!

বললাম, আমি চাই, এ খাবার নষ্ট না হোক। তিনি বললেন, খোদা আপকা ভালা কারে, ইয়ে বহুত আচ্ছী বাত হায়!

দু'একজন অবশ্য এদিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন, কিন্তু আমি তা গায়ে মাখলাম না। আমার পেট পুরলো, খাবার বাঁচলো, পয়সাও বাঁচলো।

এখানে এই একটা বিষয় মনে বড় কষ্ট দেয়, খাবারের অপচয়। আমাদের দেশে আর যাই হোক এভাবে অপচয় হয় না। খাবার কোন না কোনভাবে গরীবের পেটে যায়।

রাত তখন বারটা। হারামে ফেরার পথে দেখি, ছোট্ট একটি হাবশী মেয়ে কালো উড়না মাথায় হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। জানি না কোন দেশের, তবে মুসলিম মা-বাবার সন্তান তো অবশ্যই। দেখে মায়া হলো এবং চকোলেট দু'টোর কথা মনে পড়লো। মেয়েটির হাতে একটি রিয়াল এবং চকোলেট দু'টি দিলাম। ছোট্ট মেয়েটির মুখে সেদিন খুশির যে ঝিলিক দেখেছিলাম আমি তা এখনো ভুলিনি। কত সহজেই আমরা ছোট বড় সব মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারি!

মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ! পাকিস্তানে তোমার এক ছোট্ট অবুঝ বান্দা তোমাকে দেয়ার জন্য এই চকোলেট আমার হাতে দিয়েছে। তার ভাবনা, চকোলেট পেয়ে তুমি খুশী হবে, যেমন সে খুশী হয়। অবুঝ শিশু চকোলেট দিয়ে তোমাকে খুশী করতে চেয়েছে। আমি অবুঝ শিশু নই, তবু আমি নিয়ে এসেছি অবুঝ শিশুর উপহার, তোমাকে দেয়ার জন্য। আশা করি, তোমার হাতে আমি তা পৌঁছে দিতে পেরেছি হে আল্লাহ!

এই ছোট্ট মেয়েটির হাত, সে তো তোমারই হাত! তুমি তো বলেছো, অসুস্থের সেবা করা, তোমারই সেবা করা। পিপাসার্তকে পানি দেয়া, তোমাকেই তৃপ্ত করা! এবং ক্ষুধার্তকে আহার দান করা তোমারই ক্ষুধা দূর করা!

***

বুকভরা ব্যথা এবং সর্বস্ব হারানোর যন্ত্রণাপূর্ণ এক অনুভূতি নিয়ে হারাম শরীফে প্রবেশ করলাম। কাঁদছি না, কিন্তু কান্না এসে যায়। নিজের অজান্তেই চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে আসে। তখন এই বলে নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করি-

সম্ভবত এটাই আল্লাহর ইচ্ছা এবং আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়, বান্দার ইচ্ছা নয়। বান্দা যদি অম্লান বদনে আল্লাহর ইচ্ছা মেনে নেয় তাতে বান্দারই কল্যাণ।

হে আল্লাহ! জানি না, কী তোমার ইচ্ছা, তবে তোমার ইচ্ছার কাছেই নিজেকে আমি সমর্পণ করলাম।

কিয়ামুল্‌লায়ল শেষ হলো। বিষণ্ন মনে তাওয়াফের জন্য এগিয়ে গেলাম। জখমি দিলের জন্য তাওয়াফের চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর কী হতে পারে! তাওয়াফ শেষ করলাম। মুলতাযামে বুক লাগিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ হলো না। দুয়ারের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে মুনাজাত করলাম। চোখ থেকে নেমে এলো বাঁধভাঙ্গা জোয়ার।

হে আল্লাহ! আমাকে পথ দেখাও, আমাকে দয়া করো, আমাকে রক্ষা করো। হে আল্লাহ! আমার স্বপ্নের উদ্যানে যে ফুল ফুটেছে তা যেন ঝরে না যায়, বরং নতুন নতুন ফুল যেন ফোটে, ফুটতেই থাকে। হে আল্লাহ! তোমার ঘরের হজ্ব যেন নছীব হয়।

তাওয়াফের সময় অদ্ভুত এক ঘটনা দেখলাম। মনে হলো, ব্যথা, বেদনা ও কষ্টের মধ্যে আল্লাহ যেন আমার জন্য একটু আনন্দের আয়োজন করলেন। উর্দূভাষিণী এক

বৃদ্ধা, সঙ্গে তার ছেলে, তাওয়াফ করছিলো। সহজ সরল বুড়ি আল্লাহর ঘর দেখে ভাবনায় পড়ে গেলো। জানালা নেই, একটি মাত্র দরজা, তাও বন্ধ। আল্লাহ মিয়াঁ এর ভিতরে থাকেন কীভাবে! কষ্ট হয় না! 'আল্লাহ মিয়াঁ কো খানা কৌন পোঁহচাতা হায়!'

ছেলে দেখলাম, বুড়ি মাকে তার বুদ্ধির সীমানার ভিতরে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, এটা আল্লাহ মিয়াঁর ঘর, তবে আল্লাহ মিয়াঁ এখানে থাকেন না। এটা তিনি বান্দাদের জন্য বানিয়েছেন, যেন তারা তাওয়াফ করতে পারে। আল্লাহ মিয়াঁ আসমান থেকে বান্দার তাওয়াফ দেখে খুশী হন। মাঁ, তোমহারা তাওয়াফ ভী আল্লাহ মিয়াঁ দেখ রাহা হায়! বুড়িমা আহ্লাদিত হয়ে বললেন, সাচ্!

কিছুক্ষণ তাওয়াফ থেকে অন্যমনস্ক হয়ে বুড়িমার কথা ভাবছিলাম। হাদীছ শরীফে তো আছে, কোন কোন বান্দার ছেলেমানুষিতে আল্লাহ হেসে দেন এবং আল্লাহর কাছে তা ভালো লাগে। বুড়িমার এই সব 'ছেলেমানুষি' কথায় আল্লাহ কি হেসেছেন! আল্লাহর কি ভালো লেগেছে! হয়ত বা।

বনী ইসরাঈলের এক বান্দা নাকি আল্লাহর মুহব্বতে অস্থির হয়ে বলেছিলো, আল্লাহকে যদি পেতাম, যত্ন করে তার মাথাটা ধুয়ে দিতাম, চুলগুলো আঁচড়ে দিতাম, আর মুখে লোকমা তুলে খাইয়ে দিতাম। আল্লাহ মিয়াঁর এত কাজ, তিনি কি আর নিজের খোঁজ নিতে সময় পান!

আসলে আল্লাহর মুআমালা হবে বান্দার দিলের অবস্থা অনুসারে এবং তার জ্ঞানের পরিধি বিচারে। তাই তো এক দাসীর ঈমান পরীক্ষা করতে আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আল্লাহ কোথায়?

আসমানের দিকে ইশারা করে দাসীর সরল উত্তর ছিলো, আল্লাহ মিয়াঁ আসমানে!

এ-ই ছিলো দাসীর জ্ঞানের দৌড়, তাই ঈমান হিসাবে এটাকেই আল্লাহর রাসূল অনুমোদন করেছিলেন। অথচ আল্লাহ নিরাকার। স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে তিনি। তাঁর মত কোন কিছু নেই। সৃষ্টিকুলের যাবতীয় দুর্বলতা ও স্থূলতা থেকে তিনি চিরপবিত্র। কোরআনে যে রয়েছে, রাহমান আরশে সমাসীন হয়েছেন! হাদীছ শরীফে যে এসেছে, আল্লাহ হাসেন, এমনকি তাঁর মাঢ়ীর দাঁত প্রকাশ পায়! আল্লাহর হাত, পা, চেহারা! ..... এগুলোর হাকীকত আমরা জানি না। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল যা বলেছেন এবং যে অর্থে বলেছেন আমরা শুধু তা বিশ্বাস করি।

এর বাইরে আল্লাহর যাত ও ছিফাত নিয়ে চুলচেরা ও সূক্ষ্ম-জটিল আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া মোটেও সঙ্গত নয়, নিরাপদও নয়। কারণ আল্লাহর সত্তাকে অনুধাবন করার মত আকল বান্দার নয়। এক্ষেত্রে ছালাফে ছালেহীন ও পূর্ববর্তী বরণীয় ব্যক্তিগণ যা বলেছেন সেটাই হতে হবে আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস। তবে কখনো যদি এই রকম বুড়িমার দেখা পাওয়া যায় তখন তাকেও পেরেশান করা উচিত নয়।

যামযামের পাড়ে গিয়ে দেখি, আল্লাহর এক বান্দা কেবলামুখী হয়ে যামযামের পাত্র সামনে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। পানি পান করছেন না, বিড়বিড় করে দু'আ করছেন, আর চোখ থেকে শুধু অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। চোখের পানি, আর যামযামের পানি

একাকার হয়ে যাওয়ার এ অপূর্ব দৃশ্য আমার হৃদয়কে নাড়া দিলো, আমার খুব ভালো লাগলো। হায়, স্বপ্ন তো দেখেছিলাম, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আল্লাহর ঘরের পড়শী থাকবো, আর প্রাণ-মন শীতল করে যামযামের পানি পান করবো, কিন্তু স্বপ্ন শুরু হওয়ার আগেই যদি স্বপ্ন ফুরিয়ে যায়! মানুষ তদবীর করে, আর তাকদীর মুচকি হাসে। তাকদীরের বিপক্ষে মানুষের তাদবীর কী কাজে আসে! মানুষ কী করতে পারে!

হারাম শরীফের সবচে' আনন্দের ও প্রশান্তির সময় আমার মনে হয় ফজরের পর সূর্য উপরে ওঠার আগের সময়টুকু। এসময় একটি তাওয়াফ করলাম এবং দীর্ঘ সময় বিষণ্ন দৃষ্টিতে আল্লাহর ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তখন অবলোকনের অপার্থিব আনন্দ যেমন ছিলো তেমনি ছিলো আসন্ন বিচ্ছেদ-চিন্তার কষ্ট। আমি কি কল্পনাও করেছিলাম, দুদিনেই ফুরিয়ে যাবে মিলনের আনন্দ! কিন্তু বান্দা! তোমার জীবনে তোমার ইচ্ছা নয়, পূর্ণ হবে আমারই ইচ্ছা। তুমি শুধু উৎসর্গ করো তোমার ইচ্ছাকে আমার ইচ্ছার উদ্দেশ্যে। কিন্তু একটি ভাবনা বারবার আমাকে অশান্ত করে তুলছে, সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করছি না তো? আল্লাহর ঘরের দিকে তাকিয়ে কাতর স্বরে বললাম, হে আল্লাহ! আমাকে রক্ষা করো, আমাকে তোমার ইচ্ছার পথে চালিত করো।

একবার মনে হলো, আমার তো উচিত আসবাবের পরিবর্তে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা। যিনি আমাকে তাঁর ঘরে এনেছেন, আমি যদি তাঁর উপর ভরসা করি তাহলে কি তাঁর সাহায্য পাবো না! কিন্তু তাওয়াক্কুলের যে মাকাম আল্লাহর খাছ বান্দাদের শান, আমার মত কমযোর ও গোনাহগার বান্দা কীভাবে তার হিম্মত করতে পারে! ঘটনায় আছে, আল্লাহর এক মাজনু বান্দা পাথেয় ছাড়া চলেছেন আল্লাহর ঘরে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার পাথেয় কোথায়? পাথেয় ছাড়া হজ্বের সফর করা কি জায়েয? আল্লাহ তো বলেছেন, তোমরা পাথেয় গ্রহণ করো।

আল্লাহর পেয়ারা বান্দা জবাব দিলেন, শরীফ মেযবান যদি তোমাকে তাঁর ঘরে দাওয়াত করেন তুমি কি খানা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে? না শরীফ মেযবান তা পছন্দ করবেন? আর পাথেয়? তুমি কি শুনোনি আল্লাহর বাণী – তোমরা পাথেয় গ্রহণ করো, তবে তাকওয়াই হলো সর্বোত্তম পাথেয়।

কিন্তু কোথায় আমাদের সে তাকওয়া! আমাদের তো পা থেকে মাথা গোনাহের গান্দেগিতে ভরা!

আবার মনে হলো, এখন থেকে হজ্জ পর্যন্ত আমি করযরূপে খরচ করবো এবং দেশে গিয়ে মাদরাসাকে তা পরিশোধ করে দেবো। কিন্তু আমার নিজের তো কোন সঙ্গতি নেই। করযের ভার বহন করতে হবে আব্বাকে, আর সংসারের যে করুণ অবস্থা তাতে আব্বাকে কষ্ট দিয়ে হজ্জ করা কি আমার জন্য জায়েয হবে!

না, মনে হয় ভুল করছি না। আমার ফিরে যাওয়াই হয়ত আল্লাহর ইচ্ছা। সুতরাং তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক হে আল্লাহ!

ক্লান্তিতে, বিষণ্নতায় এবং শ্রান্তিতে, অবসন্নতায় শরীর যেন ভেঙ্গে আসছে। উম্মেহানিতে বসে আল্লাহর ঘর দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি বলতে পারবো না। কিন্তু শান্তির ঘুম আর হলো না। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় হৃদয় যার ক্ষত-বিক্ষত, তার কীভাবে হতে পারে শান্তির ঘুম! চোখ খুলে যায়, আবার চোখ বুজে আসে। ঘুম ভেঙ্গে যায়, আবার ঘুমিয়ে পড়ি। এ অবস্থায় একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম, যা আমার ব্যথিত হৃদয়ের জন্য কিছুটা হলেও সান্ত্বনা বয়ে আনলো। দেখলাম, এক সুন্দর ফুলবাগানে হযরত হাফেজ্জী হুজুর বসে আছেন। আমি হযরতের দিকে এগিয়ে গেলাম, তিনি হাসিমুখে আমার হাতে একটি ফুল দিলেন।

ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলে দেখি আল্লাহর ঘর! স্বপ্নের কথা মনে পড়লো, তাতে ভিতরের যন্ত্রণার কিছুটা যেন উপশম হলো।

একবার ইচ্ছে হলো, স্বপ্নটা মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেবকে বলি, কিন্তু ভিতর থেকে সায় পেলাম না, তাই বললাম না। শুধু ভাবলাম, আমি কাফেলার আমীরের ফায়ছালা মেনে চলবো, আল্লাহ অবশ্যই আমার কল্যাণের ফায়ছালা করবেন।

যোহরের জামা'আতে আবার তিনজন একত্র হলাম। একসাথে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলাম। ফারূক ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বড় ঈর্ষা হলো। তার ভাগ্যে আছে আল্লাহর ঘরের পড়শী হওয়া, আমার ভাগ্যে হয়ত নেই। তার তো দোষ নেই। তিনি তো চাচ্ছেন, আমরা যেন থেকে যাই।

আছরের আগে আরেকবার তাওয়াফ করলাম, মুরদা মানুষের মুরদা তাওয়াফ। হাঁ, এমনই মনে হলো আমার। আমি যেন যিন্দা লাশ। তাওয়াফের স্রোতে নিজেকে শুধু ভাসিয়ে দিয়েছি, কিন্তু নিজেই জানি না, কী করছি! বেদনাহত বান্দার বিদগ্ধ হৃদয়ের বিষণ্ন তাওয়াফ আল্লাহ যদি কবুল করেন।

***

আছরের পর হারাম শরীফ থেকে আমরা দু'জন রওয়ানা হলাম মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে। বাস ছাড়লো মাগরিবের কিছু আগে। বিষণ্ন মনেও জাগলো আনন্দের শিহরণ। স্বপ্নভঙ্গের বেদনার মাঝেও লাভ করলাম আরেকটি স্বপ্নের পূর্ণতা লাভের মধুরতা।

মক্কার সীমানা পার হয়ে বাস ছুটে চললো সুপরিসর মহাসড়কে। মরুভূমিতে এখানে সেখানে বালুর ছোট বড় টিলা। লম্বা ছায়া পড়েছে সেই টিলাগুলোর। দূরে পাহাড়শ্রেণী। সূর্য কখনো পাহাড়ের আড়ালে চলে যায়, কখনো আবার দুই শৃঙ্গের মধ্যখানে দেখা দেয়। অস্তমুখী সূর্যকে মনে হলো বড় বিষণ্ন, যেন আমারই মনের প্রতিবিম্ব। জানি না, সূর্যের বিষণ্নতা আমার মনকে বিষণ্ন করেছে, নাকি আমার মনের বিষণ্নতা সূর্যের উপর ছায়া ফেলেছে!

আরবদেশে পাহাড়ের আড়ালে সূর্যের অস্ত যাওয়া এই প্রথম দেখা হলো। বড় বেদনাবিধুর মনে হলো। বেদনাদগ্ধ হৃদয় এছাড়া আর কী ভাবতে পারে!

মাগরিবের সময় বাস থামানো হলো। যার কাছে যা, তাই দিয়ে ইফতার করা হলো। তবে এই সামান্য ইফতার অসামান্য হয়ে উঠলো, যখন প্রত্যেকে তার সামান্য ইফতারে অন্যকে শরীক করার ব্যাকুলতা প্রকাশ করলো। মানবিক চরিত্রের এ অনুপম সৌন্দর্য পৃথিবীর আর কোন জাতি ও সভ্যতা দাবী করতে পারে না। তোমার মুখের লোকমা আমি খাবো, আর তুমি কৃতার্থ হবে, এ শুধু কল্পনা করা যায় দুই রোযাদারের মাঝে। দেশ ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, অভিন্ন শুধু আল্লাহর জন্য উপবাস। কেউ এগিয়ে দিলো খেজুর, কেউ রুটির টুকরো, কেউ অন্য কিছু। সবাই এক সঙ্গে যা দিলো তা হলো, 'গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করো'!

আমাদের দু'জনের কাছে পানি ছাড়া কিছু ছিলো না। তাই আমরা শুধু শরীক হলাম, শরীক করা সম্ভব হলো না।

মরুভূমির নরম এবং গরম বালুর উপর জামাতের সাথে নামায হলো। উন্মুক্ত মরুভূমিতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে মাগরিব আদায় করলাম। দিগন্তহীন মরুভূমিতে মদীনার কাফেলার সেই যে নামায, তা স্মরণ করে হৃদয় আমার এখনো আপ্লুত হয়। সারা জীবন আমরা নামায পড়ি, কিন্তু শুধু দু'একটি নামায সম্পর্কে কিছু আশা করি, তবে 'পোল' যদি পার হতে চাই, পার হতে হবে শুধু আল্লাহর রহমতের ভরসায়, আমলের ভরসায় নয়।

বাস আবার যাত্রা শুরু করলো আল্লাহর নবীর শহর মদীনার উদ্দেশ্যে। আকাশের তারারা মিটি মিটি জ্বলছে, আমারও বুকের ভিতর স্বপ্নের জোনাকিরা নিভছে, জ্বলছে। কত দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন আজ পূর্ণ হতে চলেছে! কত বড় সৌভাগ্য এ! এত ছোট্ট কপালে সইবে তো এত বড় সৌভাগ্য! হে আল্লাহ, তুমি সঙ্গ দান করো! অধম বান্দাকে আদব দান করো, বে-আদবির ছায়া থেকেও রক্ষা করো।

সম্ভবত শেষ রাতে আমরা প্রবেশ করবো নবীজীর সোনার মদীনায়, হায়াত যদি থাকে, আল্লাহ যদি কবুল করেন। হায়াতের কী ভরসা! 'নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নেই'– এটা নিছক কথা নয়; এটা জীবনের পরম সত্য, চূড়ান্ত হাকীকাত। আমরা যেমন পথ অতিক্রম করছি মদীনার দিকে, আমাদের জীবনও পথ অতিক্রম করছে মৃত্যুর দিকে। কে জানে, কার পথ আগে ফুরোবে!

গত রামাযানের ঘটনা। মক্কায় কর্মরত যুবক ছেলে বুড়ো মা-বাবাকে আনিয়েছে ওমরা করাতে। ওমরা শেষ করে মা-বাবাকে যিয়ারাত করাবে বলে মদীনায় রওয়ানা হয়েছে। কিন্তু তা আর হলো না। সুস্থ জোয়ান ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো এবং পরক্ষণেই তার রূহ আখেরাতের সফরে রওয়ানা হয়ে গেলো। বুড়ি মা, কিংবা বুড়ো বাবা নয়, তাদের জোয়ান ছেলে পৌঁছে গেলো মৃত্যুর দুয়ারে। মদীনার পথ ফুরোবার আগেই ফুরিয়ে গেলো তার জীবনের পথ।

সুতরাং আমাকে বলতে হবে, যদি হায়াত থাকে এবং যদি আল্লাহ কবুল করেন তাহলে সম্ভবত শেষ রাতে আমরা প্রবেশ করবো মুমিনের সারা জীবনের স্বপ্নের শহর সোনার মদীনায়।

কেমন হবে আমার কলবের কাইফিয়াত! কেমন হবে আমার হৃদয়ের অনুভূতি সবুজ গম্বুজ প্রথম দেখার মুহূর্তে! আমার হৃদয় পারবে তো সেই সবুজের পুণ্যস্পর্শ গ্রহণ করতে! আমার আত্মা পারবে তো সেই সবুজের নূরে অবগাহন করতে!

বাইরে যার গান্দেগি, ভিতরে যার গান্দেগি, আগাগোড়া যার গান্দেগি সে কীভাবে দাখেল হবে নূরের মদীনায়! কীভাবে হাযির হবে নুরের রওযায়! হে আল্লাহ, আমাকে পাক-ছাফ করে দাও তোমার রহমতের দরিয়ায় ডুবিয়ে। আমাকে উপযুক্ত করে দাও তোমার নবীর শহরে প্রবেশ করার, তোমার হাবীবের রওযায় উপস্থিত হওয়ার এবং দুরূদ ও সালাম নিবেদন করার। ছাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ! ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মধ্যপথে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য বাস থামলো। দেড় ঘণ্টা পর বাস ছাড়বে। এখানে খাবার ও বিশ্রাম গ্রহণের মোটামুটি ব্যবস্থা রয়েছে। অনেকে এখানেই সেহরী খেয়ে নিলো। আমরাও হালকা কিছু খাবার খেলাম।

আসমানে রামাযানের বিদায়ী চাঁদ ছিলো, আর আমরা ছিলাম। হায়, হিজাযের দিগন্ত থেকে এ চাঁদ বিদায় নেয়ার এবং শাওয়ালের সোনালী চাঁদ উঁকি দেয়ার আগেই হয়ত আমাকে বিদায় নিতে হবে হিজাযের ভূমি থেকে, মদীনার ধুলোবালি থেকে, মক্কার অলিগলি থেকে, যামযাম থেকে, খেজুর-বাগান থেকে, কালো গিলাফ থেকে, সবুজ গম্বুজ থেকে। অথচ স্বপ্ন ছিলো কত দীর্ঘ! কত মনোরম! শাওয়ালের চাঁদ দেখবো, দেখবো যীকা'দার পর যিলহজ্বের চাঁদ! আমিও শামিল হবো জাবালে রাহমাতের কাফেলায়! কিন্তু হায়!

হালকা আলোয় মরুভূমি পার হয়ে দূরে পাহাড়শ্রেণীর ছায়া দেখা যায়। এ সময় অন্যরকম এক অস্থিরতা আমার মনকে দোলা দিলো। মনে হলো, নির্জন মরুভূমিতে কিছু সময়ের জন্য নিজেকে যদি প্রকৃতির নিঃসঙ্গতার মাঝে সঁপে দিতে পারি তাহলে হয়ত শান্তি পাবো। একটু একটু করে অনেক দূর এগিয়ে গেলাম মরুভূমির ভিতরে, বালু-সাগরের গভীরে। বড় আপন এবং অন্তরঙ্গ মনে হলো মক্কা-মদীনার মাঝখানের এ নাম না জানা মরুভূমিকে। নরম বালুতে পা একটু একটু দেবে যায়, যেন সোহাগ করে জড়িয়ে ধরতে চায়। কে জানে, এ মরুভূমি সেই মরুভূমি কি না! আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে ইসলামের নতুন আবাসভূমির উদ্দেশ্যে হিজরতের মহান কাফেলা যে মরুভূমির বালুতে পদছাপ রেখে গিয়েছিলো এ সেই মরুভূমি কি না! এ মরুভূমি ও তার বালুরাশি তাহলে কত ভাগ্যবান! পরম আদর করে নরম বালুর উপর হাত বুলালাম। মুঠে নিয়ে পরম মমতায় চুমু খেলাম। যদি হয়! এ বালু যদি সেই বালু হয়! হৃদয় তখন এমনই উদ্বেলিত হলো যে, ইচ্ছে হলো ...। শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংযত রাখলাম। কারণ যে মুহাব্বাতের প্রকাশ যত শালীন ও সংযত, আল্লাহর কাছে তা তত প্রিয়।

একবার তাকালাম সেই দিকে যেদিকে মক্কা শহর; আল্লাহর ঘরের পড়শী হয়েও যে শহরের বাসিন্দারা আল্লাহর নবীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো। হিজরতের রাতে

অন্ধকারে সবার চোখে ‘ধুলো’ দিয়ে আল্লাহর নবী মক্কা ত্যাগ করেছিলেন। প্রিয় জন্মভূমি মক্কা, যেখানে রয়েছে আল্লাহর ঘর, ছেড়ে যেতে কত কষ্ট হয়েছিলো পেয়ারা নবীর! তিনি যখন বলছিলেন, ‘হে মক্কা! তোমার সন্তানেরা যদি আমাকে বের করে না দিতো তাহলে কখনো আমি তোমাকে ছেড়ে যেতাম না’– তখন তাঁর চোখ দু’টো নিশ্চয় অশ্রুসিক্ত ছিলো! আহা, কী ব্যথা, কী মর্মযাতনা প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে! যুগে যুগে কত শত কোটি আশিকানে নবী চোখের জলে ভিজিয়ে রেখেছে আল্লাহর নবীর পবিত্র মুখে উচ্চারিত এ শব্দগুলো! আমাদের মত পাথরদিলও বিগলিত হয় এবং চোখ অশ্রুসিক্ত হয় যখন পড়ি এ বাক্যগুলো– ‘হে মক্কা! তোমার সন্তানেরা যদি আমাকে বের করে না দিতো তাহলে কিছুতেই আমি তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।’

অথচ তিনি তাদের কাছে কী চেয়েছিলেন! ধন! সম্পদ!! রাজত্ব!! না, তিনি তো শুধু চেয়েছিলেন তাদের দুনিয়ার শান্তি এবং পরকালের মুক্তি।

এবার আমি তাকালাম সেই দিকে যেদিকে নবীর শহর মদীনা, যে মদীনা পরম সমাদরে আশ্রয় দিয়েছিলো আমাদের নিরাশ্রয় নবীকে। যে পবিত্র ভূমি এখনো বুকে ধারণ করে আছে আল্লাহর পেয়ারা হাবীবকে।

কত ভালো মানুষ ছিলো মদীনার বাসিন্দারা! সেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা! নূরের নবীকে যারা বরণ করেছিলো ‘সুরের মালা’ দিয়ে! ‘তালাআল বাদরু আলাইনা’ গেয়ে গেয়ে!

তাই তো আল্লাহর পেয়ারা হাবীব বলেছিলেন, মক্কাবিজয়ের পর যখন আনছার ভেবেছিলেন, আল্লাহর নবী হয়ত এখন তাদের ছেড়ে আপন জন্মভূমি মক্কায় থেকে যাবেন, আল্লাহর পেয়ারা হাবীব তখন বলেছিলেন–

‘বলো হে মদীনার আনছার! তোমরা কি খুশী নও যে, অন্যরা ফিরে যাবে গনীমতের মাল নিয়ে, আর তোমরা ফিরে যাবে তোমাদের ঘরে আল্লাহর নবীকে সঙ্গে করে!

শোনো হে মদীনার আনছার! আমার জীবন তোমাদের মাঝে, আমার মরণ তোমাদের মাঝে। হে আল্লাহ, রহম করো আনছারদের! রহম করো তাদের সন্তানদের! রহম করো তাদের সন্তানের সন্তানদের!’

আহা, মদীনার আনছার যারা কত ভাগ্যবান তারা!

আমি একবার তাকাই মক্কার দিগন্তে, একবার তাকাই মদীনার প্রান্তে। একবার নবীর জন্মভূমির দিকে, একবার নবীর হিজরতভূমির পানে। হঠাৎ .. একেবারে হঠাৎ আমার সমগ্র অন্তর যেন কোন অদৃশ্য আলোকে উদ্ভাসিত হলো! নির্জন মরুভূমিতে রাতের অন্ধকারে একটি আলোকরেখা যেন দক্ষিণ থেকে উত্তর অভিমুখী হলো! সময়ের মহাসড়ক অতিক্রম করে আমি যেন হাযির হলাম চৌদ্দশ বছর পূর্বের এই মরুভূমিতে! আমি যেন দেখতে পেলাম এক নূরানী কাফেলার উটের পদচিহ্ন! আমি আমার উপর নিয়ন্ত্রণ হারালাম এবং নূরে ঝলমল সেই পদচিহ্নের উপর লুটিয়ে পড়লাম, কিন্তু সময়ের কঠিন বাঁধন সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে আনলো আমাকে আমার বর্তমানে। নির্জন মরুভূমিতে অদ্ভুত অন্ধকার! অদ্ভুত নৈশব্দ! কিন্তু অন্ধকারেও রয়েছে আলোর আভাস!

নৈশব্দেও রয়েছে মর্মের মর্মর ধ্বনি! এমনই হয় যখন অতীত ও বর্তমানের মিলন হয়! অতীত যখন ফিরে আসে বর্তমানের কাছে কিছু আলো দিতে, কিংবা বর্তমান যখন ফিরে যায় অতীতের কাছে কিছু আলো নিতে!

ঝিরঝির বাতাস বইছে। মনে হলো, এ বাতাস যেমন দেহকে শীতল করার জন্য তেমনি হৃদয় ও আত্মাকে সুশীতল করার জন্য। আরো মনে হলো মরুভূমির নির্জনতা আমাকে সঙ্গ দান করছে; মরুভূমির ঝিরঝির বাতাস আমাকে আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছে এবং মরুভূমির বালুকণা আমাকে মদীনার পথে পাথেয় দান করছে। এ আমার আল্লাহর দান। তোমার শোকর হে আল্লাহ, তোমার শোকর!

মরুভূমির কোল থেকে আমি ফিরে এলাম যেন শুচিশুদ্ধ ও পুত-পবিত্র হয়ে, হৃদয়ে ও আত্মায় শান্তি ও প্রশান্তির স্বর্গীয় অনুভব নিয়ে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি মদীনার ছুলোবালির সুরমা, মদীনার খেজুর বাগানের ছায়া এবং মদীনার জাবালে অহুদের একটুখানি ভালোবাসা। হে আল্লাহ! আমাকে তাওফীক দান করো, চৌদ্দশ বছরের দান তোমার হাবীবের রওযা থেকে আঁচল পেতে গ্রহণ করার।

***

বাস আবার যাত্রা শুরু করলো মদীনার উদ্দেশ্যে। পথের দূরত্ব যত কমে আসছে, হৃদয়ের ব্যাকুলতা তত বেড়ে চলেছে। এ কি স্বপ্ন! এ কি সত্যি!! ঐ যে দূর দিগন্তে আলোর আভা, সে কি সোনার মদীনার ইশারা! গোনাহগার বান্দাকে আল্লাহ তাহলে কবুল করেছেন! যিয়ারাতে মদীনার সৌভাগ্যের স্বর্ণদ্বারে উপনীত করেছেন!

হে আল্লাহ, জানি না, তোমার পেয়ারা হাবীবের আশিকান যারা, পরম প্রাপ্তির এ মুহূর্তটি কীভাবে তারা বরণ করেন! কীভাবে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন! হে আল্লাহ, অনুগ্রহ করে তুমি গ্রহণ করো অধম বান্দার শোকরের সিজদা এবং কৃতজ্ঞতার এক ফোঁটা অশ্রু!

ঐ যে! ঐ যে মিনারের আলো এবং আলোর মিনার! ঐ যে আমার স্বপ্নের সবুজ গম্বুজ! ঐ দেখো সবুজের জান্নাত এবং জান্নাতের সবুজ!

এ কিসের শিহরণ আমার দেহে, অন্তরে! আমার সমগ্র অস্তিত্বে! এ কিসের উদ্ভাস আমার চোখের তারায়! এ কিসের ঝঙ্কার আমার হৃদয়-বীণায়! এ কিসের খোশবু-সুবাস আমার সমগ্র সত্তায়! সোনার মদীনার! আলোকিত মিনারের!! সবুজ গম্বুজের!!!

হে আল্লাহ! ইশক ও মুহব্বতের এবং দুরূদ ও সালামের নাযরানা তোমার হাবীবের প্রতি। হে আল্লাহ! ঈমান ও তাওহীদের এবং ইরফান ও হিদায়াতের শোকরানা তোমার মুহাম্মাদের প্রতি। ছাল্লাল্লাহু আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ, ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্‌হামদু লিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ! অবশেষে রাতের শেষ প্রহরে এসে গেলো আলোর মদীনা! মুসাফির পৌঁছে গেলো তার স্বপ্নের মান্‌যিলে! সবই দয়াময়ের দয়া! সবই করুণাময়ের করুণা!

বাস থেকে নেমে যখন মদীনার সোনার ধুলোর প্রথম স্পর্শ গ্রহণ করলাম তখন হৃদয়ের অনুভব-অনুভূতি কেমন ছিলো তা প্রকাশ করার সাধ্য আমার কলমের নেই। মনে হলো, এটাই জান্নাত! এটাই ফিরদাউস! আসমান থেকে নূরের শিশির যেন ঝিরঝির করে ঝরছে! চারদিকে শুধু আলো আর আলো! সুবাস আর সুবাস! আলোর পরশে আমি নিজেও যেন আলোকিত! সুবাসের স্পর্শে আমি নিজেও যেন সুবাসিত! জীবনের যত সুখকর অনুভূতি, সব যেন একত্র হয়ে আমার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করলো! কিংবা .. মুহূর্তের জন্য আমি যেন সব অনুভব-অনুভূতি হারিয়ে ফেললাম! আমি যেন অন্য কিছু হয়ে গেলাম! হৃদয়ের গভীরে তখন একটাই শুধু আকুতি, একটাই শুধু মিনতি, এ সৌভাগ্য যেন চিরকালের জন্য হয়!

দু'চোখের আলো দিয়ে যে শহর আজ প্রথম অবলোকন করলাম, মনে হলো তা আমার চিরচেনা, চিরআপনার! এ পথ, এ পথিক, এ বাড়ী, এ বসতি সব আমি চিনি, সবাইকে আমি ভালোবাসি!

কেউ আমার অচেনা নয়, কিছুই আমার অজানা নয়। কারণ হৃদয়ের চোখে এ শহর তো আমি দেখে এসেছি, যখন থেকে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছি! চোখের দেখার আগে যদি হয় হৃদয়ের দেখা তখন সবকিছু মনে হয় আপন, সবকিছু মনে হয় আপনার!

হারামের সীমানায় আমাদের আগমন হয়েছিলো দক্ষিণ দিক থেকে, মসজিদে নববীর কেবলা যেদিকে। তাই আমাদের চোখের তারায় সবুজ গম্বুজের ছায়াপাত হলো সবার আগে। সেই সবুজের 'জামাল' ও সৌন্দর্য এবং নূরানিয়াত ও স্নিগ্ধতা শুধু অনুভব করা যায়, প্রকাশ করা যায় না। তবে অনুভব করার জন্য চাই এমন দিল যাতে রয়েছে মুহব্বতের আদব এবং এমন হৃদয় যাতে রয়েছে প্রেমের সংবেদন। সেই আদব ও সংবেদন আল্লাহ যেন দান করেন আমাকে, তোমাকে এবং যিয়ারাতে মাদীনার স্বপ্ন দেখা প্রত্যেক মুসলমানকে।

গভীর তন্ময়তার সঙ্গে আমি তাকিয়ে ছিলাম আলোর মিনারের দিকে এবং সবুজ গম্বুজের পানে। আমার তন্ময়তার অবসান হলো ফজরের আযান দিয়ে। আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! আযানের সুর এত সুমধুর! এখানে এখনো কি ধ্বনিত হয় হযরত বিলালের আযান-ধ্বনি! হৃদয় যদি এমন করে বিগলিত হয় আজকের আযানে, তাহলে কেমন হতো সেই আযানের ধ্বনি, যা উচ্চারিত হতো হযরত বিলালের কণ্ঠে এবং প্রবেশ করতো ছাহাবা কেরামের পবিত্র হৃদয়ে!

আলোর দিকে পতঙ্গদলের ছুটে আসা দেখেছি অনেকবার; আজ যেন আবার দেখলাম নতুন ভাবে ও অনুভবে। ইশকের পরওয়ানা এবং প্রেমের পতঙ্গ যারা চারদিক থেকে তারা ছুটে আসছে যেন নূরের সান্নিধ্যে!

যে দেশের, যে গোত্রের এবং যে ভাষারই হোক, এরা এখন সোনার মদীনার সোনার মানুষ। আমিও কি মদীনার মানুষ! সামান্য সময়ের জন্য! মদীনার ধুলো, মদীনার বাতাস তো লেগেছে আমারও গায়ে!

সময় খুব সামান্য। এখনই শুরু হবে ফজরের জামা'আত। অযু ছিলো, তবু অযু করে নিলাম; ভিতরের অপবিত্রতা তাতে যদি সামান্য ঢাকা থাকে! শরীরে, কাপড়ে আতর মেখে নিলাম; ভিতরের দুর্গন্ধ তাতে যদি সামান্য চাপা পড়ে! হে আল্লাহ, দয়া করে তোমার হাবীবের শহরে যখন আনলে, তোমার পেয়ারা নবীর মসজিদে যখন দাখেল হওয়ার তাওফীক দিলে তখন আরো দয়া করো; তোমার রহমতের পর্দায় ঢেকে দাও বান্দার সকল নীচতা, ক্ষুদ্রতা, অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতা। হে আল্লাহ, মসজিদ যেন অপবিত্র না হয়; তোমার হাবীবের যেন কষ্ট না হয়!

ধীরে ধীরে, দুরু দুরু বুকে, কম্পিত হৃদয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। যেন জিসিমের দুনিয়া ছেড়ে কলবের জাহানে দাখিল হলাম। যেন দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার আলোকবলয়ে প্রবেশ করলাম।

ইকামাত হলো, নামায শুরু হলো। জানি না, আমার কী হলো! কেন এমন কান্না পেলো! কেন চোখ থেকে অশ্রুর ঢল নামলো! আমার বড় ভালো লাগলো, মসজিদুন্নবীর প্রথম নামায অশ্রু ও কান্না দিয়ে শুরু হলো। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ সবার বড়। ইমামের তাকবীর-ধ্বনি যখন কানে এলো, অতীতের কোন তাকবীরের প্রতিধ্বনি ভেসে এলো, নিকট অতীতের! কিংবা দূর অতীতের!! অথবা সুদূর অতীতের!!!

তিলাওয়াত শুরু হলো। আসমান থেকে যেন সুকূন ও সাকীনা নাযিল হলো। জান্নাতের বাগান থেকে যেন বুলবুলির আওয়ায ভেসে এলো। গতকাল এখানে কার তিলাওয়াত ছিলো? তার আগে? তার আগে? আরো আগে? আজকের তিলাওয়াত তো সোনালী অতীতের সেই তিলাওয়াতেরই পরম্পরা! সুতরাং তোমার দিলের কানে অন্য কোন সুর যদি বাজে তাহলে অবাক হওয়ার কী আছে!

মসজিদুন্নবীর আযান অন্যরকম! নামায অন্যরকম! মসজিদুন্নবীর মুছল্লিরাও অন্যরকম! এখানে সবকিছু অন্যরকম! কী রকম, তা শুধু অনুভব করা সম্ভব, ভাষায় ও শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রাণহীন কিছু শব্দ হৃদয়ের অনুভব কীভাবে ধারণ করবে! শব্দের যদি হৃদয় থাকতো এবং ভাষার যদি প্রাণ থাকতো তাহলে হৃদয়ের অনুভূতি শব্দরা ধারণ করতে পারতো এবং মুখের ভাষা তা প্রকাশ করতে পারতো।

আমাদের তো আছে শুধু হৃদ্‌পিণ্ড; না আছে হৃদয়, না আছে হৃদয়ের অনুভব-অনুভূতি! আমাদের জন্য তো মসজিদুন্নবীর জামা'আতে শামিল হতে পারাই বড় সৌভাগ্য। যাদের হৃদয় আছে এবং সেই হৃদয়ে তাপ ও উত্তাপ আছে; যাদের দিল আছে এবং সেই দিলে দরদ আছে, তড়প আছে তারা বুঝতে পারেন, এই মসজিদের নবী কেন বলেছেন, নামায হলো মুমিনের মি'রাজ! এখানে এই মসজিদের জামা'আতে তারা অবশ্যই অনুভব করেন মি'রাজের কিছু না কিছু স্বাদ ও লয্‌যত!

মুমিন যখন যমীনের উপর সিজদা করে তখন সে আল্লাহর কুদরতি কদমের উপরই সিজদা করে। সুতরাং অন্তত এই মসজিদে সিজদা করে কারো ললাট যদি মাওলার

কুদরতি কদমের শীতলতা অনুভব করে তাহলে তাতে অবাক হওয়ার কী আছে! আমি যদি অনুভব না করি তাহলে অনুভবের বিশ্বাস তো রাখতে পারি!

নামায শেষ হলো। চারপাশের মুছুল্লিদের দেখে মনে হলো, তারা এখন দেহের জগতে নয়, হৃদয়ের জগতে। সবার চেহারায় পরম প্রাপ্তির তৃপ্তি এবং অপার্থিব আনন্দের উদ্ভাস। সবার চোখের তারায় আত্মিক প্রশান্তির ঝিলিমিলি।

***

আমরা মসজিদে প্রবেশ করেছিলাম উত্তর দিক থেকে। নামাযের পর আরো ভিতরে অগ্রসর হলাম। প্রথম খোলা চত্বর পার হয়ে দ্বিতীয় খোলা চত্বরকে সামনে রেখে ডান কোণে এসে বসলাম। সামনে তুর্কি আমলের মূল মসজিদ। আমি যেখানে বসেছি সেখান থেকে একটু সামনে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সবুজ গম্বুজ। এই সবুজ গম্বুজের নীচে দোজাহানের সরদার পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরীফ। এখানে তিনি আরাম করছেন, কিয়ামত পর্যন্ত এখানে তিনি আরাম করবেন, আর কিয়ামত তক আনেওয়ালা উম্মত তাঁর পাক দরবারে হাযির হয়ে পেশ করবে দুরূদ ও সালামের হাদিয়া এবং ইশক ও মুহব্বতের নাযরানা।

মদীনা থেকে কত হাজার মাইল দূরে আমার জন্মভূমি! সেই দূর দেশেই কেটেছে আমার পঁচিশ বছরের জীবন। এত দিন আমি শুধু স্বপ্ন দেখেছি, আর স্বপ্নের বেদনা বহন করেছি। আজ আমার স্বপ্নের ময়ূর পূর্ণ পেখম মেলেছে। এখন আমি মসজিদে নববীর নূর ও নূরানিয়াতে স্নাত। এখন আমার চোখের দৃষ্টি সবুজ গম্বুজের স্নিগ্ধতায় সিক্ত। এ মহাসৌভাগ্য কি আমার প্রাপ্য ছিলো! না, ছিলো না। এ পাক দরবারে তারাই শুধু উপস্থিত হওয়ার এবং দুরূদ ও সালামের নাযরানা পেশ করার উপযুক্ত যাদের দেহ, হৃদয় ও আত্মা পবিত্র। যুগে যুগে তারা এখানে হাযির হয়েছেন, সালাম পেশ করেছেন এবং সালামের জবাব পেয়েছেন। যুগে যুগে তারাই এখানে আসবেন, সালাম পেশ করবেন এবং সালামের জবাব পাবেন।

না বন্ধু, না! পাপী উম্মতি বলে তুমি নিরাশ হয়ো না! আল্লাহ তো গোনাহগার বান্দারও খালিক, মালিক ও রব্ব। সূর্য যখন উদিত হয় পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণাকে আলোকিত করে; মেঘ যখন বৃষ্টি বর্ষণ করে, ঊষর-উর্বর প্রতিটি ভূমিকে সিঞ্চিত করে। সূর্যের আলো, মেঘের বৃষ্টি, সে তো আল্লাহর সৃষ্টি! তাহলে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি কেন বর্ষিত হবে না তাঁর সকল বান্দার উপর! তাই তো যুগে যুগে নেককার বান্দারা যেমন লাভ করেছেন আল্লাহর রহমত এবং হাযির হয়েছেন পেয়ারা নবীর পাক রওযায়, তেমনি গোনাহগার বান্দাদেরও আল্লাহ বঞ্চিত করেননি তাঁর রহমত থেকে। তাদেরও তিনি হাযির করেছেন তাঁর পেয়ারা হাবীবের পাক দরবারে।

হে আল্লাহ! সোনার মদীনায় পেয়ারা নবীর রওযায় আমি যে হাযির হতে পেরেছি সে আমার আমলের গুণে নয়, নয় কোন যোগ্যতার বলে। এ শুধু তোমার দয়া ও করুণা। সুতরাং তোমার শোকর হে আল্লাহ! তোমার শোকর!

ভিতরে আমার আবেগের উচ্ছ্বাস, যদিও বাইরে তার নেই কোন প্রকাশ। বসে আছি শান্ত-সংযতভাবে এবং অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি সবুজ গম্বুজের পানে, কিন্তু ভিতরের উচ্ছ্বাস এক সময় বের হয়ে এলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু হয়ে। আমি কাঁদলাম খুশির কান্না! আমার অশ্রু ছিলো শোকরের ও কৃতজ্ঞতার। আল্লাহকে বান্দা আর কী দিতে পারে দু'ফোঁটা অশ্রু ছাড়া! যদিও সামান্য চোখের পানি, তবে আল্লাহর কাছে এর মূল্য অনেকখানি। কান্না, সেও তো আল্লাহর দান! তিনি যদি দয়া না করেন তাহলে তো চোখের নোনা দরিয়ায়ও জোয়ার আসে না! সুতরাং কাঁদো শোকরের কান্না এবং আদায় করো কান্নার শোকর।

হঠাৎ কী হলো! অশ্রুজলে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেলো এবং .. এবং সময়ের ব্যবধান যেন মুছে গেলো! না আছে ঝাড় বাতি, না আছে শানদার ইমারত! আমি শুধু দেখতে পেলাম সেই খেজুরপাতার মসজিদ এবং মসজিদের সামনে সেই খেজুর-বাগান ও তার মিষ্টি পানির কূপ যার বিবরণ পড়েছি ইতিহাসের পাতায়।

মসজিদে অনেক মানুষ নেই, তবে যারা আছে তাদের চেহারা নূরানী এবং মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়! আমি দেখতে পেলাম, নূর ও নূরানিয়াতওয়ালা এক জামা'আত পূর্ণ আদব ও বিনয়ের সাথে এগিয়ে চলেছেন রওযা শরীফের দিকে। ধীর গতি এবং অবনত দৃষ্টি। আকীদাত ও মুহব্বত এবং ভয় ও ভক্তির অপূর্ব এক দ্যুতি যেন ঠিকরে বের হচ্ছে তাদের সবার চেহারা থেকে।

তাঁদের দেখে আমার ভয়বিহ্বল হৃদয় একটু যেন ভরসা পেলো। কারণ এই নূরানী জামা'আতের পিছনে যদি চলতে পারি তাহলে আমিও পৌঁছতে পারি রওযা শরীফের মোকামে! আমার দুরূদ ও সালামও পেতে পারে কবুলিয়াত! এবং .. এবং দয়াময়ের দয়া হলে আসতে পারে জাওয়াবে সালাম!

ভাবের জগতে তন্ময় অবস্থায় যেন নিজের ইচ্ছায় নয়, অদৃশ্য কারো ইচ্ছায় আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং সেই নূরানী জামা'আতের পিছনে চলতে শুরু করলাম। চারদিকে শুধু নূর, আর নূর! সবকিছু থেকে শুধু নূরের বিচ্ছুরণ! উপরে খেজুর-ডালের ছাউনী, নীচে খেজুরপাতার বিছানা। কিছু নেই, তবু যেন সব আছে; নূর আছে, নূরানিয়াত আছে এবং নূরানী মানুষের জামা'আত আছে। জ্যোতি ও জ্যোতির্ময়তা আছে এবং আছে জ্যোতির্ময় মানুষের সমাবেশ। অপার্থিব এক পুলকে, শিহরণে আমি তখন আশ্চর্যরকম পুলকিত, শিহরিত ও উদ্বেলিত।

নূরানী জামা'আত এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে; আমি তাদের পিছনে পিছনে। সবার মুখে দুরূদ, আমারও মুখে। সেই দুরূদের গুঞ্জনধ্বনি সত্যি অন্যরকম; অন্তহীন ভক্তি-মুহব্বত যেন ঝরে ঝরে পড়ছে।

নূরানী জামা'আতের পিছনে পিছনে আমিও পৌঁছে গেলাম রওযা শরীফের মোকামে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর অতি সাধারণ হুজরা, এখানেই আমার পেয়ারা নবীর রওযা। এখানেই তাঁর ওয়াফাত; এখান থেকেই মহামিলনের উদ্দেশ্যে তাঁর মহান অভিযাত্রা। এখানেই তিনি চিরবিশ্রামে শায়িত।

সকলে বিনয় ও আদবের সঙ্গে, ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে দুরূদ ও সালামের নাযরানা পেশ করলেন। অবনত দৃষ্টি, দুরু দুরু বুক ও বিগলিত হৃদয়। তাঁদের মাঝে নিজেকে বড় নিরাপদ মনে হলো। তাঁদের সঙ্গে কম্পিত কণ্ঠে আমিও উচ্চারণ করলাম–

اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

(হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি দুরূদ, আপনাকে সালাম)

কত দূর দেশ থেকে কত সাগর, মরুসাগর পাড়ি দিয়ে আমি হাযির হয়েছি পেয়ারা হাবীবের দরবারে! আমার তো অনেক কিছু বলার ছিলো! কিছু মিনতি, কিছু আকুতি, কিছু কষ্ট, কিছু ব্যথা নিবেদন করার ছিলো। ভিতরে হৃদয়সমুদ্রে তরঙ্গ-জোয়ার ছিলো, কিন্তু মুখে ভাষা ও শব্দ ছিলো না। তাই কিছু বলা হলো না। ভিতরের তাপ ও উত্তাপ শুধু চোখের অশ্রু হয়ে ঝরে গেলো। ভয় ও ভক্তি এবং ভালোবাসা ও ভীতির অপূর্ব এক মিশ্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে অবনত দৃষ্টিতে আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম।

সময় হয়ত বয়ে যেতো এভাবেই। তখন হৃদয়ের জগতে এবং কলবের জাহানে হয়ত অনেক কিছু হতো, আলোর বিচ্ছুরণ, নূরের উদ্ভাস, ফুলের সুবাস, একটু হাসির আভাস! কিংবা হয়ত কিছুই হতো না। তবু হায়, সময় যদি এভাবেই বয়ে যেতো, অতীতের ছায়ায়, আলোর আভায় এবং নূরের স্নিগ্ধতায়। কিন্তু হলো না; 'আসকারি' কাঁধে হাত রেখে কোমল ভাষায় বললেন, এবার অন্যদের জায়গা দাও।

আমি জাগ্রত হলাম হৃদয় ও আত্মার ভাবতন্ময়তা থেকে। তখন অতীতের নূরানী দৃশ্য হয়ে গেলো অদৃশ্য। সেই নূরের কাফেলা হারিয়ে গেলো বর্তমানের আলোকধাঁধায়। আবার সবকিছু বর্তমান, সবকিছু বিদ্যমান। নীচে মূল্যবান গালিচা, উপরে সুদৃশ্য ঝাড়বাতি। যিয়ারাতের বিপুল সমাগম এবং আমি দাঁড়িয়ে আছি পিতলের জালি-ঘেরা রওযা শরীফের সামনে। তবে মনে হলো, অতীত ফিরে এসেছিলো এবং বর্তমানকে ছায়া দান করেছিলো! অতীত এভাবে ফিরে আসে বর্তমানকে ছায়া দিতে, কিংবা বর্তমান এভাবে ফিরে যায় অতীতের ছায়া নিতে। হৃদয় যদি সময়ের স্রষ্টার কাছে মিনতি জানাতে পারে তাহলে সহজেই মুছে যায় অতীত ও বর্তমানের সীমারেখা। জাগ্রত অতীত সহজেই ছুঁয়ে যায় প্রাণহীন বর্তমানকে। এখনো তুমি পেতে পারো সেই চাঁদের জোসনা! সেই আলোর বন্যা! সেই খেজুরবাগান! মাটির দেয়ালের সেই মসজিদুন্-নবী!

একই হুজরায় নবীজীর পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন শ্রেষ্ঠ উম্মত হযরত আবু বকর (রা)। আল্লাহর নবীর প্রথম খলীফা, হিজরতের সঙ্গী, গারেছাওরে 'দু'জনের একজন'; যার সম্পর্কে আল্লাহর নবী বলেছেন, মসজিদের (একান্ত) দরজাগুলো বন্ধ করে দাও আবু বকরের দরজা ছাড়া; তবুকের যুদ্ধে যিনি সর্বস্ব দান করেছিলেন, আর ঘরে রেখে এসেছিলেন শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে।

তৃতীয় কবর হলো উম্মতের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা)-এর। আল্লাহর নবীর দ্বিতীয় খলীফা, অর্ধবিশ্ব শাসন করে যিনি ঘুমোতেন গাছের নীচে! রাতের আঁধারে যিনি খাদ্যের বোঝা বয়ে নিয়ে যেতেন মানুষের দুয়ারে। আল্লাহর নবী বলেছেন, 'আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তাহলে সে হতো ওমর; ওমরকে তো শয়তানও ভয় করে।'

নবীজীর রওযায় সালাম পেশ করার পর একটু ডানে সরে পেয়ারা নবীর পেয়ারা খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-কে সালাম পেশ করলাম–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ – (হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনাকে সালাম)।

তারপর ডানদিকে আরেকটু সরে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা)-কে সালাম নিবেদন করলাম। অবশেষে কিবলা অভিমুখে দাঁড়িয়ে মুনাজাত করলাম। নবীজীর রওযার সান্নিধ্যে সেদিন আল্লাহর কাছে কী চেয়েছিলাম মনে নেই, কী পেয়েছিলাম জানা নেই। শুধু মনে পড়ে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরার কথা এবং হৃদয়ের গভীরে শান্তি, প্রশান্তি, আশ্বাস ও আস্বস্তি লাভের কথা। মনে হয়েছিলো, জীবনের অশান্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আজ কিশতি আমার তীরে এসে ভিড়েছে। আর ভয় নেই ঢেউয়ের আঘাতে ডুবে যাওয়ার। নবীজীর রওযায় চোখের পানিতে ধোয়া সকল চেহারায় আমি দেখতে পেয়েছি এমনই শান্তি ও প্রশান্তির উদ্ভাস। বড় ভালো লেগেছে; প্রতিটি চেহারাকে বড় আপন মনে হয়েছে। হৃদয়ের সবটুকু আকুতি নিয়ে কামনা করলাম, যুগ যুগ ধরে নবীজীর যত উম্মতি রওযা শরীফে এসেছে, কিংবা আসার স্বপ্ন দেখেছে; কেয়ামত পর্যন্ত যত উম্মতি আসবে, কিংবা আসার স্বপ্ন দেখবে, আল্লাহ যেন সবাইকে কবুল করেন এবং রোয হাশরে পেয়ারা নবীর শাফা'আত নছীব করেন, আমীন।

কত সহজে, কত আরামে, কত মসৃণভাবে আমার আজীবনের লালিত স্বপ্নের সবক'টি ফুল একে একে প্রস্ফুটিত হলো! আল্লাহর ঘরের দীদার হলো! সোনার মদীনায় পেয়ারা হাবীবের রওযা শরীফের যিয়ারাত হলো! কালো গিলাফের সৌন্দর্যে এবং সবুজ গম্বুজের স্নিগ্ধতায় হৃদয়-প্রাণ শীতল হলো। লাব্বাইক থেকে আস্-সালামু আলাইক– এ যেন গোনাহগার বান্দার কপাল উপচে পড়া সৌভাগ্য! তোমার শোকর হে আল্লাহ, তোমার শোকর!

যিয়ারাত শেষে সকলে আদবের সঙ্গে বাবে জিবরীল দিয়ে বের হয়ে আসে, আমিও বের হয়ে এলাম। এবার জান্নাতুল বাকী! আল্লাহর যে সকল খোশকিসমত বান্দার মৃত্যু হয় নবীর শহর মদীনায়, জান্নাতুল বাকী হলো তাদের ঠিকানা। এখানে শান্তির কবরে শয়ন করে কেয়ামত পর্যন্ত তারা হয়ে যায় পেয়ারা নবীর পড়শী! কত বড় সৌভাগ্য তাদের!

নবীজীর রওযা থেকে পূর্ব দিকে কিছু দূরে জান্নাতুল বাকী! আল্লাহর বান্দারা দলে দলে চলেছেন জান্নাতুল বাকীর যিয়ারাতে। আমি তাদের অনুসরণ করলাম এবং অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেলাম। দেয়ালঘেরা বিরাট কবরস্তান; হাজার হাজার যিয়ারাতকারী, তবু নীরব

নির্জন। মনে হলো, এখানে আসমান থেকে 'শবনম' ঝরে, তাই এখানে এত কোমলতা ও স্নিগ্ধতা। জান্নাত থেকে নেমে আসা প্রশান্তির আবরণে প্রতিটি কবর যেন আচ্ছাদিত।

এখানে যারা যিয়ারত করেন তারা কবরবাসীদের জন্য রেখে যান অশ্রুভেজা দু'আর সওগাত, তবে সঙ্গে করে নিয়ে যান আত্মিক প্রশান্তির উপহার! কেন নয়! এখানে তো শুয়ে আছেন নবীজীর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রা) এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন! এখানে তো চিরনিদ্রায় শায়িত মযলূম খলীফা হযরত উছমান (রা)! যালিমদের হাতে বড় নির্মমভাবে তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন, তবু কাউকে অনুমতি দেননি তাঁর জন্য তরবারি ধারণের। তাঁকে কেন্দ্র করে এক ফোঁটা রক্ত ঝরবে তা বরদাশত করেননি এই মযলূম খলীফা, যার হায়া ও লজ্জা দেখে লজ্জা পেতেন আসমানের ফিরেশতারা! শাহাদাতের সময় তিনি ছিলেন রোযাদার, তাঁর সামনে ছিলো পবিত্র কোরআন। তিনি তিলাওয়াত করছিলেন। সেই কোরআন লাল হয়েছিলো তাঁর শাহাদাতের খুনে।

এখানে আরো শুয়ে আছেন নবীজীর প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রা) যাকে তিনি দান করেছেন পিতার সমতুল্য সম্মান ও মর্যাদা! হিজরতের পূর্বে আকাবার রাতে পিতার মত স্নেহই তো ঝরে পড়েছিলো তাঁর কণ্ঠে!

সেই ছোট্টকালে যখন পড়েছি নানাজানের লেখা 'ছোটদের নূরনবী' তখন থেকেই অবুঝ মনে ভালোবেসেছি নবীজীর দাঈমা তায়েফের বিবি হালিমা (রা)কে, মক্কায় এসে পরম মমতায় যিনি কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের পেয়ারা নবীকে! তাঁর বুকের পবিত্র দুধ পান করে বড় হয়েছেন রহমতের নবী, আর বড় হয়ে তাঁকে দান করেছেন মাতার সম্মান! তিনিও শুয়ে আছেন এখানে জান্নাতুল বাকীর কবরে।

শুয়ে আছেন অসংখ্য ছাহাবা কেরাম, তাবেঈন, তাবয়ে তাবেঈন এবং যুগে যুগে আল্লাহর বহু নেক বান্দা! জান্নাতুল বাকির বাসিন্দা যারা বড় সৌভাগ্যবান তারা! কেয়ামাত পর্যন্ত নবীর পড়শী তারা!

হযরত ইমাম মালিক, এই সোনার মদীনার সোনার সন্তান! তাঁকে বলা হয় ইমামু দারিল হিজরাহ – হিজরতের পবিত্র ভূমির মহান ইমাম। তিনি কখনো মদীনা হতে বের হতেন না, যেন মদীনার বাইরে তাঁর মৃত্যু না হয়! মদীনার মাটির উপর মৃত্যু বরণ এবং মদীনার মাটির নীচে দাফন, এই ছিলো তাঁর শেষ আকাঙ্ক্ষা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পেয়ারা বান্দার তামান্না কবুল করেছেন। মদীনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং জান্নাতুল বাকীতে কবর হয়েছে।

হে আল্লাহ, নিজের দিকে যদি তাকাই তাহলে তো শরমে মরে যাই! এ অপবিত্র দেহ, আর জান্নাতুল বাকী! বাইরে ভিতরে এত গান্দেগি, তারপর মদীনার মাটি! কিন্তু যখন ভাবি তোমার দয়া ও করুণার কথা তখন আমার দিলের ঢেউ ফরিয়াদ করে তোমার রহমতের মউজকে। তুমি তো পারো হে আল্লাহ, আমাকে পাক-ছাফ করে মদীনার মাটিতে মৃত্যু দিতে! জান্নাতুল বাকীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে হে আল্লাহ! এই আমার মিনতি– মৃত্যু যেন হয় পবিত্র মদীনায় এবং কবর যেন হয় জান্নাতুল বাকীর ঠিকানায়। আমার

এবং আমার স্ত্রী-সন্তান সকলের। হে আল্লাহ! আরো যাদের দিলে এ তামান্না জাগে মওতের আগে তাদেরও তামান্না তুমি পূর্ণ করো।

জান্নাতুল বাকীর দরজা অন্যান্য দিন এসময় খোলা থাকে, আজ ছিলো না, তাই ভিতরে যাওয়া সম্ভব হলো না। দেয়ালের পাশ থেকে দৃষ্টি বুলালাম পুরো কবরস্তানে, অশ্রুঝাপসা দৃষ্টি। আল্লাহর নবী তো বলেছেন, কবরবাসী শুনতে পায় যিয়ারতকারীর সালাম। আমার সালাম তাহলে নিশ্চয় শুনতে পেয়েছেন এখানে যে পুণ্যাত্মাগণ শুয়ে আছেন! এখানে এই সামান্য সময়ের যিয়ারতে একটি মাত্র সালামের মাধ্যমে কত শতাব্দীর কত অসংখ্য পাকীযা রূহ ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো! শোকর আলহামদু লিল্লাহ!

কবরস্তানের যিয়ারত অনেকবার করেছি, কিন্তু এমন কবরস্তান এবং এমন যিয়ারত জীবনে এই প্রথম। মৃত্যুকে জীবনের চেয়ে সত্য বলে এই প্রথম অনুভব হলো। কঠিন হৃদয় যেন মোম হলো এবং গলে গলে চোখের পানি হয়ে গড়িয়ে পড়লো।

কাঁদো হে চোখ, কাঁদো! এই কবরের বাসিন্দাদের মাগফিরাত ও দারাজাতের জন্য প্রাণভরে কাঁদো। একদিন তোমারও কবর তৃষ্ণার্ত হবে জীবিত চোখের দু'ফোঁটা অশ্রুর জন্য। আজকের কান্নার বরকতে তোমারও কবরের মাটি ভিজতে পারো কারো চোখের পানিতে। ভিতরের আবেগ যেন হৃদয়কে দলিত মথিত করে বের হয়ে এলো এই শব্দগুলোকে আশ্রয় করে–

'জান্নাতুল বাকীর হে বাসিন্দাগণ! তোমাদের জন্য শান্তি ও সালাম। ইনশাআল্লাহ, আমরা আসছি তোমাদের পিছনে। দয়াময় আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য। ক্ষমা করুন আল্লাহ, রহম করুন আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের।'

ধীরে ধীরে ফিরে এলাম জান্নাতুল বাকী থেকে, এর পর আমি যাবো রিয়াযুল জান্নাহ! এর অর্থ হলো জান্নাতের বাগিচা।

কোথায় জান্নাতের বাগিচা! কোথায় জান্নাতি বাগিচার টুকরো! ঐ যে ওখানে! আল্লাহর নবীর হুজরা এবং মিম্বারের মাঝখানে! আল্লাহর নবী নিজে বলেছেন এ কথা! আর তিনি তো বলেন না কোন কথা আসামানের অহী ছাড়া! অন্য কোন কাওম যদি তাদের নবীর যবানে লাভ করতো এমন খোশখবর ও সুসংবাদ তাহলে অবশ্যই সেদিনটি হতো তাদের ঈদ উৎসবের দিন!

এ মহাসৌভাগ্য আল্লাহ দান করেছেন তাঁর পেয়ারা নবীর 'পেয়ারী' উম্মতকে; দুনিয়াতেই তারা প্রবেশ করতে পারে জান্নাতের বাগিচায়। আল্লাহর নবী তো আল্লাহর হাবীব! হাবীবের প্রতি মুহব্বতের সাওগাতরূপেই হাবীবের উম্মতকে আল্লাহ এত বড় মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং শোকর করো আল্লাহর! শোকর করো পেয়ারা নবীর! পড়ো দুরূদ; ছাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ, ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দূর থেকেই বোঝা গেলো, জান্নাতের পাগল যারা তাদের মাঝে এখন জোর প্রতিযোগিতা; কে কার আগে দাখিল হবে জান্নাতের বাগিচায়! এ বড় মধুর দৃশ্য! যদি

না তা অন্য ভাইয়ের কষ্টের কারণ হয়। আমি তো জান্নাতে যাবো আমার ভাইকে ফেলে নয়, সঙ্গে নিয়ে!

হৃদয়ে তখন অপূর্ব এক পুলক শিহরণ! সর্বসত্তায় অপার্থিব এক আনন্দের তরঙ্গদোলা! আল্লাহর কোন্ কোন্ গুণের প্রশংসা করবো! মাওলার কোন্ কোন্ নেয়ামতের শোকর আদায় করবো! দীদারে বাইতুল্লাহর স্বপ্ন পূর্ণ হলো! তাওয়াফ হলো, সাঈ হলো! আবে যামযামে প্রাণ শীতল হলো! আল্লাহর কত দয়া, কত মায়া!

চোখে সোনার মদীনার ধুলোবালির সুরমা মাখার তামান্না পুরা হলো! রাওযা শরীফের যিয়ারাত হলো, দুরূদ হলো, সালাম হলো! সবুজ গম্বুজের স্নিগ্ধতায় হৃদয় ও আত্মার প্রশান্তি অর্জিত হলো! এখন হবে জান্নাতের বাগিচায় গোনাহগার বান্দার দাখিলা! কত মেহেরবান, কত দয়াবান তুমি হে আল্লাহ!

পুলকে, শিহরণে উদ্বেলিত হৃদয়ে এবং শান্ত সংযত পদক্ষেপে আমি অগ্রসর হলাম জান্নাতের বাগিচার দিকে। এককদম, দু'কদম, কয়েক কদম। তারপর থামতে হলো। আর এককদম আগে বাড়ার উপায় নেই। জান্নাতের বাগিচা এখনো অনেক দূর! এখান থেকে শুধু দেখা যায় সাদা পাথরের স্তম্ভ। ওগুলো জান্নাতের বাগিচার স্তম্ভ! অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, আর ভাবছি, হে আল্লাহ! তোমার বান্দা কি তাহলে মাহরূম হলো! গোনাহের ফাঁদে আটকা পড়ে গেলো! তোমার হাবীব তো বলেছেন, তোমার মাগফিরাত আরো প্রশস্ত! তোমার রহমত আরো বিস্তৃত!

জনতরঙ্গ যখন আরো প্রবল হলো এবং হৃদয়-অঙ্গনে আশার আলোগুলো যখন একে একে নিভতে শুরু করলো তখন আমার ভীষণ কান্না পেলো এবং চোখ থেকে অশ্রুর ধারা নেমে এলো। আল্লাহর নবীর মসজিদের নরম গালিচার উপর প্রথম অশ্রু-নিবেদন! আল্লাহর এক বান্দা লিখেছেন- 'মায়ের আঁচল ধরেও শিশু যখন তার আব্দার আদায় করতে পারে না, তখন সে কান্না জুড়ে দেয় এবং অশ্রুর আশ্রয় গ্রহণ করে। মায়ের মমতা সন্তানের কান্নার আবেদন এবং অশ্রুর মিনতি কখনো উপেক্ষা করতে পারে না।'

এ কথা সত্য। আমি যখনই কেঁদেছি আমার মায়ের মমতা উদ্বেলিত হয়েছে। তিনি আমাকে কোলে তুলে নিয়েছেন; সাধ্যের অতীত হলেও আমার অশ্রুর মিনতি রক্ষা করেছেন। তাহলে পৃথিবীর সকল মাতৃহৃদয়ে মমতাদানকারী আল্লাহ! তাঁর রহমতের দুয়ারে কি বান্দার কান্না বৃথা যেতে পারে! তিনি কি পারেন বান্দার অশ্রুর মিনতি রক্ষা না করতে!

চোখ থেকে অশ্রুর ফোঁটা পড়তে দেরী, গায়বের হাতছানি আসতে দেরী হলো না! আল্লাহর এক বান্দা, জানি না কোন দেশের, কোন ভাষার এবং কোন গোত্রের তিনি! শুধু জানি, তিনি আমার ভাই! ঈমান ও বিশ্বাসের ভাই! তিনি হাত ধরে টানলেন। আমি তখনো বুঝতে পারিনি, এখনো বুঝতে পারি না, সেই প্রচণ্ড ভীড় কীভাবে ফাঁক হলো এবং কীভাবে তিনি এগিয়ে গেলেন! তিনি আমাকে টেনে নিলেন এবং জান্নাতের

বাগিচায় পৌঁছে দিলেন। আমি তার শোকর আদায় করার সুযোগ পেলাম না। মানুষের প্রচণ্ড চাপে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

আল্লাহ জান্নাতের বাগিচায় দাখিল করলেন এবং দু'রাকাত নামায আদায় করার তাওফীক দান করলেন। জান্নাতের বাগিচার নামায! আহা, সে নামাযের কী শান্তি ও প্রশান্তি! জান্নাতের বাগিচার সিজদা! আহা, সে সিজদার কী সুকূন ও সাকীনা! এই মিম্বরের শাহানশাহ নিজেই তো বলেছেন, নামায আমার চক্ষুর শীতলতা!

হে আল্লাহ, নামায যে তোমার হাবীবের চক্ষুর শীতলতা, তার কিছুটা অনুভব জান্নাতের বাগিচায় সেদিন তুমি দান করেছিলে! হে আল্লাহ, সারা জীবনের জন্য তুমি তা দান করো, আমাকে এবং যারা আমীন বলে তাদেরকে।

জান্নাতের বাগিচায় নামায শেষে হাত উঠলো মুনাজাতে, তবে কান্নার তোড়ে ভেসে গেলো মুখের শব্দ। শুধু অশ্রু হয়ে ঝরে পড়লো হৃদয়ের সব কাকুতি ও মিনতি।

হে আল্লাহ! তোমার অসীম দয়ায় তোমার বান্দা প্রবেশ করেছে জান্নাতের বাগিচায়; হে আল্লাহ! তোমার বান্দা আশা করে জান্নাতের বাগিচায় চিরস্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার।

মুনাজাতের মাঝেই আল্লাহর এক বান্দা হাতের ইশারায় মিনতি জানালেন নামাযের জন্য একটু জায়গা পাওয়ার জন্য। সে কী করুণ মিনতি! যেন জান্নাতের বাগিচা এখন আমার দখলে! সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

হে আল্লাহ! দেখো, তোমার বান্দাকে আমি জায়গা দিয়েছি, জান্নাতে তুমি আমাকে জায়গা দিও। না, আমলের বিনিময়ে নয়, শুধু তোমার রহমতের ওছিলায়। কারণ–

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِنَا وَرَحْمَتُكَ أَرْجَي عِنْدَنَا مِنْ عَمَلِنَا

(হে আল্লাহ, তোমার মাগফেরাত আমাদের গোনাহর চেয়ে প্রশস্ত এবং তোমার রহমত আমাদের কাছে আমাদের আমলের চেয়ে অধিক ভরসার বিষয়)

***

মসজিদের বাইরে বিরাট স্থান জুড়ে অস্থায়ী টিনের ছাউনী। সম্ভবত এখানে বাড়ী-ঘর ছিলো। মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজনে তা খালি করা হয়েছে। এ সম্প্রসারণ তো শুরু হয়েছে হযরত ওমর ও হযরত উছমান (রা)-এর যামানা থেকে, তারপর যুগে যুগে তা অব্যাহত ছিলো। এখন তো মনে হয় নবুয়ত-যুগের মদীনার প্রায় সমগ্র আবাদী মসজিদের সীমানায় চলে এসেছে। সেযুগের খেজুরশাখার মসজিদ আজ পৃথিবীর সবচে' সুন্দর ভাবগম্ভীর ইমারত! দেখে দেখে বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটে না। তবু মনে হলো, সেযুগের মসজিদুন্নবীর একটি খেজুরডালের জন্য এযুগের এই শানদার ইমারতের সব সৌন্দর্য উৎসর্গ করা যায়। সব নিয়ে নাও, এ কারুকাজ! এ আধুনিকতা! এ আলোঝলমলতা! ফিরিয়ে দাও সেই সব রাত যখন এখানে প্রদীপের আলো জ্বলতো এবং জান্নাতের বাজার বসতো!

ভাবের তরঙ্গে এভাবে দোল খেতে খেতে আমি মসজিদের মুল অংশ থেকে বের হলাম এবং টিনের ছাউনীর নীচে এসে বসলাম। মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে আছে। আমারও ঘুমের প্রয়োজন। আমারও চোখে ঘুমের আয়োজন। আফসোস! এত সামান্য সময়, তারো কিছু অংশ হবে ঘুমের শিকার! কিন্তু বান্দা যে কমযোর! আফসোসও হলো,

চোখও বুজে এলো; আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠে যোহর পড়লাম এবং রাওযা শরীফে হাযির হয়ে দুরূদ ও সালাম পেশ করলাম। রাওযা শরীফের মোকামে দুরূদের যে সুমধুর গুঞ্জন শোনা যায় তার তুলনা আসমানে কী আছে তা তো জানা নেই, তবে পৃথিবীতে যে এর কোন তুলনা নেই তা সত্য। শুধু মনে পড়ে হাদীছ শরীফের একটি উপমা। دَوِيٌّ كَدَوِّ النَّحْلِ যেন মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনি! কানে যেন মধু বর্ষণ করে! হৃদয় ও আত্মার পরতে পরতে অপার্থিব এক স্বাদ অনুভূত হয়। ভক্তি-ভালোবাসার অপূর্ব এক আবেশ যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে সমগ্র অস্তিত্বকে! শুধু মৌমাছির মত এই সুমধুর গুঞ্জনধ্বনিটুকু শোনার জন্যও লোভ হয়, বার বার রাওযা শরীফে হাযির হওয়ার।

ইচ্ছে হলো মদীনার পথে পথে একটু বিচরণ করি, যদি শরীরে এবং চোখে মদীনার একটু ধূলোবালি লাগে! চোখে মদীনার ধূলোবালির সুরমা মাখার কথা কবির কল্পনা শুধু নয়, এ তো দূর দেশের প্রতিটি নবী-প্রেমিকের মনের বাসনা! হৃদয়ের কামনা! পথের ধূলো চোখে-মুখে মাখছে এমন পাগল তো নিজের চোখেই দেখেছি, আর ঘটনা তো শুনেছি ও পড়েছি অসংখ্য। যদি এখানে লেখা সম্ভব হতো তাহলে আমিও লিখে স্বাদ পেতাম, তুমিও পড়ে আনন্দ পেতে!

যে পথেই হাঁটি, রোমাঞ্চিত হই, শিহরণ জাগে এই ভেবে যে, হয়ত এ পথে একদিন আমার পেয়ারা নবীর পবিত্র পদধূলি পড়েছিলো! হযরত আবু বকর, ওমর, উছমান, আলী (রা) হয়ত এ পথে হেঁটেছেন। হয়ত এ পথেই জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হতো ছাহাবা কেরামের বাহিনী। কে জানে, যাদের কান আছে তারা হয়ত এখানকার বাতাসে এখনো শুনতে পায় ঘোড়ার পদধ্বনি!

নীরব শান্ত এক শহর এই মদীনা! আশ্চর্য! শহর হতে পারে এমন শব্দহীন! এমন শান্ত ও প্রশান্ত! শহরের মানুষ হতে পারে এমন বিবাদহীন! এমন সহনশীল ও সংযত! কোথাও কোন 'শোর' নেই, শোরগোল তো দূরের কথা! এখানে মানুষ কথা বলে মৃদু স্বরে, কোমলভাবে। এখানে মানুষের মুখের হাসিও শব্দহীন। এমনকি গাড়ীর হরনের আওয়াযও অনুচ্চ। এত দিন শুধু মানুষের মুখে শুনেছি এবং কিতাবের পাতায় পড়েছি মদীনার নিঃশব্দ ও শান্ত পরিবেশের কথা এবং আহলে মদীনার সংযম, সহনশীলতা ও চরিত্রমাধুর্যের কথা। আজ দেখলাম নিজের চোখে এবং শুনলাম নিজের কানে। দেখলাম, শুনলাম এবং মুগ্ধ ও অভিভূত হলাম। হে মদীনা, তোমাকে আমার সালাম! হে আহলে মদীনা, তোমাদের জন্য আমার ...!

***

মদীনা শহর থেকেই দেখা যায় অহুদ পাহাড়। আমাকে যখন বলা হলো, ঐ যে দূরে পাহাড় দেখছো, সেটাই জাবালে অহুদ! তখন মুহূর্তের মাঝে আমার সমগ্র দেহে যেন এক বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেলো! আমি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম আমার পেয়ারা নবীর প্রিয় জাবালে অহুদের দিকে। মনে পড়ে, সীরাতের কিতাবে যেদিন প্রথম

পড়েছিলাম জাবালে অহুদের প্রতি আল্লাহর নবীর ভালোবাসা এবং আল্লাহর নবীর প্রতি জাবালে অহুদের ভালোবাসার কথা, সেদিন খুব অবাক হয়েছিলাম। পাহাড় নবীকে ভালোবাসে এবং নবী পাহাড়কে ভালোবাসেন! কোন্ ভালোবাসা! কেমন ভালোবাসা! কী রহস্য এ ভালোবাসার! সেদিন থেকে আমিও ভালোবাসতে শুরু করেছি জাবালে অহুদকে। কল্পনার চোখে দেখতে চেয়েছি জাবালে অহুদের সৌন্দর্যমহিমা।

সফরে যাওয়ার পথে এবং মদীনায় ফেরার পথে আল্লাহর নবী জাবালে অহুদ অতিক্রম করছেন, আর মুহব্বতের নযরে ফিরে ফিরে দেখছেন এবং বলছেন –

أُحُدٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ – এ পাহাড় আমাদের ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি।

অহুদের যুদ্ধে আহত হয়ে আল্লাহর নবী এ পহাড়েই আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং (আল্লাহর হুকুমে) পাহাড় তাঁর প্রিয় নবীকে রক্ষা করেছিলো। মুসলিম বাহিনীর চরম বিপর্যস্ত অবস্থায়ও কাফিরদের সাহস হয়নি পাহাড়ে চড়াও হয়ে হামলা করার।

ইয়া জাবালে অহুদ! আমি তোমাকে ভালোবাসি, কারণ তুমি আল্লাহর নবীকে ভালোবেসেছো! চিরজীবন তোমাকে ভালোবাসবো, কারণ আল্লাহর নবী তোমাকে ভালোবেসেছেন।

হায় আফসোস! মদীনায় হাযির হয়েও জাবালে অহুদের কাছে আমার যাওয়া হবে না। খুব কাছে থেকে, জাবালে অহুদের ছায়ায় দাঁড়িয়ে শহীদানে অহুদের যিয়ারাত নছীব হবে না! কেন এমন হলো! তাকদীর কেন মুখ ফিরিয়ে নিলো!

আযানের সামান্য বাকি। মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেব ফজরের আগেই বলে দিয়েছেন, আছরের পর বিদায় যিয়ারাত করে বাবে জিবরীলের সামনে আমরা পরস্পরের ইনতিযার করবো।

'বিদায় যিয়ারাত' কথাটা ভাবতে বুকের ভিতরে মোচড় দিয়ে উঠলো, কিন্তু কিসমতের লেখা তো অস্বীকার করার উপায় নেই! আছরের পর বিষণ্ন হৃদয়ে বিদায় যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে রাওয়ানা হলাম হাযারো আশিকানের মিছিলে শামিল হয়ে। সবার মুখে একই উচ্চারণ! সামনে, পিছনে, ডানে, বাঁয়ে শুধু দুরূদের সুমধুর গুঞ্জন! ... ...

উম্মতের মিছিল নবীর রাওযার উদ্দেশ্যে! উম্মতের হাযিরা নবীর পাক দরবারে! কী পবিত্র, মধুর ও মর্মস্পর্শী দৃশ্য! হৃদয়ের পরতে পরতে ভাবের কী অদ্ভুত তরঙ্গদোলা! নবীর রাওযার পানে উম্মতের এ মিছিল সুদীর্ঘ চৌদ্দশ বছরের। এ মিছিল ছাহাবা তাবেঈনের, তাবয়ে তাবেঈন এবং ওলামায়ে ছালেহীনের। এ মিছিল ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফার। এ মিছিল হাসান বাছরী, সুফয়ান ছাওরী ও মুসলিম-বুখারীর। এ মিছিল আব্দুল কাদির জিলানী ও জোনায়দ বোগদাদীর!

একজন গোনাহগার বান্দাকে যখন আল্লাহ চৌদ্দশ বছরের এই নূরানী মিছিলে শামিল করে দেন তখন বান্দার অন্তরে মাগাফিরাতের এবং কবুলিয়াতের আশা জাগ্রত হবে এটাই তো স্বাভাবিক! আমারও অন্তরে আশা জাগ্রত হলো। হোক না শুধু একদিনের

জন্য, নবীর রাওযায় আল্লাহ যখন হাযির করেছেন তখন ইনশাআল্লাহ নবীর শাফা'আতও তিনি নছীব করবেন। আল্লাহর প্রতি এটা আমার সুধারণা। আর আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন, বান্দার সুধারণা তিনি কবুল করেন।

নূরের মিছিল ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো এবং আমাকে এগিয়ে নিলো। আমি রাওযা শরীফের মোকাকে দাঁড়ালাম, আদবের সাথে, অবনত দৃষ্টিতে। হৃদয়ের স্পন্দন যেন থেমে গেলো; বিগলিত হৃদয় যেন চোখের অশ্রু হয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়লো। পাপের পঙ্কিলতায় ডুবন্ত এক উম্মতি বিদায়ের সময় অনুতাপের দু'ফোঁটা অশ্রু ছাড়া আর কী পেশ করতে পারে নবীর দরবারে!

আমি গোনাহগার বান্দা যদি দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে তো নেক বান্দাদের সালাম নিবেদনে বিঘ্ন ঘটবে, অথচ হয়ত তাদেরই উছিলায় কবুল হবে আমারও সালাম! তাই বুকের কান্না বুকে চেপে রেখে তাড়াতাড়ি সরে এলাম। বাবে জিবরীল দিয়ে বের হয়ে একটু দূরে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে সবুজ গম্বুজ দেখা যায়। গম্বুজের সবুজ যেন বিদায়ের বেদনায় বিক্ষত হৃদয়কে সান্ত্বনার শীতল পরশ বুলিয়ে দিলো। আমি যেন এই বার্তা পেলাম, 'দুঃখ কেন করো, যেখানেই থাকো, নবীর দরবারে দুরূদের হাদিয়া পাঠাতে থেকো, ফিরেশতারা তোমার সালাম পৌঁছে দেবে নবীর রাওযায়। দুরূদের হাদিয়া তোমার জন্য আলোকিত করে দেবে মদীনার পথ, তুমি আসবে, আবার আসবে, বারবার আসবে। দুরূদই হবে তোমার বিরহী হৃদয়ের সান্ত্বনা এবং মদীনায় ফিরে আসার পাথেয়।

অনেক্ষণ পর মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেবকে দেখতে পেলাম। বিদায় যিয়ারাত শেষে বের হয়ে আসছেন। হুহু করে কাঁদছেন তখনো। কাঁদো উম্মতি, কাঁদো! আরো কাঁদো! রহমতের নবীর দরবারে যত পারো অশ্রুর পুঁজি সঞ্চয় করে রাখো। হয়ত আখেরাতে এ অশ্রু তোমার কাছে ফিরে আসবে রহমতের নবীর শাফা'আত হয়ে!

বিদায়ের অশ্রুভেজা দৃষ্টি আবার নিবদ্ধ হলো সবুজ গম্বুজের প্রতি। বিদায় হে সবুজ গম্বুজ! বিদায়! তবে শুধু চোখের দৃষ্টি থেকে, হৃদয়ের দৃষ্টি থেকে নয়।

হে আল্লাহ! তুমি রাহমান, রাহীম, তোমার করুণা ও রহমতের কাছে মিনতি হে আল্লাহ! এ যেন শেষ বিদায় না হয়; আবার যেন আসা হয় সোনার মদীনায় নবীর দরবারে দুরূদ ও সালামের নাযরানা নিয়ে! আবার যেন পাই এ সবুজের সান্নিধ্য!

***

রওয়ানা হলাম যেখান থেকে বাস ছাড়বে সেখানের উদ্দেশ্যে। একটা কথা বলা হয়নি, এখনো মদীনার খেজুর খাওয়া হয়নি। সাধ্যের ভিতরে সামান্য কিছু খেজুর নিলাম, ইফতারের সময় নিজের মুখে দেবো এবং দেশে প্রিয়জনদের মুখে তুলে দেবো, সোনার মদীনার হাদিয়া! আমাদের নবীজী খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে দিতেন। কল্পনায় যেন দেখতে পেলাম মদীনার শিশুদের সে সৌভাগ্যের দৃশ্য! সেই দৃশ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য গ্রহণের জন্য আমিও তা করবো। মদীনার খেজুর চিবিয়ে আমার ছোট্ট মেয়েটির মুখে দেবো।

বাস যাত্রা শুরু করলো; সবুজ গম্বুজ তখনো চোখের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়নি, কিন্তু আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেলো; তবু তাকিয়ে থাকলাম ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসা সবুজের প্রতি। এক সময় সবুজ গম্বুজ দেখা গেলো না, তবে মিনার দেখা গেলো; এবার তাও চলে গেলো চোখের আড়ালে।

হৃদয়ের গভীরে সবুজ সুন্দর একটি স্বপ্ন ছিলো; আল্লাহর ইচ্ছায় সে স্বপ্ন পূর্ণ হলো, আল্লাহর ইচ্ছায় আবার তা স্বপ্ন হয়ে গেলো। স্বপ্ন দেখো, স্বপ্ন লালন করো, স্বপ্নের বেদনা বহন করো এবং স্বপ্নের পূর্ণতার জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুণো– এরই নাম জীবন। আমি আবার স্বপ্ন দেখা শুরু করবো। আবার শুরু হবে আমার স্বপ্নের জীবন এবং জীবনের স্বপ্ন। জানি না, কবে পূর্ণ হবে এ স্বপ্ন! হবে তো! স্বপ্নের জন্ম এবং স্বপ্নের মৃত্যু সবই তো আল্লাহর ইচ্ছায়! হে আল্লাহ, আমার মৃত্যু হোক, আমার স্বপ্নের যেন মৃত্যু না হয়!

মদীনা থেকে আমার এ যাত্রা যদি হতো দেশের উদ্দেশ্যে তাহলে জানি না মনের অবস্থা কী হতো! বিচ্ছেদ-বেদনা কত গভীর হতো! কিন্তু এখানে বেদনার সঙ্গে ছিলো সান্ত্বনা। কারণ মদীনার মুসাফির আবার হলো মক্কার মুসাফির। আবার আমি ইহরামের লিবাস ধারণ করবো এবং আল্লাহর ঘর দেখবো! আবার আমি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবো এবং ছাফা-মারওয়ার সাঈ করবো! প্রাণভরে আবার আমি পান করবো যামযামের সুশীতল পানি!

গত রাতে মদীনায় প্রবেশ করার সময় বুঝতে পারিনি কখন কোবার মসজিদ অতিক্রম করেছি, বরং আমার জানাও ছিলো না যে, কোবার মসজিদের হয়েই গাড়ীর পথ। এবার দেখতে পেলাম মসজিদে কোবা। শুধু দেখতেই পেলাম, আর বুকের ভিতর বেদনা অনুভব করলাম। দেখেও দেখতে না পারা, এ যে না দেখার চেয়েও বেদনার। হিজরতের সময় মদীনায় প্রবেশের পূর্বে এখানে আল্লাহর নবী অবস্থান করেছেন তেরদিন। ছাহাবা কেরামের সঙ্গে নিজে শ্রম দিয়ে তিনি কোবার মসজিদ নির্মাণ করেছেন। সীরাতের পাতা থেকে খণ্ড খণ্ড অনেক চিত্র, অনেক দৃশ্য একে একে মনের পর্দায় উদিত হতে লাগলো, কিন্তু ততক্ষণে গাড়ী চলে গেছে অনেক দূর। কিছুক্ষণ পর পিছনে ফিরে ফিরেও মসজিদে কোবা আর দেখা গেলো না, তবে ক্ষণিক দেখার যুগপৎ আনন্দ ও বেদনা আমার সঙ্গী হয়ে থাকলো দীর্ঘক্ষণ।

মদীনা থেকে কিছু দূরে যুলহোলায়ফা। সেখানে বাস থামলো ইহরাম ধারণ করার জন্য। আমরা মদীনা শরীফে আছরের আগে মসজিদুন্নবী থেকেই ইহরাম ধারণ করেছিলাম। আমার খুব ভালো লেগেছিলো ইহরামের লিবাসে নবীজীর রাওযায় বিদায় সালাম আরয করতে। এ অনুভব আমাকে অনেক তৃপ্তি দান করেছিলো যে, আমি যেন … …! নাহ্, সব কথা বলতে নেই, না মুখে, না কলমে।

যুলহোলায়ফা থেকে বাস রওয়ানা হলো। অর্থাৎ আমরা হারামের মীকাতে প্রবেশ করলাম। দিনের ক্লান্ত সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে। এ সূর্য প্রতিদিন উদিত হয় এবং

অস্ত যায়। প্রতিদিন সে দেখতে পায় মদীনার পথে এগিয়ে চলা কাফেলা। তাদের মুখমণ্ডলের উদ্ভাসই বলে দেয় তাদের স্বপ্নের পূর্ণতার আনন্দের কথা।

একই ভাবে এ সূর্য প্রতিদিন দেখতে পায় মদীনা থেকে বিদায়ের কাফেলা। তাদের মুখমণ্ডলের বিষণ্ণতাই বলে দেয় তাদের স্বপ্ন-উদ্যানের ঝরে যাওয়া ফুলের কথা। সূর্যের উদয়াস্তের মতই সুদীর্ঘ চৌদ্দশ বছর ধরে চলছে নবী-প্রেমিকদের মিলন-বিচ্ছেদের এ আনন্দ-বেদনা। আজকের অস্তগামী সূর্য সাক্ষী হয়ে থাকলো সুদূর বাংলাদেশের এক অধম উম্মতির বিচ্ছেদকাতর চোখের কয়েক ফোঁটা অশ্রুর।

সূর্য অস্ত গেলো। মদীনা এখান থেকে দূরে, তবে মদীনার খেজুর ছিলো আমাদের সঙ্গে। সেই খেজুরে ইফতার হলো। গতকালের মত আজো ইফতারের অন্তরঙ্গতা বেশ উপভোগ্য হলো। তবে আজ আমরা শরীক হওয়ার সঙ্গে শরীক করারও সুযোগ পেয়েছিলাম।

মদীনায় মসজিদে নববীর ইফতার দেখার এবং শরীক হওয়ার সুযোগ হলো না, তবে শুনে এলাম অনেক কিছু। মদীনার ভাগ্যবান লোকেরা আছরের পর থেকেই মসজিদে নববীতে ইফতারের দীর্ঘ দীর্ঘ দস্তরখান বিছাতে শুরু করেন এবং সকাতর অনুনয়ের সঙ্গে দস্তরখানে রোযাদারদের ডেকে আনেন। দস্তরখানে দস্তরখানে যেন মধুর এক প্রতিযোগিতা। ছোট ছোট শিশুরা হাত ধরে ধরে দস্তরখানে রোযাদারদের এনে বসিয়ে বড়দের থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে। তাদেরও মাঝে চলে আরো মধুর প্রতিযোগিতা। দশবছর পর নিজের চোখে দেখেছিলাম সে সব দৃশ্য। দেখে ধন্য হয়েছিলাম। দশবার বছরের সেই বালকদু'টি এখন নিশ্চয় যুবক! ওদের কথা এখনো ভুলিনি, কোন দিন ভুলতে পারবো না। আমাকে ওরা দু'দিক থেকে পাকড়াও করেছিলো মসজিদে নববীর দরজায়। নিতে নিতে নিয়ে গিয়েছিলো অনেক দূরে ওদের বাবার দস্তরখানে। মাঝখানে অন্য অনেক দস্তরখানে বসাবার চেষ্টা করা হয়েছিলো। কিন্তু আমার পাহারাদার দু'জন ছিলো খুব সতর্ক। যে আমার হাত ধরে টানে তাকেই বিনম্র দৃঢ়তার সঙ্গে বলে দেয়–

دَعْه فَإنَّه ضَيْفُنَا (দয়া করে ছাড়ুন, ইনি তো আমাদের মেহমান)

আর আরব শায়খ এমন সমাদর করে আমাকে বসালেন যেন আমি তার রক্তের ভাই! এবার শুরু হলো দু'ভাইয়ের বিবাদ। উভয়ের দাবী, সে-ই আমাকে 'অর্জন' করেছে, সুতরাং পুরস্কার তার প্রাপ্য। পিতা অবশ্য খুশী করলেন দু'জনকেই। এ রকম দৃশ্য ছিলো রামাযানের প্রতিদিন এবং মসজিদে নববী জুড়ে বিছানো প্রতিটি দস্তরখানে। হবে না কেন! আল্লাহ যে তাদের দিয়েছেন মদীনার দিল এবং দুনিয়ার মাল! ইফতারের সময় মদীনার খেজুর আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো আরো অনেক মধুর স্মৃতি। কত কিছু বলতে ইচ্ছে করে, আবার কত কিছু বলতে ভিতর থেকে কে যেন বারণ করে।

নামাযের পর বাস আবার যাত্রা করলো মক্কার পথে, বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে অন্যরকম এক ভাবের পরিবেশ ছিলো। হৃদয়ের গভীরে অদ্ভুত এক তন্ময়তা ছিলো। পথের দু'দিকে কখনো মরুভূমি, কখনো পর্বতশ্রেণী, কখনো খুব কাছে, কখনো দূরদিগন্তে। আরবের হিজাযের এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যি অপূর্ব! এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য চক্ষু অবলোকন করে এবং হৃদয় অনুভব করে, তারপর আত্মার গভীরে তা প্রবেশ করে। প্রকৃতি, হৃদয় ও আত্মা এখানে একাকার হয়ে যায়।
লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক-- এই সমধুর তালবিয়া-ধ্বনির মাঝেই পথ অতিক্রান্ত হলো। মধ্যরাতে আমরা মক্কার আলো দেখতে পেলাম। চৌদ্দশ বছর আগে এত দূর থেকে কি দেখা যেতো মক্কার আলো! বিদ্যুতের আলো না হলেও তখনো জ্বলতো আলো! এবং আমার বিশ্বাস, মক্কা-মদীনার আলো সব সময় উজ্জ্বল ছিলো।
বাস থেকেই শুনতে পেলাম কিয়ামুল্লায়লের আযান। আমরা তো আর সে যুগের মানুষ নই, যাদের দিনে ছিলো উদ্যম, রাতে ছিলো উদ্দীপনা! আমরা হলাম এযুগের মানুষ। আমাদের দেহে ছিলো পথের ক্লান্তি এবং সফরের অবসন্নতা। তাই বাস থেকে নেমে হারামের বাইরে পথের উপরই শুয়ে পড়লাম। আমরা একা নই, আরো অনেকে এবং অনেক দেশের। মক্কার ধুলোবালিতে মিসকীনের মত পড়ে থাকতে পেরে নিজেকে বড় ধনী ও সৌভাগ্যবান মনে হলো। এ ধূলিশয্যা তো মখমলের কোমল শয্যার চেয়ে অনেক অনেক প্রিয়।
সেহরীর আগে তাওয়াফ করলাম এবং সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যামযামের পারে দাঁড়ালাম। এখানে এসে যখনই দাঁড়াই আমি অন্য মানুষ হয়ে যাই। ভিতরে খুব ইচ্ছে জাগে নিষ্পাপ একটি জীবন অর্জনের, ঠিক শিশুর মত। আমি যেন শুধু মানুষের শুভকামনা করি, আমি যেন কাউকে ঈর্ষা না করি। যামযাম যেন এ শিক্ষাই দেয়, শিশুর মত নিষ্পাপ হও, পবিত্র জীবন অর্জন করো এবং মানুষের শুভকামনা করো।
যামযাম পান করলাম, প্রাণ জুড়োলো, দেহ সতেজ হলো এবং হৃদয় সজীব হলো।

***

আজকের ফজর ইমামুল হারামের প্রায় পিছনে পড়ার সৌভাগ্য হলো। মসজিদের কাতার হয় লম্বা, হারামের কাতার হলো গোল, কা'বা শরীফকে ঘিরে চারদিকে। প্রথম কাতারের বৃত্ত ছোট, পরবর্তী কাতারগুলো ক্রমসম্প্রসারিত। যেন বাইতুল্লাহ থেকে নূরের একটি তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ইমাম কা'বা শরীফের যে কোন দিকে দাঁড়াতে পারেন। তবে সাধারণত ইমামের মুছল্লা বিছানো হয় হাতীমে। সেদিন হঠাৎ করে মুছল্লা বিছানো হলো হাজারে আসওয়াদের দিকে। তাওয়াফ শেষ করে আমি তখন মুলতাযামের সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল। ফলে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ইমামুল হারামের ঠিক পিছনে দ্বিতীয় কি তৃতীয় কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম। প্রথম কাতারে যাওয়ার চেষ্টা করা যেতো, কিন্তু তাতে কারো কষ্ট হতে পারে, তাহলে তো সব বরবাদ! তাই সে লোভ সম্বরণ করলাম। তবে আল্লাহ তার গোনাহগার বান্দাকে খুশী করে দিলেন ইমামুল হারামের সঙ্গে মুসাফাহার সুযোগ করে দিয়ে। সেদিন

সারাটা দিন এজন্য খুব আনন্দে কেটেছিলো। বারবার বুকে নিজের হাতের স্পর্শ গ্রহণ করছিলাম। আল্লাহর ঘরের যিনি ইমাম, এ হাত তো স্পর্শ করেছে তাঁর পবিত্র হাত! পরবর্তীতে অবশ্য হযরত হাফেজ্জী হুযূরের ওছীলায় ইমামুল হারামের সঙ্গে মুছাফাহার সুযোগ হয়েছে একাধিক, দেশে এবং পবিত্র ভূমিতে। কিন্তু সেদিনের সৌভাগ্য-অনুভূতি ছিলো অন্য রকম! হয়ত এজন্য যে, হারানোর বেদনায় আমি তখন বড় কাতর ছিলাম। সহায়-সম্বলহীন মুসাফির তো যে কোন অবলম্বন থেকেই একটু সান্ত্বনা পেতে চায়!

ফজরের পর ছাফা-মারওয়ার সাঈ করলাম। একই আমল, ছাফা থেকে অবতরণ, দূরের মারওয়ায় আরোহণ এবং আসা-যাওয়ার পথে সবুজের সীমানায় দৌড়। এভাবে ছাফা থেকে শুরু হয়ে মারওয়ায় গিয়ে সাত চক্কর সমাপ্ত।

একই আমল, কিন্তু নতুন ইহরামের পর যতবারই তুমি ছাফা-মারওয়ার সাঈ করবে, যতবারই তুমি সবুজের সীমানা দৌড়ে পার হবে, মনে হবে জীবনে এই প্রথম। এখানে প্রতিদিন প্রথম দিন। নতুন অনুভব-অনুভূতি, নতুন চেতনা, নতুন উপলব্ধি এবং নতুন নতুন রহস্যের উদ্ভাস! একই ভাবে প্রতিটি তাওয়াফে তুমি লাভ করবে নতুন আবেগ-উত্তাপ, নতুন প্রেরণা, নতুন তরঙ্গদোলা। হৃদয় তোমার সমৃদ্ধ হবে নতুন নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞানে। বাইতুল্লাহর পঁচিশ বছরের পড়শী এক ভাগ্যবান আমাকে বলেছেন–

যতবার হজ্ব, ওমরা করি; সাঈ ও তাওয়াফ করি, আরাফা-মুযদালিফায় ওকূফ করি, জামারায় রামী করি, প্রতিবারই ভিন্ন স্বাদ ও সুবাস অনুভব করি। প্রতিবারই বলি, এমন তো আগে হয়নি! এমন তো আগে বুঝিনি!

***

ইফতারের পর আমরা তিনজন জিদ্দা রওয়ানা হলাম আমাদের দু'জনের টিকেট ও ফ্লাইট নিশ্চিত করার জন্য। তখন জিদ্দায় বাংলাদেশের নিজস্ব অফিস ছিলো না। এরিয়ান ট্রাভেলস ছিলো বিমানের প্রতিনিধি। জিদ্দায় তাদের অফিস আমাদের জাতীয় বিমানের প্রধান কার্যালয়ের চেয়ে বড়, যেমন আকারে-আয়তনে, তেমনি জাঁকজমক ও সাজসজ্জায়। কোথায় কার সাথে কথা বলবো, বুঝতে না পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে ছিলাম। আরবী নামে তারা যা বলে সেটা আর যাই হোক আরবী নয়, আর আমাদের বিশুদ্ধ আরবী তাদের কাছে একটা বিস্ময়! সে বড় অদ্ভুত অবস্থা! মধ্যযুগের কবি মুতানাব্বী দোভাষীর কথা বলেছেন, পাকিস্তানের এক ভদ্রলোক দোভাষী হয়ে আমাদের উদ্ধার করলেন। কাজ অবশ্য হয়ে গেলো অল্প সময়ে এবং কোমল পানীয়র কোমল আপ্যায়নসহ।

এবার বলবো একটি শিক্ষালাভের ঘটনা। শিক্ষক হলেন এক বেদুঈন টেক্সিচালক, যিনি আমাদের জিদ্দা থেকে মক্কা আনা-নেয়া করেছেন। নাম, জাবির আব্দুল কারীম আব্দুস-সামাদ। শিক্ষক বলেই তার দীর্ঘ নামটা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। নিজের, বাবার এবং দাদার, এই তিন নাম না বলে সাধারণত কোন আরব ক্ষান্ত হতে চায় না।

বাবার নাম তো অবশ্যই বলবে, জিজ্ঞাসা করলে দাদার পরেও কয়েক সিঁড়ি বলতে পারে দশবছরের আরবশিশুও। একসময় তো উট-ঘোড়ারও বংশপরিচয় ছিলো আরবদের গর্ব। আমাদের দেশে বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীর নাম ও পদবী গ্রহণ করে। কিন্তু আরবনারী এখনো নিজের নামের সঙ্গে বাবার নাম এবং আপন গোত্রপরিচয় ধারণ করে।

জাবিরের বস্তি হোদায়বিয়া অঞ্চলে। তার দাদা ছিলেন 'জাম্মাল'– উটচালক। মক্কা থেকে মদীনায় হাজীদের কাফেলা আনা-নেয়া করতেন। ত্রিশ-চল্লিশটি উট ছিলো তার। জাবির বেশ গর্বের সাথে বললো, দাদার কাফেলা বেদুঈন দস্যুদের হাতে কখনো লুণ্ঠিত হয়নি, একবার ছাড়া এবং সেবার তিনি ও তার দু'ভাই প্রাণ দিয়ে হাজীদের জানমাল রক্ষা করেছিলেন। আমার জিজ্ঞাসার জবাবে পঁচিশ বছরের যুবক জাবির বেশ গর্বের সাথে শুনিয়েছিলো সে কাহিনী। পূর্বপুরুষের এমন শৌর্যবীর্যে গর্ব করা অবশ্যই সাজে।

তো শিক্ষাটা কী পেলাম! যাওয়ার পথে আমাদের পিপাসা পেয়েছিলো। গাড়ী থামিয়ে আমরা তিনজনের জন্য তিনটি ঠাণ্ডা কোমল পানীয় কিনলাম। মনেই পড়েনি যে, গাড়ীতে আমরা চারজন ছিলাম। ফেরার পথে আমাদের গাড়ীর চালক জাবির আব্দুল কারীম আব্দুসসামাদ গাড়ী থামিয়ে কোমল পানীয়র চারটি বোতল এনেছিলো। তিনজন ভুলে গিয়েছিলো একজনের কথা, অথচ একজনের মনে ছিলো তিনজনের কথা! এ ঘটনা এখনো মনে হলে যুগপৎ লজ্জা ও কৃতজ্ঞতায় এতটুকুন হয়ে যাই। এ শিক্ষা আমি আমার জীবনে মনে রাখার চেষ্টা করেছি, যদিও মাটির দোষ বা গুণ এড়িয়ে চলা খুব সহজ নয়।

সবার সঙ্গে একই রকম ঘটনা ঘটবে, তা জরুরী নয়। তবে আমাদের সাথে তা ঘটেছিলো। এমনকি জাবির একরকম জোর করে আমাদের জিদ্দা শহর ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলো। তার একটি মন্তব্য এখনো মনে পড়ে, মৃদু হেসে সে বলেছিলো, এটা তোমার বিশুদ্ধ আরবী ভাষার পুরস্কার!

বিপরীত অভিজ্ঞতাও যে কখনো হয়নি তা নয়। তবে এটাও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, সব আলখেল্লার ভিতরে আরব বাস করে না। কারণ একসময় বিভিন্ন দেশের ফেরারী খুনের আসামীরা নিরাপদ ভেবে আরবদেশে পাড়ি জমাতো। এখন তাদের সন্তান ও তস্য সন্তানরা মাতৃভাষা ভুলে যাওয়া রীতিমত 'আরব'।

জিদ্দা শহরকে মনে হলো রূপকথার শহর। আলিশান সব ইমারত। বহুতল মানে একেবারেই বহুতল। প্রতিটির ডিজাইন ও নকশা ভিন্ন। যেন একটিকে অপরটি ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা! ইট-পাথরের চেয়ে কাঁচের ব্যবহার বেশী। যেন একেকটি শিশমহল! আর আলোকসজ্জার তো কোন তুলনাই নেই! চারদিকে চলছে ব্যাপক এক নির্মাণ কর্মযজ্ঞ। উটের যুগের এবং মরুভূমির আরবদের এখন খুঁজে পাওয়া সত্যি দুষ্কর! গাড়ী এখন লাখে লাখে, উট নেই এমনকি শত শত! তাঁবু নযরে পড়েনি এখন পর্যন্ত একটিও।

এক জায়গায় দেখা গেলো, বিরাট দীঘির মত মাটি খোঁড়া হয়েছে। জাবির জানালো, হিন্দুস্তান থেকে মাটি এনে ভরাট করে এখানে উদ্যান তৈরী করা হবে! বোঝা গেলো, মরুভূমির কোলে প্রতিপালিত রুক্ষ কঠিন আরবরা এখন 'কোমল' হওয়ার চেষ্টা করছে। দুশমনও তাদেরকে নরম লোকমার মত গিলতে শুরু করেছে। এটাই স্বাভাবিক, আর ইতিহাসে অস্বাভাবিক ঘটনা কমই ঘটে।

জিদ্দাকে বলা হয় লোহিত সাগরের 'কন্যা'। বিরাট শহর। বিরাট বললে কমই বলা হয়। কত বিরাট তা কল্পনা করাও বিরাট ব্যাপার। পাঁচতারা হোটেল সংখ্যায় বিশ পঁচিশের কম নয়। সেগুলোর ভিতরের চিত্র বেদুঈন যুবক জাবির বিন আব্দুল কারীম আব্দুস্-সামাদ বারবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলে যা তুলে ধরলো তা সত্যি সত্যি আস্তাগ-ফিরুল্লাহ'!

ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন শ্রেণীর নারী-পুরুষের আগমন এখানে পিছনের যে কোন সময়ের চেয়ে ভয়াবহ রকমের বেশী। তাদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ যেমন চলছে তেমনি চলছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। ফলে বিশেষ করে যুবকশ্রেণী বিপথগামী হয়ে পড়ছে খুব দ্রুত, যার কিছু চিহ্ন লোহিত সাগরের পাড়ে বিভিন্ন বিনোদন-কেন্দ্রে আমাদেরও নযরে এসেছে। এটা খুবই বেদনাদায়ক বিষয়, কিন্তু ঢল যখন ধেয়ে আসে তখন তা রোধ করার উপায় কী!

***

আজ আটাশে রামাযান। বলতে কলজে ফেটে যায়, তবু এটাই তিক্ত বাস্তব যে, মক্কা শরীফে আজ আমাদের শেষ দিন। কে জানতো, এমনই হবে আমার কিসমত! সফর তো শুরু হয়েছিলো চার মাসের নিয়তে। হযরত হাফেজ্জী হুযূর তো আমাদের পাঠিয়েছিলেন 'মুকাদ্দামাতুল জায়শ'রূপে। তিনি তো চেয়েছিলেন, আমরা হজ্জ পর্যন্ত অবস্থান করবো। তিনি হজ্জের সফরে আসবেন এবং আমরা তাঁর সঙ্গে হজ্জ আদায় করবো। জীবনের প্রথম হজ্জ হযরত হাফেজ্জী হুজুরের ছোহবতে, কত বড় সৌভাগ্যের কথা! কিন্তু ললাটের প্রশস্ততা যদি হয় অল্প তাহলে কার দোষ! তখন ভেবেছি, আমীরে সফরের ফায়ছালা মেনে নেয়াই সমীচীন। কী বলবো এটাকে? কিসমত? না নিজের হাতে নিজের কিসমতের বরবাদি?

এখন যারা যিন্দেগির সফর শুরু করছে, করজোড়ে তাদের বলি, মুরুব্বীর আদেশ-উপদেশের নিজস্ব ব্যাখ্যা বের করো না এবং নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করতে যেয়ো না। 'ক্ষতি' যদি হয় হোক মুরুব্বীর কথা অনুসরণ করে। কারণ নিজের বুদ্ধির লাভও লাভ নয়। আমি শুধু বলতে পারবো, কিন্তু 'বেলতলায় যাওয়া তো আর রোধ করতে পারবো না', নিজের বেলায় যখন পারিনি!

সময় সত্যি সত্যি একেবারে শেষ হয়ে এলো। আছরের আগেই বিদায় তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হবে। তাওয়াফ করলাম সর্বস্ব হারানোর বেদনা নিয়ে। মুলতাযামে এসে অশ্রু আর বাঁধ মানলো না। প্রাণভরে কাঁদলাম। এ কান্না ছিলো সেই দুর্ভাগা মুসাফিরের, মরুভূমিতে যার ফুরিয়ে গেছে পাথেয়, হারিয়ে গেছে সওয়ারির উট! এখন

কান্নাই তো তার সম্বল! বাঁচার একমাত্র উপায়! অশ্রুবর্ষণই এখন তার জন্য আনতে পারে রহমতের 'বারিবর্ষণ'!

বান্দার অক্ষমতাকে মাফ করো হে আল্লাহ! আমি কী করবো হে আল্লাহ, আমার সামনে যে কোন উপায় নেই! তোমার নারাযি থেকে হেফাযাত করো হে আল্লাহ! আমাকে আবার ডাক দিও হে আল্লাহ! আবার যেন আসতে পারি তোমার ঘরে, তোমার হাবীবের রাওযা শরীফে। এ স্বপ্নভঙ্গের পর আবার যেন স্বপ্ন দেখি। ভাঙ্গা বুকে আবার যেন স্বপ্নের বেদনা লালন করি! আবার যেন পূর্ণ হয় আমার স্বপ্ন! আবার যেন কাছে পাই কালো গিলাফের ছায়া এবং সবুজ গম্বুজের স্নিগ্ধতা! মুনাজাতের পর বুকটা যেন অনেক হালকা হলো। হৃদয়ের গভীরে যেন এ আশ্বাস ও বিশ্বাস জাগ্রত হলো যে, আমার আল্লাহ আমাকে আবার আনবেন। ইনশাআল্লাহ আমি আবার আসবো, আল্লাহর ঘর আবার তাওয়াফ করবো, যামযামের পারে আবার দাঁড়াবো, ছাফা-মারওয়ার মাঝে আবার সাঈ করবো। মিনা-আরাফায় ইনশাআল্লাহ আমি হাযির হবো। লাব্বাই আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলে আমি ইহরামুল হজ্জের সাজ ধারণ করবো। কবে? কীভাবে? জানি না। আমি শুধু জানি, মেহেরবান আল্লাহ তার বান্দাকে নিরাশ করেন না, কখনো না। বান্দার অযোগ্যতা, বান্দার গান্দেগি ও অপবিত্রতা তাঁর রহমতের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, কখনো না।

আল্লাহর ঘরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, আফসোস করে করে, চোখের পানি ফেলে ফেলে ধীর পদক্ষেপে মাতাফ থেকে বিদায় হলাম। হারাম শরীফে আছরের জামা'আতে শেষ নামায আদায় করলাম।

আর দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ নেই; আর বিলম্ব করার উপায় নেই। বিচ্ছেদ-কাতর দৃষ্টিতে শেষবারের মত বাইতুল্লাহকে দেখলাম। বিদায় হে বাইতুল্লাহ! এক মজবূর মুসাফিরের অক্ষম বিদায়! আবার ফিরে আসার স্বপ্ন দেখে বিদায়! হে আল্লাহর ঘর! আল্লাহর কাছে তুমিও সুফারিশ করো আমার জন্য। দু'দিনের জন্য হলেও তো আমি তোমার পড়শী ছিলাম!

মক্কা শরীফে এসে যে দোকানে ব্রিফকেস আমানত রেখেছিলাম, তিনি এ ক'দিন যথেষ্ট সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং শোকর আদায় করে ব্রিফকেস নিলাম। তিনি জানতেন, আমি হজ্জের নিয়তে এসেছি। বিদায়ের কথা শুনে তাজ্জব বনে গেলেন। উৎকণ্ঠার সঙ্গে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কী বলবো! নিজের অজান্তেই চোখে পানি এসে গেলো। শুধু বললাম–

وَمَاتَشَاؤُوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

(তোমরা যা চাও তা নয়, বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা চান তাই হয়।)

তিনি বললেন, صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ – আল্লাহর কালাম চিরসত্য।

ঐ বান্দাকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ইনশাআল্লাহ তুমি আবার আসবে। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করুন।

আমার চেপে রাখা কান্না তখন বাঁধ ভেঙ্গে বের হয়ে এলো। তিনি আমার কাঁধে কোমলভাবে হাত রেখে নীরব সমবেদনা জানালেন। জীবনে এমন মুহূর্তও আসে যখন সামান্য একটু নীরব সমবেদনা অনেক বড় অবলম্বনের কাজ দেয়। জীবনে অনেক কিছু পাওয়া যায়, এই সমবেদনাটুকু খুব কম পাওয়া যায়। এইটুকু যদি কখনো কারো কাছে পাও, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাকে স্মরণ করো।

অকালে ঝরলো ফুল!

বিমান ছাড়বে রাত আটটায়। জিদ্দা বিমানবন্দরে আমাদের পৌঁছতে হবে অন্তত সাতটায়। সুতরাং আর বিলম্ব করা চলে না, কিন্তু যা চলে না, একে একে তাই চলতে শুরু করলো, অর্থাৎ বিলম্বের পর বিলম্ব হতে লাগলো। যিনি 'আব্‌দার' রেখেছিলেন, নিজের গাড়ীতে আমাদের জিদ্দা পৌঁছে দেবেন, তার আসতে বেশ বিলম্ব হলো। এতক্ষণ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, মনে পড়েনি, তিনি আসার পর মনে পড়লো; একটি সামান ভুলে রয়ে গেছে উপরে। সুতরাং আবার বিলম্ব। সামান এলো, গাড়ীতে ওঠবো, তখন দেখা দিলো প্রকৃতির কাছ থেকে প্রাপ্ত 'অনিবার্য কারণ', যার সামনে মানুষ বড় অসহায়; সেই সুবাদে আরো কিছু বিলম্ব।

এভাবে তিন তিনটি বিলম্বের বাঁধা পার হয়ে অবশেষে গাড়ীতে বসা হলো। ফারূক ভাই পাশে দাঁড়ানো, বিষণ্ণ, বিমর্ষ। সম্ভবত আমাদের, বিশেষ করে আমার 'নির্বুদ্ধিতা'য় ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হচ্ছেন। তার অশ্রুসজল চোখ থেকে যেন এই মিনতি ঝরে পড়ছে, এখনো সময় আছে ফিরে আসার! এখনো সুযোগ আছে সৌভাগ্যের আঁচল ধরে রাখার! কিন্তু নিয়তির কাছে মিনতির মূল্য কোথায়!

গাড়ী চলতে শুরু করলো। ফারূক ভাই কান্না সম্বরণের চেষ্টা করলেন এবং হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। যতক্ষণ আমাদের গাড়ী দেখা যায় ততক্ষণ তার হাত নড়ছিলো। আমার মনে হয়, চোখের আড়াল হওয়ার পরো অনেক্ষণ তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এটা আর কিছু নয়, শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে মুহব্বত। আমি তার সৌভাগ্যের কথা ভাবছিলাম, তিনি হয়ত ভাবছিলেন আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা। এমনই হয়। জীবনে বারবার এমন হয়েছে, বারবার এমনই হবে। কেউ সৌভাগ্যের নাগাল পাবে, কেউ নাগালের সৌভাগ্য হারাবে।

হঠাৎ লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ধ্বনি আমাদের চমকে দিলো। বুকের ভিতরটা কেমন তোলপাড় করে উঠলো। হারামের অভিমুখী একটি বাস আমাদের গাড়ী অতিক্রম করলো। মুহূর্তের জন্য ইহরামের সাদা লেবাস চোখের সামনে ঝলমল করে উঠলো এবং অদৃশ্য হয়ে গেলো। সম্ভবত তানঈম থেকে তারা ওমরার ইহরাম বেঁধে এসেছে। আমারও সঙ্গে রয়েছে ইহরামের লিবাস; পরিধানে নয়, শুধু সঙ্গে।

এই ভাগ্যবান লোকগুলো যখন আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবে, ছাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে এবং যামযামের পানিতে প্রাণ শীতল করবে তখন .. তখন আমি থাকবো মক্কা থেকে অনেক দূরে, জিদ্দার মাটিতে, কিংবা বিমানে দূর আকাশে।

যারা আসে, কোন না কোন সময় বিদায় তো তাদের নিতেই হয়। আমি জানতাম, আমাকেও একদিন এ পবিত্র ভূমি থেকে বিদায় নিতে হবে, কিন্তু এভাবে! কিসমতের সিতারাকে ডুবিয়ে! এমন অভাগা আর কেউ কখনো এসেছে আল্লাহর ঘরে!

হে দয়াময়, দুর্ভাগা বান্দার ডুবে যাওয়া কিসমতের সিতারাকে তুমিই শুধু পারো আবার উদিত করতে!

হঠাৎ গাড়ীর চালক বললেন, 'শেষবারের মত দেখে নিন হারামের মিনার, কী অপূর্ব! রাতে আলো ঝলমল অবস্থায় আরো সুন্দর দেখা যায়।'

আমরা ফিরে তাকালাম এবং তাকিয়ে থাকলাম। ভিতরে আমাদের সর্বস্ব হারানোর বেদনা হু হু করে উঠলো। গাড়ী থামানো হলো না, তাই স্বপ্নের শেষ দৃশ্যটি দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেলো, সবকিছু চোখের আড়ালে চলে গেলো, আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেলো। ভিতরটাকে দুমড়ে মুচড়ে শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হয়ে এলো। কিন্তু না, দয়াময় আবার দয়া করলেন। বেদনার আকাশ থেকে যেন তিনি একপশলা সুখের বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। গাড়ীর চালক আমাদের সহায়তা করলেন, আমরা দূর থেকে দেখতে পেলাম হেরার পর্বতচূড়া। এখানে হেরার নির্জন গুহায় নাযিল হয়েছিলো আলকোরআনের প্রথম বাণী; তাই এর নাম এখন জাবালে নূর, নূরের পাহাড়। জাবালে নূর সত্যি জাবালে নূর! যারা অন্তর্জ্ঞানী এবং অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী তারা তো সেই নূর অবলোকন করতে পারেন তাদের ভিতরের নূর দ্বারা। আমাদের মত স্থূল দৃষ্টি যাদের, এমনকি তাদেরও অন্তরে নুরানিয়াতের পরশ লাগে জাবালে নূর দেখে।

একসময় আমাদের গাড়ী মক্কার সীমানা অতিক্রম করলো এবং দ্রুত গতিতে জিদ্দা-অভিমুখে ছুটে চললো। স্বপ্নের সবকিছু চলে গেলো পিছনে, সামনে থাকলো শুধু হারানোর বেদনা আর যন্ত্রণার দীর্ঘশ্বাস!

কয়েকদিন আগে জিদ্দা থেকে আমাদের বাস যখন রওয়ানা হয়েছিলো, ধীরে ধীরে আমরা তখন মক্কার কাছে এসেছিলাম; অন্তরে বাইতুল্লাহর দীদারের ব্যাকুলতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছিলো। হৃদয় জুড়ে ছিলো আসন্ন মিলনের আনন্দের অদ্ভুত এক শিহরণ। আর এখন! গাড়ী যত আগে বাড়ছে মক্কা যেন তত দূরে সরে যাচ্ছে। বিচ্ছেদ-বেদনা ততই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে। হৃদয় জুড়ে যেন বঞ্চনার অদ্ভুত এক দহন।

হে আল্লাহ, এ দূরত্ব যেন শুধু শরীরের হয়, হৃদয়ের নয়। বঞ্চনার এ দহন এবং বিচ্ছেদের এ বেদনা আবার যেন বয়ে আনে মিলনের আনন্দশিহরণ।

সূর্য অস্ত গেলো। রাস্তার পাশে গাড়ী থামানো হলো। মরুভূমির বালুতে দস্তরখান বিছিয়ে সংক্ষিপ্ত ইফতার করা হলো, তারপর মাগরিব আদায় করা হলো। আছর

আদায় করেছিলাম কা'বামুখী হয়ে, মাগরিব আদায় করলাম কিবলামুখী হয়ে। অনেক পার্থক্য এ দুয়ের মাঝে। তবে দূর থেকেও যারা অন্তরের দৃষ্টিতে অবলোকন করেন বাইতুল্লাহ তাদের কথা ভিন্ন। তাদের তো সারা জীবনের নামায হয় কা'বামুখী। কিন্তু আমরা! চোখের আড়ালে আমাদের সামনে আর কা'বা থাকে না, থাকে শুধু কিবলা।

গাড়ী আবার যাত্রা শুরু করলো এবং .. এবং যা ঘটলো তা সত্যি অদ্ভুত। আমি ভাবলাম, আল্লাহর কুদরতের কারিশমা বুঝি শুরু হলো এবং কিসমতের সিতারা আবার বুঝি জেগে উঠলো।

হঠাৎ করে গাড়ীর ইঞ্জিন বিগড়ে গেলো। বিগড়ানো অবস্থায়ও কিছু দূর চললো। কিন্তু তারপর একদম থেমে গেলো। না নড়ে, না চড়ে; না পিছনে যায়, না আগে বাড়ে। গাড়ীর মালিক বিব্রত এবং অপ্রস্তুত। আমি কিন্তু মনে মনে প্রস্তুত! আল্লাহর যদি ইচ্ছা হয়, আমরা বিমান হারাই এবং হারানো স্বপ্নের কাছে ফিরে যাই তাহলে তো আলহামদু লিল্লাহ! আমার হৃদয় ও আত্মার আকুতি তো সেটাই। কারণ যদিও যুক্তির বিচারে চলে আসার সিদ্ধান্তে একমত ছিলাম, কিন্তু তাতে মনের সায় এবং হৃদয়ের সমর্থন মোটেই ছিলো না। একটি কাঁটা বারবার বিঁধছিলো মনের ভিতরে; ভুল করছি না তো! নিজের কিসমত নিজে বরবাদ করছি না তো!

এখন হঠাৎ নেমে আসা 'বিপদ' দেখে মনে হলো, হয়ত এটা আসমানের ইশারা। হয়ত আল্লাহর ইচ্ছা আবার আমাদের আল্লাহর ঘরে ফিরে যাওয়া। আমরা তো জানি না, গায়বের পর্দায় আমাদের জন্য কী লুকিয়ে আছে! আমরা জানি না, এক মুহূর্ত পর কী ঘটবে! তাকদীরের হাতে এমনই অন্ধ আমরা! অবশ্য এটাই বান্দার জন্য কল্যাণকর। তাকদীরের পর্দার আড়ালে থাকার হিকমত সম্ভবত এই যে, আল্লাহ চান, বান্দা সর্বদা আল্লাহর দয়া ও করুণা এবং রহমত ও কুদরতের উপর ভরসা করে চলুক। মানুষের জীবন তাকদীরমুখী না হয়ে যদি তাদবীরমুখী হতো, কিংবা অন্তত তাকদীর যদি মানুষের জানা থাকতো তাহলে আল্লাহর সাথে বান্দার এই যে প্রেম ও ভালোবাসা এবং আত্মসমর্পণ ও পরম নির্ভরতার সম্পর্ক তার কিছুই হতো না। আমাদের জীবন হতো মরুভূমির চেয়ে শুক্‌নো এবং পশুর চেয়ে অধম। এই যে এখন আমি থেমে যাওয়া গাড়ীর ভিতরে তাকদীরের অন্ধকারে ডুবে আছি আর আল্লাহকে ডাকছি; এই যে আমি অজানার এবং অনিশ্চয়তার দোলায় দুলছি, অথচ আমি জানি আমার আল্লাহ সব জানেন এবং আমার আল্লাহ তাই করবেন যাতে রয়েছে আমার কল্যাণ, এই পরম নির্ভরতার শান্তি ও প্রশান্তির কি কোন তুলনা আছে!

যাই হোক গাড়ী তো আর ঠিক হয় না! এদিকে সময়ও থেমে থাকে না! গাড়ীর মালিক ভাবছেন, খেদমতের নামে উল্‌টো আমাদের বিপদে ফেলা হয়েছে, তাই তার অস্থিরতা ছিলো স্বাভাবিক। গাড়ীর সামনের ঢাকনা খুলে কতক্ষণ কী দেখলেন, তারপর বললেন, ইঞ্জিন গরম, পানি 'খাওয়াতে' হবে। ইঞ্জিন পানি খায়, ইঞ্জিনকে পানি খাওয়াতে হয়, জানা ছিলো না। আমি শুধু জানতাম, ইঞ্জিনকে তেল 'খাওয়াতে' হয়।

কিন্তু কোথায় পানি এই মরুসাগরে! দয়াপরবশ হয়ে একজন গাড়ী থামালেন এবং আমাদের নাজেহাল অবস্থা শুনে বললেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই। এই সামনে জলাশয়, ঠেলে নিয়ে যাও, পানি পেয়ে যাবে।

পানি তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সময় যে পার হয়ে যাবে! অবশ্য এছাড়া উপায়ও তো নেই। সুতরাং নামো এবং ঠেলো। আমরা নামলাম। যে গাড়ী এতক্ষণ আমাদের টেনে এনেছে, সে গাড়ীকেই এখন আমরা ঠেলে নিয়ে চললাম। আমরা গাড়ী ঠেলছি, আর আমাদের পাশ দিয়ে শাঁ শাঁ করে গাড়ী ছুটে যাচ্ছে, সে বড় মনে রাখার মত অবস্থা!

অবশেষে জলাশয়ের দেখা পেলাম। ঠিক বাংলাদেশের জলাশয় নয়, মরুভূমির একটু ঢালু স্থান এবং সেখানে জমে থাকা কিছু পানি। রাস্তা থেকে বেশ কিছু দূরে, আবছা আবছা দেখা যায়। দু'টো তিনটে তাঁবুও দেখা যায়। আমাদের কোন প্রকার সুযোগ না দিয়ে গাড়ীর মালিক নিজেই গ্যালন হাতে ছুটলেন জলাশয়ের দিকে। আমরা শুধু তাকিয়ে আছি, মাওলানা হামীদুল্লাহ সাহেব ঘড়ির দিকে, আমি দূর আকাশের দিকে। দু'জনই ছটফট করছি পরবর্তী ঘটনার জন্য।

কিছুক্ষণ পর তিনি পানি নিয়ে ফিরে এলেন। জানা গেলো, তাঁবুগুলো দু'টি বেদুঈন পরিবারের। সঙ্গে রয়েছে তাদের মেষপাল। তারা পানি দিতে রাজি নয়। অনেক অনুনয় বিনয় করে আনা গেছে।

ভাবলাম, তবু তো ভালো মানুষ, বিনা যুদ্ধে পানি দিয়ে দিয়েছে! মরুভূমির বেদুঈন তো একসময় রক্ত দিয়ে পানি রক্ষা করতো। জলাশয়ের দাবী নিয়ে বেদুঈনদের গোত্রে গোত্রে কত যুদ্ধ হয়েছে তার কিছুটা আন্দায করা যায় আরব জাহিলিয়াতের কবিতায়। এখন অবশ্য সে অবস্থা নেই। তারপরো মরুভূমির জীবনে পানি অবশ্যই মূল্যবান। আর কোথাও হোক না হোক, 'পানির অপর নাম জীবন', এটা মরুভূমির চিরসত্য। সুতরাং মেহমান-সেবার এত দীর্ঘ সুখ্যাতি সত্ত্বেও কোন বেদুঈন পরিবার যদি তার দখলের পানি দিতে কার্পণ্য করে তাতে দোষের কিছু নেই। এক গ্যালন পানি না চেয়ে দু'টো ছাগল চাইলে বরং খুশি মনে তারা দিয়ে দিতো।

যাক, পানি ঢেলে ইঞ্জিনের মাথা ঠাণ্ডা করা হলো এবং গাড়ী চলতে শুরু করলো। এখন বড় চিন্তা হলো সময়। মাওলানা হামীদুল্লাহ সাহেব বারবার ঘড়ি দেখছেন। গাড়ীর মালিক তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, আল্লাহ চাহে তো কোন সমস্যা হবে না, আমরা সময় মতই পৌঁছতে পারবো।

কিন্তু আল্লাহ চাইলেন এবং সমস্যা হলো। ইঞ্জিন আবার গরম হলো এবং 'ঠাণ্ডা' হয়ে গেলো। তখন মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেবের মাথা এমন গরম হলো যে, আর ঠাণ্ডা হয় না। না হওয়াই স্বাভাবিক; ঘড়ির কাঁটা তখন সাতটা পার হয়ে গেছে। গাড়ীর মালিক বেচারা কাচুমাচু হয়ে বললেন, বুঝতে পারছি না কেন এমন হচ্ছে! এর আগে তো এমন 'ট্রাবল' দেখা দেয় নি। আমি বললাম, দেখুন আল্লাহর ইচ্ছার উপর কারো হাত নেই। আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি।

বেশ কিছুক্ষণ পর গাড়ী সচল হলো। অবশ্য ততক্ষণে একটা বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, আটটার পর ছাড়া বিমানবন্দরে পৌঁছার কোন সম্ভাবনা নেই। মাওলানা হামীদুল্লাহ্‌ ছাহেব বললেন, বিমানবন্দর পর্যন্ত অবশ্যই যাবো, তারপর যা হয় হবে।

পাম্পস্টেশনে গাড়ী থামে তেল নেয়ার জন্য, আমাদের গাড়ী থামলো পানি নেয়ার জন্য। কারণ আমাদের গাড়ীর তখন তেলের ক্ষুধা নেই, আছে পানির পিপাসা। গাড়ীর চালক এখন বেশ হুঁশিয়ার। পাম্পস্টেশনের সামনে গাড়ী থামাতে থামাতে বললেন, পাঁচ মিনিট দেরী হয় হোক, এখান থেকে পানি নিয়ে নেই, যদি পথে প্রয়োজন পড়ে! এবং কিছু দূর গিয়ে প্রয়োজন পড়লো তাও একবার নয়, দু'বার! শেষপর্যন্ত মাওলানা হামীদুল্লাহ্‌ ছাহেব আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারলেন না। তার কথায় গাড়ীর চালকের প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েই গেলো। বেচারা ভদ্রলোক কী আর করবেন! অপরাধীর মত নীরবে শুনে গেলেন। তিনি তো হযরত হাফেজ্জী হুযূরের উৎসর্গিতপ্রাণ মুরীদ, চেয়েছিলেন পীরযাদার খিদমত করে পীরের ফয়েয হাছিল করতে; কিন্তু এখন 'নেকি বরবাদ গোনাহ্‌ লাযিম' অবস্থা। তবু তিনি এমন কৃতার্থ ভাব দেখালেন, যেন পীরযাদার কটুবাক্যও তার জন্য দু'আবাক্য। মাঝখানে আমি পড়ে গেলাম বিব্রতকর অবস্থায়। আমার বড় মায়া হলো বেচারার জন্য।

দীর্ঘ পথ আরো দীর্ঘ হয়ে এক সময় তা ফুরোলো এবং আটটার অনেক পরে, নয়টার কিছু আগে আমরা বিমানবন্দরে পৌঁছলাম মোটামুটি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যে, বাংলাদেশ বিমান এখন ডানা মেলে নিশ্চয় আকাশে!

কিন্তু না, বাংলাদেশ বিমান বলে কথা! 'উনি' এখনো বিমানবন্দরের মাটিতে! কারণ 'ওনার'ও ইঞ্জিনে গোলমাল!

যাচ্ছেলে! কি ক্ষতি ছিলো অন্তত এবার সময় রক্ষা করে আকাশে উড়াল দিলে! আমি অন্তত আজীবন কৃতজ্ঞ থাকতাম আমাদের 'বলাকা'র কাছে!

জানা গেলো, পরিবর্তিত সময় হচ্ছে দশটা বিশ। পড়িমরি করে ছুটলাম নির্দিষ্ট কাউন্টারের উদ্দেশ্যে। সেখানে এরিয়ান ট্রাভেলসের কর্মকর্তা সুদর্শন আরব যুবক হাসতে হাসতে আমাদের পাসপোর্ট হাতে নিলো। হাসিটার তরজমা করলে এরকম দাঁড়ায়, 'যেমন দেশ তেমন বিমান, আর তেমনই তার যাত্রী।'

তরজমাটা অবশ্য এখন করলাম, তখন তো মনের অবস্থা ছিলো অন্যরকম।

যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যে বোর্ডিং কার্ড আমাদের হাতে এসে গেলো এবং সামান বেল্টে চলে গেলো। ছিলাম বাইতুল্লাহ্‌র মুসাফির, হয়ে গেলাম বাংলাদেশ বিমানের যাত্রী।

এত কষ্ট করে যিনি তার প্রায় অচল গাড়ীতে করে আমাদের পৌঁছে দিলেন তাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর আগে তিনি বরং আমাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন, তার কারণে আমাদের বিড়ম্বনা পোহাতে হয়েছে বলে! তো আমরা সানন্দে তার 'ত্রুটি' ক্ষমা করে কৃতজ্ঞতা জানালাম। তিনি বিদায় হলেন, আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম।

জীবনের পথে পথে এভাবে কত মানুষের সাথে আমাদের দেখা হয় এবং কত মানুষের কথা আমরা ভুলে যাই। আসলেই আমরা বড় অকৃতজ্ঞ। এ জীবনে কত মানুষের কত উপকার আমি গ্রহণ করেছি, কিন্তু ক'জনের কথা মনে রেখেছি! এই যে বারবার 'গাড়ীর চালক' বলছি, এর কারণ, ভদ্রলোকের নাম ভুলে গেছি। জীবনের দীর্ঘ পথে অনেকের কথা আমার মনে থাকা উচিত ছিলো, কিন্তু আমি ভুলে গেছি।

শৈশবের এক দুর্ঘটনায় একজন আমাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছিলেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। তিনি আমার 'আপন' কেউ নন, কিন্তু তার হাত ধরেই আমার আজকের এ জীবন।

যখন হিফযখানায় পড়ি, এক দুষ্ট ছেলের সঙ্গী হয়ে রেললাইন ধরে হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে মগবাজারে চলে গিয়েছিলাম। তখন রেললাইন ছিলো পলাশি হয়ে। ছেলেটি আমাকে একা ফেলে নিজের পথে চলে গিয়েছিলো।

রামাযান মাস ছিলো। ইফতারের সময় একা দাঁড়িয়ে কাঁদছিলাম। এক সহৃদয় ব্যক্তি আমাকে তার দোকানে এনে ইফতার করিয়েছিলেন, তারপর চকবাজারের দোকানে আব্বার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

জীবনে একবারই হয়েছিলো এঁদের সঙ্গে এবং আরো অনেকের সঙ্গে দেখা। কিন্তু আমি ভুলে গেছি তাদের প্রায় সকলের কথা। আমরা মনে রাখি না, আমরা ভুলে যাই। আল্লাহ তাদের সবাইকে খুশী রাখুন।

***

যাত্রীরা বিমানে ওঠা শুরু করেছেন। আমরা দ্রুত দু'রাকাত এশার নামায পড়ে নিলাম, তারপর বাসে উঠলাম। বাস বিমানের সিঁড়ির সামনে এসে থামলো এবং যথারীতি একটা হুড়াহুড়ি হলো। এই ভালো মানুষগুলোকে কে বোঝাবে যে, বাংলাদেশ বিমান এত সহজে আকাশে ওড়ে না! আমরা ঘণ্টাভর দেরী করেও বিমান ফেল করতে পারিনি!

ধীরে ধীরে সিঁড়ির ধাপগুলো অতিক্রম করলাম। বিমানের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শেষবারের মত বুকভরে গ্রহণ করলাম আরবের বাতাস, হিজাযের খোশবু। শেষবারের মত তাকালাম দূরের পাহাড়গুলোর দিকে। দেখা যায় না, তবু তাকিয়ে থাকলাম। হিজাযভূমিকে সেদিন শেষ মুহূর্তে যা দিয়ে আসতে পেরেছিলাম তা ছিলো দু'ফোঁটা চোখের পানি। এ দু'ফোঁটা চোখের পানি যে কত মূল্যবান ছিলো তা বুঝতে পেরেছিলাম কিছু দিন পর। যদি মনে থাকে তাহলে সে কথা পরে বলবো।

বিমান ঢাকায় অবতরণ করলো পরদিন সকাল ন'টায়। আমাদেরকে 'অভ্যর্থনা' জানাতে বিমানবন্দরে কেউ ছিলো না। থাকবে কেন? আমরা তো ছিলাম আল্লাহর ঘরের দীর্ঘ চারমাসের মুসাফির! সবাই তো জানেন, আমরা হজ্ব করে হাজী হয়ে দেশে ফিরে আসবো। সেই আমরা যে এখন ঢাকা বিমান বন্দরে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছি তা তো কারো কল্পনায়ও আসার কথা নয়।

দুপুরে বাসায় পৌঁছলাম এবং আম্মাকে, আব্বাকে চমকে দিলাম। আছরের পর মাদরাসায় গেলাম। হযরত হাফেজ্জী হুযূর নূরিয়ার মসজিদে ইতিকাফে আছেন। শুনলাম, আমাদের এভাবে ফিরে আসায় তিনি খুব ব্যথা পেয়েছেন এবং মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেবকে তিরস্কার করেছেন। তখন আর কী করবো! দুরু দুরু বুকে মসজিদে তাঁর খিদমতে হাযির হলাম। সালাম দিলাম, মুছাফাহার জন্য হাত বাড়ালাম। তিনি সালামের জওয়াব দিলেন, মুছাফাহা করলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। না ভালো, না মন্দ। এমন কঠিন মুহূর্তেই হয়ত মানুষ বলে, ধরণী হও! কিন্তু ধরণী দ্বিধা হলো না, আমিও নিজেকে লুকোবার কোন উপায় খুঁজে পেলাম না। অপরাধীর মত মাথা নীচু করে বসে থাকলাম অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে। আমার তখন পূর্ণ বুঝ হয়ে গেছে, জীবনের কত বড় ভুল করে এসেছি! নিজের হাতে নিজের সৌভাগ্যকে কীভাবে দাফন করে এসেছি!

হায়, হযরত যদি তিরস্কার করতেন; কঠিন কোন শাস্তি দিতেন; কিছুটা অন্তত সান্ত্বনা পেতাম; ভিতরের যন্ত্রণার কিছুটা অন্তত উপশম হতো। চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার হয়ে এলো। আশঙ্কা হলো, আমি সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো। ধীরে ধীরে আমি হযরতের ই'তিকাফের পর্দাঘেরা স্থান থেকে বের হয়ে এলাম। মসজিদের এক কোণে বসে শুধু চোখের পানি ফেলতে লাগলাম। গতকাল কোথায় ছিলাম, এখন আমার কোথায় থাকার কথা, অথচ এখন আমি কোথায়! কেন এমন হলো! এত বড় ভুল কেন করতে গেলাম! ভুল যখন বোঝার দরকার ছিলো তখন আমার বুঝ কোথায় ছিলো!

সেদিন ইফতারের আগে মুনাজাতে এমন কান্না এসেছিলো এবং চোখ থেকে অশ্রুর এমন ঢল নেমেছিলো, যা পুরো সফরে কখনো হয়নি। মুসাফির পথে পথে নিজেকে নিঃসঙ্গ ও অসহায় মনে করে, কিন্তু আমি যেন ঘরে ফিরে মুসাফিরের মত নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে গেলাম। নিজেকে মনে হলো লুণ্ঠিত কাফেলার সর্বহারা এক মুসাফির। মুনাজাতে দু'হাত তুলে চোখের পানিতে বুক ভাসালাম। হে আল্লাহ! বান্দার ভুল যত বড় হোক, গোনাহ তার যত গুরুতর হোক তোমার রহমতের দরজা এবং তাওবার দুয়ার তো কখনো বন্ধ হয় না! হে আল্লাহ, আমার ভুলের জন্য আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত। হে আল্লাহ, আমার গোনাহের জন্য আমি 'পাশীমান' ও শারমিন্দা। তুমি মাফ করো হে আল্লাহ! তুমি রহম করো হে আল্লাহ! অনুতপ্ত বান্দার তাওবা কবুল করো হে আল্লাহ!

***

সেদিন ঈদের চাঁদ উঠলো। মসজিদের ছাদে উঠে সবাই আনন্দ করে ঈদের চাঁদ দেখলো, আমিও দেখলাম, কিন্তু কোথায় নতুন চাঁদের আনন্দ!

আমার স্ত্রী তখন ছিলেন নূরীয়া মাদরাসার পশ্চিমে তার মায়ের বাড়ীতে। মাগরিবের পর খুব ভারাক্রান্ত মনে সেখানে গেলাম। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন দরজায় আমার

প্রতীক্ষায়। সেদিন অত বেদনার মাঝেও তাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কোলে সন্তান, মুখে মাতৃত্বের প্রভা! এ দৃশ্য তো পার্থিব নয়, স্বর্গীয়! এখনো সে দৃশ্য আমার মনে পড়ে এবং একটি কোমল মুগ্ধতা আমাকে স্পর্শ করে।

আমার বিপর্যস্ত চেহারা থেকে হয়ত তিনি অনেক কিছু আঁচ করে নিলেন। তাই কিছু না বলে, কিছু জিজ্ঞাসা না করে শুধু চোখের সজল দৃষ্টি দিয়ে হৃদয়ের গভীরে সমবেদনার পরশ বুলিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেদিন আমার হৃদয়ের বেদনা ছিলো অন্যকিছু। তাই এমন অন্তর্নিঃসৃত সমবেদনা যেন বেদনাকে আমার আরো রক্তাক্ত করে দিলো; আমি আরো বেদনার্ত হলাম।

কোলের সন্তানকে তিনি আমার হাতে তুলে দিলেন। কোলের সন্তান হলো চাঁদের টুকরো। আমি তাকে কোলে নিলাম, চুমু খেলাম, কিন্তু কোথায় শান্তি! কোথায় আনন্দ! কান্না যেন আরো উথলে ওঠে! অপরাধের অনুশোচনা যেন আরো তীব্র হয়!

ঈদের দিনে সবার মনে আনন্দের ঢেউ, আমার মনে শুধু কান্নার ঢেউ। কান্নায় তো বুকের ভার হালকা হয়, কিন্তু আমি যত কাঁদি বুক যেন আরো ভারী হয়, ভিতরের যন্ত্রণা যেন আরো তীব্র হয়। তাহলে আমি কি পাগল হয়ে যাবো! আমার যিন্দেগি কি বরবাদ হয়ে যাবে!

'লা তাকনাতূ মিররাহমাতিল্লাহ' এ আশ্বাসবাণী কি আমার জন্য নয়! যে যত বড় গোনাহগার, এ আশ্বাসবাণী তো তার জন্য তত জোরদার! না না, আমার আল্লাহর রহমত থেকে আমি নিরাশ হবো না। অবশ্যই এ রাত পোহাবে, আঁধার শেষে আবার ভোর হবে। সবুজ ঘাসের ডগায় আবার শিশির ঝলমল করবে। আবার আমি সজ্জিত হবো ইহরামের শুভ্র-সুন্দর সজ্জায়। সেই শুভলগ্ন আমার জীবনে আবার আসবে; অবশ্যই আসবে। কবে? আমি জানি না; আমার আল্লাহ জানেন।

***

পাহাড়পুরী হুযূরের সঙ্গে দেখা করলাম কিছুটা ভয়ে, কিছুটা নির্ভয়ে। তিনি তাঁর মত করেই আমাকে গ্রহণ করলেন। আফসোস করলেন, তিরস্কার করলেন এবং সান্ত্বনা দিলেন। তিনি বললেন, ভুল এবং অনুতাপ হলো আমাদের জীবনের আলো এবং অন্ধকার। ভুল করে আমরা অন্ধকারে পতিত হই, আবার অনুতাপের সিঁড়ি বেয়ে আলোর জগতে ফিরে আসি। সুতরাং অশ্রুজলের সিঞ্চনে জীবনের ভুল হতে পারে জীবনের ফুল। অদ্ভুত সান্ত্বনা এবং অদ্ভুত তার প্রশান্তি! কষ্টের মুহূর্তে মানুষের জীবনে খুব দরকার প্রিয় মানুষের মুখে এমন অন্তরঙ্গ কিছু সান্ত্বনার!

আব্বা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন মাদবর বাজার মসজিদে নামাযের পর মুছল্লিরা যখন একে একে বিদায় হলো, শুধু আব্বা ছিলেন আর আমি ছিলাম, তখন আব্বা বললেন, 'আল্লাহর ঘরের আদব রক্ষায় হয়ত তোমার কোন ত্রুটি হয়েছে। আল্লাহর ঘরে যাওয়া সহজ, অনেকেই যায়, কিন্তু আদব রক্ষা করা কঠিন। খুব কম মানুষই পারে আদব রক্ষা করতে। তবে আল্লাহ তাকেই সতর্ক করেন যাকে তিনি ভালোবাসেন। তুমি যদি কেঁদে কেঁদে চোখের পানি ফেলে ফেলে তাওবা করতে পারো

তাহলে আল্লাহর মাগফিরাতের চাদর অনেক প্রশস্ত। বাপ হিসাবে আমি সবসময় দু'আ করছি, আল্লাহ যেন তোমাকে মাফ করে দেন এবং কবুল করে নেন।'

এবার শোনো, মায়ের কাছে কী পেলাম! আমি আমার ছাত্রদের প্রায় বলে থাকি, 'দুনিয়াতে সন্তানের জন্য মা হলেন আল্লাহর রহমতের 'আঁচল'। তুমি যত বড় হও, কিংবা যত ছোট; তুমি যত ভালো হও, কিংবা যত মন্দ, মা শুধু জানেন তোমার মাথার উপর মমতার আঁচল ধরে রাখতে। দুর্ভাগা সন্তান অনেক সময় নিজের হাতে মাথার উপরের এই মমতার আঁচল ছিন্ন করে ফেলে। তারপরো মমতাময়ী মা সেই ছিন্ন আঁচলটুকু ধরে রাখেন সন্তানের মাথার উপর।'

প্রিয় পাঠক, তুমি যদি বিশ্বাস করো যে, আমি তোমার কল্যাণকামী তাহলে একটি উপদেশ শোনো, সারা জীবন মায়ের আঁচলের নীচে থাকার চেষ্টা করো। যতদিন তিনি বেঁচে আছেন চোখের পানি দিয়ে তাঁর পায়ের পাতা ভিজিয়ে রেখো, আর মৃত্যুর পর ভিজিয়ে রেখো তাঁর কবরের মাটি! তাহলে আল্লাহ তোমাকে চিরকাল সিক্ত করে রাখবেন তাঁর করুণার শিশিরে।

মায়ের মমতার আঁচল আমাকে সবসময় স্মরণ করিয়ে দেয়, মাতৃমমতা যার দান তিনি কত বড় মেহেরবান! তাঁর মায়া-মমতা কত অফুরান!

চৌদ্দশ বছর আগে মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক বেদুঈন মা বলেছিলেন আল্লাহর রাসূলকে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো আমার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারবো না, আল্লাহর মায়া আমার চেয়ে বেশী হলে কীভাবে পারবেন মানুষকে তিনি আগুনে জ্বালাতে!

সেই মায়ের কথায় আল্লাহর রাসূলের চোখে অশ্রু ঝরেছিলো। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, দেখো, আল্লাহ শুধু তাকেই শাস্তি দেন যে হঠকারিতা করে।

আরবের সেই বেদুঈন মাকে আমি দেখিনি, কিন্তু আমার মা তো সেই মমতাময়ী মা! পৃথিবীর সব মায়ের বুকেই তো রয়েছে সেই বেদুঈন মায়ের মমতা!

সেদিন আমার সীমাহীন অস্থিরতা ও যন্ত্রণার সময় মা আমার মাথার উপর মমতার আঁচল ধরে বলেছিলেন, মায়ের দু'আ আল্লাহ অবশ্যই শোনবেন। ইনশাআল্লাহ তুই আবার আল্লাহর ঘরে যাবি! তুই অনেকবার আল্লাহর ঘরে যাবি!

মনে হলো, এটা মায়ের কথা নয়, মায়ের মুখে এ যেন আসমানের কথা! এ যেন আসমান থেকে নেমে আসা সান্ত্বনা!

একদিন আমার কলিজার টুকরো ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে নিলাম, সে কেঁদে উঠলো। আমার কাছে তার কান্না সেদিন অন্য রকম মনে হলো। যা মনে হয়, সবসময় হয়ত তা সত্য নয়, তবে ক্ষতি কী তাতে যদি সান্ত্বনা হয়! তাছাড়া কিছু মনে হওয়া তো আল্লাহর ইশারা ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং যা মনে হয় তা বিশ্বাস করা অসঙ্গত কিছু নয়।

সেদিন আমার ছোট্ট মেয়ের কান্না আমার জন্য বয়ে আনলো অনেক সান্ত্বনা! মনে হলো তার কান্না আমারই জন্য; আমার ইহরামের সাদা লেবাসে যে দাগ পড়েছে তা মুছে ফেলার জন্য। আবেগে আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম, আদর করে চুমু

খেলাম। আশ্চর্য! তার কান্না থেমে গেলো! দু'চোখে অবাক চাহনি! ঠোঁট দুটিতে যেন জান্নাতের হাসি! আমার ছোট্ট মেয়ের সেদিনের সেই অবাক চাহনি এবং অপূর্ব হাসি আমি এখনো ভুলিনি, কোন দিন ভোলবো না। কারণ তার চোখের তারায় সেদিন আমি দেখতে পেয়েছিলাম কালো গিলাফের স্নিগ্ধতা! তার ঠোঁটের হাসিতে দেখতে পেয়েছিলাম আবে যামযামের ফোয়ারা!

আমার হৃদয়ে একটি বাগান আছে। সেই বাগানে একটি সাদা ফুল আছে। হৃদয়োদ্যানের সেই প্রস্ফুটিত পুষ্পের স্নিগ্ধ শুভ্রতা এবং পবিত্র সৌরভ, তাতেও আমার জন্য ছিলো অনেক শান্তি ও সান্ত্বনা। কিন্তু যখন নিজের দিকে তাকাই; নিজের মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা ও পাপপঙ্কিলতার কথা ভাবি, সব শান্তি ও সান্ত্বনা তখন হারিয়ে যায় হতাশার অন্ধকারে; তখন মনে হয়, এ জীবনে, এই পাপী চোখে হয়ত আর দেখা হবে না আল্লাহর ঘর।

হে মূর্খ জাহিল, জাবালে রাহমাতের ময়দান সেকি তোমার জন্য! পিতাপুত্রের কোরবানির পবিত্র ভূমি সেকি তোমার জন্য! আরাফার ময়দানে যুগে যুগে ঝরেছে যাদের চোখের পানি তারা কারা! ইবরাহীমের দাওয়াতে আখেরি নবীর অনুসরণে যুগে যুগে যারা লাব্বাইক বলেছেন, মুযদালিফার রাতে আহাযারি করেছেন এবং মিনায়, জামারায় আব্দিয়াতের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা কারা! তুমি কে?!

অথচ .. অথচ তোমাকেও ডাকা হয়েছিলো! দয়া করে তোমাকেও নেয়া হয়েছিলো! তুমি কী মর্যাদা রেখেছো সে ডাকের! সে দয়ার! কী হক আদায় করেছো ঘরের মালিকের সে দাওয়াতের?!

কোন্ মুখে তাহলে আবার তোমার এ আব্দার?! তুমি কি হকদার সে মর্যাদার?!

এভাবে কখনো আশায়, কখনো আশংকায় আমার দিন-রাত চলে যায়। রাতের অন্ধকার যেমন আসে তেমনি আসে দিনের আলো। সন্ধ্যায় যেমন সূর্যের অস্ত হয়, আগামী ভোরে তেমনি হয় সূর্যের উদয়। হৃদয়ের মেঘলা আকাশে কখনো দেখি রংধনু, কখনো শুধু কালো কালো মেঘ। স্বপ্নের ময়ূর কখনো পেখম মেলে, কখনো পেখম গুটিয়ে নেয়। দু'চোখ থেকে কখনো অশ্রু ঝরে, কখনো চোখের তারায় আশার আলো ঝিলমিল করে।

বিরহী হৃদয়ে মেঘ-রোদের আলো-ছায়ার এই যে আসা-যাওয়া তাতে কষ্টের মাঝেও শান্তি ছিলো, সান্ত্বনা ছিলো, কিন্তু যে বেদনা হৃদয়কে অবিরাম দগ্ধ করছিলো তা হলো হযরত হাফেজ্জী হুযূর-এর অসন্তুষ্টি, কিংবা মনোকষ্ট। সেই যে ই'তিকাফের শেষ মুহূর্তে মসজিদের পর্দাঘেরা 'খালওয়াতে' হাযির হলাম! না ছিলো শাসন, না ছিলো তিরস্কার! পবিত্র মুখমণ্ডলে ছিলো শুধু বেদনা ও বিষণ্নতার ছায়া, যা আমার জন্য ছিলো অসহনীয়। এ মুখমণ্ডলে আমি তো চিরদিন দেখে এসেছি শুধু স্নেহ-মমতার উদ্ভাস!

সেদিন সেখান থেকে সেই যে ফিরে এলাম 'তিরস্কারহীনতার' আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে, তারপর আর ডাক আসেনি, যা আগে কখনো হয়নি। এত দিন আমি গাফলতের পরিচয় দিয়েছি, তিনি বারবার ডেকেছেন, জানতে চেয়েছেন, 'কীভাবে ভুলে থাকো

এই বুড়োকে?! যখন বোঝবে তখন তো পাবে না, আমাকে?!' এভাবে আমি ভুলে থাকতাম, তিনি মনে রাখতেন, কাছে ডাকতেন, আদর করতেন এবং শাসন করতেন। তাঁর আদরে যেমন গলে যেতাম, শাসনে তেমনি বিগলিত হতাম।

কিন্তু এখন! এখন যে আর কোন ডাক আসে না! না সোহাগের, না শাসনের!

আমি বারবার যাই তাঁর খানকায়; কখনো দাঁড়াই বাইরে দরজার গোড়ায়, কখনো কামরার ভিতরে পর্দার আড়ালে। তারপর আর সাহসে কুলায় না; ফিরে আসি বেদনায় আরো বেশী ভারাক্রান্ত হয়ে।

নতুন করে ফুটলো ফুল

একদিন হঠাৎ শুনি খবর, শুরু হতে যাচ্ছে হযরতের হজ্বের সফর! সে খবর শুনে আমি কি আনন্দিত হলাম, কিংবা বেদনার্ত? জানি না কী হলাম! তবে আমি শুধু কাঁদলাম। কাঁদলাম, আর আকাশের দিকে তাকালাম। এমন কঠিন সময় যদি না থাকে আকাশের সান্ত্বনা তাহলে দুঃখে বেদনায় জর্জরিত মানুষ বাঁচতে পারে না। যখনই প্রয়োজন হয়, আমি তাকাই মেঘের উপরে নীল আকাশের শূন্যতায়। সেখানে আমার জন্য সান্ত্বনা থাকে, সবার জন্যই থাকে। শুধু খুঁজে নিতে হয় এবং অনুভব করতে হয়।

শুনলাম, হজ্বের আগে হযরত যাবেন ইরান সফরে, আর হজ্বের পর যাবেন ইরাক। সফরের উদ্দেশ্য, বলা হলো, দুই মুসলিম দেশের ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বন্ধের প্রয়াস চালানো।

আরো শুনলাম, সফরের পুরো আয়োজনে রয়েছেন আমাদের সফরের আমীর মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেব! তিনি এখন ভীষণ ব্যস্ত। আজ আসেন ইরানের রাষ্ট্রদূত, কাল আসেন ইরাকের। প্রতিদিন আনাগোনা পরিচিত অপরিচিত বহু মানুষের। তখন অনেক কিছু আমার কাছে পরিষ্কার হলো এবং আমার আফসোস ও অনুতাপ শতগুণে বেড়ে গেলো; তবে অপরাধী অন্য কাউকে নয়, নিজেকেই আমার মনে হলো।

যেদিন হযরত সফরে রওয়ানা হবেন তার আগের রাত্রে কীভাবে যেন সব ভয়-সংশয় দমন করে তাঁর সামনে হাযির হয়ে গেলাম। সালাম নিবেদন করে একপাশে বসে থাকলাম। হযরতের মোরাকাবার সেই নির্জন কক্ষে তখন শুধু তিনি, আর ..

বুক দুরু দুরু করছে। কিছু বলতে চাই, বলতে পারি না। ভিতরে শুধু কম্পন অনুভব করি। একসময় হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, মওলভী আবু তাহের ছাহাব, কুছ ফারমায়েঙ্গে?

অদ্ভুত সম্বোধন! তবু তো সম্বোধন! এবং কতদিন পর! চোখের পানি আর বাধা মানলো না। ঝাঁপিয়ে পড়লাম হযরতের কদমে। আমার বুক ভিজলো, ভিজলো হযরতের পাক কদম। চোখের পানির মূল্য আল্লাহর কাছে তো অপরিসীম, আল্লাহর পেয়ারা বান্দাদের কাছেও রয়েছে তার মূল্য। হযরত বুকে টেনে নিলেন। আমি শুধু অঝোরে কাঁদলাম, কেঁদেই গেলাম। আমার চোখের পানিতে এবার ভিজলো হযরতের বুক। হয়ত সেদিন তিনি তাঁর বুকে অনুভব করেছিলেন আমার চোখের পানির উষ্ণতা! কারণ হযরত তখন পরম মমতায় তাঁর হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন আমার মাথায়।

আমি শুধু বলতে পারলাম, হযরত! আর তো পারি না, আমাকে শাস্তি দিন, কিন্তু মাফ করে দিন।

মুখের শব্দগুলো চোখের পানিতে ভেজা ছিলো, হয়ত বা হৃদয়ের ক্ষত থেকে ঝরা রক্তেও ভেজা ছিলো। শব্দ যদি রক্তভেজা হয়, কিংবা অন্তত অশ্রুভেজা তাহলে তা

কম্পন আনে আল্লাহর আরশে। আর মুমিনের দিল যদি হয় আরশের মত তাহলে মুমিনের দিলেও অনুভূত হয় সে কম্পন।

হযরতের দিলে তখন শাফকাত ও মুহব্বতের কী ঢেউ উঠেছিলো তা তো দেখিনি, বুঝিওনি; শুধু অনুভব করলাম, তিনি আরো নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধরেছেন এবং ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

মুখে তিনি কিছু বললেন না, সবকিছু হলো নীরবে, নিঃশব্দে। তাঁর কলবের 'ধাড়কান' আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। আল্লাহর নেক বান্দার 'কলবের যবান' বোঝার সাধ্য কি আমার! শুধু বুঝলাম, এ কলবে এই অধমের জন্য এখনো আছে একটু 'নরম গোশা'।

বললাম, 'হযরত! কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে দু'আ করবেন, আল্লাহ যেন আমার সব ভুল মাফ করে দেন। মুলতাযামে বুক লাগিয়ে বলবেন, আল্লাহ যেন তার অবুঝ বান্দাকে আবার লাব্বাইক বলার তাওফীক দান করেন।'

হযরতের কাফেলা রওয়ানা হলো আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে। সে কাফেলায় শামিল ছিলেন মাওলানা হামীদুল্লাহ, ছিলেন আরো অনেকে; ছিলাম না শুধু আমি। এতে অবশ্য কারো দোষ নেই। যাদের ডাক এসেছে তারাই তো শামিল হবে কাফেলায়! যাদের নামে ডাক নেই তারা কিভাবে শামিল হবে! তারা শুধু চোখের পানি ফেলতে পারে, আর পারে রাতের তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে। তারকার ঝিলিমিলি ছাড়িয়ে আরো বহু দূর থেকে কোন অদৃশ্য আলোর ইশারা যদি পাওয়া যায়! সেই 'বহু দূর' চোখের দৃষ্টিসীমার বাইরে, কিন্তু হৃদয়ের দৃষ্টিসীমার বাইরে তো নয়!

সামন্য একটু কষ্ট অবশ্য হলো এজন্য যে, মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেবের সঙ্গে দেখা হলো না; না আমার পক্ষ হতে, না তার পক্ষ হতে। আশা করেছিলাম, যাওয়ার সময় তিনি কিছু সান্ত্বনার কথা বলবেন।

আশ্চর্য! এই একটি ভুল জীবনে আমরা বারবার করি। 'মাটির পুতুল', আমরা আশা করি তার কাছে কিছু পাওয়ার, যার না আছে দেয়ার ইচ্ছা, না আছে সাধ্য। আশা করি এবং নিরাশ হই। অথচ শান্তি ও সান্ত্বনার ডালি সাজিয়ে যিনি প্রতীক্ষায় আছেন আমার জন্য, কখন হাত পেতে দাঁড়াবো তাঁর দুয়ারে, তাঁর কথা আমরা ভুলে যাই!

লালবাগ থেকে রওয়ানা হয়ে হযরতের কাফেলা যখন চোখের আড়াল হলো তখন হৃদয়ের গভীর থেকে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হলো, আর হঠাৎ মনে হলো, আমি কেন বিমানবন্দরে যাবো না! কাফেলায় শামিল হতে পারি না, কাফেলাকে বিদায় জানাতেও কি পারি না!

আমার হযরত আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে বিমানে আরোহণ করবেন, বিমান আকাশে ওড়বে, রাতের আকাশে দূর থেকে বিমানের লাল আলো জ্বলবে, নিভবে; সে দৃশ্য তো আমি দেখতে পারি! বঞ্চিত ভিখারীর এ অসহায় দৃষ্টি যদি পছন্দ হয়ে যায় ঘরের মালিকের! যদি ফিরেশতারা সুফারিশ করেন! যদি রহমতের দরিয়ায় জোশ আসে! কুদরতওয়ালার কুদরতের কাছে অসম্ভব কী!

আল্লাহর শোকর, এমন একটি চিন্তা অন্তরে তখন উদিত হয়েছিলো, যার সুফল আমি হাতে হাতে পেয়েছিলাম। কোন কিছু আমরা নিজেরা কি চিন্তা করতে পারি?! পারি না, বরং অন্তরে বিভিন্ন চিন্তার উদয় ঘটিয়ে তিনিই আমাদের পথ দেখান, সবসময় যাকে আমরা ভুলে থাকি! একটি অদৃশ্য পর্দার অদৃশ্য আড়াল আছে বলে আমরা তাঁকে বুঝতে পারি না। যারা বুঝতে পারেন, অনেক সময় পর্দার আড়ালও সরে যেতে চায় তাদের সামনে থেকে।

কিছু দূর হেঁটে, কিছু দূর বাসে দাঁড়িয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। ভিতরে যাবো, সে ব্যবস্থা আমার কাছে ছিলো না। আল্লাহর এক বান্দা নিজে থেকে সাহায্য করলেন, আমি ভিতরে গেলাম। সামান্য একটু সাহায্য, কিন্তু আমার জন্য ছিলো অসামান্য। তাই তখনো তাকে অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম, এখনো তাকে স্মরণ করি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। তাকে চিনি না, তখনো চিনতাম না, কিন্তু তার উজ্জ্বল ছবি এখনো আছে আমার অন্তরে। তিনি যদি বেঁচে থাকেন, সুখের বৃক্ষ থেকে তার উপর যেন অসংখ্য ফুল ঝরে, কল্যাণের ফুল! যদি মৃত্যুবরণ করে থাকেন, রাতের আকাশ থেকে তার কবরে যেন শিশির ঝরে, করুণার শিশির!

***

কাফেলার লোকেরা দেখলাম ব্যস্ত চঞ্চল। কেউ কাগজপত্র নিয়ে ছোটাছুটি করছেন, কেউ খালি হাতেই এখানে আসছেন, ওখানে যাচ্ছেন। ভাগ্যবানদের দেখলেই চেনা যায়। তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালনেই থাকে সৌভাগ্যের স্ফুরণ।

মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেব ইরানী দূতাবাসের কর্মকতাদের সাথে কথা বলছেন। তাদের এই সময়ের ব্যস্ততায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা ভালো মনে হলো না। ব্যাকুল দৃষ্টিতে আমি শুধু খুঁজতে লাগলাম হযরত হাফেজ্জী হুযূরকে!

একসময় তাঁকে পেলাম এবং যে অবস্থায় পাবো, ধারণা ছিলো, সে অবস্থায়ই পেলাম; নিরিবিলি এক কোণে জায়নামাযে! এটা তাঁর চিরপরিচিত রূপ; নির্জনে যেমন তেমনি কোলাহলের মধ্যে; অবসরে যেমন তেমনি ব্যস্ততার ভিতরে।

'নামায আমার চক্ষুর শীতলতা'– এ বাণীর মর্ম কিঞ্চিৎ যদি উপলব্ধি করতে চাও তাহলে তোমাকে দেখতে হবে আল্লাহর এই বান্দার নামায-নিমগ্নতা। আমি যদ্দুর জেনেছি, হাদীছের মসনদ এবং নামাযের মুছল্লা, এর চেয়ে প্রিয় স্থান তাঁর জীবনে আর কিছু ছিলো না।

হযরতের খুব কাছে পিছনে গিয়ে বসলাম। বসে বসে দেখলাম তাঁর নামায; রুকু, সিজদা ও কিয়াম। নামাযের পরিবেশেই তো আমরা নামায পড়তে জানি না, তাই ভিন্ন পরিবেশে হযরতের নামায পড়া দেখতে থাকলাম। হায়, এ দেখা যদি শুধু চোখের না হয়ে, হতো কলবেরও দেখা! এ দেখা যদি নিছক অবলোকন না হয়ে, হতো হৃদয়ের অনুভব! তাহলে হয়ত আমার নামাযেও হতো কিছুটা প্রাণের সঞ্চার, আমার সিজদায়ও থাকতো শক্তির একটু জোয়ার!

নামায শেষ হলো এবং মুনাজাত শুরু হলো। আমার মনে হলো, এ এক অমূল্য সুযোগ! পিছনে বসে আমিও শরীক হলাম সেই মুনাজাতে। যারা দেখেছেন তারা জানেন, কেমন ছিলো হযরতের মুনাজাত! তিনি যখন দু'হাত তুলতেন তখন মুনাজাত ও কান্না হতো একাকার। তিনি মুনাজাত করতেন এবং কাঁদতেন; কাঁদতেন এবং মুনাজাত করতেন। এ মুনাজাত ছিলো আল্লাহর সমীপে বান্দার প্রকৃত আত্মনিবেদন, আবদিয়াতের চরম ও পরম প্রকাশ। তখন মনে হতো, বান্দার এমন আব্‌দার আল্লাহর দরবারে কবুল না হয়ে পারে না। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করলাম যে, তিনি তাওফীক দান করেছেন এখানে আসার এবং বাইতুল্লাহর এই মুসাফিরের আখেরি মুনাজাতে শরিক হওয়ার।

মুনাজাত শেষ হলো, আমি এগিয়ে মুছাফাহা করলাম। কিছু বলতে চাইলাম, কিন্তু উদ্গত কান্নার কারণে বলা সম্ভব হলো না। হয়ত তিনি আমার বলতে না পারা কথা বুঝলেন, তাই সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, তবে এতদিন যেমন তেমনি আজও কিছু বললেন না।

রাত একটায় হযরত যাত্রী এলাকার ভিতরে প্রবেশ করলেন। ইত্তেফাক পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক নাযিমুদ্দীন মোস্তান তাঁকে ইরান-ইরাক সফর সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন, কিন্তু তিনি তো তখন অন্য জগতে! হযরত শুধু নিয়মিত নামায পড়ার উপদেশ দিয়ে আগে বেড়ে গেলেন। সাংবাদিক মোস্তানের সেদিনের মন্তব্য আমার এখনো মনে পড়ে। হযরতের গমন পথের দিকে একদৃষ্টিতে অনেক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি বলেছিলেন–

'সঙ্গের লোকেরা তো যাচ্ছেন ইরান-ইরাক সফরে, কিন্তু তিনি যাচ্ছেন আরো অনেক দূরে। তাঁর জগত আমাদের থেকে অনেক ভিন্ন এবং আমাদের জগত অনেক নীচে।'

মোস্তান সাহেবের মন্তব্যে চমকে উঠলাম, অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আশ্চর্য! আমরা কাছের মানুষেরা কি তাঁকে এভাবে চিনতে পেরেছি?! তাঁর চারপাশে আমাদের দিনরাতের আচরণ এবং উচ্চারণ কী প্রমাণ করে?! আমার মনে হয়, শুধু এখানে নয়, সবখানে, দূরের মানুষেরা কাছের মানুষের চেয়ে বেশী চিনতে পারে এবং বেশী বুঝতে পারে। কারণ কাছের মানুষের সামনে কিসের যেন একটা পর্দা থাকে!

যতক্ষণ দেখা যায়, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম । একসময় তিনি চোখের আড়াল হলেন। আমি বিমানবন্দরের খোলা ছাদে দর্শকদের দাঁড়াবার স্থানে চলে এলাম। বোম্বাইগামী বিমান দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীরা বিমানে উঠতে শুরু করেছে। হযরতকে অস্পষ্টভাবে দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে উঠতে। তিনি বিমানের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হলেন। মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেবকেও দেখতে পেলাম। নিজের অজান্তেই বুকের ভিতর থেকে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হলো। ফারুক ভাইকে খুব বেশী করে মনে পড়লো। তিনি মহাভাগ্যবান। মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেবও ভাগ্যবান। দুর্ভাগা শুধু একজন।

ফারুক ভাই আল্লাহর ঘরের পড়শী, ইনি আল্লাহর ঘরের যাত্রী, আর আমি! 'আমি সাত সাগর পাড়ি দিয়ে সৈকতে পড়ে আছি'!

কিছুক্ষণ পর বিমান চলতে শুরু করলো, আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করলো। অশ্রু ছাড়া আর কোন সম্বল তো ছিলো না আমার!

না, ছিলো! আমার শেষ সম্বল ছিলো আকাশের অসীম শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকা। আমি তাকালাম আকাশের তারাগুলোকে ছাড়িয়ে সেই অসীম শূন্যতার দিকে। আমার ভিতর থেকে তখন বের হয়ে এলো এই নীরব আকুতি–

হে আল্লাহ! এখনো আমি আশা ছাড়িনি; কখনো আশা ছাড়বো না। এখনো হতাশ হইনি; কখনো হতাশ হবো না। আমি শুধু তাকিয়ে থাকবো তোমার রহমতের পানে এবং প্রতীক্ষা করবো তোমার কুদরতের স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশের।

বিমান আকাশে উড়লো এবং বহু দূর চলে গেলো। এখন শুধু লাল আলোর বিন্দুটুকু দেখা যায়; একসময় তাও মুছে গেলো। আমার সঙ্গে থাকলো শুধু আমার দীর্ঘশ্বাস।

হযরতকে যারা বিদায় জানাতে এসেছিলেন তাদের সঙ্গে গাড়ী ছিলো, তারা চলে গেলেন। আমিও তাদের সঙ্গে যেতে পারতাম, কিন্তু গেলাম না; এমনকি নাযিমুদ্দীন মোস্তানের অনুরোধও রক্ষা করলাম না। বাকি রাতটুকু পড়ে থাকলাম বিমানবন্দরে নামায পড়ার ছোট্ট জায়গাটিতে। একাকিত্ব ও অসহায়ত্বের এক অদ্ভুত অনুভূতি ছিলো তখন আমার সঙ্গী।

***

আশা ও প্রত্যাশা এবং সংশয় ও নিরাশার মাঝে আরো ক'টা দিন পার হলো। আশা ও প্রত্যাশা হলো আল্লাহর রহমতের এবং কুদরতের; নিরাশা ও সংশয় হলো উপায়হীনতার এবং অসহায়ত্বের।

যিলকদের সম্ভবত চৌদ্দ তারিখ। সারাদিন সবক পড়িয়ে আমি ক্লান্ত শ্রান্ত এবং অবসাদগ্রস্ত। দেহের অবসাদ এবং মনের বিষণ্নতা যখন একত্র হয় তখন বিপর্যস্ততার চূড়ান্ত হয়। তেমনই বিপর্যস্ত অবস্থা ছিলো তখন আমার। এমন সময়, হাঁ, ঠিক এমন সময় হযরতের ছোট ছাহেবযাদা মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেব ডেকে পাঠালেন। তিনি মাদরাসার নায়েব মুহতামিম এবং হযরত হাফেজ্জী হুযূরের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম। আল্লাহ তার কল্যাণ করুন, তিনি আমাকে ডেকেছিলেন আমারই সৌভাগ্যের জন্য, কিন্তু আমি বিরক্ত হলাম অবসাদ ও বিষণ্নতার কারণে। শরীরটাকে জোর করে টেনে নিয়ে দফতরে হাযির হলাম। চিরকাল তার মুখে যেন ফুলের সুবাস থাকে, তিনি বললেন, আপনি যদি হজ্বের সফরে যেতে চান তাহলে তার ব্যবস্থা হতে পারে।

শরীরে বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে যাওয়ার কথা শুনেছি, আজ অনুভব করলাম। হাঁ, আমার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেলো। কী বলছেন এই ভালো মানুষটি! তিনি যা বলছেন আমি তাই শুনছি তো! আমি যা শুনছি তিনি তাই বলছেন তো! বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো যে, এটা স্বপ্ন নয়, সত্য; কল্পনা নয়, বাস্তব।

আবার তিনি আমার কানে মধু বর্ষণ করলেন। মধু বর্ষণ ছাড়া আর কী বলতে পারি! বাংলাভাষায় এর চেয়ে সমৃদ্ধ শব্দ আর কী হতে পারে!

আবেগের উচ্ছ্বাসে আমার তখন বাকরুদ্ধ অবস্থা; শুধু বলতে পারলাম, আলহামদু লিল্লাহ!

তিনি মৃদু হেসে বললেন, তাহলে চলুন আমার সঙ্গে। চললাম। জিজ্ঞাসা করার কথা মনেও হলো না, কোথায় এবং কার কাছে! কারণ আমি তখন স্বপ্নের ঘোরে। আমি তখন মক্কার পথে পথে এবং মদীনার গলিতে গলিতে বিচরণ করতে শুরু করেছি।

নূরিয়া থেকে পায়ে হেঁটে খেয়াঘাট, খেয়া পার হয়ে আরো কিছু দূর পায়ে হেঁটে এবং রিকশায় করে কিল্লার মোড়ে খেলাফত দফতর। সেখান থেকে গাড়ীতে করে রওয়ানা হলাম, কোন দিকে তা জানা ছিলো না।

আমি হয়ত স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম, যখন মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেব বললেন, নামুন আমরা এসে গেছি; তখন দেখি, আমাদের গাড়ী থেমেছে লিবিয়ার দূতাবাসের সামনে। আমি তো অবাক! জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কী জন্য?! তিনি বললেন, লিবীয় দূতাবাস থেকেই এসেছে আমাদের হজ্বের দাওয়াত। আমাদের চারজনের টিকেট ভিসা হয়ে গেছে। মাননীয় রাষ্ট্রদূত দুপুরে ফোন করে বললেন, তিনি আপনাকেও দাওয়াত দিতে চাচ্ছেন।

আমার স্বপ্নের বেলুন যেন ফুলে ওঠে আবার ফুটো হয়ে গেলো। দপ করে জ্বলে ওঠা আশার প্রদীপ যেন দপ করেই নিভে গেলো। লিবিয়া মুসলিম দেশ, কিন্তু তার রাষ্ট্রীয় আদর্শ হলো সমাজতন্ত্র। লিবিয়ার নেতা গাদ্দাফী সম্পর্কে আমার মনোভাব ছিলো চরম নেতিবাচক, (এখনো তাই)। এ ভদ্রলোক হাদীছ ও সুন্নাহকে অস্বীকার করেন এবং কোরআনকে শরীয়াতের একমাত্র উৎস বলে দাবী করেন। নাদওয়াতুল উলামা লৌখনো থেকে প্রকাশিত আল-রাঈদ এবং আলবা'ছুল ইসলামী পত্রিকায় গাদ্দাফীর মতবাদের কঠোর সমালোচনা করে তাকে বলতে গেলে মুরতাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এমন একটি দেশের অর্থানুকূল্যে হজ্বের সফর করা আমার কাছে অসঙ্গত মনে হলো। আরো মনে হলো, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে কঠিন পরীক্ষা এবং এ পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হতে হবে; ছবর ও ধৈর্যের সাথে আমাকে আরো অপেক্ষা করতে হবে।

মনে পড়লো হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবী (রহ)-এর ঘটনা। ১৯৬২ সনে নাদওয়াতুল উলামার পক্ষ হতে তিনি কুয়েত সফরে ছিলেন। হজ্বের মৌসুম ছিলো, আর তাঁর অন্তরে ছিলো হজ্বের বে-ইনতিহা শাওক ও তামান্না। প্রথম হজ্ব করেছেন, দীর্ঘ এগার বছর হয়ে গেছে। এরপর আল্লাহর ঘর যিয়ারাতের ডাক আর আসেনি। তিনি তখন এ আশংকায় সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, হয়ত হজ্বের সফরে আদবের খেলাফ কিছু ঘটেছে, যার কারণে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত থেকে মাহরূমি নেমে এসেছে।

এই যখন মনের অবস্থা তখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর কাছে সউদী হজ্বমন্ত্রীর ব্যক্তিগত দাওয়াত এসে পৌঁছলো যে, আপনি তো কুয়েত পর্যন্ত এসে গেছেন! এখন

আমার মেহমান হয়ে হজ্ব করে যান। এ দাওয়াত কবুল করলে আমি শোকরগুজার হবো।
হযরত আলী নদবীর সফরসঙ্গীরা এ দাওয়াতকে গায়বী মদদ মনে করে খুব আনন্দিত হলেন, কিন্তু তিনি ভাবলেন অন্যকিছু। আল্লাহর নেক বান্দাদের নযর থাকে ঘটনার বাইরে নয়, ভিতরে। সেই ভিতরের দিকে নযর রেখে সফরসঙ্গীদের তিনি বুঝিয়ে বললেন, মনে হয়, এটা আল্লাহর পরীক্ষা। আমি এটা পছন্দ করি না যে, আল্লাহর ঘরে যাবো আল্লাহর কোন বান্দার ইহসান ও অনুগ্রহের বোঝা মাথায় করে। আমার তো বিশ্বাস, আমার আল্লাহ আমার জন্য গায়ব থেকে কোন ইন্‌তিযাম করবেন।
এভাবে চিন্তা করে তিনি সউদী হজ্বমন্ত্রীর দাওয়াত বিনয়ের সাথে ফিরিয়ে দিলেন।
হযরত আলী নদবী বলেন, 'এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা এমন সম্মানজনক রাস্তা খুলে দিলেন যে, এখন প্রায় প্রতিবছর আমার হজ্ব নছীব হয়, এমনকি কোন কোন বছর একাধিকবার বাইতুল্লাহ যিয়ারাতের তাওফীক হয়।'
আমি ভাবলাম, হযরত আলী মিয়াঁর সামনে ছিলো একজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দাওয়াত, যা গ্রহণ করা তিনি সঙ্গত মনে করেননি; অথচ এখানে তো লিবিয়ার মত একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের দাওয়াত; এটা গ্রহণ করা কীভাবে সঙ্গত হতে পারে!
আমার আরো মনে পড়লো মরহূম কবি ফররুখ আহমদের কথা। তিনি আমার আদর্শ কবি। আমি মনে করি, তাঁর জগতে তিনি এক মর্দে মুজাহিদ। তাই অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি এবং তাঁর কবিতা থেকে আদর্শের প্রেরণা গ্রহণ করি।
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান একবার একদল কবি-সাহিত্যিককে সরকারিভাবে হজ্ব করার দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাতে নাম ছিলো ফররুখেরও। আমার প্রিয় কবি কী করলেন?! তিনি এই বলে সরকারী দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলেন, আল্লাহর ঘর যিয়ারাত করবো, যদি তাওফীক হয়, নিজের খরচে, সরকারের দয়ায় সরকারী খরচে নয়। আল্লাহর ঘর যিয়ারাতের সুযোগ কবি ফররুখ আহমদের কখনো আর হয়নি, তবে মৃত্যুর পর তিনি একটি অভাবনীয় মর্যাদা লাভ করেছিলেন। যখন তাঁকে কাফন পরানো হচ্ছে তখন নূরানী চেহারার সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তি সেখানে হাযির হলেন এবং একশিশি আতর দিয়ে বললেন, এ আতর মদীনা শরীফ থেকে এসেছে কবির জন্য। এ আতর মেখে কবিকে কবরে শোয়াবেন। এ কথা বলে সেই নূরানী চেহারার মানুষটি বিদায় হলেন। আগে বা পরে কেউ তাঁকে আর দেখেনি। হয়ত এটা ছিলো আল্লাহর পক্ষ হতে কবির সেই ঈমানি গায়রতেরই পুরস্কার।
এদু'টি ঘটনা এবং আরো কিছু ঘটনা স্মরণ করে অন্তরের বেদনা এবং হৃদয়ের সুতীব্র দহন সত্ত্বেও আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, যথাযোগ্য বিনয়ের সাথে অপারগতা প্রকাশ করবো। আল্লাহ তো অসীম কুদরতের অধিকারী, তাঁর খাযানা তো অফুরন্ত। অবিলম্বে, কিংবা সবিলম্বে অবশ্যই তিনি আমাকে ডাকবেন এবং অন্য কোন ইন্‌তিযাম করবেন, যাতে দ্বীনী গায়রাতের, কিংবা আত্মমর্যাদার প্রশ্ন নেই।

মাননীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সৌজন্য বিনিময়ের পর তিনি বললেন, তোমার সম্পাদনায় বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের জন্য প্রকাশিত আরবী পত্রিকা 'ইক্‌রা' আমি দেখেছি। এদেশে আরবী ভাষার সেবায় তোমার যে মূল্যবান অবদান সে জন্য আমি অত্যন্ত প্রীত। আমি চাই, লিবিয়া সরকারের পক্ষ হতে তুমি এবছর হজ্বের সফর করো।

আমার জীবনে সেটা সত্যি কঠিন এক মুহূর্ত ছিলো। একদিকে হৃদয়ের আবেগ, একদিকে বিচার-বিবেক। একবার ভাবি, বঞ্চনার নিরন্তর যন্ত্রণা ভোগ করার পর নেমে আসা সৌভাগ্যের সুযোগ নিজের হাতে ঠেলে দেবো! একবার ভাবি, ঈমান ও বিশ্বাসের প্রশ্নে গায়রাত পরিত্যাগ করবো? এটা কি আল্লাহর পছন্দ হবে? আল্লাহ কি সন্তুষ্ট হবেন?

মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মুছে ফেলে মাননীয় রাষ্ট্রদূতকে আমি বললাম, আমার মত সাধারণ তালিবে ইলমের প্রতি আপনার যে আন্তরিকতা সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং এ দাওয়াত পেয়ে আমি গৌরবান্বিত। তবে অনিবার্য কিছু অসুবিধার কারণে চিন্তা করার জন্য আমার কিছু সময়ের প্রয়োজন।

মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেবকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম বিনিময় দান করুন। আমি যা বলেছি তা তিনি আশা করেননি; তবু মনঃক্ষুণ্ণতা প্রকাশ করেননি, বরং বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, আমি ভুল করছি।

হাঁ, বড় ধরনের ভুলই ছিলো সেটা আমার। কারণ এত কিছু হলো, কিন্তু একবারও মনে পড়লো না পাহাড়পুরী হুযূরের কথা! শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু করলাম নিজে নিজেই করলাম! মানুষ যখন নিজের বুদ্ধিতে চলে তখন এমনই হয়। ভুলের পর ভুল করে যায়, আর ভাবে, ঠিক পথেই সে চলেছে। এটা হলো, শয়তানের নূরানী অস্ত্র। কামিল রাহবারের রাহবারি ছাড়া শয়তানের নূরানী অস্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়া সত্যি কঠিন।

আমার কর্তব্য ছিলো পাহাড়পুরী হুযূরকে বিষয়টি জানানো এবং তাঁর কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া, কিন্তু যে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিলাম আল্লাহর ঘর থেকে চলে এসে, সেটারই পুনরাবৃত্তি করলাম এখন হজ্বের দাওয়াত ফিরিয়ে দিয়ে। ফোনে যখন মাননীয় রাষ্ট্রদূতকে আমার অপারগতার কথা জানালাম, তিনি কিছুটা আহত হলেন, বললেন, দেখো, এটা ছিলো আমার আন্তরিক ইচ্ছা, এখন তোমার সিদ্ধান্তের উপর আমার কিছু বলার নেই।

মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেবের কথা ভেবে অবশ্য খুব খারাপ লাগছিলো। কারণ তিনি আমার বেদনা বুঝতে পেরেছিলেন এবং আমার দুর্ভাগ্য দূর করতে চেয়েছিলেন। তার আন্তরিক ইচ্ছা ছিলো, যে কোন উপায়ে আমার যেন আল্লাহর ঘরে যাওয়া হয়। এবারের হজ্বের জামাতে আমার সফরসঙ্গীদ্বয়ের সঙ্গে আমার নামও যেন লেখা হয়। এটা ছিলো আমার প্রতি তার নিছক আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতা, অন্য কিছু নয়। আমার সিদ্ধান্তে তাই তিনি মর্মাহত হলেন এবং সে জন্য আমারও খুব খারাপ

লাগছিলো। তার শুভকামনার কথা যখনই মনে পড়ে, হৃদয় আপ্লুত হয় এবং আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করি। আল্লাহ তাকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

সিদ্ধান্ত তো নিয়ে নিলাম এবং মাননীয় রাষ্ট্রদূতকে তা জানিয়েও দিলাম। কিন্তু মনের ভিতরে একটা কাঁটা খচ খচ করে বিঁধতে লাগলো এবং থেকে থেকে এই ভাবনা পেরেশান করতে লাগালো, ভুল করছি না তো! পরে আবার পস্তাতে হবে না তো!

***

অবশেষে মনে পড়লো আমার করণীয়। মাগরিবের পর পাহাড়পুরী হুযূরের খিদমতে হাযির হলাম। তিনি তখন নূরিয়া মাদরাসার খানকাহর দোতালার একটি কামরায় অবস্থান করতেন। হযরত হাফেজ্জী হুযূর-এর দরবারে যারা আসতেন আত্মশুদ্ধির পাঠ ও দীক্ষা গ্রহণের জন্য, তাছাওউফের পরিভাষায় যাদের বলা হয় 'সালিকীন', তাদের জন্য মসজিদের উত্তর দিকে খুব নিরিবিলি পরিবেশে দোতালা ও তিনতালায় কতগুলো ছোট ছোট কুঠুরি ছিলো; একজনের থাকার উপযোগী, যাতে প্রত্যেকে নির্জনতার মাঝে আত্মশুদ্ধির সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। কামরাগুলো ছিলো পূর্ব-পশ্চিম দুই সারিতে এবং উপরের তালায় উঠতে হতো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। নির্জনবাসের অত্যন্ত উপযোগী পরিবেশ ছিলো সেটা। এখন হযরত হাফেজ্জী হুযূর নেই, খানকাহও পড়ে আছে বিরান। এমন কোন বিরান ভূমি দেখেই হয়ত কবি বলেছেন ব্যথিত হৃদয়ের যন্ত্রণাকে বিগলিত করে–

বুলবুলি নেই বাগানে কে গাইবে বলো বসন্তের গান!/ ঝরা ফুল, শুকনো গাছের শোকে কাঁদে যে বাগানের প্রাণ!

পাক-ভারত উপমহাদেশে রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার একসময়ের প্রাণকেন্দ্র এমন বহু খানকাহ এভাবে আজ বিরান পড়ে আছে। সে বড় বেদনাদায়ক কাহিনী। কলমের মুখে এসে গেলো, তাই কথাগুলো এখানে লিখে রাখলাম। কারণ আমাদের বর্তমান প্রজন্মের কাছে খানকাহ এবং খানকাহর আত্মশুদ্ধির জীবন এখন একেবারে অপরিচিত। হয়ত আমার এক'টি কথা কারো অন্তরে জাগ্রত করবে নতুন ভাবনা ও নতুন চেতনা। কবি তো বলেছেন–

'একটি কাঠি জ্বেলে দেয় প্রদীপ, আলোকিত করে ভবন/ প্রদীপ হতে প্রদীপ জ্বলে আলোকিত হয় ভুবন।'

ফিরে আসি আগের কথায়। পাহাড়পুরী হুযূর বেশ কিছু দিন থেকে খানকাহর একটি কামরায় অবস্থান করছিলেন। আমি তার খিদমতে হাযির হলাম এবং সব ঘটনা খুলে বললাম। ঘটনা বলছি, আর তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে চলেছে। চিরকালের শান্ত কোমল আমার প্রিয় উস্তাযের সেদিন দেখলাম অন্য এক রূপ। এমন কঠিন শব্দের তিরস্কার তাঁর মুখে আগে বা পরে আর কখনো শুনিনি।

যেদিন আব্বা আমাকে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেদিন থেকে তিনি আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করেন। এ অদ্ভুত সম্বোধনের উদ্দেশ্য ও রহস্য এখনো আমি ঠিক বুঝতে পারি না। সেদিনও তিনি 'আপনি' সম্বোধন করলেন, কিন্তু সেই 'আপনি' ছিলো

অন্যরকম। তিনি বললেন, আপনার মত নির্বোধ আমি আর দেখিনি। এভাবে নিজের মতে চলতে থাকলে আমার তো আশংকা হয় ....

মাওলার পক্ষ হতে বারবার সুযোগ আসছে, আর বান্দা 'নখরা' করে চলেছে! ....

তারপর হুযূর বললেন সেই ঐতিহাসিক বাক্যটি যা এখনো আমি আমার ছাত্রদের খুব স্বাদ গ্রহণ করে করে শোনাই। তিনি বললেন, আল্লাহর ঘরে আপনার এভাবে থাকা পছন্দ না, ওভাবে যাওয়া পছন্দ না, তো আল্লাহ কি আপনাকে দুলহা সাজিয়ে পালকিতে চড়িয়ে নেবেন!

আপনি কি জানেন, হযরতের দিলে কত বড় 'ছাদমা' হয়েছে! এবং আল্লাহর কত বড় নারাযি আপনি ডেকে আনছেন?!

হুঁশ হওয়ার জন্য এত 'বকুনি'র প্রয়োজন ছিলো না, কিন্তু হুযূর তখন ছিলেন অন্য হালাতে। কারণ তিনি তাঁর এই ছাত্র থেকে এমন মূর্খতা আশা করেন নি। লজ্জায়, অনুশোচনায় আমি তখন পানি পানি। কাতর কণ্ঠে বললাম, হুযূর! বোকামি তো করেই ফেলেছি, এখন উপায়? আমি কি একবার চেষ্টা করে দেখবো? বান্দার জন্য আল্লাহর রহমতের দুয়ার তো কখনো বন্ধ হয় না!

হুযূর তখন কোমল হয়ে বললেন, অবশ্যই চেষ্টা করেন। দু'আ করি, আল্লাহ যেন ভুল সংশোধনের সুযোগ দান করেন।

***

সারাটা রাত নির্ঘুম কেটে গেলো। কীভাবে কী হবে বুঝে আসছে না। ভিসা প্রদানের শেষ তারিখ আগামীকাল এবং ফ্লাইট দুপুর দু'টোয়, এদিকে আমার অবস্থা 'শূন্য'!

ফজরের পর মাদবরের বাজার মসজিদে অনেক্ষণ আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করলাম। এমন মুনাজাত জীবনে খুব কমই নছীব হয়েছে। চোখের পানি যেন ছিলো কলিজার গলিত রূপ।

ছোট্ট মেয়েটি এখন হাসে এবং অবাক চোখে চেয়ে থাকে। তাকে কোলে নিলাম, চুমু খেলাম, আর বললাম, হে আল্লাহ, আমি এই মাসুম মেয়েটির বাপ, এর ওছিলায় আমাকে মাফ করো, আমার রাস্তা খুলে দাও।

আম্মা-আব্বার দু'আ সম্বল করে বিসমিল্লাহ বলে রওয়ানা হলাম। আমার সব ভাই আমার প্রিয়, তাদের মাঝে বশির আরো প্রিয় তাকে বললাম, ব্যাগে করে আমার ইহরামের লিবাস এবং জামাকাপড় নিয়ে তুমি বিমানবন্দরে যাও, আল্লাহ যদি কবুল করেন তাহলে তো সামনে.., আর ..!

লিবীয় দূতাবাসে যখন পৌঁছলাম তখন নয়টা এবং মাননীয় রাষ্ট্রদূত অনুপস্থিত। হায় আল্লাহ! তিনি এলেন দশটার কিছু আগে। আমার কোন পূর্বনির্ধারিত সময় ছিলো না। সেখানে বামপন্থী মহলের চিন্তাপুরুষ মরহূম আহমদ ছফা ছিলেন এবং তার এ্যাপয়েনমেন্ট ছিলো প্রথম। বোধগম্য কারণেই লিবীয় দূতাবাসের সাথে আহমদ ছাফাদের তখন বেশ ঘনিষ্ট সম্পর্ক। তারপরো মাননীয় রাষ্ট্রদূত সবার আগে আমাকে ডাকলেন। আমি সালাম দিয়ে কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই বললাম, দেখুন, আমি ভুল

করেছি; আপনার দাওয়াতকে অসম্মান করেছি। এখন আমি কি ভুল সংশোধনের সুযোগ পাবো?

একজন রাষ্ট্রদূতের অহমিকা নিয়ে তিনি বলতে পারতেন, সুযোগ বারবার আসে না। কিংবা সুযোগ দিলেও তিরস্কারের ভাষায় কথা বলতে পারতেন। কিন্তু না, তিনি আমাকে বিদায়ও করলেন না, তিরস্কারও করলেন না। তিনি ছিলেন আরব রক্তের অধিকারী। সুতরাং আরবীয় আভিজাত্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি বললেন, বলো কি! এ তো আমার জন্য এবং আমার দেশের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়! তোমার টিকেট ও ডলার আমি রেখে দিয়েছি। তুমি যদি রাযি হও তাহলে হজ্বের পর আমার দেশও দেখে আসো, এটা আমি চাই।

আনন্দের আতিশয্যে প্রায় কেঁদে ফেললাম। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যতগুলো শব্দ জানা ছিলো, তাঁকে বললাম, আর বললাম, ইন্‌শাআল্লাহ পরবর্তী সুযোগে তোমার দেশে যাবো; তোমার দেশ তো আমারও দেশ! তবে এখন শুধু হজ্বের সফরে যেতে চাই।

মাননীয় রাষ্ট্রদূতের হাতে চুমু খেয়ে টিকেট নিলাম। এক হাজার ডলার ছিলো, আমি দু'শ ডলার নিয়ে বললাম, এতেই রাহা খরচ হয়ে যাবে। তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, বললেন, তোমার যেমন ইচ্ছা!

আলী আলগাদামসীর পরে তিনি রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছিলেন। গাদামসীর সঙ্গে আমার পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা ছিলো। পটিয়া মাদরাসায় আমি যখন শেষ বর্ষের ছাত্র তখন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং ছাত্রদের পক্ষ হতে আমি তাকে সংবর্ধনা ও মানপত্র দিয়েছিলাম। সেই থেকে পরিচয় এবং পরবর্তীতে অন্তরঙ্গতা। এই রাষ্ট্রদূতের নাম আলী হোসাইন। তার সঙ্গে কোন পরিচয় ছিলো না। একবার শুধু হযরত হাফেজ্জী হুযূর এবং তার মাঝে আমি দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেছিলাম। অথচ আমার প্রতি তার অনুগ্রহ ছিলো এই।

জানি না এখন তিনি কোথায়, কী অবস্থায় আছেন! যেখানেই থাকুন, মাটির উপরে এবং মাটির নীচে আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন। তার অনুগ্রহের কথা আমি কখনো ভোলবো না।

এরপর ভিসার প্রশ্ন। তখন বাজে দশটা। ছুটলাম সউদী দূতাবাসের উদ্দেশ্যে। বহু বছর হলো সউদী দূতাবাসে (এবং অন্য কোন দূতাবাসে) যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, তাই এখনকার অবস্থা ঠিক বলতে পারবো না; তখন সউদী দূতাবাসের অবস্থা ছিলো এই যে, দারোয়ান থেকে গাড়োয়ান এবং চাপরাশি থেকে অফিসার সবক'টি বাঙ্গালী এমন একটি দলের অনুগত যারা মনে করে, ইকামাতে দ্বীনের জন্য তারাই 'ভগবানের' একমাত্র নির্বাচিত দল এবং এ দেশের আলিম সমাজ হলো তাদের পথের কাঁটা।

দূতাবাসের প্রধান ফটকে এসে 'দারোয়ান সাহেব'কে যখন যথাযোগ্য বিনয়ের সাথে উদ্দেশ্যের কথা জানালাম, তিনি 'ভিসার সময় শেষ' বলে পত্রপাঠ আমাকে নাকচ করে দিলেন এবং আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো।

কিন্তু আল্লাহ যখন সাহায্য করেন বান্দা তখন সঠিক পথ অনুসরণ এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ফলে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও, যখন সামনে কোন পথ খোলা থাকে না, কীভাবে যেন পথ খুলে যায় এবং মানযিল দেখা যায়। কাজ তো হয় পর্দার আড়ালে গায়বের ইশারায়, কিন্তু বান্দা পড়ে যায় বুদ্ধি-কৌশলের ধাঁধায়। দৃষ্টি তার চলে যায় আত্মযোগ্যতা ও কর্মকুশলতার দিকে। একবারও সে ভাবে না, অনুকূল অবস্থায়ও তো তার বুদ্ধি-কৌশল বহুবার ব্যর্থ হয়েছে! অবশ্য প্রকৃত সত্য যাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তারা লুটিয়ে পড়ে সিজদায় এবং বিগলিত হয় কৃতজ্ঞতায়। তবে আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন–

'আমার বান্দাদের মাঝে কৃতজ্ঞ খুব অল্পই আছে।'

যাই হোক, আল্লাহ আমাকে সাহায্য করলেন, আমি ভাবলাম, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হবে সময়ের অপচয়, আর সবচে' বড় সংকট এখন সময়। ঘড়ির কাঁটা পার হয়ে গেছে দশটা পনের। আমি ছুটে গেলাম ইরাকী দূতাবাসে। ওখানে আমার পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা ছিলো। মাননীয় রাষ্টদূত মৃদু হেসে বললেন, এটা কোন সমস্যা হলো! দেখো, এক্ষুণি তোমার কাজ হয়ে যাচ্ছে।

তিনি রিসিভার তুলে সউদী রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আব্দুল হামীদ আলখাতীবের সঙ্গে কথা বললেন এবং কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

মাননীয় রাষ্ট্রদূত নিজের ব্যক্তিগত কার্ডের উল্টো পিঠে স্বাক্ষর করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, আশা করি, এবার সেখানে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না; তবে আমি বুঝতে পারি না, এসব ক্ষেত্রে তোমরা 'ওদের' চেয়ে পিছিয়ে কেন?

পিছিয়ে থাকার কারণ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যায়, কিন্তু আমার কি তখন কিছু বলার এবং শোনার সময়! তাই তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে উঠতে চাইলাম। কিন্তু তিনি হাত ধরে বসালেন। আমি অবাক হলাম এবং কিছুটা উৎকণ্ঠিত হলাম সময়-সংকটের কথা ভেবে।

কিন্তু আমি জানতাম না, আমার জন্য তখন অপেক্ষা করছে একটি মধুর বিস্ময়। আসলে এমনই হয়। বান্দাকে আল্লাহ যখন দয়া করেন, করতেই থাকেন। বান্দা চায় সামন্য কৃপাদৃষ্টি, অথচ শুরু হয় রহমতের অঝোর বৃষ্টি! তাতে বান্দা স্নাত হয় এবং সুসিক্ত হয়। বান্দা আপাদমস্তক ভিজতে থাকে এবং ভিজতে ভিজতে ...., কিন্তু রহমতের মেঘ সরে না এবং দানের বর্ষণ থামে না। বান্দা যত দুর্বল রহমতের জোশ তত প্রবল! দানের ভাণ্ডারে গোনাহগার বান্দার হক যেন আরো বেশী! কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, প্রতিনিয়ত আমরা দান গ্রহণ করি, অথচ দাতাকে স্মরণ করি না এবং জীবনের অঙ্গনে তাঁকে বরণ করি না। পরম দয়ালু দাতা তবু দানের ভাণ্ডার বন্ধ করেন না। তিনি আশা করেন, জীবনের কোন এক শুভলগ্নে হয়ত বান্দা তাঁর কাছে ফিরে আসবে এবং কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে বলবে, 'অনেক বিলম্ব করেছি, তবু হে আল্লাহ, আমি ফিরে এসেছি!'

প্রিয় পাঠক! আবেগের ঢেউ হয়ত আমাকে কিছুটা দূরে নিয়ে গেছে। আমি বলছিলাম একটি মধুর বিস্ময়ের কথা। মাননীয় রাষ্ট্রদূত বললেন, আমি অবাক হয়েছি, হাফেজ্জী হুযূরের সফরসঙ্গীদের তালিকায় তোমার নাম না দেখে। তুমি এসেছো, ভালোই হলো। এক কাজ করো, হজ্জের পর তুমিও আমাদের বাগদাদ দেখে আসো।

আমি মৃদু হেসে বললাম, বাগদাদ শুধু তোমাদের! তাহলে সুদূর বাংলাদেশের বাসিন্দা হয়েও কেন শৈশব থেকে বাগদাদকে ভালোবাসলাম! কেন কারবালার জন্য এত কাঁদলাম!

তিনি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আফওয়ান'!

মাননীয় রাষ্ট্রদূতের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব আমার কাছে মনে হলো, আল্লাহর পক্ষ হতে আরেকটি নেয়ামত। কারণ তাহলে হজ্বের পরও হযরত হাফেজ্জী হুযূরের ছোহবত লাভের সৌভাগ্য হবে। আমি খুশির সাথে রাজি হলাম এবং এজন্য পুনরায় তাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

তিনি বললেন, তুমি ভালো ইনসান। অল্পকে তুমি অনেক মনে করো। এটা ভালো গুণ। আমার বয়স তোমার দ্বিগুণ; আমি তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা করি। তিনি আরো বললেন, আমি বাগদাদে এবং জিদ্দায় যোগাযোগ করছি। (মাওলানা) মুহিউদ্দীন খান আমাদের জিদ্দা দূতাবাস থেকে তোমার ভিসার ব্যবস্থা করবেন।

আবার ছুটলাম 'রাজকীয়' সউদী দূতাবাসের উদ্দেশ্যে। ঘড়ির কাঁটা তখন এগারটা ত্রিশে। হে আল্লাহ, তুমি তাওফীক দিলে আমি শুধু দৌড়ঝাঁপ করতে পারি। দরজা খোলা তো তোমার কাজ! সৌভাগ্য তো আসে তোমার নির্দেশে তোমার কুদরতের পথ ধরে, বান্দার চেষ্টা-তাদবীরে নয়। জানি না, আমার তাকদীরে তুমি কী রেখেছো; তবে তোমার ইচ্ছার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করছি হে আল্লাহ! আমি তাদবীর করবো এবং তাকদীরকে কবুল করে নেবো; মজবূর হয়ে নয়, খুশী হয়ে।

রাজকীয় দূতাবাসের সামনে দণ্ডায়মান 'রাজকীয় প্রহরী' এবার সদয় হলেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। সেখানে দেখলাম, মাওলানা মুমিনুল্লাহ ছাহেব (হযরত হাফেজ্জী হুযূরের প্রিয়ভাজন খলীফা) অসহায় অবস্থায় বসে আছেন। বুঝতে অসুবিধা হলো না, তিনি কী পরিস্থিতির সম্মুখীন।

ভিসার দায়িত্বে নিয়োজিত সহকারী অফিসার বাঙ্গালী। চেহারা থেকেই আমাদের উভয়ের 'পরিচয়' পরিষ্কার। তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন ইকামাতে দ্বীন ...।

দুঃখ হলো; ক্রোধ যে হলো না তাও নয়, কিন্তু আমার তখন একমাত্র লক্ষ্য বাইতুল্লাহর সফরের ছাড়পত্র, পর্যটনের পরিভাষায় যার নাম ভিসা! সুতরাং হে মহামান্য রাজকর্মচারী! তোমার তাচ্ছিল্য তো তুচ্ছ বিষয়, পা দু'টো যদি এগিয়ে দাও, আমি তা চুম্বন করবো, তবু দয়া করে মসজিদুল হারামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িও না। একটু সহযোগিতা করো; আল্লাহ তোমার মঙ্গল করবেন।

ইরাকী রাষ্ট্রদূতের স্বাক্ষরযুক্ত কার্ডটি ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিলাম এবং যথাসাধ্য বিনয় ও নম্রতার সাথে উদ্দেশ্যের কথা বললাম। এর মধ্যে ফোন বেজে উঠলো এবং তিনি রিসিভার তুলেই তটস্থ হলেন। রিসিভার নামিয়ে তিনি বিশেষ সমীহ প্রকাশ করে বললেন, মাননীয় রাষ্ট্রদূত আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাওলানা মুমিনুল্লাহ ছাহেবকে বললাম, আপনার পাসপোর্ট দিন। পাসপোর্ট দু'টো নিয়ে উপরে গেলাম। রাষ্ট্রদূতের বিশাল ও জমকালো দফতর। আগে কখনো আসা হয়নি। ইরান, ইরাক, লিবিয়া ও আরব আমিরাতের দূতাবাসে অবশ্য গিয়েছি; আকাশ-পাতাল পার্থক্য, হওয়ারই কথা। এটা রাজার দূতাবাস; এখানে সবকিছু রাজকীয়!

সালাম ও কুশল বিনিময় হলো। মাননীয় রাষ্ট্রদূত আরবীয় ঐতিহ্য অনুসারে যথেষ্ট সৌজন্যের পরিচয় দিলেন। তিনি জানতে চাইলেন, এখানে কী সমস্যা হয়েছিলো, যার কারণে আমাকে ইরাকী 'ছাফীরের' শরণাপন্ন হতে হলো?

আমি বললাম, দেখুন; হাতে সময় অত্যন্ত কম। ঠিক দু'টোয় ফ্লাইট। দয়া করে এই দু'টো পাসপোর্টে ভিসার ব্যবস্থা করে দিন। আমি এখনই রওয়ানা হতে চাই। অন্য বিষয়, সুযোগ হলে অন্য সময় আলোচনা করা যাবে।

বাঙ্গালী অফিসার ভদ্রলোককে তলব করে আনা হলো এবং আল্লাহর রহমতে দশমিনিটে ভিসা হয়ে গেলো। যখন হয়, এভাবেই হয়; যখন হয় না, কোনভাবেই হয় না। 'তোমার দানে কেউ বাধা দিতে পারে না, আর তুমি বাধা দিলে কেউ দিতে পারে না।'

দূতাবাস থেকে যখন বের হলাম, ঘড়ি তখন বারোটা পার হয়ে এগিয়ে গেছে কিছু দূর। মাওলানা মুমিনুল্লাহ ছাহেবের ফ্লাইট আগামীকাল। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর বড়ত্বের পরিচয় দিলেন। আমি বললাম, আপনার একটু খিদমতের সুযোগ হলো; এটা আমার সৌভাগ্য। আশা করি, আল্লাহর ঘরে দেখা হবে।

***

বাচ্চাকোলে এক ভিখারিণী সামনে এসে হাত পেতে দাঁড়ালো। হায়, তখন যদি আমার তাওফীক থাকতো! মাত্র দশটি টাকা তার হাতে তুলে দিয়ে আমি আমার আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলাম। দশটাকাতেই ভিখারিণী এত খুশী হলো এবং এত দু'আ দিলো যে, আমি অভিভূত হলাম। সব সময় দেখেছি; দানে ভিখারীরা আমাদের চেয়ে বড়। আমরা দান করি সামান্য পয়সা, তারা দান করে কৃতজ্ঞতাসিক্ত অসামান্য দু'আ। গরীবের দু'আ আমাদের জীবনকে সুখী-সমৃদ্ধ করতে পারে, যদি আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু গরীবের মুখ থেকে উচ্চারিত প্রার্থনাকে আমরা ততটা গুরুত্ব দেই না এবং সাদরে গ্রহণ করি না।

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় উদ্ভাসিত ঐ ভিখারিণীর চেহারাটি আমার আজো মনে পড়ে, এমনকি তার কোলের কঙ্কালসার বাচ্চাটির অবাক চাহনিও! আমার সেদিন মনে

হয়েছিলো, সে বুঝতে পেরেছে, তার মা কত খুশী হয়েছে! তার চোখের অবাক দৃষ্টি সেদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিলো।

জানতে বড় ইচ্ছে করে, এই পাষাণ পৃথিবীতে অসহায় ঐ ভিখারিণী মা কি তার কোলের সন্তানকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পেরেছে? এরা মা হয়; এদেরও বুকে থাকে মায়ের মন এবং মাতৃমমতা। সন্তানকে এরা মায়া-মমতা দিতে পারে, বুকের উত্তাপ দিতে পারে, একজন সুখী মায়ের মতই। কিন্তু দিতে পারে না ক্ষুধার অন্ন, জীবনের নিরাপত্তা এবং বেঁচে থাকার অবলম্বন; শিক্ষা তো অনেক দূরের কথা। তবু এরা মা! এবং আমার মায়ের মতই মা! এদেরও পায়ের নীচে থাকে সন্তানের জান্নাত! সন্তানের জন্য এদের ত্যাগ ও আত্মত্যাগ কি পৃথিবীর আর কোন মায়ের চেয়ে কম! কীভাবে তাহলে ভিখারিণী মাকে আমরা তার সন্তানের সামনে অসম্মান করি! নাকি নিজেদের কাছে নিজেরাই আমরা অসম্মানিত হই! এমন মর্মান্তিক দৃশ্য আমি অনেক দেখেছি। দরজায় দাঁড়িয়ে ভিখারিণী মা নিজের জন্য নয়, ক্ষুধার্ত সন্তানের জন্য চেয়েছে দু'লোকমা ভাত, আর পেয়েছে নির্মম আঘাত। দুঃখে লাঞ্ছনায় তার চোখ ফেটে এসেছে জল, আর কোলের সন্তান চোখের পানি মুছে দিয়ে বলেছে, থাক মা কাইন্দো না!

এমন দৃশ্য আমি দেখেছি, একবার নয়, অনেক বার।

প্রিয় পাঠক, হয়ত দেখেছো তুমিও। ভিখারিণী মাকে যদি ইচ্ছে হয় খালি হাতে ফিরিয়ে দিও, কিন্তু সন্তানের সামনে লাঞ্ছিত করো না। এটা কিন্তু আসমানে জমা হয় এবং একসময় নেমে আসে। মানুষ তখন বুঝতে পারে না, কী নেমে এলো এবং কেন? এটা আসলে আসমানের সেই জমা।

এই যে ভিখারিণী মা আমার সামনে হাত পেতে দাঁড়ালো, কে এর জন্য দায়ী? সমাজ ও সামাজিক বৈষম্য? অর্থব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক শোষণ? ব্যক্তি হিসাবে কিছু দায় কি আমার উপরও বর্তায় না? মাতৃত্বের এ অসহায়ত্ব কত বার কতভাবেই তো দেখেছি, কিন্তু আমি কি চেষ্টা করেছি অন্তত একজন মাকে তার মাতৃত্বের অসহায়ত্ব থেকে উদ্ধার করার? শুধু হজ্ব করা, শুধু আল্লাহর ঘরে যাওয়া কি যথেষ্ট?

বিগত যুগের এমন ঘটনা তো কিতাবে পড়েছি, আল্লাহর নেক বান্দা এক ক্ষুধার্ত পরিবারকে হজ্বের পাথেয় দান করে মাঝ পথ থেকে ফিরে এসেছেন, অথচ ঐ বছর তারই ওছিলায় নাকি সকলের হজ্ব কবুল হয়েছে!

সন্তানকোলে ভিখারিণী মা ততক্ষণে চলে গেছে অনেক দূরে। আমি বিষণ্ন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে প্রতিজ্ঞা করলাম, অন্তত একজন অসহায় মাকে আমি তার লাঞ্ছনার জীবন থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবো। এতটুকু সাধ্য মনে হয় আমার আছে। এটাই হবে আমার আল্লাহর ঘরে যাওয়ার তাওফীক লাভের শোকরানা।

***

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে হুঁশ হলো। অন্য সময় যেমন হোক, এখন সময় আমার জন্য সবচে' মূল্যবান; একটি মিনিট যেন একটি হীরকখণ্ড!

তবু মনে হলো, ইরাকের মাননীয় রাষ্ট্রদূতকে সুসংবাদটুকু না দিয়ে এবং ধন্যবাদ না জানিয়ে চলে যাওয়াটা সঙ্গত হবে না। পরে দেখা গেলো, এই কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন সেদিন আমারই উপকার করেছিলো।

রিকশা নিয়ে গেলাম ইরাকী দূতাবাসে। মাননীয় রাষ্ট্রদূত তখন বের হওয়ার জন্য গাড়ীতে উঠছেন। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আল্লাহর রহমতে, তারপর তোমার ওছিলায় ভিসা পেয়ে গেছি। তিনি খুশী হলেন। ঘড়ি দেখে বললেন, সময় তো খুব কম। দু'টোর সময় ফ্লাইট বলছিলে না! চলো তোমাকে বিমানবন্দরে নামিয়ে দেবো। এই সাহায্যটুকুর সত্যি তখন খুব প্রয়োজন ছিলো। এটা ছিলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দুনিয়াতে প্রথম পুরস্কার, অথচ শুধু আখেরাতের জন্যই আমাদের এটা করা উচিত।

বিমানবন্দরে প্রবেশের মুখে দেখি, সামনের বাসে পিছনের আসনে আমার বন্ধু মাওলানা ইসমাঈল বরিশালী এবং পাহাড়পুরী হুযূর। ইসমাঈল বরিশালী পিছনে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেলেন। 'আকলমন্দ'কে হাতের ইশারায় সুসংবাদ জানালাম। সম্ভবত তিনি পাহাড়পুরী হুযূরকে বললেন। হুযূর হাসিমুখে পিছনে ফিরে হাতের ইশারায় জানালেন, 'আল্লাহর শোকর'!

মাননীয় রাষ্ট্রদূত মৃদু হেসে বললেন, তোমার বন্ধুরা তোমার সৌভাগ্যে খুব খুশী! আমি বললাম, এ জন্য সবার আগে তোমাকে 'জাযাকাল্লাহ'।

দূর থেকে দেখলাম, আমার প্রিয় ভাই বশির – এখন সে অনেক বড়, তখন ছিলো অনেক ছোট– ব্রিফকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে, আর অস্থিরভাবে রাস্তার দিকে দেখছে। মাননীয় রাষ্ট্রদূতকে বললাম, ঐ দেখো, আমার ছোট ভাই আমার জন্য কেমন পেরেশান! আমার মা-বাবা তোমার জন্য অনেক দু'আ করবেন। ঘরে এখন তারা আমার খবর জানার জন্য ছটফট করছেন।

রাষ্ট্রদূতেরা কূটনীতির জগতের বাসিন্দা। আপাদমস্তক তারা কূটনীতির ধাতু দিয়ে গড়া। তাদের বলা হয় আবেগমুক্ত মানুষ, কিন্তু ইরাকী রাষ্ট্রদূত সেদিন আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। জীবনে এই প্রথম কোন রাষ্ট্রদূতের চোখে অশ্রু দেখার সুযোগ হলো। বড় ভালো লাগলো। এ সফরনামা যখন লিখছি, তার দেশ তখন হিংস্র শ্বাপদের বিচরণভূমি। তিনি কি বেঁচে আছেন! আমার মা-বাবার দু'আ কি এই বিপদের দিনে তাকে ছায়া দিতে পেরেছে!

আমার মুখের হাসি থেকেই বশিরের সব বুঝে নেয়ার কথা, তবু সে ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, 'কী খবর বড় ভাইসাব?'

ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের এ অন্তরঙ্গ ব্যগ্রতা আমার খুব ভালো লাগলো। হয়ত সে জানে না, আমি আজো তার জন্য দু'আ করি, সেদিন আমার জন্য তার এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য।

সুসংবাদ শুনে সে বললো, আপনি বের হয়ে আসার পর আম্মা কেঁদে কেঁদে অনেক দু'আ করেছেন।

বশিরকে বললাম, সবাই মিলে আম্মার দিকে খেয়াল রেখো। আম্মাকে, আব্বাকে আমার সালাম বলো। আর বলো, তাঁদের দু'আর ওছিলায় আল্লাহ সবকিছু আসান করে দিয়েছেন।

মাননীয় রাষ্ট্রদূত শেষ মুহূর্তে যে আখলাক ও সৌজন্যের পরিচয় দিলেন তার কোন তুলনা নেই। গাড়ী থেকে নেমে আমাকে আলিঙ্গন করলেন। একশ ডলার আমার হাতে দিয়ে বললেন–

هذا من أخ مسلم لتنفقه فى سبيل الله

এটা একজন মুসলমান ভাইয়ের পক্ষ হতে আল্লাহর ঘরে খরচ করার জন্য।

আমি শুকরিয়ার সাথে তার হাদিয়া গ্রহণ করলাম। এর পর আর কোন দিন তার সাথে দেখা হয়নি; কোন খবরও পাইনি। হে আমার মুসলিম ভাই! তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন।

দু'আ চেয়ে মুছাফাহার জন্য পাহাড়পুরী হুযূরের দিকে হাত বাড়ালাম। মুছাফাহার পরিবর্তে তিনি আমাকে বুকে নিলেন, আর বললেন, আপনাকে অনেক কষ্টদায়ক কথা বলেছি, আল্লাহর ঘরে গিয়ে আমার কথা মনে থাকবে তো!

আবেগ তখন আমাকে ভিতর থেকে দলিত মথিত করছিলো। হৃদয়ের প্রতিটি অণু তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত ছিলো। অনেক কিছু বলতে চাইলাম, বলতে পারলাম, শুধু জাযাকাল্লাহ। ।

আমি তো তাঁর ইহসানের কোন বদলা দিতে পারবো না, আল্লাহ দেবেন, আমার পক্ষ হতে। তিনি আমার প্রতি আরো ইহসান করেছেন, তখন হজ্বের পর এই সফরনামা লিখতে না দিয়ে এবং আজ এতদিন পর লেখার অনুমতি দিয়ে। আমার মাথার উপর তাঁর ছায়া যেন আরো দীর্ঘ হয়। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন দান করুন, আমীন।

***

বিমানবন্দরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। মাওলানা আতাউল্লাহ, হাজী সিরাজুদ্দৌলা এবং হাবীবুর রহমান তিতাস তাদের সামান দিয়ে দিয়েছেন এবং ভিতরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমাকে দেখে মাওলানা তো অবাক এবং কিছুক্ষণ নির্বাক! বিস্ময়ের ঘোর যখন কাটলো, বে-ইখতিয়ার আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, কিসমত হয়ত শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গ ত্যাগ করেছে। যদি সঙ্গ ত্যাগ করতো, কিসমতকে দোষ দেয়া যেতো না। কারণ পদে পদে কিসমতকে আমি চিনতে ভুল করেছি। তবু কিসমত আমার প্রতি বিমুখ হয়নি, টেনে টেনে আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে; সামনে আল্লাহর ইচ্ছা!

প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সেরে ভিতরে যেতেই বিমানে আরোহণের ঘোষণা হলো। বাজামা'আত দু'রাকাত যোহর আদায় করে আমরা বিমানের উদ্দেশ্যে বাসে উঠলাম।

সোনার মদীনায়

বিমানের সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে মনের যে অবস্থা হলো তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আনন্দের, পুলকের, শিহরণের সবক'টি শব্দ একত্র হয়েও আমার তখনকার বিগলিত হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারবে না। প্রয়োজনই বা কী! হৃদয় যার সৃষ্টি, হৃদয়ের আনন্দ যার দান, হৃদয়ের সব অনুভূতি তো তাঁরই জন্য নিবেদিত, আর হৃদয়ের কোন কিছু তাঁর কাছে অপ্রকাশিত নয়।

কয়েক দিন আগে গভীর রাতে যেখানে দাঁড়িয়ে হযরত হাফেজ্জী হুযূরের বিমানে আরোহণ এবং তারাভরা আকাশে বিমানের উড্ডয়ন দেখেছিলাম, আর আকাশের মহাশূন্যতার দিকে তাকিয়ে মিনতি জানিয়েছিলাম সেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছেন পাহাড়পুরী হুযূর। আমি হাত নাড়লাম, তিনিও। শোকর ও কৃতজ্ঞতার প্রশান্তি তখন আমার সারা অন্তর জুড়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু বললাম, হে আল্লাহ, তুমি কী না করো! তুমি কী না করতে পারো! সবই তোমার কুদরতের কারিশমা হে আল্লাহ!

বিমান আকাশে উড়লো, আমিও ডানা মেলে উড়াল দিলাম কল্পনার আকাশে এবং চলে গেলাম জিদ্দা বিমানবন্দরে বিমানের অনেক আগে। সেখান থেকে মরুভূমির দীর্ঘ পথ এবং পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে পৌঁছে গেলাম সোনার মদীনায়, অনেক স্বপ্ন দেখার পর এই সেদিন যেখানে হাযির হয়েছিলাম মাত্র একদিনের সৌভাগ্য নিয়ে। ছোট্ট সময়ের সামান্য স্মৃতি, কিন্তু সেই স্মৃতির মধুর অনুভূতি এখনো হৃদয়ে জাগরূক।

আকাশপথ পাড়ি দিতে দিতে আমি বিভোর ছিলাম মদীনার স্বপ্নে। কবি যেন আমারই হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করেছেন এভাবে-

'হৃদয়ের অঙ্গনে প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে/ দুরূদের তাছবী পড়ে ছাল্লি আলা বলে/ হে শাহে মাদীনা, আসছি আমি তোমার দুয়ারে/ পথে মৃত্যু হলে হে প্রাণ, তুমি গিয়ে সালাম বলো তাঁরে।'

কল্পনার মধুর সুরঝঙ্কার হঠাৎ ছিন্ন হলো এবং আমি জেগে উঠলাম মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেবের ডাকে। তিনি জানতে চাইলেন, এত অল্প সময়ে কীভাবে ভিসার ইনতিযাম হলো? আমি কিছুটা লজ্জিত হলাম। আসলে নিজে থেকেই বলা উচিত ছিলো তাকে। আগাগোড়া ঘটনা বললাম। তিনি বিস্ময়াভিভূত হলেন এবং বললেন, কুদরতের এর চেয়ে প্রকাশ্য নমুনা আর কী হতে পারে! আল্লাহর শোকর, আল্লাহ আপনাকে এনেছেন। আমার দিলের তামান্না ছিলো, আপনার সফরের কোন একটা ইনতিযাম যেন হয়ে যায়। যামানার ঝড়-ঝাপটায় আমরা অনেক দূরে সরে পড়েছি, তবু হৃদয়ের গভীরে তার প্রতি কিছু কৃতজ্ঞতা এখনো সংরক্ষণ করে রেখেছি। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বিমানের জানালাপথে নীচে তাকিয়ে এমন অপূর্ব সুন্দর এক দৃশ্য দেখতে পেলাম, যা এখনো আমার চোখে ভাসে। পরে যত বার আল্লাহর ঘরের সফর হয়েছে, সে দৃশ্যটি দেখার চেষ্টা করেছি, দেখতে পাইনি। বিমান হয়ত এক পথে চলাচল করে না, কিংবা

অন্যকিছু। আরবসাগরের কোল ঘেষে একটি পাহাড়ের ঢালু নেমে গেছে এবং চলে গেছে সাগরের ভিতরে বেশ কিছু দূর, আঁকা-বাঁকা হয়ে, যেন নিপুণ কোন শিল্পীর হাতে গড়া। বিমান থেকে আমি অনেক সৌন্দর্য দেখেছি আকাশের এবং পৃথিবীর। কিন্তু আমার হৃদয়ে ঐ সৌন্দর্যের আবেদন ছিলো অন্য রকম। সৃষ্টির সৌন্দর্য স্রষ্টার নৈকট্য এমনভাবে অনুভব করাতে পারে, আমার জানা ছিলো না। যতক্ষণ দেখা যায়, তাকিয়েই ছিলাম অভিভূত হয়ে। বিমানের গতিবেগ এত, কিন্তু মনে হয় কত ধীর! একটি দৃশ্য দেখা যায় অনেক সময় ধরে। এটাও বড় অদ্ভূত।

জিদ্দা এসে গেছে। একটু পরেই বিমান অবতরণ করবে, ঘোষণা হলো এবং আসনের ফিতা বাঁধার অনুরোধ জানানো হলো।

রাতের আকাশ থেকে জিদ্দার নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে পেলাম। বিশাল বিস্তৃত শহর, যেন আলোর মালা পরিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পথে গাড়িগুলো দেখা যায় না, শুধু দেখা যায় আলোর চলাচল।

আলোঝলমল জিদ্দা দেখে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। এই সেদিন রাতের আকাশেই তো আমি জিদ্দার ভূমি ত্যাগ করেছিলাম! সেদিনের কান্না আমার আল্লাহ আমাকে আজ আলোর হাসিরূপে ফিরিয়ে দিয়েছেন! সেদিনও জিদ্দা শহরে আলো ছিলো, কিন্তু উজ্জ্বলতা ছিলো না। আজ জিদ্দার আলো কত সমুজ্জ্বল! সবকিছুর আগে আল্লাহর প্রশংসা, সবকিছুর পরেও আল্লাহর প্রশংসা।

বিমান জিদ্দার মাটি স্পর্শ করলো আমাদের ঘড়ির হিসাবে রাত বারটায়। আছর ও মাগরিব আমরা বিমানেই পড়েছি দু'জন দু'জন করে জামাতে এবং দাঁড়িয়ে। আল্লাহর শোকর কেউ বাধা দেয়নি। অনেকে বিমান সেবকদের বাধা উপেক্ষা করে অযুর পানিতে টয়লেট সয়লাব করে ফেলেছেন। এটা আমার কাছে ঠিক মনে হয়নি। আমি তায়াম্মুম করেছিলাম।

***

বিমানের দরজা খোলা হলো। সিঁড়ির পাটাতনে এসে দাঁড়ালাম, যেমন দাঁড়িয়েছিলাম রামাযানের সফরে এমনি এক রাতে! সমগ্র দেহে এবং অন্তরে অনুভব করলাম হিজায ভূমির মৃদুমন্দ বায়ুর স্নিগ্ধ পরশ। হিজাযের সেই পবিত্র ঘ্রাণ আবার আমাকে মোহিত করলো; সেই ঘ্রাণ যা শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। এবং হৃদয় যার যত উন্মুখ, যত ব্যাকুল ও সমর্পিত, সে তা তত গভীরভাবে অনুভব করতে পারে। আল্লাহর আশিক ও দিওয়ানা বান্দা যারা তাদের কথা অবশ্য ভিন্ন। তারা তো হিজাযভূমির ঘ্রাণ তেমনই অনুভব করেন যেমন আমরা ফুলের সুবাস এবং আতরের ঘ্রাণ অনুভব করি। তাদের অনেক কাহিনী আমি পড়েছি কিতাবের পাতায়, তবে একটি জীবন্ত উদাহরণ দেখারও সৌভাগ্য হয়েছে এবার এই গোনাহগার চোখ দু'টোর। এমন আশিক ইনসান এবং ইশকের এমন নমুনা শুধু চোখের দেখা দেখতে পাওয়াও বড় সৌভাগ্য। সেই মানুষটির কথা এবং তার কিছু সময়ের সঙ্গলাভের ঈমানোদ্দীপক ঘটনা এখানে লিখতে

আমার বড় লোভ হয়, কিন্তু এ সফরনামা যে হয়ে চলেছে সফরের চেয়ে দীর্ঘ! বহু আগে কোন এক কিতাবে পড়েছিলাম একটি ফারসি কবিতা, যার মর্ম–

'হিজাযভূমিতে কেন আমার এ মস্তি ও ফুর্তি?/ কারণ তোমরা যা পাও বছরার গোলাবে এবং হরিণের নাভিতে/ আমি তা পাই হিজাযের বাতাসে/ তুমি বিশ্বাস না করো, তাতে কী আসে যায়, বন্ধু!'

হয়ত পারস্যের কবি আমার দেখা এই মানুষটির মত কারো কথাই বলেছেন তার কবিতায়।

রামাযানের সফরে এসেছিলাম আবুধাবি থেকে সউদিয়ার বিমানে। তখন নেমেছিলাম জিদ্দা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। সেখানে অন্যান্য দেশের বিমানের জন্য রয়েছে সাধারণ টার্মিনাল, আর রাজকীয় সউদী এয়ার লাইন্সের জন্য স্বতন্ত্র টার্মিনাল। রাতের আলোতে সেই রাজকীয় টার্মিনালকে মনে হয়েছিলো স্বপ্নপুরী।

হজমৌসুমে হাজীদের আগমনের জন্য তৈরী করা হয়েছে বিশাল হজ্বটার্মিনাল। আকাশে বিমান থেকে মনে হয়েছিলো, যেন ছোট ছোট সারিবদ্ধ অনেক তাঁবু। পুরো টার্মিনালের ছাদের নকশা করা হয়েছে বেদুঈন আরবের তাঁবুর মত করে। মরুভূমির পরিবেশে এ স্থাপত্যনকশা সত্যি অপূর্ব।

বিমান থেকে নেমে বাসে উঠলাম। বিমান থেমেছে মূল টার্মিনাল থেকে অনেক দূরে, দু' কিলোমিটারের কম হবে না। পুরো বিমানবন্দর আয়তনে এত বিশাল যে, আমাদের রাজধানী ঢাকা শহর অনায়াসে তার ভিতরে এসে যায়। বাস অনেক্ষণ ধরে চলতে চলতে হজ্বটার্মিনাল ভবনের সামনে এসে থামলো। আমাদেরকে এক বিরাট হলঘরে নেয়া হলো। আমাদের পৌঁছার পর পরই আরেক দেশের, সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ার হাজীদের আরেকটি দল এসে হাজির। অত বড় হলঘরে যেন তিল ধারণের স্থান নেই। কোন কোন হাজী বিলম্বের কারণে সমালোচনা শুরু করলেন। আমি অবশ্য বেশ উপভোগ করছিলাম হাজীদের এই বিরাট লোকারণ্য; এরা সবাই আল্লাহর ঘরের মেহমান! আশিক ইবরাহীমের ডাকে ছুটে আসা আশিকান! এখানে এই ছোট্ট ছাদের নীচে হাজারের মজমা যদি হয় এত 'খোশমানযার' তাহলে কেমন হবে আরাফার খোলা ময়দানে লাখ লাখ হাজীর জমায়েত-দৃশ্য! আমার নছীবে আছে তো আরাফার ময়দান! লাব্বাইক লাব্বাইকের 'আযান'!

অযু ইস্তিনজা থেকে ফারিগ হতে বেশ সময় লাগলো এবং কষ্ট হলো। মানুষের এই একটি দুর্বলতা আমাকে খুব লজ্জিত করে। তবে আজ এ কষ্টকে কষ্ট মনে হলো না; এ লজ্জাকেও মনে হলো না লজ্জা। আল্লাহর ঘরের মেহমান হয়ে হজ্বের সফরে এসে এতটুকু যদি হাসিমুখে বরণ করতে না পারি তাহলে কেন আর ঘর ছেড়ে আসা! কেন তবে আল্লাহর ঘরের মেহমান হওয়া! পবিত্র ভূমিতে অবতরণ করেই যদি আমার মুখে শুরু হয়ে যায় সমালোচনা এবং বিরক্তির প্রকাশ তাহলে কীভাবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারি বাইতুল্লাহর আশিক এবং মাদীনার দিওয়ানা বলে! তবে যারা ব্যবস্থাপনায় আছেন তাদের মনে হয় বিষয়টি আরো গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার।

এর মধ্যে ঘটে গেলো এমন একটি দুর্ঘটনা, যা আমাদের বাংলাদেশী হাজীদের জন্য ছিলো চরম লজ্জার ও কলঙ্কের। হাজীর পরিচয় নিয়ে আসা একলোকের সামানে পাওয়া গেলো নিষিদ্ধ কিছু বস্তু। ফলে হাজীদের সামান তল্লাশিতে আরোপ করা হলো অসম্ভব কড়াকড়ি, যা শুনেছি, এর আগে কখনো হয়নি। আমরা নিজেরাই টেনে আনলাম নিজেদের লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ।

গভীর রাত হয়ে গেলো ভিতর থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে আসতে।

বিমান থেকে যে তাঁবুর দৃশ্য দেখেছিলাম, এবার দেখলাম তাঁবুর ভিতর থেকে। হজ্বটার্মিনালকে আসলে বলা উচিত হজ্ব-তাঁবু, বা হাজীতাঁবু। আরববেদুঈনদের মরুভূমির তাঁবুজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা তো নেই; শুধু কিছু তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করেছি আরবীসাহিত্য এবং আরবজাহেলিয়াতের কবিতা থেকে, বিশেষত ইমরাউল কায়স থেকে। কিন্তু আধুনিক স্থাপত্যের অবদান এই তাঁবুর নীচে কাটানো একটিমাত্র রাতই যেন আমাকে বেদুঈন আরবের মরুর তাঁবুজীবনের আবহ এবং অনুভব দান করলো। বাংলা কবিতায় পড়েছি, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরববেদুঈন'! সত্যি সত্যি আমার তখন মন কেমন করছিলো বেদুঈনদের মরুভূমির তাঁবুজীবনের প্রতি অজানা এক আকর্ষণে! ভাবছিলাম, অন্তত কিছুদিনের জন্যও কি বাস করা যায় না মরুভূমির তাঁবুতে! শুনেছি, আধুনিক নগরজীবনের আরাম আয়েশে অভ্যস্ত অভিজাত আরবরা এখনো মাঝে মধ্যে মরুভূমিতে চলে যান এবং তাঁবুর জীবন উপভোগ করেন।

হাজার হাজার হাজী শুয়ে বসে অপেক্ষা করছেন মক্কা শরীফে, কিংবা মদীনা শরীফে রওয়ানা হওয়ার। সবারই দেহে অবয়বে রয়েছে দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি ও অবসাদ, কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠছে তাদের ভিতরের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা। অন্তত কিছু মানুষ তো ছিলো এমন যেন তারা পিপাসায় ছটফট করছে, একটু দূরেই রয়েছে শীতল পানির ঝর্না, কিন্তু তাকে আটকে রেখে বলা হচ্ছে, আরো ছবর করো হে মুসাফির!

যারা মক্কা শরীফ যাবেন তারা নিজ নিজ দেশ থেকে, বা বিমান থেকে ইহরাম বেঁধে নিয়েছেন। আমাদের মত যারা মদীনা শরীফ যাবেন তারা এখনো ইহরাম মুক্ত রয়েছেন। তারা ইহরাম বাঁধবেন হজ্বের পূর্বে মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা হওয়ার সময়। আমরা আগে মদীনা শরীফ যাচ্ছি, কারণ হযরত হাফেজ্জী হুযূর ইরান থেকে মদীনা শরীফ আসবেন, তারপর মক্কা শরীফ যাবেন। সবকিছু যদি নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী হয়ে থাকে তাহলে হযরত তাঁর কাফেলাসহ গতকালই মদীনা শরীফ পৌঁছে গেছেন। কেমন হবে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটি, ভাবতে গিয়ে বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠলো। তাঁর নারাযি দূর হবে তো? আমাকে দেখে তিনি খুশী হবেন তো?

কিছুক্ষণ ঘুম হলো এবং গভীর ঘুম। ফজরের প্রায় শেষ সময় উঠলাম। আলহামদু লিল্লাহ! সফরের ক্লান্তি ও অবসাদের কোন চিহ্ন নেই। শরীর-মন এখন একেবারে সজীব সতেজ এবং নতুন সফরের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত।

এখানে 'টয়লেটব্যবস্থা', আরবীতে যাকে বলে 'দাওরাতুল মিয়াহ' বেশ ভালো। কিছু দূর পর পর দশটি টয়লেটের একটি ইউনিট, সঙ্গে অযুর ব্যবস্থা। পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা ইউনিট। পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকায় ভিড় নেই। ভিতরে তল্লাশির স্থানে দীর্ঘ সময় থাকতে হয়। সেখানে যদি অন্তত দ্বিগুণ ব্যবস্থা হতো তাহলে প্রথম মুহূর্তে হাজী ছাহেবদের যে কষ্টটা হয় তা কিছুটা দূর হতো। হাজী ছাহেবরাও পবিত্র ভূমিতে এসেই অপ্রতুল ব্যবস্থার সমালোচনা এবং পরস্পর অসৌজন্য প্রকাশের গোনাহ থেকে বেঁচে যেতেন।

ইতমিনানের সাথে জরুরত সেরে বা-জামাত নামায আদায় করলাম। মশওয়ারা হলো, বিশ্রাম ও নাস্তার পর মদীনা শরীফ রওয়ানা হবো। মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেব আমাকেও বিশ্রাম নিতে বললেন এবং এমনভাবে বললেন, যাতে মধুর শাসন ছিলো। শাসনে যদি মধুরতা থাকে তাহলে হৃদয় কেমন আপ্লুত হয় তা তুমি বুঝতে পারবে যদি কখনো এমন মধুর শাসন পেয়ে থাকো, কিন্তু সংসারে এ পদার্থ এখন বড় দুর্লভ। আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'জোয়ান বয়সে বিশ্রামের কী প্রয়োজন! আমি তো দিনের ঘুম কাকে বলে জানি না, এমনকি লাগাতার রাত জাগার পরও আল্লাহর রহমতে শরীর সচল থাকে। আম্মা-আব্বা তো আমাকে রীতিমত পাহারা দিয়ে এবং হ্যারিকেনের আলো সরিয়ে ঘুম পাড়াতেন, এখনো তাই করেন। আমি চারদিকে কাপড় টানিয়ে রাখি, যাতে বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলো বাইরে না যায়। এসম্পর্কে মজার মজার অনেক গল্প আছে। এই যে চশমা দেখছেন, এটা কিন্তু চাঁদের আলোতে বই পড়ার ফল।

তিনি বললেন, আপনার অবস্থা আমার জানা আছে, কিন্তু এটা ঠিক নয়, 'নেযামের' সাথে কাজ করলে অনেক দিন কাজ করতে পারবেন। স্বাস্থ্য বিরাট নেয়ামত; এটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার। যৌবনের ঢল গড়িয়ে যেতে বেশী সময় লাগে না। আজ থেকে বিশবছর পর হয়ত আপনার কথাগুলো আপনারই কাছ স্বপ্নের মত মনে হবে। তখন হয়ত আমার কথা মনে পড়বে এবং আফসোস হবে।

পঁচিশ বছর পর এ সফরনামা লিখতে বসে সত্যি আফসোস হচ্ছে। শরীর এখন আমার কথা শোনে না, আমাকেই শুনতে হয় শরীরের কথা। তাই আমি যা শুনিনি, অন্যকে এখন তা শোনাতে চাই।

নিজেদের অবস্থানক্ষেত্র চিহ্নিত করে- খুঁটি ও টয়লেট ইউনিটের নম্বর দ্বারা- হজ্বতাঁবুর বাইরে এলাম। এখন যত কঠিন এবং হাজীদের গতিবিধি যত নিয়ন্ত্রিত পঁচিশ বছর আগে তা ছিলো না; বলতে গেলে কোন বিধিনিষেধই ছিলো না। দোষ কিন্তু সিংহভাগ আমাদের, আর কিছুটা সউদীদের সরল বুদ্ধির। আসলে সবসময় সবখানে আগে ঘটে অপরাধ, তারপর আসে আইন ও নিয়ন্ত্রণ ।

হাঁটতে হাঁটতে বেশ দূরে চলে এলাম। একপাশে খেজুরগাছের, অন্যপাশে ঝাউগাছের সারি, আর সবুজ ঘাসের গালিচা; তাতে পরিবেশ হয়েছিলো অত্যন্ত মনোরম। কিছু দূর পর পর যেন সবুজ দ্বীপ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের দেশে 'সবুজ' হলো প্রকৃতির

দান। সব সৌন্দর্য সেখানে সবার অগোচরে তৈরী হয়। আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরে, ভূমি থেকে সবুজ অঙ্কুরিত হয়। মানুষের যত্ন-পরিচর্যা ছাড়া শুধু প্রকৃতির সযত্ন ছোঁয়ায় সারা দেশ সবুজ হয়ে যায়। সেখানে মানুষ বরং সবুজের প্রতি বৈরী। মানুষ বৃক্ষ নিধন করে এবং সবুজ বনানী ধ্বংস করে।

এখানে পরিবেশ অন্যরকম। এখানে মরুভূমির কোলে সবুজের স্নিগ্ধতা সৃষ্টির জন্য যে বিপুল উদ্যোগ আয়োজন এবং যে বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন তা না দেখলে বোঝা যায় না। প্রতিটি গাছের গোড়ায় রয়েছে নল-ব্যবস্থা। তা থেকে পানি সরবরাহ করতে হয় মরুভূমির দগ্ধ আবহাওয়ায় সবুজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। সম্ভবত এখানে মাটিও অন্যখান থেকে আনা, যেমন রামাযানে জিদ্দা শহরে দেখেছি।

সূর্যোদয় হলো। আসলে হয়েছে আরো আগে, তবে দূরে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে সময় লেগেছে। হিজাযভূমিতে নতুন দিনের প্রথম সূর্যোদয় যেন নতুন জীবনের শুভসংবাদ জানালো। মদীনা শরীফের যাত্রালগ্নে শুক্রবারের এ সূর্যোদয় হৃদয়ের অনুভবে আশ্চর্য এক পবিত্রতা এনে দিলো। কামনা করলাম, আলোর দিকে আমার এ সফর যেন সার্থক হয়। যখন দেশের মাটিতে ফিরে যাবো ঠিক এই পথ দিয়ে, দেশের মাটিতে ফিরে তো যেতেই হয়, তখন যেন আজকের সূর্যের মত আলোকিত এক জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারি। জীবনের অবসান যেন হয় নূরের শহর মদীনার যিয়ারাত করে করে এবং মদীনার স্বপ্ন দেখে দেখে । দেহ আমার যেখানেই থাকুক হৃদয় যেন বাস করে সবুজ গম্বুজের শহরে।

***

একটি মাইক্রোবাসে ওঠা হলো রীতিমত দরদস্তুর করে। ভালো লাগলো না। আল্লাহর নবীর শহরে যাওয়ার পথে, কী ক্ষতি হতো যদি পাঁচটি রিয়াল বেশী খরচ হতো! এ সফর কি পৃথিবীর আর দশটি সফরের মত! হয়ত ভাড়া বেশী চাওয়া হয়েছে, হয়ত এটা অসঙ্গত। কিন্তু মদীনার সফর সারা জীবনে কার ভাগ্যে ক'বার জোটে! দরদস্তুর করার জন্য তো পড়ে আছে আরো বহু শহর! আরো বহু সফর! বিভিন্ন যুক্তি আসতে পারে; পাথেয়সল্পতার কথা উঠতে পারে। আমার নিজেরও পাথেয় সামান্য। তবু প্রায় ঝগড়ার মত এ দরকষাকষি ভালো লাগেনি।

যাত্রীসংখ্যা পনের কি ষোল। আমরা চারজন; বাকিরা অপরিচিত হলেও বাংলাদেশের, নোয়াখালি এবং সিলেটের, দু'জন বরিশালের। আলোর শহরের উদ্দেশ্যে কয়েক ঘণ্টার যাত্রাপথে আশ্চর্য এক আলোকিত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো আমাদের, যা পরবর্তী কোন সফরে হয়নি। মানুষ এবং মানুষের মন সবকিছুরই বড় দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে।

মহিলাযাত্রী ছিলো দু'তিনজন। একজন মনে হলো অভিজাত ও সুশীলা। স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ, যা সব সময় আমার ভালো লাগে। সঙ্গীকে তিনি গাড়ীর চালকের সঙ্গে উত্তপ্ত কথা বলতে নিষেধ করছিলেন। আমার ভালো লাগলো যে, উপরে যে অনুভূতির কথা বললাম তা রয়েছে আরো কিছু হৃদয়ে। বড় আবেগ দিয়ে বলা তার

একথাগুলো এখনো কানে বাজে, 'সারা জীবন তো অনেক কামিয়েছো, যেতে দাও না কিছু। কোথায় চলেছো সেটা একবার ভাবো!'
ভদ্রমহিলা বড় মূল্যবান কথা বলেছেন। পথে আচরণে ও উচ্চারণে আসলেই আমরা ভুলে যাই, কোন্ সফরে, কোন্ শহরে আমরা চলেছি।
যাত্রা শুরুর পর কিছু সময় পার হলো নির্ঝামেলায়। এসি চালু ছিলো; শীতল বাতাস আরামদায়ক ছিলো। প্রথমে এসিটা বন্ধ হলো এবং জানালা খুলে দেয়া হলো। সূর্য ততক্ষণে তেতে উঠেছে এবং বাসটাকেও তাতিয়ে তুলেছে। এসি সচল থাকলে বাইরের গরম হাওয়া রোধ করে ভিতরের শীতল বাতাস উপভোগ করা যেতো। এ নিয়ে একদফা কথা কাটাকাটি হলো, তারপর বিভিন্ন মন্তব্য, কোনটা গাড়ীচালকের উদ্দেশ্যে, কোনটা সউদী সরকারকে লক্ষ্য করে, আর কোনটা ...। তাতে গরম হাওয়া এবং বেদুঈন চালকের মেজায ঠাণ্ডা তো হলোই না, উল্টো গাড়ীর ইঞ্জিনটা বিগড়ে গেলো। হয়ত যিনি এ গাড়ী এবং আমাদের জীবনের গাড়ী নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর পছন্দ হয়নি, হাবীবের দেশের যাত্রীদের আচরণ। তাই তিনি আমাদের কিঞ্চিৎ পরিশোধনের ব্যবস্থা করলেন আগুনঝরা রোদের মধ্যে পথে কিছু সময় থামিয়ে রেখে। সেটা বোঝা গেলো এভাবে যে, এরপর সবার মাথা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। সেই ভদ্রমহিলা সঙ্গীকে বললেন, 'নাও এবার বসে বসে এসির বাতাস খাও। এতক্ষণ তো গরম হলেও বাতাস ছিলো, এখন গরমে সেদ্ধ হও। দুরূদ পড়া নেই, শুধু শুধু ঝগড়া!'
একতরফা ঝগড়াটা বেশ উপভোগ্য হলো। আরো আনন্দ হলো যখন ভদ্রপুরুষটি মৃদু কণ্ঠে দুরূদ পড়া শুরু করলেন। নারী যদি ইচ্ছে করে, কুশলতার সঙ্গে ভুলবিচ্যুতি থেকে বাঁচিয়ে পুরুষকে সঠিক পথে চালিত করতে পারে। কারণ মাতৃত্বই নারীর মূল প্রকৃতি; তারা মায়ের জাত। অবশ্য মাতৃজাতির 'আদর্শ শিক্ষা' ছাড়া এ মহৎ ভূমিকা পালন এবং মানবতার উৎকর্ষ সাধন কিছুতেই সম্ভব নয়।
অনেক চেষ্টার পর গাড়ী সচল হলো, কিন্তু আবার কিছু যাত্রীর মন বিকল হলো। তারা ভাবলো, চালক ইচ্ছে করে এসি বন্ধ রেখেছে ভাড়া কমানোর কারণে। গাড়ীর চালক বাংলা না বুঝলেও অনুমান করলো যে, তাকে অবিশ্বাস করা হচ্ছে। আরব বেদুঈন সব সহ্য করে, মিথ্যার অভিযোগ সহ্য করতে পারে না। মিথ্যা তো আবু সুফিয়ানও বলতে পারেনি রোমের বাদশার দরবারে, শুধু এ লজ্জার কারণে যে, লোকে বলবে, দেখো, আবু সুফিয়ান সরদার হয়েও মিথ্যা বলে! সে যুগের আরবচরিত্র কিছু না কিছু এযুগেও বিদ্যমান রয়েছে। একসময়ের উটচালকের বংশধর এই বেদুঈন তাই ক্রোধে প্রায় আত্মহারা হয়ে পড়লো।
গাড়ী চলছে পূর্ণ গতিতে, তর্ক-বচসা চলছে আরো জোর গতিতে, আর এসব ক্ষেত্রে বাংলাভাষা যেমন হয় তেমনই হলো, বাইতুল্লাহর মুসাফির এবং মদীনার যাত্রীদের মুখে যা একেবারে বেমানান।

এমন সময় এক বৃদ্ধযাত্রী, আমার ধারণা. গরমে তারই কষ্ট হওয়ার কথা সবচে' বেশী, তিনি সবাইকে শান্ত করলেন এই বলে, ভাই, চিন্তা করেন, কোথায় চলেছেন। দুনিয়ার গরম যদি সহ্য না হয়, আখেরাতের গরম কেমনে সহ্য হবে! .....।

এবং আশ্চর্য! ঐ বৃদ্ধের কথায়, যাকে খুব শিক্ষিত বলেও মনে হয়নি, সবাই শান্ত হয়ে গেলো। আসলে তার মুখের প্রতিটি শব্দে ছিলো হৃদয়ের স্পর্শ, তাই সকল হৃদয়কে তা স্পর্শ করলো।

তিনি উচ্চ স্বরে দুরূদ পড়া শুরু করলেন, আমরাও তাকে অনুসরণ করে দুরূদে মশগুল হলাম। পুরো বাসের পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেলো। আমাদের সবার মনের অবস্থাও পরিবর্তিত হলো।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম. মরুভূমিতে শাব্দিক অর্থেই যেন আগুন ঝরছে। দূর থেকেই বোঝা যায়, বালুগুলো কী পরিমাণ তপ্ত! যেন বাংলাভাষার খৈফোটা বালু! সেই আগুনঝরা রোদেও দেখতে পেলাম একপাল মেষ এবং এক রাখাল।

দূরের পাহাড়শ্রেণী ধূধূ ঝাপসা দেখা যায়। গাড়ীর পথ কখনো মরুভূমির মধ্য দিয়ে, কখনো পাহাড়ের কোল ঘেঁষে; কখনো বা পথ তৈরী হয়েছে পাহাড় কেটে মাঝখান দিয়ে। দু'দিকে কাটা খাড়া পাহাড় দেখে গা ছমছম করে। বিরাট বিরাট পাথরখণ্ড পাহাড়ের গায়ে এমন আলতোভাবে লেগে রয়েছে, যেন একটু নাড়া খেলেই গাড়ীর উপর এসে পড়বে এবং যাত্রীশুদ্ধ গাড়ী ছাতু হয়ে যাবে।

ভাবছি, মসৃণ পথে দ্রুতগামী গাড়ীতে এত আরামের সফরে আমাদের এমন অসহ্য অবস্থা! তাহলে একশ দু'শ বছর আগে, তিন চারশ বছর আগে, যখন কোন রাস্তা ছিলো না, ছিলো শুধু মরুসাগর– বালু, পাথর এবং মরুজাহাজ, তখন কী অবস্থা হতো! তখন বাইতুল্লাহর এবং মদীনার কাফেলা কীভাবে এ দীর্ঘ কঠিন পথ পাড়ি দিতো?! মরুভূমির বাসিন্দা যারা তাদের কথা না হয় ভিন্ন; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন আবহাওয়ার মানুষ যখন এখানে হাজির হতো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশে মরুভূমির লু হাওয়ার মাঝে তখন তারা কীভাবে সফর করতো?! কীভাবে তা সম্ভব হতো?! আর কিছু নয়, এটা হলো ইশক ও মুহব্বতের কারিশমা! এটা হলো প্রেম ও ভালোবাসার রহস্যলীলা! মদীনার প্রেম এবং বাইতুল্লাহর ইশক আল্লাহর বান্দাদের এমনই মাতোয়ারা করে রাখতো যে, পথের কোন কষ্টই কষ্ট মনে হতো না। চলার পথে উটের দোলা এবং তাদের হৃদয়ে প্রেমের দোলা একাকার হয়ে যেতো। তারা ইশকের দরিয়ায় ডুবে যেতো, আর ইশকের জোয়ার ভাসিয়ে নিয়ে যেতো কষ্টের সব খড়কুটো। যুগের যত পরিবর্তন হচ্ছে, সময়ের ব্যবধান যত বাড়ছে ইশকের দরিয়ায় ততই যেন ভাটার টান ধরছে। তাই ছোট ছোট কষ্টও এখন বড় বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এভাবনা আমার ভিতরে যেন ইশক ও মুহাব্বাতের নতুন মাদকতা সৃষ্টি করলো। আমি আবেগ উদ্দীপনার সঙ্গে দুরূদ পড়তে লাগলাম। আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মদ ..., ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সারা জীবন দুরূদ পড়েছি এবং আল্লাহর রহমতে কিছু স্বাদও পেয়েছি, কিন্তু আজকের দুরূদের স্বাদ অন্যরকম। কারণ দুরূদ পড়ে পড়ে যতই এগিয়ে চলেছি, প্রিয়তম ও তাঁর প্রিয় ভূমি ততই নিকটবর্তী হয়ে চলেছে। প্রিয়তমের পথে প্রিয়তমের নাম জপার স্বাদই যে ভিন্ন! বুলবুলির কণ্ঠ এত মধুর কেন লাগে, ভেবে অবাক হয়েছেন বাংলার কবি, তারপর নিজের ভিতর থেকেই যেন তিনি পেয়ে গেছেন রহস্যের সমাধান; তাই বুলবুলিকে জিজ্ঞাসা করছেন, হে বুলবুলি, তুমি কি কখনো মুহম্মদের নাম জপেছিলে! তাই কি তোমার কণ্ঠ এত মধুর লাগে!

এতদিন মনে হয়েছে; এ কবি-কল্পনা, আজ হৃদয়ঙ্গম হলো, এ চিরসত্য। মুহম্মদ নাম যে যত জপে, অর্থাৎ যত বেশী দুরূদ পড়ে তার কণ্ঠ তত মধুর হয়, তার হৃদয় তত পবিত্র হয় এবং তার আত্মা তত পরিশুদ্ধ হয়। ছাল্লাল্লাহু আলা মুহম্মদ, ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– আল্লাহ মুহম্মদকে শান্তি দান করুন; তাঁর প্রতি আল্লাহর সালাম।

দুরূদ তো আল্লাহর এত প্রিয় যে, স্বয়ং আল্লাহ আপন শান মোতাবেক তাঁর হাবীবের উপর দুরূদ পড়েন এবং দুরূদ পড়েন আল্লাহর আদেশে তাঁর ফিরিশতাগণও। তারপর আল্লাহ মুমিনদের আদেশ করে বলছেন, তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করো।

সুতরাং মুমিন যখন দুরূদ পাঠ করে তখন প্রথমত ফিরেশতাদের সাথে সাদৃশ্যের মাধ্যমে তাদের জড়দেহ নূরানী সত্তায় পরিণত হয় এবং এই নূরানিয়াতের কল্যাণে তারা আল্লাহর নূরকে ধারণ করার উপযোগী হয় এবং ঐশী সত্তার পরম সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়। নবীর প্রতি দুরূদ আমি পড়ি আমারই হৃদয় ও আত্মার চাহিদার কারণে। আমি নিজে নূরানিয়াত হাছিলের জন্যে।

আগেও দুরূদের স্বাদ পেয়েছি, কিন্তু দুরূদের এমন মর্ম-উপলব্ধি হৃদয়ে কখনো উদ্ভাসিত হয়নি এবং এমন নূরানিয়াত অনুভূত হয়নি। তাই মদীনা যতই নিকটবর্তী হচ্ছে দুরূদ আমার হৃদয়সমুদ্রে ততই যেন ইশক ও প্রেমের নব নব তরঙ্গ এবং নয়া নয়া মউজ সৃষ্টি করছে।

যখনই তুমি কল্পনা করবে মদীনা, দেখতে পাবে খেজুরবাগান এবং খেজুরগাছের ছায়া! কিন্তু এখন আর কল্পনা নয়, চোখের সামনে দেখতে পেলাম সেই খেজুরবাগান এবং তার স্নিগ্ধ ছায়া। সর্বসত্তায় যেন নতুন এক পুলককম্পন অনুভূত হলো। মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেব এমন মধুর সুরে দুরূদ পড়ছিলেন, যা মনে হলে এখনো কানে মধুবর্ষণ হয়। ছাল্লাল্লাহু আলা মুহম্মদ, ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শিহরণে ও পুলককম্পনে আত্মহারা হয়ে আমিও গেয়ে উঠলাম ছন্দের পরোয়া না করে–

খেজুর বাগান, তুমি মদীনার খেজুর বাগান/ তুচ্ছ তোমার কাছে বছরার গোলাব বাগান।

রাস্তার দু'পাশে শুধু খেজুরবাগান। গাছে গাছে থোকা থোকা খেজুর। সে বড় অপূর্ব দৃশ্য! এজন্যই হয়ত কবিদের কবিতায় খেজুরবাগানের ছায়া ও সৌন্দর্যের কথা এত বারবার এসেছে।

মদীনার যিয়ারাত-সৌভাগ্য আগেও যারা লাভ করেছেন তারা একসঙ্গে আনন্দধ্বনি করে উঠলেন, মদীনা এসে গেছে, মদীনা! ঐ যে হাবীবের শহর মদীনা! নতুন আবেগে নতুন জাযবায়, নতুন স্বাদে ও লায্‌যাতে সুমধুর সুরে সকলে গেয়ে উঠলো–

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহম্মদ! ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি নিজের ভাব ও ভাবনা ভুলে বারবার ডুবে যাচ্ছিলাম মাওলানার করুণ স্বর ও মধুর সুরের তরঙ্গে। স্পষ্ট অনুভব করছিলাম, কণ্ঠের সুরতরঙ্গ আসলে হৃদয়ের প্রেম-তরঙ্গেরই প্রতিধ্বনি। প্রিয় পাঠক, এখানে আমি সেই না'তের দু'টি চরণ শুধু তোমাকে শোনাতে পারি, কিন্তু সেই সুরতরঙ্গ কীভাবে শোনাবো যাতে প্রতিফলিত হয়েছিলো হৃদয়ের প্রেম-তরঙ্গ! আচ্ছা, শুধু শব্দগুলোই শোনো–

......

আকণ্ঠ পিলাও মোরে নবীপ্রেমের শরাব সাকী!/ এই শরাবের জামে ডুবে থাকতে ভালো লাগে/ মরণ যদি হয়, হয় যেন তাঁর পাক কদমে/ এখন যে প্রেমে তাঁর বেঁচে থাকতেই ভালো লাগে!

রামাযানের সফরে প্রবেশ করেছিলাম রাতের আলোকসাজে সজ্জিত মদীনায়। তখন সারা শহর ছিলো শান্ত নিঝুম। রাস্তা ছিলো প্রায় নির্জন। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই; সবাই যেন ঘুমিয়ে আছে মধুর কোন স্বপ্ন দেখার জন্য, আর ফিরেশতারা যেন গোটা শহরকে ঢেকে রেখেছেন নূরের ডানা বিছিয়ে! দূর থেকে দেখা মসজিদুন্‌-নবীর আলোকিত মিনারগুলো যেন হাবীবের ঘুমন্ত শহরের অতন্দ্র প্রহরী! জাগরণের মাঝেও আমি যেন চলে গিয়েছি স্বপ্নের জগতে!

মাত্র দু'মাস পর মেহেরবান আল্লাহ আবার আমাকে এনেছেন তাঁর হাবীবের পাক মদীনায়। এবার আমি প্রবেশ করছি দিনের সূর্যকরোজ্জ্বল মদীনায়। দূর থেকে মসজিদুন-নবীর মিনারগুলো মনে হলো.. কী যে মনে হলো তা ঠিক বুঝিয়ে বলার শব্দ আমার জানা নেই। মনে হলো আকাশের সঙ্গে এই মিনারগুলোর একটা যেন বন্ধন আছে, আলোর বন্ধন। মিনারের চূড়া থেকে আকাশ পর্যন্ত একটি যেন আলোকরেখা বিরাজমান। মদীনার পথে এখন জনস্রোত। মানুষের ঢল মসজিদুন-নবীর অভিমুখে, জুমার জামা'আতে শামিল হওয়ার জন্য। চারদিকে শুধু দুরূদের মৃদু মধুর গুঞ্জন, আর কোন শব্দ নেই। মদীনা হলো পৃথিবীর সবচে' কম শব্দের, সবচে' শান্ত ও প্রশান্ত শহর। বিচার ও যুক্তিতর্কই যাদের সত্য লাভের একমাত্র পথ তারা ভেবে দেখো, এ রহস্যের পাও কি না কোন কূলকিনারা!

সেদিন রাতের মদীনায় প্রবেশ করে মুগ্ধ হয়েছিলাম মদীনার আলোক-সৌন্দর্যে; আজ দিনের মদীনায় প্রবেশ করে অভিভূত হলাম সৌন্দর্যের আলোকময়তায়। আলোর

সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যের আলো, দু'টোই প্রেমিক হৃদয়কে সিক্ত, স্নাত ও বিধৌত করে।

মদীনা শরীফে হযরত হাফেজ্জী হুযূর চানমিয়া সওদাগরের মুসাফিরখানায় ওঠবেন, আমাদের জানা ছিলো, কিন্তু জানা ছিলো না, সেটা কোথায়? বাস থেকে যেখানে নেমেছি সেখান থেকে কত দূর? তবে মসজিদে নববী ছিলো একেবারে নিকটে। সবুজ গম্বুজ দেখা যায় না, কিন্তু মিনার দেখা যায়। ব্যাকুল হৃদয়ের দাবী তো হলো, এখনই উড়ে চলে যাই ডানা মেলে! এখনই সবুজের পরশ গ্রহণ করি প্রাণভরে! কিন্তু নবীপ্রেমের যে রয়েছে স্বতন্ত্র রীতি ও নীতি! ইশকে রাসূলের যে রয়েছে নিজস্ব আদাব ও 'আন্দায'। কবির ভাষায়–

এখানের আদাব আলাদা, এখানের আন্দায নিরালা/ এখানে ধীরে ধীরে পান করো বন্ধু শরাবের পেয়ালা।

নবীর যামানায় দূরের এক কাফেলা এসেছে মদীনায়, নবীর যিয়ারাত ও দিদার-সৌভাগ্য লাভের জন্য। কাফেলা মসজিদের কাছে আসামাত্র সবাই হয়ে গেলো বেকাবু বেকারার! উটের লাগাম ছেড়ে, সামানপত্র ফেলে সবাই ছুটলো মসজিদের দিকে। যেন মধুর প্রতিযোগিতা, কে কার আগে লাভ করবে নবীর যিয়ারাত এবং রাসূলের দিদার।

কাফেলার একজন শুধু ভিন্ন। তিনি নিজের ও অন্যদের উটগুলো বেঁধে সামানের হেফাযত সেরে গোসল করলেন, পাকসাফ লেবাস পরলেন, খোশবু মাখলেন; তারপর ধীর শান্ত পদক্ষেপে মসজিদে হাজির হলেন। তাঁরও কলবে ইশকের মউজ ছিলো, তাঁরও হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ ছিলো। নবীর যিয়ারাত ও দিদারের জন্য তিনিও বে-কারার ছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যাকুলতা ও চঞ্চলতার উপর ছিলো স্থিরতা ও প্রশান্তির সর্বসুন্দর এক আবরণ। আদর্শ প্রেমিকের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা হলো অন্তরে, বাইরে দেখতে পাবে তুমি নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি। আল্লাহর নবী এ দৃশ্য দেখছিলেন; তিনি তাঁকে সাধুবাদ জানিয়ে বললেন, তোমার মাঝে দু'টি গুণ রয়েছে যা আল্লাহর খুব প্রিয়; ধীরস্থিরতা এবং গভীর প্রশান্ততা।

রাসূলের আদর্শ প্রেমিক হওয়ার দাবী করবো আমরা, সুন্নতের খেলাফ যাদের জীবনধারা! তবে আদর্শ প্রেমিকের অনুকরণও যে সৌভাগ্য লাভের কারণ! তাই ব্যাকুল চঞ্চল মনকে সংযত করে আগে আমরা মুসাফিরখানা খুঁজে বের করলাম, সামানপত্র রেখে 'অযু-গোসল' করলাম। তাতে ভিতরের শুচিতা অর্জিত নাও যদি হয়, বাইরের অপরিচ্ছন্নতা অন্তত দূর হলো। নতুন লেবাস পরে খোশবু মাখলাম। তাতে অন্তর সুরভিত নাও যদি হয়, বাইরের দুর্গন্ধ অন্তত দূর হলো।

এবার রওয়ানা হলাম ধীর শান্ত পদক্ষেপে আল্লাহর নবীর মসজিদের উদ্দেশ্যে। দৃশ্যত মসজিদ ভিতরে-বাইরে পরিপূর্ণ, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে জায়গা ছিলো। আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট না দিয়ে এবং আশেকানে রাসূলের বিরক্তির কারণ না হয়ে, আর পরে যারা

আসবে তাদের সুবিধার নিয়ত করে যদ্দুর পারা যায় এগিয়ে গেলাম এবং খোতবা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লাম।

মদীনাতুর রাসূলে এবং মসজিদে নববীতে শোনা আমার জীবনের প্রথম খোতবা! কীভাবে কোন ভাষায় প্রকাশ করবো তখনকার অনুভব-অনুভূতি! শুধু বলতে পারি, খোতবার শব্দগুলো যেন নূরের ঝিরঝির বৃষ্টি হয়ে বর্ষিত হতে লাগলো। এ খোতবা তো যুগপরম্পরায় সে মহান খোতবারই অনুকরণ এবং অনুরণন, যা চৌদ্দশ বছর আগে এই মসজিদের 'শাহানশাহ' তাঁর ছাহাবা কেরামের উদ্দেশ্যে প্রদান করতেন। আমার মনে হলো, দুই খোতবার মাঝে সময়ের ব্যবধান আছে, কিন্তু সময়ের প্রাচীর নেই। তাই যত ক্ষীণ ধারায় হোক আজকের খোতবার মাঝেও প্রবাহিত রয়েছে সেই খোতবার নূরের ফোয়ারা। তবে হৃদয় যার যতটুকু উন্মুক্ত এবং অনুভব যার যতটুকু পরিশুদ্ধ সে ততটুকু লাভ করবে সেই নূরের সংস্পর্শ। সময়ের ব্যবধান যত বাড়ুক, তার অনুভবের জগতে সময়ের দূরত্ব ততই কমে আসবে। কলব যদি হয় জোনায়দ-জিলানীর, জাযবা যদি হয় রূমী-তাবরীযীর এবং রূহানিয়াত যদি হয় সারহিন্দী-গাঙ্গোহীর তাহলে তো মনে হতে পারে, এ কোন্ কণ্ঠ! এ কার কণ্ঠস্বর! মসজিদে নববীর খতীব যখন বললেন–

يَا عِبَادَ اللّٰهِ ! اِتَّقُوْا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

তখন অন্তরে আশ্চর্য এক ভাবের উদয় হলো। অদ্ভুত এক তন্ময়তা যেন সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। তাকওয়া অবলম্বন করার, আল্লাহর ভয় দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করার আহ্বান এ মসজিদ থেকে আজই কি প্রথম?! এ মসজিদের শ্রোতারা একশ বছর আগে কি শুনেনি এ আহ্বান?! এ কণ্ঠস্বর?! পাঁচশ বছর আগে?! হাজার বছর আগে?! চৌদ্দশ বছর আগে?! হিজরতের প্রথম বছরে?!

হে আল্লাহ! তোমার নবীর মসজিদের খোতবায় মুত্তাকী হওয়ার, চৌদ্দশ বছরের পরম্পরাধন্য যে আহ্বান আজ ধ্বনিত হলো তা অন্তরে গ্রহণ করার তাওফীক দাও, আমাদেরকে, এ মসজিদের সকল হাযিরানকে। জীবনের প্রতি পদে, প্রতি পদক্ষেপে তোমাকে যেন ভয় করে চলি। দিনের আলোতে যেন ভয় করি; রাতের অন্ধকারেও যেন ভয় করি। লোকচক্ষুর সামনে যেন ভয় করি, লোকচক্ষুর আড়ালেও যেন ভয় করি।

খোতবা শেষ হলো, তবে রয়ে গেলো খোতবার তন্ময়তা। এরই মাঝে শুরু হয়ে গেলো জামা'আত। মসজিদে নববীর মুছল্লায় জীবনের প্রথম জুমু'আর জামা'আত! ভিতরের আনন্দ যেন উপচে পড়ে নিজের সৌভাগ্যে নিজেই মুগ্ধ হয়ে! ভিতর থেকে কান্না যেন ভেঙ্গে পড়ে সৌভাগ্য ধরে রাখার অযোগ্যতার কথা ভেবে! তবে সান্ত্বনা এই যে, দান করে দান ফিরিয়ে নেবেন, এ দাতা সেই দাতা নন! ইনি তো পরম দাতা! পরম দয়ালু!! চিরদয়াবান!!!

সিজদায় গিয়ে মনে হলো, এ মাথা আর তোলবো না! সারা জীবন পড়ে থাকবো সিজদায়! কিন্তু আমার উপর যে মাওলার আদেশ, মনের অনুসরণ করো না, ইমামের ইকতিদা করো! সুতরাং ইমামের 'আল্লাহু আকবার' অনুসরণ করে মাথা তুললাম এবং আবার সিজদায় গেলাম। আবার সিজদা, আবার সিজদা। কী শান্তি!

কী প্রশান্তি!! শীতলতার কী আশ্চর্য অনুভূতি!!!

এ মাথা সিজদায় যে ভূমি স্পর্শ করছে, যুগে যুগে কত পুণ্যাত্মার পদস্পর্শে সে ভূমি ধন্য হয়েছে! কপালে এই সিজদার দাগ নিয়ে যদি হাযির হতে পারি হে আল্লাহ, রোযহাশরে তোমার দরবারে!

নামায শেষে বসে আছি নিজের মাঝে সমাহিত হয়ে; ঘটনারা একের পর এক কীভাবে ঘটে গেলো! উপায় ছিলো না, উপকরণ ছিলো না, কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানি হলো; রামাযানের পবিত্র মাসে আল্লাহ হজ্বের সফরে আনলেন। এমন সৌভাগ্য কবে কার হয়! কিন্তু সে সৌভাগ্য ধরে রাখতে পারলাম না। আল্লাহর ঘরে আসার পর আল্লাহর ঘরে থাকা হলো না। তবু আসমান থেকে রহমতের বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ হলো না। তাই তো না-লাকায়েক বান্দা এখন আবার হাবীবের শহরে!

তবু আকাশ থেকে করুণার শিশির বর্ষণ বন্ধ হলো না। তাই তো পাপী উম্মতি এখন আবার নবীর মসজিদে!

গতকাল কি জানতাম, আজ কী হবে? এখন কি জানি, আগামীকাল কী ঘটবে? কখন মৃত্যু হবে? হজ্বের শেষ পর্যন্ত কি বেঁচে থাকবো? আমার কি হজ্ব নছীব হবে? আমি জানি না, আল্লাহ জানেন। তবে আল্লাহর রহমতের কাছে আশা করি।

এরই নাম তাকদীর! এর বেশী আমি জানি না, কোন মানুষ জানে না। মানুষের জ্ঞান সীমিত। কত সীমিত? সাগর থেকে পাখীর ঠোঁটে তুলে আনা জলবিন্দু! সসীম জ্ঞানের মানুষ অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর তাকদীর বোঝবে কীভাবে? বুঝতে চায় কোন্ সাহসে? আমি শুধু জানি, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভরশীল। বান্দার কর্তব্য শুধু আল্লাহর রহমত ভিক্ষা করা এবং আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া।

এসব ভাবনার মাঝে সামনের দিকে তাকালাম এবং অবাক হয়ে দেখলাম তাকদীরের কারিশমা! কয়েক কাতার সামনে হযরত হাফিজ্জী হুযূর! সুবহানাল্লাহ! বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সময় লাগলো। মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেবও আছেন, তিনি আমাকে দেখলেন এবং অবাক হলেন। আমাদের মনে তখন কী কী ভাবের উদয় হলো তা কী করে বলবো! তার মনের কথা তো জানি না; আমার মনের কথা যতটুকু জানি তা প্রকাশ করার ভাষা যে জানি না!

সম্ভবত তিনি হযরতকে আমার কথা বললেন। হযরত পিছনে তাকালেন এবং উঠে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর চেহারায় আনন্দের যে উদ্ভাস এবং চোখের তারায় মমতার যে ঝিলিক দেখেছিলাম তা এখনো, এত বছর পরো আমি স্পষ্ট দেখতে পাই।

বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি; দেখি হযরত এগিয়ে আসছেন। আমি দ্রুত উঠলাম এবং ছুটে গেলাম। হযরত দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে তাঁর আলিঙ্গনে গ্রহণ করলেন। আমি ঝাঁপ দিলাম তাঁর বুকে এবং সমর্পিত হলাম তাঁর আলিঙ্গনে। বুকের সঙ্গে বুক যখন লেগে থাকে তখন কী হয়, জানি না। আমার তখন কী হলো, বলতে পারি না। শুধু অনুভব করলাম বুক দিয়ে বুকের স্পন্দন। আমি কাঁপছিলাম, কাঁদছিলাম; চোখ থেকে আমার অশ্রু ঝরছিলো। হযরত আমাকে বুকে ধরে রেখেছিলেন। সাহস করে অন্যরকমও বলতে পারি। আর যদি আল্লাহর বড়ত্ব ছাড়া সবকিছু ভুলে যেতে পারি তাহলে বলতে পারি 'দু'টি বুক পরস্পরকে ধরে রেখেছিলো, একটি বুক কিছু দেয়ার জন্য! একটি বুক কিছু নেয়ার জন্য!'

মোমের মত গলে গলে আমার অস্তিত্ব যেন বিলীন হয়ে চলেছিলো! জানি না, কিসের মাঝে! কারণ মসজিদ ছিলো আল্লাহর নবীর, আর বুকের আলিঙ্গন ছিলো নায়েবে নবীর। এ আলিঙ্গন তো শুরু বা শেষ নয়! এ বুক তো অন্য বুকের আলিঙ্গন গ্রহণ করেছিলো! এবং সে বুক অন্য বুকের! এ বুকের আলিঙ্গ যদি আমাকে সময়ের পিছনে নিয়ে যায়! চোখের দৃষ্টি থেকে যদি বর্তমানকে মুছে দেয়! সময়ের প্রাচীর ভেঙ্গে অতীতের রাজপথ ধরে যদি চলে যাই দূরে বহু দূরে! এ আলিঙ্গনের মাঝে যদি পেয়ে যাই সুদূর অতীতের অন্য কোন আলিঙ্গনের কিছু সুবাস! কিছু আভাস!

আলিঙ্গন কি শুধু শব্দ! নেই কি এর কোন মর্ম! কী ছিলো এবং কেন ছিলো প্রথম আলিঙ্গন! পরবর্তী আলিঙ্গন!! যুগ যুগের আলিঙ্গন!!! মসজিদুন-নবীর পবিত্র পরিবেশে আজকের আলিঙ্গন!

এসকল ভাবনায় সত্যি সত্যি আমি তখন আত্মহারা। সূর্যের আলোতে ধুলিকণা ঝিলমিল করে, আমিও ঝিলমিল করে উঠেছিলাম।

হযরত যে কথাটা প্রথম উচ্চারণ করলেন তা হলো, 'আখের আ-হী গায়ে তুম!' শেষ পর্যন্ত এসেই গেছো তাহলে! আল্লাহ এনেছেন তোমাকে!

হযরত আরো বললেন, তোমার ফিরে যাওয়ায় দিলে বহুত 'ছাদমা' হয়েছিলো। অনেক পেরেশান ছিলাম, আজ আমার দিল ঠাণ্ডা হয়েছে।

কীভাবে যেন মুখ থেকে বের হয়ে গেলো, হযরত! 'আপনার বুকের 'ঠাণ্ডক' অনুভব করতে পারছি।'

হযরত শুধু হাসলেন। বহুদিন পর, অনেক অস্থির প্রতীক্ষার পর তাঁর মুখে আজ দেখতে পেলাম সেই মমতাসিক্ত হাসি!

এতদিন পর, বহু দহনযন্ত্রণা ভোগ করার পর আজ আল্লাহর নবীর মসজিদে তাঁর মুখে শুনতে পেলাম সেই স্নেহসম্বোধন। তপ্ত হৃদয় আজ শান্ত শীতল হলো।

মসজিদে নববীতে হযরত সবসময় যেখানে বসেন সেখানে এসে বসলেন। সবুজ গম্বুজের দিকে তাকালেন, তাকিয়ে থাকলেন এবং পূর্ণ আত্মসমাহিত হয়ে গেলেন। সবুজ গম্বুজ তাহলে এভাবে দেখতে হয়! হযরতের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও তাকালাম। রামাযানের সফরে এখানে বসেই তাকিয়েছিলাম সবুজ গম্বুজের দিকে।

সেটা ছিলো নিঃসঙ্গ অবলোকন। আজ হলো আশিকে নবীর প্রেমদৃষ্টিকে অনুসরণ করে সঙ্গধন্য অবলোকন। আজকের সবুজ গম্বুজ অবলোকন, আল্লাহর কসম, ছিলো অন্যরকম! দিলের ভিতরে পয়দা হলো নতুন মঊজ, নতুন ঢেউ, নতুন তরঙ্গ। আমরা ভুলে যাই, প্রেমের জগতে অনুসরণই প্রেমকে প্রাণ দান করে। কবি কী বলেন!–

লায়লা! হায়, লায়লা!! নেই তো আমার কোন অবলম্বন/ আছে শুধু তোমার চিহ্ন এবং পদচিহ্নের অনুসরণ!

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, যিয়ারাত 'করছেননি'? বললাম, হযরত! আপনি যখন করবেন, আপনার পিছনে করবো।

হযরত খুশী হলেন। ইতিমধ্যে মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেব এসে গেলেন। আগেই আমি হযরতকে তার কথা বলেছিলাম। কিছুক্ষণ পর হযরত বললেন, 'এখন একটু আসান হইতে পারে, আল্লাহর নাম নিয়া চলেন।'

আমরা তাঁকে অনুসরণ করে রওয়ানা হলাম পরম সৌভাগ্য অর্জনের পথে।

যুগে যুগে আল্লাহর অলী ও নবীর আশিকগণ দরবারে নববীতে হাযির হয়েছেন এবং দুরূদ ও সালামের নাযরানা পেশ করেছেন। তাঁদের বিভিন্ন হালাত ও বিস্ময়কর ঘটনা কিতাবে পড়েছি এবং অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাতে আমাদেরও হৃদয়ে নবীপ্রেমের পরশ লেগেছে; আমাদেরও হৃদয় আকুল ও ব্যাকুল হয়েছে রওযা শরীফে হাযির হওয়ার, দুরূদ ও সালামের নাযরানা পেশ করার। হযরতের যবানেও শুনেছি আকাবিরীনে উম্মতের বিভিন্ন ঘটনা। এমনকি তিনি নিজেরও যিয়ারাতের হালাত শুনিয়েছেন বিভিন্ন সময়।

পড়েছি এবং শুনেছি, চোখে দেখিনি; আজ দেখলাম; দেখে ধন্য হলাম। কী দেখলাম তা কীভাবে বলবো?! শব্দ দিয়ে কি হৃদয়ের অনুভূতির জীবন্ত ছবি তুলে আনা যায়!

রাওযাতুর রাসূল অভিমুখী আশিকানে রাসূলের নূরানী কাফেলায় শামিল হলেন হযরত হাফেজ্জী হুযূর এবং তাঁর পিছনে ...

ধীর পদক্ষেপে পূর্ণ আত্মসমাহিত অবস্থায় তিনি এগিয়ে চলেছেন এবং আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ যেন অন্য এবং ভিন্ন। আমি যদি বলতে না পারি, তা আমার অনুভবের দৈন্য এবং কলমের অক্ষমতা। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন ইশকে রাসূল ও নবীপ্রেমের নতুন নতুন রূপ ও সৌন্দর্যের প্রকাশ। প্রতিটি পদক্ষেপ যেন এক একটি ধাপ, প্রেমের ও নিবেদনের সুউচ্চ শিখরে আরোহণের, কিংবা গভীর তলদেশে অবতরণের। একসময় মনে হলো, আমার সামনে যে শুভ্র অস্তিত্ব, আমি তাঁকে চিনি না। তিনি অন্য যুগের, অন্য জগতের। তিনি বর্তমানের নন, অতীতের এবং সুদূর অতীতের।

কিতাবের পাতায় বিভিন্ন যুগের বহু আশিকানে রাসূলের বিস্ময়কর অসংখ্য কাহিনী আমি পড়েছি, যা প্রেমহীন হৃদয়েও সৃষ্টি করে নবী-প্রেমের তরঙ্গ-জোয়ার। তবে এত দিন ভেবেছি, এগুলো অতীতের কাহিনী, কিন্তু আজ মনে হলো, অতীত আবার ফিরে এসেছে এবং সকল আশিকানে রাসূলের তাজাল্লিয়াতে ইশক ও প্রেমজ্যোতির্ময়তা

আমাদের হযরতের মাঝে উদ্ভাসিত হয়েছে। নবীপ্রেমের সুরভিত উদ্যানে একটি শুভ্র-সুন্দর ফুল যেন ফুটে আছে সকল ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভ নিয়ে!

সে পবিত্র প্রেমময় রূপ কীভাবে তুলে ধরবো কলমের আঁচড়ে কাগজের পাতায়! তা যে শুধু অবলোকন এবং অনুধাবন করার বিষয়, ভাষা ও শব্দের সীমাবদ্ধতায় ধারণ করার বিষয় নয়।

অন্তরে তখন একটাই ছিলো সান্ত্বনা; হয়ত হৃদয় আমার নবীপ্রেমের আলোকস্পর্শ থেকে বঞ্চিত, কিন্তু আমি যে যুগের শ্রেষ্ঠ নবীপ্রেমিকের সান্নিধ্যপ্রভায় উদ্ভাসিত! এও কি কম সৌভাগ্যের আমাদের মত দুর্ভাগাদের জন্য!

আমি তখন হযরতের একেবারে সংলগ্ন ছিলাম এবং সত্যি সত্যি তাঁর দেহসত্তা থেকে অন্যরকম একটি খোশবু ও সুবাস অনুভব করছিলাম; ইশকে রাসূলের খোশবু এবং নবীপ্রেমের সুবাস। সেই সুবাসের সামান্য পরশে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য আমিও যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলাম; এমন মানুষ যে ভালোবাসতে জানে না, কিন্তু ভালোবাসতে চায় এবং ভালোবাসার 'অর্ঘ্য' নিবেদন করতে চায়! এমন মানুষ যার কলবে নেই ইশকের হাকীকত এবং মুহব্বতের মারেফাত, তবু সে পেশ করতে চায় ইশক ও মুহাব্বাতের নাযরানা!

আশিকানের ঢল এগিয়ে চলেছে তরঙ্গের পর তরঙ্গ হয়ে দুরূদ ও সালামের সুমধুর গুঞ্জন তুলে। আহ! অবশেষে এসে গেলো পরম সৌভাগ্যের মুহূর্ত! মা আমিনার এতীম দুলাল শুয়ে আছেন যে কবরে আমাদের হযরত দাঁড়ালেন তার সামনে। দাঁড়ালেন এমন আদবের সাথে, এমন বিগলিতভাবে যেন .. যেন তিনি সেই হাদীছের বাস্তব রূপ, যাতে আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছেন–

'আমার মৃত্যুর পর যে আমার কবর যিয়ারাত করলো সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারাত করলো।'

সৌভাগ্যের সেই সোনালী মুহূর্তটি আমি কখনো ভোলবো না, যা জীবনে একবারই এসেছিলো; আর কখনো আসবে না। দু'কানে যেন মধু বর্ষিত হলো; আমি শুনতে পেলাম হযরতের কম্পিত কণ্ঠস্বর–

আছ্ছালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!

কী ছিলো হযরতের ছালাত ও সালাম নিবেদনের সেই কাঁপা কাঁপা আওয়াযে! আমার অন্তরে কিসের কম্পন সৃষ্টি হলো! কিসের তরঙ্গ অনুভূত হলো! কেমন এক সম্মোহিত অবস্থার মাঝে আমিও উচ্চারণ করলাম–

আছ্ছালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!

জীবন যেন আজ সার্থক হলো! সালাম নিবেদন যেন কবুলিয়াতের আশ্বাস লাভ করলো। কারণ ইশকের 'আতর' যদিও ছিলো না আমার কাছে, কিন্তু ছিলো একজন 'আত্তার'-এর সান্নিধ্য ।

আশিকানের তরঙ্গ-স্রোত এখানে এমন তীব্র যে, মুহূর্তের বেশী দাঁড়ানো সম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের হযরত স্থির প্রশান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন অনেক্ষণ। আশ্চর্য! একটি

আলোর প্রাচীর যেন তাঁকে বেষ্টন করে ছিলো। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে এবং তাঁকে স্পর্শ না করেই পার হয়ে যায়। তিনি তখন পূর্ণ আত্মসমাহিত।

পিছনের প্রচণ্ড চাপে আমার বুক লেগে ছিলো হযরতের পিঠের সঙ্গে। এ সংলগ্নতার কিছু অনুভূতি লিখতে গিয়েও কলমকে সংযত করলাম। কারণ কিছু জিনিস থাকে, যা একান্তভাবে নিজের জন্য রেখে দিতে হয়।

রওযা শরীফের মোকামে হযরত হৃদয়ের কী ভাব নিবেদন করলেন এবং ইশক ও মুহাব্বাতের কী নাযরানা পেশ করলেন তা আমার জানা নেই; বিগলিত হৃদয়ের অশ্রুধারাকে আশ্রয় করে আল্লাহর কাছে কী তিনি চাইলেন এবং কী তিনি পেলেন তাও জানা নেই। আমি শুধু নিবেদন করলাম–

'হে আল্লাহ! আমার না আছে ইশক, না আছে আদাবে ইশক। কিন্তু হে আল্লাহ! এই গোনাহগার বান্দার বুক লেগে আছে তোমার পেয়ারা বান্দার সঙ্গে। এইটুকু তুমি কবুল করো হে আল্লাহ!

ধীরে ধীরে হযরত সরে এলেন একটু ডানে। সালাম পেশ করলেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা)-এর খেদমতে–

আস্-সালামু আলাইকা ...

তারপর আরেকটু ডানে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর বরাবরে–

আস্-সালামু আলাইকা ...

বাবে জিবরীল দিয়ে হযরত যখন বের হলেন, তাঁর মুখমণ্ডলে ছিলো এমন এক আশ্চর্য আলোক-উদ্ভাস, যা অন্তত দেখার সৌভাগ্য যদি হয় কারো, সে ভাবতে পারে নিজেকে ধন্য।

***

একদিন যিয়ারাতের পর হযরতকে মনে হলো খুব খোশদিল; তখন সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত! যখন আপনি দুরূদ ও সালাম পেশ করেন তখন আপনার দিলে কী হালাত ও কাইফিয়াত পয়দা হয়?

তিনি বললেন, আরে মিয়াঁ! তখন তো হালাত ও কাইফিয়াতের কোন ইহসাসই দিলে থাকে না।

'তব তো দিল হী রুখসত হো যাতা হায় সীনে সে!' (দিল তো তখন রুখসত হয়ে যায় সিনার ভিতর থেকে)

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত! এটা কি সত্য যে, আল্লাহর কোন কোন বান্দা যখন দুরূদ ও সালাম পেশ করেন তখন তার জাওয়াব শুনতে পান রওযা শরীফ থেকে?

তিনি বললেন, অনেক ঘটনা কিতাবে আছে। এমনকি আল্লাহর খাছ বান্দা যারা, দুরূদ ও সালাম পেশ করার সময় ইশক ও মুহব্বতের এমন উঁচা মাকামে তাঁরা পৌঁছে যান যে, হাকীকী যিয়ারাতও নছীব হয়ে যায়।

এরপর তিনি বললেন, কিন্তু মিয়াঁ! এসব চিন্তায় লিপ্ত হওয়া ঠিক না। আসল কর্তব্য হলো যিয়ারাতের যাবতীয় আদব রক্ষা করা এবং দিলের মধ্যে আযমত ও মুহব্বতের ভাব পয়দা করা। তাহলেই যিয়ারাতের হাকীকী ফায়দা ও রূহানিয়াত হাছিল হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত! আপনার জীবনের প্রথম যিয়ারাতের কথা কি মনে আছে?

তিনি বললেন, মিয়াঁ! প্রত্যেক যিয়ারাতকেই মনে হয় জীবনের প্রথম যিয়ারাত। আসল কথা হলো, ইশক ও মুহব্বতের না ইবতেদা আছে, না ইনতিহা। আছে শুধু তরক্কীর নতুন নতুন মাকাম। আর প্রত্যেক মাকামে পৌঁছে মনে হবে, এখান থেকেই শুরু, আগের সবকিছু যেন কিছুই না।

আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করার খুব ইচ্ছা ছিলো, হযরত কখনো রওযা শরীফ থেকে সালামের জাওয়াব পেয়েছেন কি না, কিন্তু সাহস হলো না; যদি নারায হন, যদি বলেন, অপ্রয়োজনীয় চিন্তা ছেড়ে আসল কাজে মশগুল থাকো।

একদিন রাতে মসজিদুন-নবী থেকে ফিরে আসার পর হযরতের আরামের ইনতেযাম করা হচ্ছিলো, তখন বললেন, মিয়াঁ আবু তাহের, সকালে আমাকে জান্নাতুল বাকীতে যিয়ারাতের জন্য নিতে পারবেননি?

এটা ছিলো ছোটদের সাথে হযরতের কথা বলার খাছ 'আন্দায', যার সাথে কম বেশী সবাই পরিচিত ছিলো। অন্যসময় যেমন তেমনি পুরো সফরে দেখেছি, সবার সঙ্গে তিনি এভাবেই কথা বলতেন, যেন আমরা তাঁর সঙ্গে নই, তিনি আমাদের সঙ্গে। এই 'আদা ও আন্দায' নিজের জীবনেও অনুসরণ করার বড় ইচ্ছে হয়, পারি না। এটা পারা যায় না, নিজের ভিতরের 'আমি'কে বিসর্জন দেয়া ছাড়া।

তাহাজ্জুদের সময় হযরত আমাদের ডেকে ডেকে তুললেন। অনেক কষ্টে চোখ মেলে উঠে বসলাম। বিছানো মুছল্লা দেখে বুঝলাম, খুব কম সময় তিনি বিছানায় ছিলেন। আমাদের জাগিয়ে আবার তিনি মুছল্লায় দাঁড়ালেন। খুব কাছে থেকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর নামায পড়া দেখতে থাকলাম; নামায পড়া তো নয় যেন গোপন অভিসারে মিলিত হওয়া। সালাম ফিরিয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি এমন আদরের একটি শব্দ বললেন যে, আমি আনন্দে আত্মহারা হলাম।

হযরতকে এভাবে এত নিকট থেকে আর কখনো দেখিনি। আসলে সফর এবং বিশেষ করে হজ্বের সফর অনেক বড় নেয়ামত। এ সময় সবার মাঝে অন্যরকম একটা নৈকট্য থাকে। অনেক বড়কেও তখন অনেক কাছের মনে হয়; যেন ইচ্ছে করলেই ধরা যায়, ছোঁয়া যায়। পুরো সফরে হযরতের যে নিকটসান্নিধ্য পেয়েছি এবং তাঁকে যত কাছের মনে হয়েছে, আগে বা পরে কখনো এমন মনে হয়নি। তবিয়তে কোন জালাল ছিলো না, ছিলো শুধু জামাল আর জামাল। ইচ্ছে হতো কাছে, আরো কাছে যাই। মাঝে মধ্যে এমন আব্দারও করে বসতাম, অন্যসময় যা কল্পনা করাও সম্ভব ছিলো না। আরো আনন্দের কথা, কখনো কখনো হযরতও 'আব্দার' করতেন ঠিক

শিশুর মত। নিজেকে তখন মনে হতো বড় ভাগ্যবান। হায়, জীবনের এমন সুখ ও সৌভাগ্যের দিনগুলো স্মরণ করেই হয়ত বলা হয়–

'সাকাল্লাহু তিলকাল আইয়াম'

(জীবনের সেই মধুর দিনগুলোকে হে আল্লাহ! তুমি শিশিরসিক্ত করে রাখো)

হে আল্লাহ! তুমি যদি জীবনের এই সব দিন-রাত নিয়ে নাও, আর ফিরিয়ে দাও তোমার এই বান্দার পবিত্র সান্নিধ্যের অল্পক'টি দিন-রাত, নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো।

হায়, বড় মধুর দিনগুলো যেন শুকনো পাতা হয়ে ঝরে গেলো জীবন-বৃক্ষ থেকে; তার কিছুটাও যদি থেকে যায় আমলনামায় তো আলহামদু লিল্লাহ!

***

তাহাজ্জুদের আযানের বেশ আগে আমরা তিনচারজন হযরতের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। বলা উচিত, হযরতের পিছনে রওয়ানা হলাম। তাঁকে মনে হলো খুব তাজাদম। বেশ দ্রুত হাঁটছেন। এ হাঁটা বলে দেয়, ইনি এখন অজানা কোন অভিসারের অভিসারী! একজন বৃদ্ধ কোন্ শক্তিবলে এভাবে হাঁটতে পারেন! সম্ভবত এটাকেই বলে মনযিলের চৌম্বুকাকর্ষণ। আমাদের মত যুবকদেরও কষ্ট হচ্ছিলো তাঁর পিছনে চলতে। অথচ তিনি বলেছিলেন, আমরা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাবো!

হযরতের পৌঁছার একটু আগে মসজিদের দরজা খোলা হয়েছে। বাবুস্-সালাম দিয়ে প্রবেশ করে তিনি যিয়ারাত করলেন। দিনের দৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এখনকার দৃশ্য। যিয়ারতকারী সংখ্যায় খুব অল্প। নির্জন নাহলেও নির্জনতার আত্মসমাহিত একটি পরিবেশ বিরাজমান। অপূর্ব এক পুলক অনুভূত হলো ভিতরে। যেন শোনা গেলো একটি সাদর আহ্বান, 'এসো এসো সালাম নিবেদন করো! শাফা'আতের আরজি পেশ করো! রহমতের নবীর দয়া ও করুণার ছায়া গ্রহণ করো!'

দিনে ছিলো অদ্ভুত এক ত্রস্ততা, এখন অপূর্ব এক প্রশান্তি ও স্থিরতা! দাঁড়াও, আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকো! এখন কেউ তোমাকে বলবে না সরে যেতে। মনের যত আকুতি, হৃদয়ের যত ব্যথা-বেদনা বলে যাও নীরবে অশ্রুর ভাষায়! প্রতি ফোঁটা অশ্রু এখানে মুক্তার চেয়ে মূল্যবান! তোমার প্রেমহীন অশ্রুর হয়ত কোন মূল্য নেই, কিন্তু যুগ যুগের অসংখ্য আশিকানের চোখ থেকে ঝরা অশ্রুর সঙ্গে মিশে গিয়ে তোমারও অশ্রু হয়ে যাবে মূল্যবান।

হযরত বলেছিলেন, প্রতিটি যিয়ারাতকে মনে হবে নতুন ভাবের, নতুন অনুভবের এবং নতুন স্বাদ ও নতুন প্রাপ্তির। আজ রাতের নির্জনতার যিয়ারাতে তাঁর সে কথা অত্যন্ত সত্য হয়ে উদ্ভাসিত হলো আমার সামনে। হৃদয়-মন আপ্লুত হলো অন্যরকম এক আত্মিক প্রশান্তিতে।

যিয়ারাতের পর হযরত রাওযাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাতে দাখেল হলেন। সেখানে তখন সত্যি সত্যি এক জান্নাতি পরিবেশ। এদিকে যিকিরের, ওদিকে তিলাওয়াতের মধুর গুঞ্জন! এখানে দু'আ ও মুনাজাতের, ওখানে কান্না ও রোনাযারির অনুচ্চ ধ্বনি!

অন্তর এমনিতেই পবিত্র হয়ে ওঠে! হৃদয় আপনাতেই বিগলিত হয়ে যায়! এরকম সুমধুর গুঞ্জনই হয়ত থাকবে জান্নাতে, হৃদয় ও আত্মার আনন্দ যা শতগুণ বাড়িয়ে দেবে!

উসতুয়ানা আবু লুবাবার কাছে হযরতের জায়গা হয়ে গেলো। দু' তিনজন সরে গিয়ে ইকরামের সঙ্গে তাঁকে জায়গা করে দিলো। পুরো সফরে বহুবার দেখেছি এ দৃশ্য; মক্কায়, মদীনায়, মিনায়, আরাফায়। কেউ তাঁকে চেনে না; আপনাতেই যেন তাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ইকরাম ও মুহব্বতের জাযবা পয়দা হয়ে যায়।

হজ্বের পর শুক্রবারের ঘটনা। জুমু'আর অপেক্ষায় হারামের উম্মে হানীতে হযরত বসে আছেন, এমন সময় তাঁর বের হয়ে আসার প্রয়োজন হলো। ভাবলাম, ভিতরে আর জায়গা পাওয়া যাবে না। জরুরত থেকে ফারিগ হয়ে যখন ফেরা হলো তখন খোতবা শুরু হতে বেশী বাকি নেই। কিন্তু আশ্চর্য! সবাই নিজ থেকে এমনভাবে পথ করে দিলো যে, হযরত স্বচ্ছন্দে ফিরে এলেন ঠিক আগের জায়গায়। এমনই হয়। আসমানে যখন কোন বান্দার প্রতি মুহাব্বাতের ফায়ছালা হয় তখন যমিনওয়ালাদের দিলেও তার প্রতি মুহাব্বাত ঢেলে দেয়া হয়।

ফিরে আসি আগের কথায়। রওযাতুল জান্নাহ সম্পর্কে হযরত অনেক কথা বললেন; প্রায় সবই জানা কথা। আমাদের তো আর জানার অভাব নেই! অভাব শুধু ভাবের! আল্লাহর পেয়ারা হাবীব বলেছেন–

'আমার ঘরের এবং মিম্বরের মাঝে যা, তা জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা।'

এ হাদীছ জানতাম। অনেকবার পড়েছি, শুনেছি। কিন্তু আজ স্বয়ং রওযাতুল জান্নায় বসে হযরতের পাক যবানে, এ হাদীছের স্বাদ ও লায্যতই মনে হলো অন্য রকম। রওযাতুল জান্নাহর হাদীছ যেন জান্নাতের খোশখবরের হাদীছ!

মহান ছাহাবী হযরত আবু লুবাবার তাওবার ঘটনা তিনি এমনভাবে বর্ণনা করলেন, পুরো ঘটনা যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো। কল্পনার চোখে যেন দেখতে পেলাম, হযরত আবু লুবাবা নিজেকে বেঁধে রেখেছেন খুঁটির সঙ্গে। একসময় তাওবা কবুল হলো এবং তাঁর কোমরের বাঁধন খুলে দেয়া হলো।

হযরত যখন উসতুয়ানাতুল-হান্নানার ঘটনা বললেন; আল্লাহর নবীর বিচ্ছেদব্যথায় উসতুয়ানাতুল-হান্নানা কীভাবে কাঁদলো এবং আল্লাহর নবী মিম্বর থেকে নেমে এসে কীভাবে সান্ত্বনা দিলেন, তখন নিজের অজান্তে উসতুয়ানাতুল-হান্নানার দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম, আর ভাবলাম, তাহলে তো এই মানবজীবনের চেয়ে ঐ জড়জীবন অনেক বেশী সৌভাগ্যের!

একটি কাষ্ঠখণ্ড নবীর বিরহে কাঁদে! তোমার অন্তর যদি না কাঁদে মদীনার জন্য, নবীর যিয়ারাতের জন্য, তাহলে কী মূল্য এমন জীবনের!

পাথরের পাহাড় ভালোবাসে আল্লাহর নবীকে! তোমার হৃদয় যদি ভালোবাসতে না পারে, তোমার দিলে যদি মুহাব্বাত না থাকে তাহলে কী মূল্য এমন মৃত হৃদয়ের! এমন মুরদা দিলের!

কী বললে! তুমি আশিকে রাসূল! তোমার দিলে আছে ইশকে নবী! তোমার হৃদয়ে বয়ে যায় নবীর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার ঝর্নাধারা! তাহলে তোমার ঘরে, তোমার পরিবারে এবং তোমার জীবনে নেই কেন সুন্নাতের ছায়া?

নবীর সুন্নাত তোমার চোখের সামনে মিটে যায়, অথচ তুমি নির্লিপ্ত, তোমার দিলে লাগে না চোট!

নবুয়তের উপর হামলা আসে, যামানার মুসায়লামারা উল্লাস করে, আর তুমি নির্বিকার, তোমার হাতে ঝলসে ওঠে না তলোয়ার! তারপরো তুমি আশিকে রাসূল হওয়ার দাবীদার! ইশক ও মুহাব্বাতের এ কেমন দাবী তোমার, আমার! প্রেম ও ভালোবাসার প্রমাণ কি শুধু মুখের স্লোগান!

শোনো বন্ধু! ইশক ও মুহাব্বাত এবং প্রেম ও ভালোবাসার দাবী হলো আনুগত্য। আমি যাকে ভালোবাসবো, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকেই অনুসরণ করবো! তার প্রতিটি আচরণ এবং উচ্চারণ, আমি চাইবো আমার মাঝে যেন ঘটে এর পূর্ণ প্রতিফলন! আমার ওঠা-বসা, চলা-ফেরা ও আহার-নিদ্রা সবকিছু যেন হয় তার মত! যুগে যুগে প্রেমের জগতে এটাই হয়েছে এবং হতে থাকবে! নবীকে যারা ভালোবেসেছেন, আজীবন তারা নবীর সুন্নাতের উপর অবিচল ছিলেন! কখনো পরোয়া করেননি যুগ ও সমাজের নিন্দা-উপহাসের। বরং তাদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা ছিলো–

أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِى لِهٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ

(আমি কি আমার হাবীবের সুন্নাত ছেড়ে দেবো এই মূর্খদের জন্য?)

উসতুয়ানাতুল-হান্নানার দিকে তাকিয়ে থেকে এই সব ভাবনা অন্তরে উদিত হলো এবং হৃদয় উদ্বেলিত হলো। হযরত তাঁর ভাবের জগতে নিমগ্ন ছিলেন; আমি তা খেয়াল না করেই বললাম, হযরত, আজ এই পবিত্র স্থানে, জান্নাতের এই টুকরায় বসে দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে সুন্নাতের পাবন্দ হওয়ার তাওফীক দান করেন।

বিঘ্ন ঘটালাম, তবু তিনি বিরক্ত হলেন না। মৃদু হেসে দু'আ করলেন, আর বললেন, মিসওয়াকের ইহতিমাম করো, আর তোমার তহবন্দ টাখনুর নীচে থাকে, এদিকে খেয়াল করো। প্রত্যেক কাজে নবীর সুন্নাত কী? সুন্নাত তরীকা কোন্‌টি, তালাশ করে করে তার উপর আমল করার চেষ্টা করো এবং যারা তোমার অধীন তাদের সুন্নাতের উপর ওঠানোর মেহনত করো। শুধু দু'আ দ্বারা কাজ হয় না, দু'আর সঙ্গে আমলের মেহনতও থাকা চাই।

***

ফজরের কিছুক্ষণ পর হযরত জান্নাতুল বাকীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কিছুটা যেন ক্লান্ত। সারাটা রাত তো কেটেছে মুছল্লায় নামাযে দাঁড়িয়ে। আমরা বললাম, আজ না হয় থাক; ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন। তিনি বললেন, মিয়াঁ, আমাকে বুড়া মনে করেছো! আমার শরীর বুড়া, কিন্তু দিল জোয়ান; আসো আমার পিছনে পিছনে।

আসলে ক্লান্তি ছিলো আমাদের জোয়ানদের। বুড়োকে দেয়া পরামর্শটা ছিলো নিছক কৌশল। কিন্তু হযরত আমাদের 'জোয়ানি'র উপর দয়া না করে সতেজ পদক্ষেপে চলতে লাগলেন, আমরা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, 'বার্ধক্যের যৌবন' কাকে বলে!

জান্নাতুল বাকী হলো মদীনার প্রাচীনতম কবরস্তান। নবুয়তের যুগে আকারে ছোট ছিলো; ক্রমসম্প্রসারিত হয়ে বর্তমান আয়তন লাভ করেছে। রামাযানে দেখেছি, মাঝে অনেক বাড়ী-ঘর ছিলো; এখন ভেঙ্গে প্রায় সমান করে ফেলা হয়েছে। দূর থেকেই দেখা যায় প্রাচীরঘেরা জান্নাতুল বাকী। সম্ভবত তিনটি প্রবেশপথ। আমরা প্রবেশ করলাম মসজিদে নববীর দিকের প্রবেশপথ দিয়ে।

জান্নাতুল বাকীর পুরো এলাকায় অবাক দৃশ্য। ইরান ও অন্যান্য এলাকার শিয়া হাজীরা এখানে সেখানে তাঁবু টানিয়ে দিন-রাত বাস করে। এমনিতে তারা বেশ স্বাভাবিক। কথা বলছে, চা-কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে, হাসি-আনন্দও করছে। কিন্তু নবী-কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) এবং অন্যান্য আহলে বাইতের কবরের সামনে গিয়েই শুরু হয় অদ্ভুত আচরণ। কেউ মাটিতে গড়াগড়ি যায়; কেউ কবরের উপর 'সিজদার মত' পড়ে যায়। তাদের ফার্সি বিলাপগুলো যদ্দুর বোঝা গেলো, তাতে শিরক সুস্পষ্ট। সউদী পুলিশ ও 'মুবাল্লিগ' নরমে গরমে সবরকমে তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টায় গলদঘর্ম, কিন্তু কে শোনে কার কথা! কে মানে কার উপদেশ।

আমার মনে হয়, সউদীদের বিদ'আত প্রতিরোধের প্রচেষ্টা বিফলে যাওয়ার কারণ একদিকে যেমন ভাষাগত, অন্যদিকে তেমনি মনস্তাত্ত্বিক। যদি ফার্সি ভাষায় পারদর্শী একদল চৌকশ লোককে নিযুক্ত করা হতো, যারা হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে তাদের বোঝাতেন তাহলে এ উত্তম প্রচেষ্টা অবশ্যই উত্তম ফল দান করতো। একদিন এক শিক্ষিত ইরানীকে টুটাফাটা ফার্সি যবানে বললাম, দেখো; কারবালার ঘটনা যেমন তোমাদের কাছে তেমনি আমাদেরও কাছে হৃদয়বিদারক। আহলে বাইতের প্রতি মুহাব্বাত আমাদেরও ঈমানের দাবী। তবে শোক ও ভালোবাসা দু'টোই হতে হবে শরীয়তসম্মত। অহুদের শহীদানের প্রতি আল্লাহর নবী শোক প্রকাশ করেছেন, কিন্তু কীভাবে? মদীনার নারীদের তিনি চাচা হামযার শোকে বিলাপ করতে নিষেধ করেছিলেন। ...

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফার্সিতে যা বললাম তাতেই ভদ্রলোক বেশ নমনীয় হলেন।

জান্নাতুল বাকী হযরতের অতি পরিচিত এবং এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। হযরত হেঁটে হেঁটে যিয়ারাত করলেন এবং প্রসিদ্ধ কবরগুলোর পরিচয় বললেন। তাঁর দু'আ ও যিয়ারাত ছিলো আবেগপূর্ণ, তবে শান্ত-সংযত। তাঁর আবেগ-উদ্বেলতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিলো তিনটি স্থানে; মা ফাতেমা (রা) ও অন্যান্য আহলে বাইতের কবরের সামনে, নবীজীর দুধমা বিবি হালিমা সা'দিয়া (রা)-এর কবরের সামনে এবং তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান (রা)-এর কবরের সামনে।

আল্লাহর নবীর কত প্রিয় ছিলেন এই মযলূম ছাহাবী! একে একে দুই কন্যাকে তিনি তাঁর বিবাহে দান করেছিলেন, তাই তাঁকে বলা হতো যিন্‌নূরাইন (দুই নূরের অধিকারী)।

তাঁরই জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিলো বাই'আতে রিযওয়ান, আর আল্লাহর নবী নিজের ডান হাতের উপর বাম হাত স্থাপন করে বলেছিলেন, 'এ হাত উছমানের পক্ষ হতে।' কারণ হযরত উছমান (রা) তখন আল্লাহর নবীর প্রতিনিধি হয়ে মক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং পরপর খবর এসেছিলো, কোরায়শ তাঁকে ধরে রেখেছে; শহীদ করে ফেলেছে।

এসব ঘটনা আমাদের জানা ছিলো, অনেকেরই জানা আছে; জানা থাকে; থাকে না শুধু উপলব্ধি। জানা দ্বারা মানুষ জ্ঞানী হয়, আর উপলব্ধি দ্বারা হয় অন্তর্জ্ঞানী।

উছমান (রা)-এর কবরের সামনে হযরত যখন তাঁর শাহাদাতের মর্মন্তুদ কাহিনী বলছিলেন তখন অশ্রু শুধু হযরতের চোখেই ছিলো না, আমাদেরও চোখে ছিলো; যদিও অশ্রুর উষ্ণতা সব চোখে সমান হয় না।

যুগে যুগে আল্লাহর কত বান্দার চোখের পানি ঝরেছে এই কবরের মাটিতে, তবু কি শোধ হয়েছে এই মযলূম ছাহাবীর এক ফোঁটা রক্তের ঋণ! তিনি নিজের রক্ত ঝরিয়েছিলেন, যেন নবীর উম্মতের রক্ত না ঝরে। অনেক তলোয়ার ছিলো তখন মদীনায় মযলূম খলীফার হেফাযতের জন্য, কিন্তু আশি বছরের বৃদ্ধ খলীফার একই কথা; আমার জন্য কোন মুসলমানের রক্ত ঝরবে, তা হতে পারে না।

ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে সময়ের পর্দা যেন সরে গেলো। সময়ের পর্দা যখন সরে যায়, অতীত তখন বর্তমানের চেয়ে আপন হয়ে যায়। পরম মমতায় অতীত যেন আমাকে টেনে নিলো তার কোলে। আমি যেন দেখতে পেলাম মযলূম খলীফাকে কবরে নামানোর দৃশ্য; আমি যেন দেখতে পেলাম তাঁর রক্তভেজা কাফন।

আল্লাহর নবীর শহর এখন ফাসাদীদের দখলে। তাই অল্পক'জন মানুষ আসতে পেরেছেন মযলূম খলীফাকে শেষ বিদায় জানাতে? তারা কাঁদছেন নীরবে। মুখে শব্দ নেই, কিন্তু চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে অঝোরধারে। এত শতাব্দীর সময়ব্যবধানেও বন্ধ হয়নি সে অশ্রু ঝরা; এখনো যেন তরতাজা সেই পবিত্র রক্তের ঘ্রাণ!

খুব ইচ্ছে হলো, কবরের অশ্রুভেজা এবং রক্তভেজা মাটির স্পর্শ গ্রহণ করি। কিন্তু সংযত হলাম। হযরতের সংযম যেন আমাকেও সংযত করলো।

কবরস্তান হলো মৃতদের শহর, কিন্তু জান্নাতুলবাকীতে বিচরণ করে মনে হবে, মৃতদের এই শহরে যারা আছেন তারা জীবন্ত। তারা ঘুমিয়ে আছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকবেন, যেমন ঘুমিয়ে থাকে 'নয়া দুলহা' আনন্দের সুখশয্যায়'!

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলো জান্নাতুলবাকীর যিয়ারাতে, কিন্তু হযরতের হৃদয় এখনো যেন তৃপ্ত হলো না; তাঁর আত্মার পিপাসা এখনো যেন নিবারিত হলো না। অশ্রুসিক্ত চোখে অনেক্ষণ তিনি তাকিয়ে থাকলেন 'চিহ্নহীন' কবরগুলোর দিকে এবং দু'আ করলেন নিজের মাঝে সম্পূর্ণ সমাহিত হয়ে। আমরা শুধু দেখতে পেলাম তাঁর ঠোঁটের কম্পন এবং গড়িয়ে পড়া চোখের পানি। এভাবে যদি দেখতে পেতাম তাঁর অন্তরের

দৃশ্য! চোখের পানি অবশ্য অন্তরেরই ছবি, কিন্তু অশ্রুর ভাষা পড়ার 'বর্ণমালা' কি জানা থাকে সবার!

হযরতের পিছনে পিছনে জান্নাতুল বাকী থেকে আমরা বের হলাম অশ্রুসিক্ত চোখে, মৃত্যুর স্মরণকে সম্বল করে এবং অন্তরে জান্নাতুলবাকীতে দাফন হওয়ার আকুতি পোষণ করে। আল্লাহ যখন এতদিন এতভাবে বান্দার মনের আশা পূর্ণ করেছেন, আজকের এ আশাটুকুও পূরণ করবেন নিশ্চয়! বান্দা যেমন ধারণা করে আল্লাহ তো তেমনই আচরণ করেন! হে আল্লাহ, তোমার প্রতি আমি সুধারণা পোষণ করি, আমার আশা তুমি পূর্ণ করবে। তোমার নবীর শহরে আমাকে তুমি শাহাদাতের মওত দান করবে এবং তোমার নবীর প্রতিবেশে জান্নাতুলবাকীতে আমার কবর হবে। আমীন।

হযরতের দিল জোয়ান এবং তাঁর বুড়ো শরীর রূহের শক্তিতে বলীয়ান, একথা সত্য; তারপরো তিনি বেশ ক্লান্ত ছিলেন। একটি গাড়ী ঠিক করে হযরতের দুই ছাহেবযাদা তাঁকে নিয়ে মুসাফিরখানায় চলে গেলেন।

আজ এতদিন পর এই সফরনামা লিখতে বসে মনে পড়লো, হযরত একদিন চানমিয়া সওদাগরের মুসাফিরখানায় বসে বলেছিলেন, 'দুনিয়ার এই বিরাট মুসাফিরখানায় রয়েছে ছোট ছোট মুসাফিরখানা।'

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরো জীবনটাই তো মুসাফিরের জীবন! কিন্তু আমরা বড় গাফিল মুসাফির।

***

হযরত চলে গেলেন মুসাফিরখানায়, আমি কিছুক্ষণ বসে থাকলাম জান্নাতুলবাকীর দেয়ালের ছায়ায়। বড় ভালো লাগছিলো মৃতদের শহরের ছায়ায় এই নিঃসঙ্গ সময়টুকু। কিন্তু না, আমাকে উঠতেই হলো। কারণ জীবনের অনিবার্য উপদ্রব এই যে, তুমি যত গভীর তত্ত্বকথাই ভাবো এবং যত সুন্দর কবিতাই লেখো, সময়মত ক্ষুধা ও পিপাসা তোমাকে পেরেশান করবেই। কারণ তুমি জড়দেহের মানুষ এবং তোমার মধ্যভাগে রয়েছে উদর নামের একটি গহ্বর। খাদ্য ও পানীয় হচ্ছে তোমার শরীরের জ্বালানী। এটা তোমাকে সরবরাহ করে যেতেই হবে, কী ঢাকায়, কী মক্কা-মদীনায়। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। পরবর্তী উপসর্গটি আরো ভয়াবহ এবং তা থেকেও তোমার মুক্তি নেই। কারণ তুমি 'গন্দম খাওয়া' আদমের বেটা! সুতরাং এটা কোন সমস্যা নয়। কিন্তু আমি সমস্যায় পড়ে গেলাম। কারণ উপদ্রব ও উপসর্গ, দু'টো দুর্বলতা একসঙ্গে হানা দিলো। আর সঙ্গত কারণেই তারতীব রক্ষা করা সম্ভব হলো না। প্রথমে খাদ্যপরবর্তী উপসর্গ থেকে মুক্ত হলাম, তারপর শূন্য উদরে খাদ্যজ্বালানী সরবরাহ করলাম। উদর যে পরিমাণ পূর্ণ হলো, পকেট সেই পরিমাণ শূন্য হলো। এটা প্রকৃতির বিধান; ত্যাগ ছাড়া ভোগ সম্ভব নয়। যখনই আমরা ত্যাগ ছাড়া ভোগে প্রবৃত্ত হই, জীবনে অশান্তি দেখা দেয়।

নাস্তার পর নিজেকে বেশ তাজাদম মনে হলো। রামাযানে হাতে সময় ছিলো না, তাই ইচ্ছে থাকলেও মদীনার পথে পথে বিচরণ করার সুযোগ ছিলো না। অথচ আমার স্বপ্ন

ছিলো, মদীনার পথে পথে এবং অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াবো। কারণ এ শহরের ধূলিকণায় জড়িয়ে আছে আনছার-মুহাজির ছাহাবা কেরামের পদস্পর্শ! এখানে পথের ধূলায় খেলা করেছেন মা ফাতিমার কলিজার টুকরো, পেয়ারা নবীর চোখের মণি ইমাম হাসান-হোসায়ন! এই মদীনার পথের ধূলো কতবার উড়েছে ঘোড়সওয়ার মুজাহিদীনের আসা-যাওয়ায়!

হয়ত তুমি বলবে, এখন কোথায় সেই সব স্মৃতিচিহ্ন মদীনায়?! আমি বলবো, সময়ের প্রাচীর অতিক্রম করো; বর্তমানের স্থূল বন্ধন ছিন্ন করে অতীতের পথে যাত্রা করো, তুমি খুঁজে পাবে সব স্মৃতিচিহ্ন। তুমি দেখতে পাবে নবীর মদীনার সব দৃশ্য। ঐ যে মাঠে ছেলেরা খেলা করছে; ছোটাছুটি করছে, বর্তমানের চোখে যদি দেখো, এরা আজকের মদীনার শিশু, আর যদি অতীতের চোখে তাকাও তাহলে এদেরই মাঝে তুমি দেখতে পাবে সে যুগের মদীনার শিশুদের ছবি। একটি ছেলে তার নামের শেষে বললো, 'আলআনছারী'। আচ্ছা বলো তো, এই ছেলেটির মাঝে তুমি কি দেখতে পাও না মু'আওয়ায ও আফরার, কিংবা সামুরা ও জুন্দুবের ছবি! কিংবা তোমার কি মনে পড়ে না সেই এতীম দুই বালকের কথা, যারা মসজিদে নববীর জন্য আল্লাহর নবীকে দান করতে চেয়েছিলো তাদের একটুকরো জমি!

আল্লাহর শোকর, মদীনার পথে পথে আমি কিন্তু দেখতে পেয়েছি সে যুগের সোনার মদীনাকে। এখানে সেখানে কাঁচা পাকা ঘর, মাঝে মাঝে খেজুর বাগান এবং মিষ্টি পানির কূপ। আধুনিক পণ্যসম্ভারে সুসজ্জিত আজকের মদীনার বাজারে আমি দেখতে পেয়েছি সেযুগের মদীনার বাজার, যেখানে বিক্রেতা লাভ করেন এবং ক্রেতা লাভবান হন; যেখানে দোকানদার বিক্রি করেন এবং তিলাওয়াত করেন; যেখানে খরিদ্দার খরিদ করেন এবং যিকির করেন।

আমার প্রিয় ভাই, মদীনার যিয়ারাতে গিয়ে সাবধান! বর্তমানের ধাঁধায় হারিয়ে যেয়ো না। আসমানছোঁয়া ইমারত ও দালানকোঠায় বিভ্রান্ত হয়ো না। দোকানে দোকানে সাজানো পণ্যসম্ভার ও স্বর্ণালঙ্কার দেখে ভুলে যেয়ো না, তোমার লক্ষ্য আজকের মদীনা নয়, অতীতের মদীনা। বাইরের চোখ বন্ধ করে ভিতরের চোখ খুলে দেখো, সময়ের পর্দা সরে যাবে এবং অতীতের রাজপথ ধরে তুমি পৌঁছে যাবে নূরানী যুগের নূরের মদীনায়। তখন তুমি ধন্য হবে এবং তোমার প্রাপ্তির পাত্র পূর্ণ হবে।

এই যে বারবার বলছি সময়ের ব্যবধান অতিক্রম করে বর্তমান থেকে অতীতে ফিরে যাওয়ার কথা, এটা কিন্তু আমার নিজের কথা নয়; এটা শুধু বড়দের কথা বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেয়া।

এক আরবদম্পতি সম্ভবত প্রয়োজনীয় কেনাকাটার জন্য এসেছে। কিছু মানুষ থাকে, প্রথম দর্শনেই তাদের সম্পর্কে মন সাক্ষ্য দেয়, এরা 'মানুষ'! এখানেও আমার মন সাক্ষ্য দিলো এবং নিজের অজান্তেই এগিয়ে গেলাম। সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি মদীনার বাসিন্দা! তিনি অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, হাঁ; আমি আউস গোত্রের ... শাখার লোক। চৌত্রিশ সিঁড়ি উপরে আমার দাদা হলেন ... (রা)।

আমি রোমাঞ্চিত হলাম। শ্রদ্ধায় অভিভূত দৃষ্টিতে তাঁকে নতুন করে দেখলাম। কোলের শিশুটিকে দেখিয়ে অনুনয়ের স্বরে বললাম, আমি কি... (রা)-এর পঁয়ত্রিশতম বংশধরকে একটু কোলে নিতে পারি?

তিনি মৃদু হেসে বললেন, অবশ্যই।

হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ দ্বারা সিক্ত করে শিশুটিকে কোলে নিলাম। আবার .. আবার আমি কোলের শিশুটিকে আশ্রয় করে অতীতের কোলে ফিরে গেলাম। এ শিশুটি তো সে যুগের মদীনার ঐ সকল শিশুদেরই প্রতিনিধি, যারা তাদের শৈশবে আল্লাহর রাসূলকে দেখেছে! এমনকি হয়ত ...

মদীনায় নতুন শিশুকে তো বরকতের জন্য আল্লাহর নবীর কাছে আনা হতো, আর তিনি খেজুর চিবিয়ে, পবিত্র থুথু মিশিয়ে শিশুটির মুখে দিতেন। এ শিশুটি তো ঐসকল ভাগ্যবান শিশুরই প্রতিনিধি! আমি তার মাথায় মখমল-চুলে আলতো করে হাত বুলিয়ে ঐ শিশুদের স্পর্শ অনুভবের চেষ্টা করলাম। আমি শিশুটির মাথার ঘ্রাণ নিলাম। কে জানে, হয়ত এরকমই ছিলো তাদেরও মাথার ঘ্রাণ!

মন চাইছিলো তাকে কিছু দান করি! কিন্তু কী দেবো আমি! কী দিতে পারে মদীনার এক গরীব মুসাফির! শিশুটির রক্তের কাছে হৃদয়ের সবটুকু মিনতি নিবেদন করে গভীর আবেগে তার গোলাপরাঙ্গা গালে শুধু একটি কোমল চুম্বন এঁকে দিলাম। ফুলের মত সুন্দর শিশুটি অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে! আশ্চর্য! কোন শিশুর চোখের চাহনি হতে পারে এমন মায়াকাড়া! কিন্তু সে চোখের তারায় এবার আমি অতীতের ছায়া দেখতে পেলাম না, বরং আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো আমার শিশুকন্যার ছবি। মদীনার শিশুর মুখাবয়বে সুদূর বাংলাদেশের কোন শিশুর মুখচ্ছবি! কী আশ্চর্য মধুর অনুভূতি যে জেগেছিলো তখন আমার মনে! এমন দুর্লভ অনুভূতির মুহূর্ত জীবনে বারবার আসে না। যখন আসে হৃদয় থেকে কখনো তা মুছে যায় না। সুখের এবং সৌভাগ্যের স্মৃতি হয়ে রয়ে যায় চিরকাল।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এই নম্র, বিনয়ী ও স্মিতভাষী মানুষটির সঙ্গে পথের সামান্য কথা থেকে গভীর অন্তরঙ্গতা হয়ে গেলো। তার নাম শায়খ আছিম বিন আব্দুল জাব্বার। তিনি তার 'পরিচয় বিতাকা' এগিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার বিশুদ্ধ ভাষা এবং আরবীয় উচ্চারণ সত্যি আমাকে মুগ্ধ করেছে। বিশুদ্ধ আরবী ভাষা তো এখন খোদ আরবদের মাঝেই 'আজনবী' হয়ে গেছে। তুমি যদি আমাদের বাড়ীতে আসো তাহলে আমার বৃদ্ধ পিতা খুশী হবেন।

আমি বললাম, এ আন্তরিকতার জন্য তোমাকে জাযাকাল্লাহ। কিন্তু আমি আমার শায়খের সঙ্গে এসেছি; তাঁর অনুমতি ছাড়া কোথাও যেতে পারি না। তিনি বললেন, তোমাদের মুসাফিরখানা আমি চিনি। ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল আমি তোমার শায়খের সঙ্গে দেখা করতে এবং দু'আ নিতে যাবো, আর তাঁকেও আব্বার পক্ষ হতে দাওয়াত দেবো। আশা করি, মদীনার মেযবানকে তিনি নিরাশ করবেন না।

শায়খ আছিম ও তাঁর স্ত্রী একটু দূরে তাদের গাড়ীতে উঠলেন। আমি মায়াভরা দৃষ্টিতে কোলের শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। গাড়ী দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো। একজন মাদানীর সঙ্গে এ আকস্মিক শুভপরিচয়, হৃদয় তাতে খুবই আপ্লুত হলো। আল্লাহর শোকর আদায় করলাম এবং ধীরে ধীরে মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

***

যোহরের সময় হয়ে এসেছে। নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। হযরত যেখানে বসেন সেখানে হাযির হলাম। মানুষ আসতে শুরু করেছে। সামনের খোলা চত্বর খালি। রোদের কারণে এখনো কেউ সেখানে বসেনি, একটু পরে সেটাও পূর্ণ হয়ে যাবে। হযরতের কাছে শুনেছি, তুর্কীদের আমলে মসজিদ তৈরী করার সময় এই চত্বরে খেজুর বাগান ছিলো এবং সুপেয় পানির কূপ ছিলো। পরে বাগান কেটে ফেলা হয় এবং কূপটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

সেই খেজুর বাগান এবং সেই পানির কূপ কল্পনার চোখে দেখতে চেষ্টা করলাম। নবীজীর যামানায়ও এই বাগান ও কূপ বিদ্যমান ছিলো এবং তিনি তার পানি পান করেছেন। কত ভালো হতো, এখনো যদি এই বাগানে খেজুর হতো! এখনো যদি এই কূপ থেকে পানি উঠতো! সময় বড় নির্মম হাতে সবকিছু মুছে দিতে চায়। অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে রাখতে উম্মতকে এখন সময়ের প্রাচীর অতিক্রম করা শিখতে হবে। অতীত তো আর ফিরে আসবে না, বর্তমান থেকে আমাদেরই যেতে হবে অতীতের কাছে। এ আকুতি আমাদের সামনে বারবার তুলে ধরেছেন হযরত আলী মিয়াঁ তাঁর কলমের কালিতে। আজীবন আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো, আর কিছু না হোক শুধু একটি লেখার জন্য– 'উফূদুল উম্মাহ বাইনা ইয়াদাই নাবিয়্যিহা' (নবীর দরবারে উম্মাহর প্রতিনিধিদল)। কৃতজ্ঞ থাকবো, কারণ এ আশ্চর্য লেখাটির মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন অতীতের কাছে ফিরে যাওয়ার আলোকিত পথ।

সউদী আমলে তৈরী মসজিদের এ অংশে ছাহাবা কেরামের বসতি ছিলো। মসজিদের পড়শী হওয়ার জন্য সবারই আকাঙ্ক্ষা হতো মসজিদের নিকটে বাড়ী করার। একবার দূরের এক কবীলা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে দরখাস্ত করেছিলো মসজিদের নিকটে আবাদ হওয়ার। আল্লাহর নবী তাদের বলেছিলেন, 'যেখানে আছো সেখানেই থাকো। কারণ মসজিদে আসার পথে প্রতিটি পদক্ষেপে তোমাদের জন্য আজর ও ছাওয়াব লেখা হয়।'

আল্লাহর নবীর উপদেশ তারা অম্লান বদনে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা শিখেছিলেন নবীর ইচ্ছার সামনে 'আত্মআকাঙ্ক্ষা'কে হাসিমুখে কোরবান করতে। প্রতিবছর লাখ লাখ আশিকানে রাসূল এখানে এই মসজিদে আসেন, তারা যদি এই মহান শিক্ষাটুকু এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন, কত যে ভালো হয়! জীবনের অঙ্গনে প্রতিটি কর্মে আমার ইচ্ছায় নয়, আমি চলবো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছায়। তাহলে তো মুসলিম উম্মাহর জীবন-চিত্রই পরিবর্তিত হয়ে যেতো! অন্যের কথা ভাবছি, আমি নিজেও কি

তা পেরেছি! হে আল্লাহ, তাওফীক দাও আমাকে এবং সবাইকে; যারা এসেছে তাদেকে; যারা আসবে তাদেরকে এবং যারা আসতে চাইবে তাদেরকে।

তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিলাম সবুজ গম্বুজের পানে। যত দেখি তত যেন পিপাসা বাড়ে, মধুর এক পিপাসা! সারা জীবন তাকিয়ে থাকো, তবু যেন আশা মিটবে না! তবু যেন পিপসা দূর হবে না!

আমি জানি, ঐ সবুজ এবং গম্বুজ, তার সঙ্গে নেই শরীয়তের কোন যোগসূত্র, তবু কেন হৃদয়কে তা এমন অভিভূত করে! কীভাবে কলবকে তা এমন সজীবতা দান করে! এরই নাম কি ইশক ও মুহাব্বাত এবং প্রেম ও ভালোবাসা!

সবুজ কি আমার ভালোবাসা, না শুধু ভালো লাগা, জানি না। ভালোবাসা না হোক, শুধু ভালো লাগাও যদি হয়, আমাদের মত দুর্ভাগাদের জন্য সেও তো অনেক পাওয়া। কবি হয়ত আমার মনের কথাই বলেছেন এভাবে–

হে প্রেমিক! তুমি ধন্য হও তোমার ভালোবাসার সৌরভে/ আমি বেঁচে থাকতে চাই একটু সামান্য ভালো লাগার গৌরবে।

আমার তন্ময়তার মাঝে হযরত কখন এসেছেন, বুঝতে পারিনি। আযানের সমধুর ধ্বনিতে যখন ধ্যান ভঙ্গ হলো তখন লোকে সব পরিপূর্ণ এবং আশ্চর্য এক নীরবতা! বিশ্বাস করো আমার ভাই! এ আযানের সুর থেকে সবাই যেন অন্য কোন সুরের মধুরতা আহরণ করছিলো; সেই সুরের নাম তুমি যদি বলো বেলালী সুর, বলতে পারো।

এখানেই তো তিনি একদিন প্রথম আযান দিয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তমের আদেশে! তিনি এবং আরেকজন, যার শানে নাযিল হয়েছিলো 'আবাসা ও তাওয়াল্লা' !

হযরত একটু দূরে বসে আছেন। হাতে সেই পরিচিত তাসবীহ। কয়েকবার তিনি আমার হাতে তাসবীহ তুলে দিয়েছেন, কিন্তু থাকে না। একবার মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'মিয়াঁ আবু তাহের! হযরত হাকীমুল উম্মতের হাতে কলম ও তাসবীহ দু'টাই ছিলো, তুমিও চেষ্টা করো, কলম ও তাসবীহ দু'টোই হাতে রাখতে!'

বিশবছর হলো, হযরত দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর দেয়া তাসবীহ এখনো আছে আমার কাছে। আল্লাহ যেন তাওফীক দেন; হযরতের আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণ হয়; আমার হাতে যেন হয় কলম এবং তাসবীহের শুভমিলন। কলমের সেবায় যারা নিবেদিতপ্রাণ তাদের সঙ্গে তো আমার রয়েছে নিবিড় একটি বন্ধন। সেই বন্ধনকে স্মরণ করে তাদের কাছেও আমি এ আবেদন রাখতে চাই।

***

রাতে মুসাফিরখানায় হযরতকে বললাম দুপুরের ঘটনা। তিনি বললেন, 'আচ্ছা'। শায়খ আছিম যথাসময়ে এলেন এবং হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গভীরভাবে প্রভাবিত হলেন। হযরত তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করলেন, রাতের দাওয়াত। তিনি নিজে এসে তাঁকে ও তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে যাবেন।

শায়খের বাসভবন জামিয়া ইসলামিয়ার নিকটে। রাতের আলোকজ্জ্বল মদীনার আলোকিত পথে গাড়ীর সংক্ষিপ্ত সফর বেশ আনন্দদায়ক হলো। পথের দু'পাশে সবুজ বৃক্ষ ছিলো। পরিকল্পিত সবুজায়ন সত্যি মনোমুগ্ধকর! দিনে সূর্যের প্রখর তাপ থাকে, কিন্তু রাতে ঝির ঝির বাতাস দেহমন জুড়িয়ে দেয়।

শায়খের আব্বা সত্তরোর্ধ্ব শান্ত সৌম্য নূরানী চেহারার বৃদ্ধ; মদীনার বিশিষ্ট আলিম। এখন তার প্রায় সবটুকু সময় কাটে ঘরে ও কিতাবঘরে। হযরতকে তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন। হযরতও মনে হলো অন্তরঙ্গতা অনুভব করছেন। শায়খের দস্তরখান ছিলো বেশ আড়ম্বরপূর্ণ। তবে হযরতের অনুকরণে আমাদেরও আহারসংযম রক্ষা করতে হলো।

বাংলাদেশের দ্বীনী শিক্ষা এবং ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে শায়খ ও তাঁর আব্বা অনেক প্রশ্ন করলেন। হযরতের পক্ষ হতে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। অহীর কেন্দ্র থেকে বহু দূরে বাংলাদেশে ইলমের প্রচার এবং খিদমতে দ্বীনের ক্ষেত্রে আলিমসমাজের ত্যাগ ও কোরবানি এবং মেহনত ও মোজাহাদার বিবরণ শুনে তাঁরা অভিভূত হলেন। এসম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিলো বেশ অসম্পূর্ণ। তাঁরা ভাবতেন, মালের গরীব বাংলাদেশ বুঝি ইলমেরও গরীব এবং সেখানে মানুষ শুধু শিরক ও বিদ'আতে ডুবে আছে।

হযরত সদ্য ইরান সফর করে এসেছেন শুনে তারা ইরানের শিয়া বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, কিন্তু হযরত এ আলোচনায় আগ্রহী হলেন না। আমার কৌতূহল ছিলো খোমেনীর ইরান সম্পর্কে হযরতের মন্তব্য শোনার। কিন্তু তিনি দু'চার বাক্যে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। তিনি বললেন, ইরানে আলিমদের কিয়াদাত ও নেতৃত্ব কায়েম হয়েছে এবং তারা প্রশংসনীয় কিছু সংস্কার করেছেন। শাহের আমলের পর্দাহীনতা ও বেহায়াপনা ছিলো চরম। আলিমগণ কঠোরভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং নারীসমাজকে পর্দার ভিতরে এনেছেন। মনে হয় তাদের প্রতি কাওমের সমর্থন রয়েছে। তবে তাদের আকায়েদ সম্পর্কে আমার পরিষ্কার ধারণা নেই।

ইরান-ইরাক যুদ্ধ সম্পর্কে হযরত কোন মন্তব্য করতে রাজি হলেন না। জনাব আখতার ফারূক নিজে থেকে বললেন, ইরাকীরা বহু ইরানী শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, যা খুবই বেদনাদায়ক; নিজের চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন।

এ মন্তব্য হযরতের পছন্দ হয়েছে, মনে হলো না। চেহারায় অসন্তোষের ছাপ ছিলো স্পষ্ট।

শায়খ তার ব্যক্তিগত কুতুবখানা দেখালেন। বেশ সমৃদ্ধ কুতুবখানা। শায়খ বললেন, এখানে রয়েছে তিনপুরুষের সংগ্রহ। লোভ হয়েছিলো কুতুবখানাটি ভালো করে দেখার, কিন্তু সময় ছিলো না। একজন মাদানী আলিমের ব্যক্তিগত কুতুবখানা দেখার এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হওয়া আমার জন্য ছিলো খুব আফসোসের। এ

আফসোস আরো তীব্র হলো এ কথা ভেবে যে, এমন একটি কুতুবখানা হয়ত সারা জীবনেও আমার হবে না। অবশ্য আল্লাহর কুদরতের কাছে অসম্ভব কিছু নেই।

বেশ রাত করে মুসাফিরখানায় ফেরা হলো। শায়খ আছিম নিজে হযরতকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। তিনি উষ্ণ আন্তরিকতার সাথে আমার সঙ্গে মুছাফাহা করে বললেন, 'কখনো আর যদি দেখা নাও হয়, তোমার কথা আমার মনে থাকবে। তোমাদের দেশে কোরআন ও সুন্নাহর ভাষা শিক্ষাদানের সাধনায় তোমার জীবন ভাস্বর হোক, কামনা করি।'

***

পরবর্তী দিন ফজরের পর হযরত যিয়ারাতে রওয়ানা হলেন; আমরা তাঁর অনুগামী হলাম। যিয়ারাত মানে মদীনার কিছু ঐতিহাসিক স্থান দেখতে যাওয়া। রামাযানে মদীনা শরীফে মাত্র একদিন ছিলাম। তাই যিয়ারাতে যাওয়ার সুযোগ ছিলো না। শুধু দূর থেকে আফসোসের নযরে অহুদ পাহাড় দেখেছিলাম। আজ সে আফসোসের অবসান হলো। হযরতের সঙ্গে বিভিন্ন পবিত্র স্থানের যিয়ারাতে এবং পরবর্তীতে হজ্বের সমস্ত আমলে যে রূহানী সুকূন ও সাকীনা এবং ফায়য ও ফায়যান অনুভূত হয়েছিলো, তার সত্যি কোন তুলনা নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে সঙ্গ ও ছোহবতের রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। আল্লাহর নেক বান্দাদের ছোহবত ও সঙ্গ হৃদয় ও আত্মাকে যেমন সজীবতা দান করে তেমনি আমলের মাঝেও সৃষ্টি করে রূহ ও প্রাণ। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

(তোমরা রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো)

আরো ইরশাদ হয়েছে–

كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

(তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন করো।)

যারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবত-সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁরাই হলেন ছাহাবা। এই ছোহবতের ফযীলত এমন যে, শ্রেষ্ঠ তাবেঈও আদনা দরজার ছাহাবীর সমমর্যাদার নন। কারণ তাবেঈর ইলম ও আমল নবীর ছোহবতধন্য নয়। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের পর উম্মতকে ছোহবত দান করেছেন ছাহাবা কেরাম। তাই তাবেঈনের মর্যাদা তাবয়ে তাবেঈনের উপরে। যুগপরম্পরায় উম্মতকে এই ছোহবত দান করে এসেছেন নবীর ওয়ারিছ ওলামায়ে উম্মত। এই ছোহবত ছাড়া না ঈমান পূর্ণতা লাভ করে, না আমলে সজীবতা আসে।

আল্লাহর শোকর, জীবনের অন্তত একটি হজ্ব ও যিয়ারাত হযরত হাফেজ্জী হুযূর (র)-এর ছোহবতে আদায় করার তাওফীক হয়েছিলো। পরবর্তী হজ্ব ও যিয়ারাতগুলোর সঙ্গে এর পার্থক্য আমার মত নাদান ইনসানও বুঝতে পারে। বাকী কবুল করার মালিক আল্লাহ।

হে প্রিয় ভাই, তুমি যখন বাইতুল্লাহর মুসাফির হবে, আমি প্রার্থনা করি, আল্লাহ যেন তোমাকে কোনা আল্লাহওয়ালার ছোহবত দান করেন এবং মকবুল হজ্ব ও যিয়ারাত নছীব করেন। আমীন।

মদীনা শরীফ থেকে কোবার মসজিদে যেতে পায়ে হেঁটে চল্লিশ মিনিট লাগে। কোবা হচ্ছে নবীজীর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের প্রবেশপথ। মদীনায় প্রবেশ করার পূর্বে তিনি চৌদ্দ দিন কোবায় অবস্থান করেছিলেন। কোবার মসজিদই হলো আল্লাহর নবীর হাতে তৈরী প্রথম মসজিদ। কোবার মসজিদ ও তার জনপদের সঙ্গে আমাদের নবীজীর ছিলো অত্যন্ত মুহাব্বাতের সম্পর্ক। মাঝে মাঝে তিনি মদীনা থেকে কোবায় আসতেন, কখনো সওয়ারিতে, কখনো পায়দাল। এ কারণেই আল্লাহর বান্দাগণ মদীনা যিয়ারাতের সময় কোবার মসজিদে হাযির হন এবং দু'রাকাত নফল আদায় করেন। রামাযানে একঝলকের জন্য কোবার মসজিদ দেখেছিলাম, আর আফসোসের দহনে দগ্ধ হয়েছিলাম। আজ আল্লাহ সৌভাগ্য দান করেছেন তাঁর এক মাকবূল বান্দার ছোহবতে কোবার মসজিদে হাযির হওয়ার এবং দু' রাকাত নামায আদায় করার। শোকর আলহামদু লিল্লাহ।

কোবায় হযরতকে আমরা এক নতুনরূপে দেখতে পেলাম। আমাদের মাঝে থেকেও যেন তিনি ছিলেন না আমাদের মাঝে। বর্তমানকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন সুদূর অতীতে। বাহ্যিক জগতে আমরা ছিলাম তাঁর ছোহবতে, কিন্তু আত্মার জগতে তিনি নিজে যেন লাভ করছিলেন অন্য কোন ছোহবতের ফায়য ও ফায়যান। নামাযে ও মুনাজাতে এখানে তাঁর যে আত্মসমাহিত রূপ দেখেছি তার সত্যি কোন তুলনা নেই। জীবনের সৌভাগ্য, এ মুনাজাতে আমিও দু'হাত তুলেছিলাম এবং নিজের ভিতরে প্রাপ্তির অব্যাখ্যাত একটি আশ্বাস লাভ করেছিলাম।

কোবার মসজিদ এখন এক শানদার ইমারত। পুরো মসজিদে মূল্যবান গালিচা বিছানো। আশিকীন-যাইরীনের আগমনে গমগম পরিবেশ। মুনাজাতের পর হযরত স্মৃতিচারণ করলেন তাঁর প্রথম জীবনে প্রথম দেখা কোবা মসজিদের। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত ছিলো আলোর অন্যরকম এক আভা। অতীতের সঙ্গে যত বেশী একাত্ম হওয়া যায়, এ আলোর আভা অন্তরে ও বাইরে তত বেশী উদ্ভাসিত হয়। অতীত কিন্তু মুছে যায়নি সময়ের অবয়ব থেকে; শুধু লুকিয়ে আছে বর্তমানের আবরণে। এ আবরণ যদি সরাতে পারো তাহলেই তুমি দেখতে পাবে অন্যরকম দৃশ্য এবং শুনতে পাবে অন্যরকম আওয়ায।

ধীরে ধীরে এক মধুর স্বপ্ন-আবেশ থেকে আমাদের হযরত যেন জাগ্রত হলেন এবং বর্তমানের মাঝে ফিরে এলেন। তিনি আমাদের দেখতে পেলেন এবং মৃদু মধুর একটি হাসি উপহার দিলেন। সে পবিত্র হাসিতে, মনে হলো আমাদেরও জন্য কিছু আশ্বাস ছিলো। আমরা যে তাঁর সঙ্গে! আমরা যে তাঁর পিছনে!

কোবার মসজিদে হযরত সেদিন নামায পড়েছেন, মুনাজাত করেছেন এবং অশ্রুবর্ষণ করেছেন। আমরাও নামায পড়েছি, মুনাজাত করেছি এবং আমাদেরও চোখ

অশ্রুবঞ্চিত ছিলো না, কিন্তু .. এবং এই 'কিন্তু'টুকুই হলো এক বিশাল মরুভূমি, যার একপ্রান্তে আমরা, অন্য প্রান্তে তিনি। এ মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আমাদেরও যেতে হবে অন্য প্রান্তে, অন্তত চেষ্টা তো করতে হবে! কিন্তু বড় গাফেল, বড় দুর্ভাগা আমরা!

***

এরপর দুই কিবলার মসজিদ। এখানে দু'রাকাত নামায পড়ার আগে হযরত কিছু কথা বললেন। খোলাছা হলো–

'এখানে আসা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে নিষেধও নয়। কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে যে, কেন আমরা এই মসিজদে আসি? কী শিক্ষা এখান থেকে আমরা নিতে চাই? প্রথম কেবলার চিহ্নিত স্থানটি দেখিয়ে হযরত বললেন, 'তখন বাইতুল মুকাদ্দাস ছিলো মুসলমানদের কিবলা। ছাহাবা কেরাম এখানে ইমামের পিছনে বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে নামায আদায় করছিলেন। সে অবস্থায় কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাযিল হওয়ার খবর এসে পৌঁছলো। বলা হলো, বাইতুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে বাইতুল্লাহকে কিবলারূপে গ্রহণ করো। এরপর কোন প্রশ্ন নয়, নয় কোন দ্বিধা-সংশয়। নামাযের মাঝেই তাঁরা কিবলা পরিবর্তন করলেন এবং বাকি নামায কাবামুখী হয়ে আদায় করলেন। আর কিছু নয়, শুধু আল্লাহর নবীর দূত এসে খবর দিয়েছেন। এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের সামনে পূর্ণ তাসলীম, সেই স্মৃতিকে স্মরণ করার জন্যই এখানে আমাদের আসা। যিন্দেগির সকল ক্ষেত্রে ইতা'আত ও আনুগত্যের এই জাযবা এখান থেকে আমরা নিতে চাই।'

মোটামুটি এই ছিলো হযরতের বক্তব্য। এরপর আমরা দু'রাকাত নামায পড়লাম, মুনাজাত করলাম এবং নতুন এক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে অহুদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

এখানে এবং কোবার মসজিদে বিশাল খেজুর বাগান ছিলো, ছায়াঘেরা বড় শান্ত পরিবেশ ছিলো। মদীনার খেজুর বাগানের প্রতি কবির কবিতায় উচ্ছ্বাস দেখেছি। সেই কবিতা আবৃত্তি করে নিজেও উচ্ছ্বসিত হয়েছি, কিন্তু ছায়াঘেরা খেজুর বাগান যে মনকে এমনভাবে টানে, হৃদয়কে এভাবে বিগলিত করে তা আমার জানা ছিলো না! মন চাইছিলো, খেজুর বাগানের শীতল ছায়ায় কিছুক্ষণ বসি। কে জানে, আর কখনো আসা হবে কি না এখানে, এই খেজুর বাগানের সান্নিধ্যে! কিন্তু সময় ও সুযোগ ছিলো নিয়ন্ত্রিত, তাই মনের ইচ্ছাকে মনেই 'কবর' দিয়ে রওয়ানা হলাম হযরতের সঙ্গে। এরকম অনেক কবর আছে আমার মনের মাটিতে।

***

অহুদ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে গাড়ী থামলো। হযরত গাড়ী থেকে নামলেন। এখন এখানে জনপদ গড়ে উঠেছে; তখন জনবসতি ছিলো না। ছিলো শুধু অহুদ পর্বত এবং অহুদ প্রান্তর; সেই প্রান্তর, যেখানে যুদ্ধের সাজে আল্লাহর নবী হাযির হয়েছিলেন সাতশ জানবায ছাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে। কেন? শিরক ও কুফুরির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীনকে কেয়ামত পর্যন্ত যিন্দা রাখার জন্য। আজ চৌদ্দশ

বছর পর আমরা হাযির হয়েছি অহুদ প্রান্তরে আরামদায়ক গাড়ীতে করে, কেন? এই 'কেন'-এর কী জবাব আছে আমার কাছে? না, কোন জবাব নেই। তবে আমার ভিতর থেকে যেন একটি আওয়ায এলো, জিজ্ঞাসা করো তোমার হযরতকে।

এখানে একটি ছোট মসজিদ আছে। হযরত প্রথমে সেখানে দু'রাকাত আদায় করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত! অহুদের ময়দানে আমরা কেন এসেছি? প্রশ্ন শুনে তিনি আমার দিকে তাকালেন, তাঁর দৃষ্টি থেকে স্নেহ ঝরে ঝরে পড়ছিলো। তিনি বললেন, 'অহুদের ময়দানে আমরা 'আসছি' শহীদানে অহুদের পিছনের কাতারে শামিল হওয়ার জন্য; 'তা-দমে যিন্দেগি' ঈমান ও কুফুরের জিহাদে 'ছাবিতকদম' থাকার বাই'আত গ্রহণের জন্য এবং আমাদের মুরদা দিলে শাহাদাতের তামান্না আবার যিন্দা করার জন্য।'

শহীদানে অহুদের কবরগুলো এখন দেয়াল দিয়ে ঘেরাও করা। ভিতরে যাওয়ার সুযোগ নেই। দূর থেকে হযরতের সঙ্গে আমরাও যিয়ারাত করলাম। এখানে শুয়ে আছেন নবীজীর প্রিয় চাচা সাইয়েদে শুহাদা হযরত হামযা (রা)। আজ এতদিন পর সেদিনের অনুভব অনুভূতি লিখতে বসে আমার বুক কাঁপছে, হাত কাঁপছে, আমার কলম কাঁপছে! হৃদয়ের ক্ষত থেকে তখন তো রক্ত ঝরছিলো; শব্দের ভাষা কি যখমি দিলের বেদনা ধারণ করতে পারে! কলমের কালিতে কি রক্তের ঘ্রাণ আসতে পারে!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, এখানে আজ এসেছি 'দর্শক' হয়ে, অথচ একদিন এখানে হক-বাতিলের মাঝে ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিলো। আল্লাহর নবীর দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে এসেছিলো; এখানে এই মাটিতে আল্লাহর নবীর রক্ত ঝরেছিলো, দান্দান শহীদ হয়েছিলো! এখানে এই মাটিতে আমার পেয়ারা নবী পড়ে গিয়েছিলেন যখমি হয়ে!

অহুদের প্রান্তরে আমরা আজ 'দর্শক', কিন্তু সেদিন এখানে শহীদানের সরদার, নবীর চাচা হযরত হামযা (রা)-এর বুক চিরে কলজে বের করা হয়েছিলো এবং সে দৃশ্য আল্লাহর নবীকে দেখতে হয়েছিলো! কেমন কষ্ট হয়েছিলো সেদিন আমার পেয়ারা নবীর!

হায়, কী মুরদা দিল নিয়ে এসেছি এখানে, এই পবিত্র ভূমিতে! অন্তরে কেন ব্যথার ঢেউ জাগে না! হৃদয় থেকে কেন রক্ত ঝরে না! এই শহীদানে অহুদের কোরবানী ও শাহাদাতের পথ ধরেই তো ইসলাম পৌঁছেছে আমাদের কাছে! এখন কি দুনিয়াতে ঈমান ও কুফুরের মোকাবেলা নেই? এখন কি যিন্দেগির ময়দানে হক ও বাতিলের লড়াই নেই? সে ময়দানে কোথায় শহীদানে অহুদের উত্তরসূরীরা?

এখানে এই মাটিতে একদিন ইতিহাস তৈরী হয়েছিলো, শাহাদাত ও কোরবানির ইতিহাস! সাতশ জানবায ছাহাবার মাথার উপর তিন হাজার তলোয়ার ঝলসে ওঠার ইতিহাস! ছাহাবা কেরাম এখানে ইতিহাস তৈরী করেছেন। সেই ইতিহাস আমরা লিখি এবং পড়ি; একটু রক্ত সিঞ্চন করে ইতিহাসকে প্রাণ দিতে পারি না, তবু দাবী করি, আমরা তাদের উত্তরসূরী!

আকাশের সূর্য সেদিনও এখানে ছিলো। কী দেখেছিলো সে এখানে সেদিন? তালহার বীরত্ব! আলীর শৌর্য! আবু দোজানার বিক্রম! ওয়াহশীর হিংস্রতা! হিন্দার পৈচাশিক উল্লাস!

নূরের ফিরেশতারা আকাশ থেকেই তো নেমে এসেছিলো এখানে তাঁকে গোসল দিতে, যিনি বাসরশয্যা থেকে ছুটে এসেছিলেন জিহাদের ময়দানে!

হে জাবালে অহুদ! তুমি তো আজো দাঁড়িয়ে আছো সেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে! তোমার পিছন থেকেই তো এসেছিলো জান্নাতের খোশবু! বলো না হে প্রিয় অহুদ! কী দেখেছিলে সেদিন তুমি! আবু জামূহের লাশ বহন করতে কেন অস্বীকার করেছিলো উট! তুমি কি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলে, যেন এখানে তোমারই ছায়ায় শুয়ে থাকেন তিনি!

তুমি কি দেখেছিলে আল্লাহর নবীর জন্য জান কোরবান করার সেই সব দুর্লভ দৃশ্য! তুমি কি দেখেছিলে সেই পুণ্যবতী ছাহাবিয়াকে, ভাই স্বামী ও পুত্রের শাহাদাতের খবর শুনেও যার মুখে শুধু একটি ব্যাকুল প্রশ্ন ছিলো, আল্লাহর নবী কেমন আছেন? তারপর আল্লাহর নবীকে দেখে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে দেখার পর আমার কোন দুঃখ নেই!

হে জাবালে অহুদ! আল্লাহর নবী তোমাকে ভালোবাসতেন; তুমিও ভালোবাসতে আল্লাহর নবীকে; সেই ভালোবাসার দোহাই, আমাকে বলো যা যা দেখেছো সেদিন! কিতাবের পাতা থেকে নয়, আমি শুনতে চাই তোমার মুখ থেকে! হয়ত তাতে আমারও কলবে পয়দা হবে জিহাদের জাযবা! শাহাদাতের তামান্না! কিতাবের পাতায় আছে শুধু ঘটনার বর্ণনা; তোমার কাছে আমি পেতে চাই ঘটনার মর্ম ও বেদনা! কিতাবের পাতা থেকে তো আসে না জান্নাতের খোশবু; আসে শুধু তোমার পিছন থেকে! এবং পায় শুধু তারা যারা ছুটে যায় তলোয়ার হাতে তলোয়ারের দিকে! হে জাবালে অহুদ, প্রতিজ্ঞা করছি, আজীবন আমি জিহাদ করবো সত্যের পক্ষে; আজীবন আমি লড়াই করবো বাতিলের বিরুদ্ধে; তোমার পিছন থেকে আসা সেই খোশবুর একটুখানি ভাগ পাওয়ার জন্য!

ভাবের জগতে তন্ময় ছিলাম; হৃদয় দুলছিলো আবেগের দোলায়; হঠাৎ ভেসে এলো কান্নার আওয়ায! কার কান্না! অহুদের কান্না! হাঁ, অহুদের কান্নাই যেন ধ্বনিত হলো আমার হযরতের কণ্ঠে! তাঁর হৃদয়নিংড়ানো মুনাজাতে। মুনাজাত তো নয়, কান্নার ঢেউ এবং অশ্রুর ঢল! আমি শরীক হলাম মুনাজাতে। আমারও হৃদয়-তটে আছড়ে পড়লো কান্নার ঢেউ! আমারও চোখ থেকে নেমে এলো অশ্রুর ঢল! আজকের দৃশ্যই যেন লিখে গেছেন পারস্যের কবি অনেক আগে এভাবে–

তোমার কান্না দেখে কাঁদি আমি, কিন্তু/ জানি না তুমি কেন কাঁদো? কিসের ব্যথা তোমার বুকে?/ এতদিন দেখেছি দীপ থেকে দীপ জ্বলে, আজ/ দেখি, চোখ ভেজে ভেজা চোখ থেকে!

দীর্ঘ সময় হযরত অহুদের ময়দানে অবস্থান করলেন। আমরা তাকে দেখতে পেলাম অন্য জগতের অন্য এক মানুষরূপে। কখনো তিনি তাকিয়ে থাকেন শহীদানে অহুদের কবরের দিকে অশ্রুসিক্ত চোখে; কখনো জাবালে অহুদের দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে। কখনো মনে হয়, কল্পনার চোখে তিনি দেখছেন অহুদের সেই সব দৃশ্য, যা সংঘটিত হয়েছিলো আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে এখানে, এই প্রান্তরে। বারবার পরিবর্তিত হচ্ছে তাঁর মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি! কখনো হর্ষ, কখনো বিষাদ! কখনো আনন্দের উদ্ভাস, কখনো বেদনার ছায়াপাত! হয়ত তাঁর অন্তরে চলছে বিভিন্ন ভাবের তরঙ্গ এবং বিভিন্ন আবেগের জোয়ার-ভাটা। হৃদয়ের গভীরে এই যে রহস্যলীলা, এটা বুঝতে পারে শুধু আশিক দিল ও প্রেমিক হৃদয়; আমাদের মত মুরদাদিল নয়। আমরা যে সঙ্গে ছিলাম এবং 'সঙ্গী' ছিলাম সেটাই তো পরম সৌভাগ্য! শুনোনি পারস্যের প্রেমিক কবির প্রেমকবিতা! –

পানের আসরে পাওনি প্রবেশপত্র/ হাতে আসেনি তোমার পানপাত্র/ একটু দাঁড়াও, দু'চোখ ভরে দেখে যাও/ মাতাল জলসার উন্মাতাল কিছু দৃশ্য।

অহুদের ময়দান থেকে বিদায়কালে হযরত আমাকে বললেন, খুব বেদনার্ত স্বরে। আজ পঁচিশ বছর পর এখনো তা কানে বড় বিষণ্ন হয়ে বাজে এবং হৃদয়ের গভীরে অন্যরকম একটি আর্দ্রতা সৃষ্টি করে। তিনি বললেন–

'মওলবী আবু তাহের! আল্লাহর নবী দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের আগে শহীদানে অহুদের যিয়ারাতে এসেছিলেন। আমি তো বুড়া, তুমি জোয়ান! তোমার যদি আবার এখানে আসা হয় তাহলে আমার পক্ষ হতে শহীদানে অহুদের উদ্দেশ্যে অবশ্যই সালাম পেশ করবে।

দুনিয়া থেকে হযরতের বিদায়ের পর যত বার এসেছি অহুদের ময়দানে শহীদানে অহুদের যিয়ারাতে, আমার মনে হয়েছে, ঐ তো হযরত দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে! ঐ তো তাঁর বিগলিত কণ্ঠে সালাম উচ্চারিত হলো শহীদানে অহুদের উদ্দেশ্যে!

হয়ত ভালো হতো, কলমকে যদি আরো সংযত রাখা যেতো! সব কথা কি বলার কথা?! সব কথা কি লেখার কথা?! তবু কলমের উচ্ছ্বাসকে, মন বলে না সবসময় মুছে ফেলতে! কিছু কল্যাণ যদি তাতে থেকে থাকে! আমাদের সবকথা, আমাদের সবলেখা আমরা যেন আল্লাহকে নিবেদন করি। যা কিছু কল্যাণ আল্লাহ যেন রেখে দেন; যা কিছু অকল্যাণ আল্লাহ যেন মুছে দেন।

***

অন্তত কিছু সময়ের জন্য অন্য রকম এক মানুষ হয়ে অহুদের ময়দান থেকে আমরা রওয়ানা হলাম হযরতের সঙ্গে। সাত মসজিদের সামনে গাড়ী থামলো কিছু সময়ের জন্য। গাযওয়াতুল খান্দাকের স্মৃতি বিজড়িত এসকল মসজিদ! কঠিন এক দুর্যোগ নেমে এসেছিলো তখন মদীনায় আল্লাহর নবী ও তাঁর ছাহাবাদের উপর। আরবের গোত্রসকল একত্র হয়েছিলো এবং দশ হাজারের বিশাল বাহিনী মদীনা ঘেরাও

করেছিলো। আল্লাহর নবী তাঁর প্রিয় ছাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শে মদীনার তিনদিকে পরিখা খনন করেছিলেন। আরবের রণকৌশলে এটা ছিলো অভিনব এক প্রতিরক্ষাব্যবস্থা! যুদ্ধের আয়োজনে ও সাজসরঞ্জামে শত্রুরা সবসময় এগিয়ে ছিলো, কিন্তু যুদ্ধকৌশলে এগিয়ে থাকতেন আল্লাহর নবী। কিন্তু আজ! কেন?! হোনায়ন-যুদ্ধকালে দু'জন ছাহাবী গোয়েন্দাবেশে প্রেরিত হলেন শামদেশে মিনজানিক ক্ষেপণাস্ত্রের কৌশল আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে! শত্রুর সমর-পরিকল্পনা থেকে সেখানেও আল্লাহর নবী এগিয়ে ছিলেন অনেক দূর! কিন্তু আজ! কেন?! কে দেবে এ প্রশ্নের জবাব?! আমার মনে হয়, 'ডক্টর আব্দুল কাদীর এবং মাওলানা আব্দুল কাদীর' উভয়কে আজ এ প্রশ্নের জবাব খুজতে হবে একত্র হয়ে!

অবিশ্বাস্য রকম অল্প সময়ে অকল্পনীয় ত্যাগ ও কোরবানির মাধ্যমে পরিখা তৈরী হলো, যা দেখে হতবাক হয়ে গেলো সম্মিলিত মুশরিক বাহিনী! হানাদার শত্রুকে এরকম চমকে দিতে পারি না কেন আমরা আজ!

পরিখাখননকালে ছাহাবা কেরামের বিভিন্ন অবস্থানের স্মৃতিস্বরূপ পরবর্তীতে এ মসজিদগুলো তৈরী হয়েছিলো। একটু উঁচু স্থানে ছোট ছোট মসজিদ, যেন নূরের আলাদা আলাদা টুকরো! হৃদয় এক অপার্থিব অনুভূতিতে সিক্ত হলো। এখানে অল্প কিছুক্ষণ অবস্থান করে হযরতের সঙ্গে আমরা মদীনায় ফিরে এলাম।

***

দুপুরে হযরতের দাওয়াত ছিলো ভাই মাছীহুল্লাহর বাসায়। তার আব্বা মাওলানা ক্বারী বেলায়াত ছাহেব হযরতের বিশিষ্ট ছাত্র। তাঁরই তত্ত্বাবধানে তিনি বাচ্চাদের কোরআন শিক্ষার নূরানী তালীম প্রবর্তন করেছেন, যা আজ বাংলাদেশে ব্যাপক মাকবূলিয়াত অর্জন করেছে।

ভাই মাছীহুল্লাহর সঙ্গে আমার পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা লালবাগ মাদরাসার ছাত্রজীবন থেকে। তিনি এখানে জামিয়া ইসলামিয়ার অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছেন এবং স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আমাকে বললেন, হযরতের সঙ্গে তাঁর সফরসঙ্গীদের দাওয়াত তো আছেই, তবে আপনাকে আলাদা দাওয়াত। এ আন্তরিকতায় আমি অভিভূত হলাম এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম।

দাওয়াত ছিলো দুপুরের। অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও তৃপ্তিদায়ক দাওয়াত হলো। প্রতিটি খাবারের স্বাদে ও ঘ্রাণে যেন দেশের জন্য মন কেমন করে। কৈ ও পাবদা থেকে শুরু করে মুগডাল ও কচুর লতি সবই ছিলো। বিছানো দস্তরখানে এবং খাবার পরিবেশনে যেমন মুহাব্বাতের প্রকাশ ছিলো তেমনি রান্নায় পরিমিত লবণের সঙ্গে অপরিমিত আন্তরিকতার মিশ্রণ ছিলো!

মদীনায় আরো কিছু দাওয়াত হযরত কবুল করেছেন, কিন্তু আজকের দস্তরখানে যেমন তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন তেমন আর দেখিনি।

যেহেতু দস্তরখানের বিষয় সেহেতু আমার কথা একটু আলাদা করে বলা দরকার। অন্যরা শুধু দুপুরের খাবার খেলেন, আমি উত্তম উপলক্ষ বিবেচনা করে দুপুরের সঙ্গে

রাতের খাবার যোগ করে নিলাম। পাবদা মাছের ঝোলটা হয়েছিলো বেশ মজাদার, আর মুগডালের মুড়িঘণ্টটা তো রীতিমত 'রসনীয়'। কচুর লতির কথা যদি বলি তো সেটা হয়েছিলো ঠিক কচুর লতির মত। মোট কথা, আলিফ থেকে ইয়া সবকিছু এমন 'মযেদার' ছিলো যে, কলমের ডগা দিয়ে না লিখে যদি জিহ্বার ডগা দিয়ে লেখা যেতো তাহলে প্রিয় পাঠক, তুমিও কিঞ্চিৎ স্বাদ পেতে পারতে!

ভাই মসীহুল্লাহ অন্য একদিন আমার প্রতি আরেকটি দয়া করলেন। মৌসুমের 'জানান্ত কর' ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে জামিয়া ইসলামিয়া দেখাতে নিয়ে গেলেন। যদিও জামিয়া তখন ছুটির নির্জনতায় বিলকুল সুনসান ছিলো তবু পুরো এলাকা ঘুরে দেখতে খুব ভালো লাগলো। পটিয়ার 'জামিয়া ইসলামিয়ায়' যখন দাওরা পড়ি তখন মদীনার জামিয়া ইসলামিয়ার নামে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলাম। মূল লক্ষ্য ছিলো মদীনার স্বপ্ন। যে কোন উপায়ে আল্লাহর নবীর শহরে হাযির হওয়ার কিসমত যেন হয়। সে আবেদনপত্রের উত্তর আসেনি, কেননা তা পাঠানো হয়েছিলো মানুষের ঠিকানায়। এ সহজ সত্য কথাটি আমরা প্রায় ভুলে যাই যে, মানুষের ঠিকানা হলো ভুল ঠিকানা। আজ আমি মদীনায় হাযির হতে পেরেছি, কারণ মদীনার আরযি আমি দাখিল করেছিলাম আসমানের ঠিকানায়। জামিয়া ইসলামিয়ার বিশাল চত্বরে দাঁড়িয়ে এসব কথা মনে পড়লো এবং অন্তরে অন্যরকম এক অনুভূতি হলো। আমার আল্লাহ যা করেন আমার ভালোর জন্য করেন; একথা আমার জন্য যেমন সত্য তেমনি সত্য তোমারও জন্য। কিন্তু সবসময় আমরা তা বুঝতে পারি না। বুঝলেও মনে রাখতে পারি না।

***

মদীনার স্বপ্নের দিনগুলো যখন স্বপ্নের মতই ফুরিয়ে আসছিলো তখন হঠাৎ করেই দেখা হয়ে গেলো আমার স্বল্প পরিচিত একজন মানুষের সঙ্গে। তার নাম মনে থাকা উচিত ছিলো; মনে নেই। তবে নাম-ঠিকানা ছাড়াও আল্লাহর কাছে কারো জন্য দু'আ করা যায়। দু'আ করি, আল্লাহ যেন তার মঙ্গল করেন। আমার হৃদয়ের সুন্দর একটি আকাঙ্ক্ষা তিনি পূর্ণ করেছিলেন, যা পরে আর কোনদিন পূর্ণ করার সুযোগ আসেনি। তিনি বহুদিন মদীনায় থাকেন। তাকে বলেছিলাম, মদীনার কোন গ্রাম এবং গ্রামের জীবন দেখার আকাঙ্ক্ষার কথা। কিতাবে পড়েছি, গ্রাম থেকে সহজ সরল লোকেরা মদীনার বাজারে আসতেন তাদের গ্রামীণ পণ্যদ্রব্য নিয়ে। আল্লাহর রাসূলের জন্য তারা গ্রাম থেকে বিভিন্ন হাদিয়া আনতেন, আর তিনি তা খুশির সাথে কবুল করতেন এবং তাদেরকে শহরের দ্রব্য হাদিয়া দিতেন।

আল্লাহর রাসূল একবার মদীনার বাজারে এক গ্রাম্য বেদুঈনের সঙ্গে সুন্দর কৌতুক করেছিলেন। তিনি তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, কে এই গোলামকে আমার কাছ থেকে খরিদ করবে?! গ্রামের সহজ সরল ছাহাবী যখন বুঝতে পারলেন, আল্লাহর নবীর পবিত্র দেহ তার শরীরকে স্পর্শ করেছে তখন তিনি আপ্লুত হয়ে

আল্লাহর নবীর সঙ্গে আরো নিবিড়ভাবে লেগে থাকলেন, আর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে তো আপনি আমাকে সস্তা পাবেন!

গ্রামের মানুষ, যাকে বলে দেখতে সুন্দর, হয়ত তিনি তেমন ছিলেন না, তাই বিষণ্ন স্বরে কথাটা বলেছিলেন, কিন্তু আল্লাহর পেয়ারা নবী স্নেহ-মমতার পরশ বুলিয়ে তাকে এমন একটি কথা বললেন, যাতে তার কিসমতের সিতারা রওশন হয়ে গেলো চিরকালের জন্য। তিনি বললেন–

وَلٰكِنَّكَ عِنْدَ اللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ – কিন্তু আল্লাহর কাছে তো তুমি সস্তা নও!

তখন থেকে মদীনার সহজ-সরল ছাহাবাদের প্রতি আমার অন্তরে সঞ্চারিত রয়েছে অন্যরকম একটি ভালোবাসা এবং তখন থেকে আমার আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহ যদি মদীনার যিয়ারাত নছিব করেন, মদীনার গ্রাম দেখতে যাবো। নিজের চোখে দেখবো, মদীনার গ্রামের মানুষ কেমন! কেমন তাদের সহজ-সরল জীবনযাপন!

আমার এই স্বল্প পরিচিত মানুষটি সানন্দে রাজি হলেন। তিনি বললেন, আমি অনেক বার গিয়েছি কাছের এবং দূরের গ্রামে। আমার পরিচিত কিছু পরিবারও আছে সেখানে। আমি নিজের গাড়ীতে করে আপনাকে নিয়ে যাবো।

মদীনার গ্রামের কথা শুনে মাওলানা হাবীবুল্লাহ মেছবাহ মিনতির সুরে বললেন, নেবেন আমাকে আপনার সঙ্গে? খুব ভালো লাগলো তার অভিব্যক্তি এবং মদীনার গ্রামের প্রতি এই অনুরাগ-অনুভূতি। হযরতের অনুমতি নিয়ে বের হলাম। শহর পার হয়ে সুপ্রশস্ত সড়কে গাড়ী যেন হাওয়ায় ভেসে চললো। এটা ছিলো মদীনার নিম্ন এলাকা। কিছু দূর পরপর বড় বড় খেজুর বাগান। অল্প কিছু তাঁবু, খেজুর পাতার ছাউনী, দু'চারটে কাঁচা ঘর; এই হলো মদীনার গ্রাম। পরিবেশের এই শান্ত নির্জনতা এবং জীবনের এই অনাড়ম্বর ছবিই বলে দেয়, এখানে যারা বাস করে তারা কত সহজ সরল হতে পারে!

ত্রিশ চল্লিশ কিলোমিটার দূরে একটি বড় গ্রামে গাড়ী থামলো। সফরসঙ্গী বললেন, এ গ্রামে আমার পরিচিত একটি পরিবার আছে। এদের আন্তরিকতা মনে রাখার মত।

মরুভূমির মুক্ত নির্মল আবহাওয়া। মূল সড়ক থেকে বেশ কিছু দূর বালুর উপর দিয়ে এসেছে আমাদের গাড়ী। নরম বালুর উপর গাড়ীর চলা বড় অদ্ভুত! চাকা দেবে দেবে যায়, আগে যেন বাড়তেই চায় না। সেখান থেকে মূল সড়কের ধাবমান গাড়ীগুলো শুধু দেখা যায়; আসছে, যাচ্ছে। এখান থেকে আওয়ায শোনা যায় না। আধুনিক জীবনের সঙ্গে সংযোগ বলতে ঐ অতটুকুই। দূর থেকে গাড়ীর নিঃশব্দ ছুটে চলা দেখতে পাওয়া! দূর অতীতের একটুকরো জীবন যেন তুলে এনে রাখা হয়েছে আমার চোখের সামনে! খেজুরবাগানের শান্ত-শীতল ছায়া আমাকে যেন সেই দূর অতীতেরই ছায়া দান করলো! একটা কূপ দেখলাম; সামান্য সামান্য পানি তোলা যায় তা থেকে। একটি বালিকা পানি তুললো, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম! আমি যেন দেখলাম সেই ভাগ্যবতী মেয়েটিকে, যে বিবি হালিমার ঘরে কুয়া থেকে মশক ভরে পানি আনতো,

আমার প্রিয় নবীও সে পানি পান করতেন। আমার প্রিয় নবী তার কোলে দোল খেতেন। হয়ত এমনই ছিলেন দেখতে সেই ভাগ্যবতী মেয়ে শায়মা!

বেশ কিছু পরিবারের বাস এই গ্রামে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে দল বেঁধে ছোটাছুটি করছে, লুকোচুরি খেলছে। এদেরই বোধ হয় বলে প্রকৃতির কোলে প্রতিপালিত মানবসন্তান।

গাড়ী দেখে ছেলে-মেয়েরা খেলা ছেড়ে গাড়ীর পাশে এসে জড়ো হলো। অবাক তাদের চাহনি, নিষ্পাপ কৌতূহল! কখনো তাকায় গাড়ীর দিকে, কখনো আমাদের দিকে। এদেশেও গাড়ী তাহলে দেখার জিনিস! যেমন আমাদের দেশে শহর থেকে দূরে প্রত্যন্ত কোন গ্রামে! নিষ্পাপ শিশুদের নিষ্পাপ কৌতূহল বড় ভালো লাগলো; আরো ভালো লাগলো তাদের মুখের বিশুদ্ধ ভাষা! যা কিছু জিজ্ঞাসা করি, হাসি মুখে উত্তর দেয়, একেবারে কিতাবের ভাষায়! তাদের ডাগর ডাগর চোখের অবাক চাহনি আমাকে মনে করিয়ে দেয় একটি হরিণশাবকের কথা, যা আমি দেখেছিলাম অনেক বছর আগে, আমার কৈশোরে। সেই আশ্চর্য-সুন্দর চাহনিটাই যেন ফিরে এসেছে মদীনার এই শিশুদের চোখে!

কিছুক্ষণ পর এক বৃদ্ধ এবং তার যুবক পুত্র আমাদের 'আহলান ওয়া সাহলান' বললেন। আরবের হাজার বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ স্বাগত সম্ভাষণ! গবেষণা করে দেখা যেতে পারে, মেহমানকে স্বাগত জানানোর এর চেয়ে আন্তরিক ও অর্থপূর্ণ সম্ভাষণ পৃথিবীর আর কোন জাতির ভাষায় আছে কি না?

'আহলান ওয়া সাহলান'– আপনি আপনার পরিবারে এসেছেন এবং কোমল ভূমিতে পা রেখেছেন। এখানে আপনার হাঁটতেও কষ্ট হবে না, থাকতেও কষ্ট হবে না। ভাব ও আবেগের এমন অপূর্ব নিবেদন দু'টিমাত্র শব্দে! 'আহলান ওয়া সাহলান'!

পিতা-পুত্র আমাদের সাদরে নিয়ে গেলেন তাদের খেজুর-ডালের ছাউনী দেয়া কাঁচা ঘরে। বাইরে যেমন গরম ভিতরে তেমনি ঠাণ্ডা! প্রাথমিক আপ্যায়ন হলো দুধ দিয়ে এবং তা আমাদেরই সামনে বকরী দোহন করে! তারপর দেয়া হলো গাছ থেকে পেড়ে আনা কাঁচা-পাকা খেজুর। পুরো থোকাটাই রেখে দেয়া হলো দস্তরখানে। পছন্দ মত খেতে থাকো পাকা খেজুর, বা কাঁচা খেজুর, যেন তুমি নিজেই গাছ থেকে পেড়ে খাচ্ছো!

সবকিছুতে এমন সাবলীল আন্তরিকতা যে, হৃদয়ের গভীরে গিয়ে স্পর্শ করে। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কথায় তারা আমাদের আগমনে তাদের খুশির অনুভূতি প্রকাশ করলেন।

মুগ্ধ বিস্ময়ে আমরা শুধু অনুভব করলাম এবং উপভোগ করলাম। আরবের তাঁবুবাসী বেদুঈনদের মেহমান-সেবার অনেক কাহিনী কিতাবে পড়েছি। সেই সব দৃশ্য যেন আমাদের সামনে একে একে জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আস্ত দুম্বা ভুনা হয়ে সামনে হাজির! ক্ষুধা ছিলো না, তবু সামান্য খেলাম। সামান্য খেলাম বলে কোন পীড়াপীড়ি নেই, আবার সবটা খেলেও আপত্তি নেই। এটাই আরব-মেহমানদারির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দু'তিন ঘন্টার মত ছিলাম মদীনার খেজুরবাগানের ছায়াঘেরা সেই গ্রামে এবং সারা জীবনের জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম একটি সুখময় স্মৃতি!

আমাদের পথপ্রদর্শক, যিনি আগেও এগ্রামে কয়েকবার এসেছেন এবং পরিবারটির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত, তিনি গ্রামের শিশুদের জন্য চকোলেট ও টফি নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলো পেয়ে শিশুরা যে আনন্দ প্রকাশ করেছিলো, তাদের চোখে-মুখে খুশির যে ঝিলিক দেখা দিয়েছিলো তা সত্যি অপূর্ব! তাদের জন্য আমাদের উপহার ছিলো সামান্য টফি, আর আমাদের জন্য তাদের উপহার ছিলো অসামান্য খুশির হাসি ও আনন্দের ঝিলিক! এখনো যা মনে পড়লে আত্মার গভীরে প্রশান্তি অনুভব করি।

ফেরার পথে মাওলানা হাবীবুল্লাহ মেছবাহ বললেন, যদি সম্ভব হয়, হযরত সালমান ফার্সী (রা)-এর বাগানে যাবো।

আমি জানতাম না, হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর বাগান এখনো আছে! সত্যের সন্ধানে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত মানুষ যত কষ্ট ভোগ করেছে, যত ত্যাগ ও কোরবানি স্বীকার করেছে তাদের মাঝে হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর মর্যাদা অনন্য। এজন্য আল্লাহর পেয়ারা হাবীব তাঁকে এতো ভালোবাসতেন যে, একবার পারস্য থেকে আগত এই ছাহাবীকে নিয়ে আনছার-মুহাজিরদের মাঝে মধুর প্রতিযোগিতা হলো। মুহাজিরগণ বললেন, সালমান আমাদের। কেননা তিনি পারস্যের স্বদেশ ভূমি থেকে হিজরত করে এসেছেন।

আনছার বললেন, সালমান আমাদের। কেননা নবীর হিজরতের আগে থেকেই তিনি মদীনার বাসিন্দা ছিলেন। আল্লাহর পেয়ারা নবী তখন বলে উঠলেন–

سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ সালমান তো আমাদের আহলে বাইতের একজন!

এমন অনন্য সৌভাগ্য ছাহাবা কেরামের মাঝে একমাত্র তিনিই লাভ করেছিলেন।

হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর সর্বশেষ ঘটনা এই যে, তিনি এক ইহুদীর বাগানে দাসরূপে কাজ করতেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পরামর্শ দিলেন মুক্তি লাভের জন্য ইহুদী বাগানওয়ালার সাথে চুক্তি করার। ইহুদী শর্ত দিলো, বাগানে নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুর-চারা রোপণ করতে হবে। তাতে যখন ফল আসবে তখন তিনি মুক্তি পাবেন। শর্তের বিবরণ শুনে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সেই বাগানে তাশরীফ নিলেন এবং আপন পবিত্র হাতে চারা রোপণ করলেন, আর আল্লাহ তা'আলা এমন বরকত দান করলেন যে, নবীর মু'জিযারূপে অতি অল্প সময়ে খেজুর গাছে খেজুর ধরলো এবং হযরত সালমান ফারসী (রা) দাসত্বের চরম কষ্টদায়ক জীবন থেকে মুক্তি লাভ করলেন।

মাওলানা হাবীবুল্লাহ মেছবাহ জানালেন, তার আব্বা (কিংবা দাদা) তাঁর যুগে যখন হজ্ব করেছেন তখন এই বাগানে এসেছিলেন। কিছু গাছ দেখিয়ে বাগানের মালিক নাকি তাঁকে বলেছিলেন, এগুলো আল্লাহর নবীর মোবারক হাতে লাগানো গাছের বংশ। আর একটি শুকনো কাণ্ড দেখিয়ে বলেছিলেন, এটি সেই গাছের কাণ্ড!

লোকপরম্পরায় খেজুরবাগানটির যখন এ পরিচয় চলে আসছে তখন তা সত্যই হবে আশা করা যায়!

বাগানটি প্রায় বে-আবাদ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, সম্ভবত অনাদর এবং অযত্নের কারণে! এর চেয়ে বড় বড় চিহ্নই তো মুছে ফেলা হচ্ছে, এটা আর বাদ যাবে কেন! ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু গাছ এখনো আছে এবং তাতে খেজুরও ধরেছে। বাগানের মালিককে পাওয়া গেলে একটা দু'টো খেজুর চেয়ে নিতে পারতাম। গাছ এবং গাছের খেজুরগুলোর দিকে আমরা মুহাব্বাতের নযরে তাকিয়ে থাকলাম, যদি জনশ্রুতি সত্য হয়!

***

আমাদের হাতে আর মাত্র একটি দিন! সুখের দিন দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়ার কথা সাহিত্যের পাতায় পড়েছি, জীবনের পাতায় কখনো তার অভিজ্ঞতা হয়নি। আজ বুঝলাম, সাহিত্যের পাতায় যা লেখা হয় তার সব অবাস্তব নয়। কীভাবে কোন্ দিক দিয়ে দিনগুলো পার হয়ে গেলো এবং রাতগুলো হারিয়ে গেলো! কী জন্য এসেছিলাম? ভুল হলো, আমি আসিনি, দয়া করে আল্লাহ এনেছিলেন। কী জন্য আল্লাহ এনেছিলেন, আর আমি কী করলাম?! জীবনের এমন সৌভাগ্যের দিনগুলো এমন গাফলতে, এমন অবহেলায় হারালাম! হায়, কবি কি আমাদের মত দুর্ভাগাদের কথাই বলেছেন তার কবিতায়? –

বাগানে ফুল ফুটেছিলো, কোথায় ছিলে প্রজাপতি!/ তুমি এলে না, ফুল ঝরে গেলো, বসন্তের হলো ইতি/ এখনো আছে বাগানে ঝরা ফুল, শুকনো পাতা/ যাও না উড়ে, শুনতে পাবে বিগত বসন্তের কথা।

স্বপ্ন দেখেছিলাম যিয়ারাতে মদীনার! স্বপ্ন দেখেছিলাম সবুজ গম্বুজের! স্বপ্নের মধুর বেদনায় কেটেছে দিনের পর দিন। জীবনের অনেকগুলো বসন্ত পার হয়েছে ফুল ও ফুলের সুবাস ছাড়া! তারপর ঝিরঝির করে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হলো, আমার স্বপ্নের বাগানে সবুজ বৃক্ষের শাখায় একটি কলি দেখা দিলো। কিন্তু স্বপ্নের কলি ফুল হয়ে ফোটার আগেই আমার দুর্ভাগ্যের ঝাপটায় তা বৃন্তচ্যুত হলো। একদিনের বাদশাহ যেমন ছিলো তেমনি ভিখারী হয়ে গেলো নিজের অবহেলায় এবং নিজের নির্বুদ্ধিতায়! কিন্তু রহমতের দুয়ার বন্ধ হলো না; রহমতের দুয়ার কখনো বন্ধ হয় না। আকাশ থেকে আবার করুণা বর্ষিত হলো। স্বপ্নের বাগানে আবার কলি দেখা দিলো এবং এবার তা পূর্ণ প্রস্ফুটিত হলো। ভিখারী আবার রহমতের নবীর দরবারে হাজির হলো। যামানার শ্রেষ্ঠ আশিকে নবীর ছোহবত লাভেরও সৌভাগ্য হলো, কিন্তু গাফলতের

ঘোর থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব হলো না। আর মাত্র একটি দিন আছে আমার সামনে।

প্রতিজ্ঞা করলাম, আজকের দিনটিতে অন্তত চেষ্টা করবো কিছু অর্জনের, কিছু ক্ষতিপূরণের। তুমি তাওফীক দান করো হে আল্লাহ!

এশার পর হযরতের সঙ্গে মুসাফিরখানায় ফিরে এলাম। আল্লাহর শোকর, আজ রাতে ডাকতে হলো না। নিজে নিজেই ঘুম ভাঙ্গলো। হযরত মুনাজাতে ছিলেন। মুনাজাত শেষে আমাদের জাগাবেন, যেমন প্রতিদিন করেন। আজ আগেই জেগেছি দেখে খুশী হলেন এবং শাবাশি দিলেন। 'বুড়োর' ডাক শোনার আগেই 'জোয়ান' জেগে যাবে, শাবাশির মত কাণ্ডই বটে!

হযরতের পিছনে পিছনে রওয়ানা হলাম। বাবুস-সালাম তখন খোলা হয়েছে। পশ্চিম থেকে পুবের সোজা পথ, যেন ছিরাতুল মুসতাকীমের বাস্তব নমুনা! দুরু দুরু বুকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম রাহমাতুল-লিল আলামীনের মহান দরবারের উদ্দেশ্যে। হযরত আমাদের সামনে, আমরা তাঁর পিছনে। এ পথের তিনি পুরোনো পথিক! এ দরবারের তিনি বৃদ্ধ প্রেমিক! তাঁর পিছনে থাকা নিরাপদ। আমরা হাঁটতে জানি না, তিনি যেভাবে হাঁটেন সেভাবে হাঁটার চেষ্টা করবো। আমরা দাঁড়াতে জানি না, তিনি যেভাবে দাঁড়ান সেভাবে দাঁড়াতে চেষ্টা করবো। দুরূদ ও সালামের নাযরানা কীভাবে পেশ করতে হয় জানি না, তিনি যেভাবে পেশ করেন সেভাবে করার চেষ্টা করবো। তাতে হয়ত আমাদেরও নাযরানা কবুল হবে! হে আল্লাহর নবী, আপনাকে সালাম! হে রাহমাতের নবী, হে পাপী-তাপীর সুফারিশকারী, আপনাকে সালাম! রোয হাশরে 'উম্মাতি উম্মতি' বলে হে বে-কারার নবী, আপনাকে সালাম! আপনাকে সালাম!

হে শ্রেষ্ঠ উম্মত, হে ছিদ্দীকে আকবার, আপনাকে সালাম! হিজরতের পথে নবীর সঙ্গদানকারী এবং নবীর জন্য সর্বস্ব কোরবানকারী হে আবু বকর, আপনাকে সালাম! আপনাকে সালাম!

উম্মতের দ্বিতীয় সর্বোত্তম হে ফারূকে আ'যাম, আপনাকে সালাম! খেজুরতলায় ধূলিশয্যায় শয়নকারী এবং তাগুত ও শয়তানের মাঝে ত্রাশ সৃষ্টিকারী হে উমার ইবনুল খাত্তাব, আপনাকে সালাম! আপনাকে সালাম!

হযরতের ছোহবতে, হযরতের পিছনে আমাদেরও যিয়ারাত সম্পন্ন হলো। হৃদয় ও আত্মা আজ অনেক বেশী তৃপ্ত হলো, অনেক বেশী প্রশান্তি লাভ করলো; আসমান থেকে যেন অন্যরকম সান্ত্বনা বর্ষিত হলো! মনে হলো গরীব বান্দার শূন্য পাত্র দেখে হয়ত দাতার দানের ভাণ্ডারে জোশ এসেছে! হয়ত ভিখারীর করুণ দশায় রহমতের দরিয়ায় জোয়ার এসেছে!

হযরত ইচ্ছা করলেন, আজ তিনি ছুফফার চত্বরে বসবেন। আমরাও তাঁর অনুগামী হলাম এবং সেখানেই তাহাজ্জুদের নামায আদায় করলাম। আরো দু'তিনবার ছুফফায় হযরতের ছোহবতে বসেছি; হযরতের যবানে আহলে ছুফফার বিভিন্ন হালাত ও ঘটনা শুনেছি। বারবার পড়া কাহিনী, বারবার শোনা ঘটনা, কিন্তু ছুফফার মাকামে হযরতের

যবানে প্রতিটি ঘটনা যেন অন্য রকম এক নূরানিয়াত নিয়ে উদ্ভাসিত হয়! কবির ভাষায়–

একই পানশালায় একই পাত্রে সেই পুরোনো শরাব/ তুমি কে হে নতুন সাকী, নতুন নেশায় মজলো শাবাব!

এটাই সত্য! শরাবের নেশা জমে সাকীর পরিবেশনগুণে। অতীতের ঘটনাবলীতে নূরানিয়াতের উদ্ভাস ঘটে, যিনি ঘটনা বলেন তার দিলের নূর থেকে। হযরত হাফেজ্জী হুযূরের ছোহবতে এসত্য বারবার উপলব্ধি করেছি। তাই একই ঘটনা হযরতের যবানে বারবার শুনতে ইচ্ছা করতো। আজো প্রতীক্ষায় ছিলাম, হয়ত তিনি কিছু বলবেন এবং বললেন। তবে অন্য কথা, এমন কথা যা কিছুক্ষণের জন্য আমাকে নির্বাক করে রেখেছিলো। আমার ভিতরে তখন অপূর্ব এক পুলককম্পন সৃষ্টি হয়েছিলো। হযরত বললেন, 'মওলবী আবু তাহের! তোমার জন্য একটি দু'আ করতে চাই, বলো কী দু'আ করবো?

হে আল্লাহ, এটা কি তোমার পক্ষ হতে নেমে আসা পরীক্ষা, না সৌভাগ্য?! আমি তো বুঝতে পারছি না, কী বলা উচিত! একবার মনে হলো, বলি, আপনার যা ইচ্ছা সেই দু'আ করুন। হঠাৎ দিলে জেগে উঠলো একটি কথা, ভয়ে ভয়ে কম্পিত কণ্ঠে নিবেদন করলাম, হযরত, দু'আ করুন, আমার যবানে এবং কলমে যেন ইলমের 'চশমা' এবং নূরের ফোয়ারা জারি হয়।

হযরত মৃদু হেসে বললেন, আচ্ছা এই দু'আ করবো, তারপর আমার নিজের পক্ষ হতে একটি দু'আ করবো।

সাহস হয়নি, তাই কখনো জিজ্ঞাসা করিনি, হযরত আমার জন্য কী দু'আ করেছেন। শুধু প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ! তোমার পেয়ারা বান্দা তোমার এই গোনাহগার বান্দার জন্য যখন যে দু'আ করেছেন, সব তুমি কবুল করো; তোমার শান মোতাবেক কবুল করো। আমীন।

আরয করলাম, হযরত! কিভাবে চাইতে হয়, কিভাবে পেতে হয়, আমি তো কিছু জানি না, আমাকে শিখিয়ে দেবেন!

তিনি বললেন, 'ইয়াহি বে-কাসী ওয়া বে-বাসী আল্লাহকে হুযূর মেঁ পেশ কর দো।'

(এই নিঃস্বতা ও রিক্ততাই আল্লাহর কাছে পেশ করে দাও) বান্দার এই মিসকীন-অনুভূতি আল্লাহর খুব পছন্দ!

এশরাক পর্যন্ত হযরত ছুফফায় অবস্থান করলেন। তারপর মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেব হযরতকে নিয়ে ফিরে গেলেন।

***

সময় যত কমে আসুক, ঘড়ির কাঁটা যত দ্রুত চলুক আমার মত গাফেল ইনসান সেখান থেকেও আরাম ও বিশ্রামের জন্য সময় কেটে নিয়ে আসে। জানি না, মৃত্যুর আগের রাত্রিটিও কি ঘুমের শিকার হবে? হে আল্লাহ, তোমার রহমতে আমার 'আনজাম' যেন নেক হয়, যারা আমীন বলবে তাদেরও।

বিশ্রামের 'আয়োজন' করছি, এমন সময় একটু দূরে দেখলাম একটি দৃশ্য! খুব সাদামাটা দৃশ্য, তবে হৃদয় ও আত্মাকে আপ্লুত করার মত দৃশ্য! দেখতেই থাকলাম! সারা জীবন দৃশ্য অনেক দেখেছি, তবে এমন নয়! দু'হাত তুলে বসে আছেন আল্লাহর এক বান্দা। ঠোঁটে কোন শব্দ নেই, আছে শুধু সামান্য কম্পন। চোখ থেকে শুধু ঝরছে টপ টপ করে অশ্রুর ফোঁটা, একটার পর একটা!

হে আল্লাহর বান্দা! জানি না তুমি কোন দেশের, কোন গোত্রের! কী তোমার ভাষা, কী তোমার পরিচয়! তবে আজীবন আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকলাম! তোমার অজ্ঞাতেই তোমার অশ্রুবিন্দুগুলো দ্বারা নিজেকে সিক্ত করে নিলাম!

খুব গভীর ঘুম ছিলো, তবু বলবো না, গাফলতের ঘুম ছিলো। কেন নিজের বিরুদ্ধে নিজে সাক্ষী দিতে যাবো! আমি তো দু'আ পড়ে বিশ্রামের নিয়তে ঘুমিয়েছিলাম! আল্লাহ যদি কবুল করেন তাহলে তো এই ঘুমই হয়ে যাবে ইবাদত! আল্লাহর রহমতের কাছে কেন আমি আশা করবো না! অবশ্যই আশা করবো।

যোহর আদায় করার পর হিসাব করে দেখলাম, আছর, মাগরিব, এশা, ফজর ও যোহর– এ পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে নববীতে আদায় করা সম্ভবত কিসমতে আছে। হৃদয়ে অদ্ভুত এক ভাবের উদয় হলো। বাকি সময়টুকু একা একা থাকবো আল্লাহর নবীর মসজিদে। কারো সঙ্গে দেখা করবো না, এমনকি হযরতের সঙ্গেও না। শুধু আমি থাকবো এবং আমার হৃদয় থাকবে। আজ আমি শুধু আমার নিঃসঙ্গতার সঙ্গী হবো। কে যেন বলেছেন, 'আব তো আ-জা, আব তো খালওয়াত হো গায়ী!'

(এখন তো এসো হে প্রিয়তম! এখন তো হয়েছে একান্ততা ও নির্জনতা!)

সকালে আল্লাহর বান্দাকে কাঁদতে দেখেছিলাম। আমি কি পারবো না দু'হাত তুলে তেমন করে কাঁদতে? তেমন করে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরাতে! মসজিদে নববীতে আমি রেখে যেতে চাই আমার শেষ কান্না, শেষ অশ্রুবিন্দু!

যদি কান্না না আসে?! শুকনো চোখ যদি অশ্রুতে না ভেজে?! এই মসজিদের শাহানশাহ বলেছেন–

فَإِنْ لَمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا

(কাঁদতে যদি না পারো, কান্নার ভান করো।)

সুবহানাল্লাহ! এর পরো কি আমরা বোঝবো না?! রাহমান রাহীম আল্লাহ দিতে চান যে কোন সুযোগে, যে কোন উপায়ে এবং যে কোন বাহানায়! তাই তো রহমতের নবীর মাধ্যমে চাওয়ার এবং পাওয়ার কত রকম কৌশল শিখিয়েছেন তিনি তাঁর বান্দাকে!

আল্লাহ যেন বলছেন, আমার নেক বান্দারা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়; আমার আযাবের ভয়ে, আমার রহমতের আশায় অশ্রুর ঝর্না বহায়। তোমার তো হে বান্দা, সে তাওফীক হয় না! তোমার বুকে তো কান্না জমে না! তোমার চোখ থেকে তো অশ্রু ঝরে না! শক্ত তোমার দিল, মুরদা তোমার কলব, অনুভূতিহীন তোমার হৃদয়!

তবু হে বান্দা, তোমাকে আমি দিতে চাই, রহমতের জোয়ারে তোমাকেও আমি ভাসিয়ে নিতে চাই! এক কাজ করো: কাঁদতে পারো না, তো কান্নার ভান করো!
কাঁদতে পারে না সবাই, কিন্তু কান্নার ভান করতে কে না পারে?! তাতেই আমি খুশী হবো। তোমার ভান দেখেই আমার দান নেমে আসবে। কান্নার ভান কেউ পছন্দ করে না, আমি করি!
আল্লাহর নবীর এ হাদীছ অন্তরে ভাবের অপূর্ব এক তরঙ্গ সৃষ্টি করলো এবং আমি উদ্বেলিত হলাম, ভাবের তরঙ্গদোলায় আমি আন্দোলিত হলাম। আশায় আমার বুক ভরে উঠলো। ভিতর থেকে কে যেন আমাকে পথ দেখালো, দরবারে নবীর আশিক তুমি হতে পারোনি, কিন্তু আশিকের ভান ধরে অন্তত একটা দিন তো তুমি অতিবাহিত করতে পারো! আশ্চর্য কী, হয়ত তাতেই আশিকানে রাসূলের দফতরে তোমারও নাম লেখা হয়ে যাবে! তিনি নিজেই তো উম্মতকে সুসংবাদ দিয়ে গেছেন, আল্লাহর কাছে আসলের যেমন কদর আছে তেমনি নকলেরও সমাদর আছে। আসল-নকল সবই তার পছন্দ, পছন্দ নয় শুধু 'ভেজাল'।
আছরের নামায হলো। সময় আরো গড়িয়ে গেলো। সবুজ গম্বুজের উপর অস্তগামী সূর্যের আলো পড়লো। এ অস্তগামী সূর্য যেন আজকের নয়, চৌদ্দশ বছরের! রাতের আকাশে তারার উদয় হলো। তারাভরা এ আকাশ যেন আজকের নয়, চৌদ্দশ বছরের। আমি! আমি আজকের, আমি বর্তমানের, কিন্তু আমার পরিচয় দূর অতীতের, চৌদ্দশ বছরের! আমি নামায পড়ি ইমারতসজ্জিত এই মসজিদে, কিন্তু সিজদা করি খেজুরপাতার সেই মসজিদে! আমি এই, কিন্তু আমি সেই!

***

এশার নামাযের পর হযরতের সঙ্গে দেখা করলাম মসজিদের ঐ স্থানে যেখানে বসে তিনি সবসময় যিয়ারাত করেন সবুজ গম্বুজের! তিনি আমার দিকে তাকালেন। কিছু যেন জিজ্ঞাসা করবেন, কিন্তু করলেন না। আমি আরয করলাম, হযরত শেষ রাতটা মসজিদে থাকতে চাই, বাইরে টিনের ছাউনীর নীচে। তিনি অনুমতি দিলেন। মুসাফিরখানায় ফিরে এলাম। কিছু শুকনো খাবার ছিলো; তিনি আমাকে দিলেন। তা নিয়ে মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।
মদীনা শরীফের প্রথম দিনই হযরত বলে দিয়েছিলেন নযর নীচের দিকে রেখে চলার কথা। তিনি বলেছিলেন, নযরের খেয়ানত সবসময় এবং সবখানেই কবীরা গোনাহ, কিন্তু হজ্বের সময় পবিত্র ভূমিতে আরো বড় গোনাহ, আরো বড় বরবাদির কারণ। কিন্তু আজ নিজের অজান্তেই ব্যাকুল ব্যথিত দৃষ্টি চারদিকের সবকিছু অনুসরণ করতে লাগলো। আগামী রাতে আমার এই পথে আর হাঁটা হবে না। মুসাফিরখানার সামনে এই যে মাঠ, সকালে-বিকালে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলাধুলা করে; সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বড়দের এবং বুড়োদের কফি ও গল্পের আসর বসে, এই মাঠ আমি আর দেখতে পাবো না! এই যে একটু দূরে আধুনিক বুকশপ মাকতাবাতুছ-ছাকাফাহ, ঐ যে ওখানে দ্বীনী কিতাবের বিশাল কুতুবখানা মাকতাবাতুল ঈমান, প্রতিদিন এখানে

ওখানে কত রকম কিতাব দেখেছি, আর কিতাব সংগ্রহের অপারগতায় আফসোস করেছি, এখানে আর আসা হবে না! মদীনার পথে পথে আর হাঁটা হবে না! মদীনার খেজুর বাগান আর দেখা হবে না! এই সব ভাবছি, আর ভিতর থেকে কেমন একটা কষ্ট, ব্যথা ও কান্না উঠে উঠে আসছে এবং সমগ্র হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম দিকের বিশাল এলাকায় টিনের ছাউনী। এটা অস্থায়ী ব্যবস্থা। মসজিদুন-নবী বিশাল আকারে সম্প্রসারিত হবে, সেই আয়োজন চলছে। মসজিদ আরো বড় হবে, আরো সুন্দর হবে। আরো বিপুল সংখ্যায় আশিকানে মদীনার আগমন হবে। অনেক কিছু হবে; আমি শুধু থাকবো না, আমি শুধু দেখবো না। যেদিকে তাকাই সেদিকে বিষাদের ছায়া এবং বেদনার সুর! বিদায় তো অনিবার্য। একদিন এসেছি, একদিন যেতে হবে, এ তো অমোঘ সত্য! কিন্তু বিদায় যে এত কষ্টের, এত বেদনার, এত স্পষ্ট করে তা বুঝতে পারিনি কখনো।

আবার ভাবি, আচ্ছা! এত কষ্ট হচ্ছে কেন?! মদীনার আসন্ন বিচ্ছেদ এত কাঁদাচ্ছে কেন?! মদীনার প্রতি ভালোবাসার জন্যই তো! তাহলে তো এটা আনন্দের এবং সৌভাগ্যের! তাহলে তো আমার কিসমতের সিতারা উদিত হয়েছে! তাহলে তো আমার হৃদয়-উদ্যানে প্রেমের কলি এসেছে, ভালোবাসার ফুল ফুটেছে!

এভাবে অনেকরকম ভাবের দোলায় যখন দুলছি তখন সময় কিন্তু থেমে ছিলো না, সময় কখনো থেমে থাকে না। তাহাজ্জুদের আযান হলো। আহা, আযানের সুর কী সুমধুর! যুগ যুগ ধরে মদীনার সব মুআয্যিনের কণ্ঠেই কি এভাবে ফিরে ফিরে আসে বিলালী আযানের সুর! আল্লাহর রাসূলের প্রিয় মুআয্যিন, হে সাইয়েদেনা বিলাল! আপনি শুয়ে আছেন সুদূর শামদেশের মাটিতে। আপনার কবর যদি হতো মদীনায়! জান্নাতুল বাকীতে! আল্লাহর নবী কত ভালোবাসতেন আপনাকে, জীবদ্দশায়, এমন কি মৃত্যুর পর! সুদূর শামদেশে স্বপ্নযোগে আপনার দেখা হলো আল্লাহর নবীর সঙ্গে। আল্লাহর নবী অনুযোগ করে বললেন, বেলাল! তুমি কি ভুলে গেছো আমাকে? তবে কেন মদীনায় আসো না? স্বপ্ন থেকে আপনি জেগে উঠলেন ব্যাকুল বে-কারার হয়ে। তারপর রওয়ানা হলেন সুদূর শাম থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে।

কত কঠিন ছিলো সে যুগের সফর! কঠিন ছিলো, কিন্তু বাধা ছিলো না। এখন কত আরামের সফর! আরামের, কিন্তু সহজ নয়। এখন অনেক রকম বাধা, নিয়মের অনেক বেড়াজাল।

সুদূর শামদেশ থেকে আপনি ছুটে এলেন আপনার প্রিয় মদীনায়। যিয়ারাত করলেন প্রিয় হাবীবের কবর! তারপর ঘটলো সেই ঘটনা, যা ইতিহাসের পাতায় বারবার পড়েছি, অনেকের মুখে অনেকবার শুনেছি। প্রিয় নবীর আদরের নাতি, মা ফাতেমার কলিজার টুকরা ইমাম হাসান-হোসায়ন আব্দার জানালেন আযান দেয়ার। সে আব্দার রক্ষা না করে কি পারা যায়!

অনেক দিন, হাঁ, অনেক দিন পর মদীনার বাতাসে আপনার কণ্ঠের আযান ধ্বনিত হলো, আর মদীনার ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেলো। পেয়ারা নবীর নূরানি যামানা

শুধু আপনার আযানের সুর ধরে যেন ফিরে এলো, তাই মদীনায় কান্নার রোল পড়ে গেলো। মদীনার যুবক-বৃদ্ধ সবাই ছুটে এলো। আপনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জারজার হয়ে কাঁদলো।

আপনাকে আবার ফিরে যেতে হলো জিহাদের ডাকে, কিন্তু আপনার আযানের সুর রয়ে গেলো মদীনায়! এত যুগ পরে আজো আমরা শুনতে পাই মদীনার আযানে আপনার আযানের সুর! আর দু'টি মাত্র আযান আমি শুনতে পাবো মদীনার!

বাবে সালাম দিয়ে প্রবেশ করলাম। এখন আমি যিয়ারাত করবো, তবে বিদায়ের যিয়ারাত নয়। আরো সুযোগ আছে আমার যিয়ারাত করার। আরো একবার, হয়ত আরো কয়েকবার।

সোজা পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। সামনে আজ হযরত হাফেজ্জী হুযূর নেই। তাহলে কে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন? আসল কথা শোনো বন্ধু! সবকিছু হলো পর্দা। তুমি নেককার, আমি বদকার, এটা সত্য। তবে এটাও সত্য যে, তুমি যার বান্দা, আমিও তাঁরই বান্দা। তোমাকে যিনি পথ দেখান, আমাকেও তিনিই পথ দেখান। আজ এই একা একা যিয়ারাতে আমি যেন পর্দার আড়ালের সেই সত্যকে অন্তর দিয়ে অনুভব করলাম। হাত ধরে, পথ দেখিয়ে কেউ যেন নিয়ে গেলো এগিয়ে! আমার না হলো ভয়, না হলো দ্বিধা-সংকোচ। আমি যেন একটি আশ্বাসবাণী পেলাম, চলো বান্দা, এগিয়ে চলো। আমার হাবীবের দরবারে সালামের নাযরানা পেশ করো। আদবের যদি ভুল হয়, ভয় করো না, আমি মাফ করে দেবো।

আমার আল্লাহ আমার সব, এছাড়া যা কিছু তা হলো পর্দা। আমার পেয়ারা রাসূল আমার সব, এছাড়া যা কিছু সব হলো পর্দা। পর্দার অবলম্বন অবশ্যই আমার প্রয়োজন, কিন্তু মাকছূদ আমার পর্দার আড়ালের সত্য, অন্য কিছু নয়। সেই পরম সত্যের একটুখানি স্পর্শ যেন আজ লাভ করলাম এই একা একা যিয়ারাতে।

হে আমার প্রিয় ভাই! যতবার তুমি তোমার পেয়ারা হাবীবের দরবারে হাযির হবে, যতবার তুমি সালামের নযরানা পেশ করবে, অন্তরের অন্তস্তল থেকে যদি বলতে পারো, হে আল্লাহ! আমি কিছু জানি না, তুমি আমাকে তোমার পেয়ারা হাবীবের যিয়ারাত করিয়ে দাও, তাহলে তোমার কোন ভয় নেই। তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন পেয়ারা হাবীবের দরবারে। তোমার মনে হবে, তুমি একা নও, তিনি আছেন তোমার সঙ্গে। তখন তুমি অর্জন করবে নতুন কিছু। নতুন স্বাদ, নতুন আনন্দ, নতুন অনুভব-অনুভূতি এবং আলোর নতুন উদ্ভাস! আজকের যিয়ারাত আমার জন্য নিয়ে এলো তেমনি এক নতুন প্রাপ্তির প্রশান্তি! সবই আমার আল্লাহর দান! সবই আমার আল্লাহর করুণা ও মেহেরবানি! শোকর আলহামদু লিল্লাহ!

রাওযাতুল জান্নায় বসার নছীব আবার হয় কি না হয়, যিয়ারাতের পর তাই রাওযাতুল জান্নায় প্রবেশ করলাম। তাহাজ্জুদ আদায় করে কিছুক্ষণ তিলাওয়াত করলাম। তারপর প্রাণভরে সবকিছু দেখলাম। উসতুওয়ানা আয়েশা, উসতুওয়ানা আবু লোবাবা. উসতুওয়ানা হান্নানা এবং উসতুওয়ানাতুল অফুদ, একে একে প্রতিটির উপর কোমল

করুণ দৃষ্টি বুলালাম। আল্লাহর নবীর মেহরাব দেখলাম আদব ও মুহাব্বাতের নযরে। প্রাণভরে দেখলাম সবকিছু সম্ভবত বিদায়ের দেখা।

সামনে জ্বলজ্বল করছে যেন নূরের হরফে লেখা সেই হাদীছ, সেই পরম আশ্বাসবাণী–

مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَ مِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

আমার ঘর এবং আমার মিম্বরের মাঝখানে যা আছে তা জান্নাতের একখণ্ড বাগান!

রাহমানের রাহীমানা শান ভেবে কূলকিনারা পাই না। দুনিয়াতেই জান্নাতের বাগিচা কেন সাজালেন তিনি! বান্দার প্রতি এত দয়া! এত মায়া! বিশাল কোন আয়তন নয় জান্নাতের এ বাগিচা! মাত্র কয়েক গজের ছোট্ট একটি খণ্ড! কিন্তু আল্লাহর এমন একজন বান্দা তুমি খুঁজে পাবে না, যিনি দরবারে মদীনায় এসেছেন, অথচ জান্নাতের বাগিচায় প্রবেশের এবং অন্তত দু'রাকাত নামায আদায়ের সৌভাগ্য তার জুটেনি! লক্ষ লক্ষ আশিক বান্দা আসেন এবং ঐ একটুকরো জান্নাতের বাগিচায় প্রবেশ করেন। নেককার বান্দা, তিনিও প্রবেশ করেন; গোনাহগার বান্দা, সেও প্রবেশ করে। পাপের পঙ্কিলতায় ডুবে যাওয়া বান্দা, সেও বাদ পড়ে না। আল্লাহর কুদরত ছাড়া এ কিভাবে সম্ভব! আল্লাহর দয়া ও রহমত ছাড়া এ কিভাবে সম্ভব!

আমি বিশ্বাস করি, রাহীম ও রাহমানের দয়া ও করুণার কাছে আমি আশা করি, জান্নাতের বাগিচায় একবার যে প্রবেশ করেছে, সে কিছু না কিছু পেয়েছে। এমনকি সে যার যার জন্য দু'আ করবে তারাও কিছু না কিছু পাবে!

ভাবতে খুব ভালো লাগলো, এখানে এই জান্নাতের বাগিচায় আমার বাবা এসেছিলেন! নিশ্চয় আমার জন্য তিনি দু'আ করেছিলেন! হে আল্লাহ, আমার মাকেও তুমি এখানে হাযির করো। তোমার দুয়ারে মায়ের জন্য এটি এক সন্তানের মিনতি!

হে আল্লাহ, যে ছোট্ট এক 'মা' তুমি আমাকে দান করেছো সেও যেন আসতে পারে এখানে তোমার দয়ায়।

হে আল্লাহ, আমার সন্তানকে ধারণ করে যে এত কষ্ট করেছে সেও যেন বাদ না পড়ে তোমার হাবীবের সাজানো এই জান্নাতি দস্তরখান থেকে। হে আল্লাহ, প্রসবকালে তার যে চিৎকার শুনেছিলাম অন্তত সেজন্য তাকে তুমি এ সৌভাগ্য দান করো।

একে একে সবার জন্য দু'আ করলাম। ভাইবোনদের জন্য, আসাতেযা কেরামের জন্য, আমার ছাত্রদের জন্য, বন্ধুদের জন্য এবং দুনিয়ার সকল মুসলিমের জন্য। বিশেষ করে ইরাক-ইরানের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধের জন্য।

ফজরের আগে ছুফ্ফার মজলিসে হাযির হলাম। ছুফ্ফার মজলিস সবার প্রিয় স্থান, সবারই ভালোবাসার স্থান। তবে একজন তালিবে ইলম যখন ছুফ্ফার মজলিসে হাযির হয় তখন সে যে আপনত্ব অনুভব করে, তার অন্তরে যে ভাবের উদয় হয় এবং তার হৃদয়ে আনন্দ ও পুলকের যে তরঙ্গ জাগে তার সত্যি কোন তুলনা নেই। একজন তালিবে ইলম যখন 'ওয়াবিহী হাদ্দাছানা' বলে এবং 'আন আবী হোরায়রাতা' পড়ে তখন তো সে যুগের ব্যবধান এবং দেশের সীমানা অতিক্রম করে ছুফ্ফার মাকামে

হাযির হয়ে যায় এবং আহলে ছুফ্ফার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়! এরপর দুনিয়ার মানুষের কাছে তার কী চাওয়ার এবং কী পাওয়ার থাকতে পারে?!

***

ফজরের পর 'সেই স্থানে' হযরত হাফেজ্জী হুযূরের খিদমতে হাযির হলাম। হযরত কলজে ঠাণ্ডা করা একটি কথা বললেন। এই শুভ্র-পবিত্র মানুষটি আমার অনেক স্খলনের কথা জানতেন, বুঝতেন, তবু স্নেহ করতেন। বলতে পারো, সাদা রুমাল দিয়ে তিনি আমাকে ঢেকে রাখতেন। যত দিন দুনিয়াতে ছিলেন আমাকে মুহাব্বাত করেছেন এবং আমার তরক্কীর ফিকির করেছেন। কিন্তু .. আলো কিভাবে তোমার পথ আলোকিত করবে, তুমি যদি চোখ বন্ধ করে রাখো। হয়ত আমার চোখ বন্ধ ছিলো, নইলে এমন আলোর স্পর্শ লাভ করেও কেন আমি আজ ..! তবে আল্লাহর রহমত থেকে আমি কখনো নিরাশ নই।

হযরত বললেন, আজ রাত্রে আমি তোমার রূহানি তরক্কীর জন্য অনেক দু'আ করেছি। হযরত যখন একথাগুলো বলছিলেন, তাঁর দৃষ্টি ছিলো সবুজ গম্বুজের দিকে। আমার চোখে তখন আনন্দের অশ্রু; আমিও তাকালাম অশ্রুসিক্ত চোখে সবুজ গম্বুজের দিকে। আমি বললাম, হযরত আমিও রাওযাতুল জান্নায় আপনার জন্য দু'আ করেছি।

হযরত হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী দু'আ করেছো?

বললাম, দু'আ করেছি, আল্লাহ যেন দুই মুসলিম দেশের মাঝে রক্তপাত বন্ধে আপনার মেহনতকে কবুল করেন। হযরত খুশী হয়ে বললেন, আমীন।

আরয করলাম, হযরত! বিদায়ের সময় যত করিব হচ্ছে কলবের ব্যথা-বেদনা ততই যেন বেড়ে চলেছে। আর যেন সহ্য হতে চায় না।

হযরত খুব স্বাভাবিকভাবে বললেন। যেন খুব সাদামাটা একটা কথা, যা সবাই জানে এবং বোঝে এমনভাবে বললেন এবং আমার সারা জীবনের জন্য তা আলোকবর্তিকা হয়ে গেলো। তিনি বললেন, 'তুমি বিদায় হবে কেন?! সারা যিন্দেগির জন্য তুমি মদীনায় থেকে যাও। জিসিমের দুনিয়ায় যেখানেই থাকো, কলবের জাহানে মক্কায় এবং মদীনায় বাস করো; তখন দেখবে, বিছাল ও ফিরাক (মিলন ও বিরহ) তোমার কাছে একরকম হয়ে গেছে।'

সুবহানাল্লাহ! রহস্যের নতুন এক জগৎ যেন আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেলো, যা এত দিন ছিলো একেবারে অজানা। আমি যেন নবজন্ম লাভ করলাম, আমি যেন এক নতুন বর্ণমালার পাঠ গ্রহণ করলাম।

***

মদীনার শেষ আযান শুনলাম। যোহরের পর হযরত আমাদের বিদায়কালের জরুরি নছীহত করলেন। বললেন, 'দেখো: আমাদের তো মদীনায় আসার এবং থাকার কোন যোগ্যতা ছিলো না। মদীনায় আসার যোগ্যতা ছিলো যাদের তাঁরা তো এখানে শুধু নূর দেখতেন। এটা তো শুধু আল্লাহর ফযল ও করম যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর হাবীবের দরবারে হাযির হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। কিন্তু আমরা মদীনার কোন আদব

রক্ষা করতে পারি নাই। রাওযা আতহারের শান বজায় রাখতে পারি নাই। আমাদের দ্বারা শুধু বেহুরমতি হয়েছে। তাই এখন আমাদের শরমিন্দা হওয়া দরকার, আফসোস করা দরকার, তাওবা ও ইসতিগফার করা দরকার, যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের সব কুছূর মাফ করে দেন। তিনি যেন আপন হাবীবের ফুয়ূয ও বারাকাত দ্বারা আমাদেরকে মালামাল করে দেন। আমরা যেন খোশনছীব হয়ে মদীনা থেকে বিদায় নিতে পারি।'

স্বাভাবিক কিছু কথা, যে কেউ বলতে পারে, যে কেউ শুনতে পারে এবং যে কোন কিতাব থেকে হাছিল করা যেতে পারে। কিন্তু কথা যখন বের হয় কলব থেকে তখন প্রতিটি শব্দ হয়ে যায় নূর এবং শ্রোতার কলবকে দান করে নূরানিয়াত। আমাদের মত মুরদা দিলেও যেন সেই নূরানিয়াতের কিছুটা ছায়াপাত হলো। আমরা যেন নতুন এক অনুভব-অনুভূতি লাভ করলাম।

এবার বিদায় যিয়ারাত। ফুরিয়ে গেলো স্বপ্নের দিনগুলো এবং সৌভাগ্যের মুহূর্তগুলো। এবার বিদায় সালাম। যারা অনেক পেয়েছে তারা শেষ মুহূর্তের প্রাপ্তি ছাড়তে রাজি নয়। যারা কম পেয়েছে তারা শেষ মুহূর্তে আরো কিছুটা পেতে চায়। যারা কিছুই পায়নি তারা ভাবছে, অন্তত শেষ মুহূর্তে যেন কিছু পাওয়া যায়। মোটকথা, আশায় বুক বেঁধে আমরা সবাই হযরতের পিছনে এগিয়ে চললাম, আমাদের কাফেলা আজ বিদায় কাফেলা! প্রতিদিন যেমন ছিলো, আজো আশিকানে রাসূলের তেমনি মউজ, তেমনি তরঙ্গ! দুরূদ ও সালামের তেমনি সুমধুর গুঞ্জন! গতকাল যেমন ছিলো আজো তেমনি আছে, আগামীকালও তেমনি থাকবে; শুধু আমরা থাকবো না।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। এই মহান দরবারের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপ যেন জীবনের শেষ পদক্ষেপ! একটু একটু করে যেন ফুরিয়ে আসছে! আমি যেন ফুরিয়ে যাচ্ছি!

এসে গেছি! হযরতের পিছনে পিছনে আমরা এসে গেছি রাওযা শরীফের মাকামে বিদায় সালাম জানাতে! কিন্তু আশ্চর্য! বিদায়ের এবং বিচ্ছেদের বিষাদ-বেদনার কোন চিহ্ন নেই হযরতের মুখমণ্ডলে! তাঁর আজকের মত এমন শান্ত-সমাহিত রূপ আর দেখিনি। আমি নিজে তো জানি না কিছু, বুঝি না কিছু; প্রেম কাকে বলে? প্রেমিকের বিদায় কেমন? কাকে বলে ইশকের খুশি-গম? কেমন হয় আশিকানের বিদায় সালাম? তাই হযরতকে দেখে তাঁর অনুকরণ করাকেই নিরাপদ মনে হলো। হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ে সুপ্ত রেখে, ভিতর থেকে উথলে ওঠা কান্নাকে সংযত করে আমিও শান্ত-সমাহিত রূপ ধারণের চেষ্টা করলাম।

জিসমের বিদায় হলেও এ তো কলবের বিদায় নয়! দেহের দূরত্ব হলেও এ তো হৃদয়ের দূরত্ব নয়!

যেখানেই থাকি, আমি এখানেই আছি এবং ইনশাআল্লাহ এখানেই থাকবো নবীর পবিত্র জীবন অনুসরণের মাধ্যমে, নবীর সুন্নাহর উপর আমল করার মাধ্যমে এবং নবীর রেখে যাওয়া দ্বীনের জন্য জিহাদ ও মুজাহাদার মাধ্যমে! সুতরাং আমার এ বিদায় তো বিদায় নয়, মিলনেরই অন্য রূপ!

হযরত বিদায় সালাম আরয করলেন, আমরাও করলাম–

اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

তাঁর গলার আওয়ায কি একটু কম্পিত হলো! ভিতরের কম্পন কি কণ্ঠস্বরেও প্রকাশ পেলো! হয়ত তাই! অর্থাৎ বাইরে তাঁর শান্তরূপ, কিন্তু ভিতরে চলছে ভাবের ঢেউ, আবেগের তরঙ্গ এবং বিচ্ছেদ-বেদনার অনলপ্রবাহ! এসবেরই ক্ষীণতম আভাস যেন পেলাম তাঁর সালাম আরযের কম্পিত কণ্ঠস্বরে! আর তাতেই আমার সংযম শিথিল হয়ে গেলো; আমার নীরব কান্না শব্দ হয়ে বের হলো এবং দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ঢল নেমে এলো। আমি আত্মহারা হলাম, তবে খুব সামান্য সময়ের জন্য। আবার আমার সবকিছু সংযত হলো, আবার আমি দুরূদ ও সালাম আরয করলাম–

اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

হঠাৎ মনে হলো, আল্লাহর যিনি হাবীব তিনি তো রাহমাতুল লিল আলামীন! তিনি তো রাহমাতের নবী! তিনি তো শাফা'আতের নবী! তাঁর শাফা'আত ছাড়া তো উম্মাতের কোন গতি নেই! সুতরাং পেয়ারা নবীর রাহমাত ও শাফা'আতের কথা স্মরণ করে আবার দুরূদ ও সালাম আরয করলাম–

اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

তারপর সালাম আরয করলাম প্রথম খলিফা হযরত ছিদ্দীকে আকবার এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত ফারূকে আ'যামের খিদমতে।

এর পর আমাদের হযরত হুজরা শরীফের ডান দিক দিয়ে কদম মোবারাকের দিকে এসে বসলেন। এখানে অনেক্ষণ তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। কিসের ধ্যান, কিসের মগ্নতা, তা জানার সাধ্য কোথায় আমাদের! শুধু মনে হলো, হযরতের সঙ্গে যদি না হতাম তাহলে নবীজীর কদম মোবারাকের সামনে বসার সৌভাগ্য আমাদের হতো না। জানতেই পারতাম না, এখানে বসা যায়! এখানে পাওয়া যায়! উম্মতের সৌভাগ্যবান যারা যুগে যুগে এই পাক কদমের ছায়ায় বসেছেন তারা। বহু যুগ আগে বলে গেছেন নবীর প্রেমিক কোন এক কবি–

নাই বা হলো তোমার কদমের দীদার/ নাই বা পেলাম তোমার কদমের 'গোবার'/ ঠাঁই তো পেলাম কদমের নীচে তোমার!/ এ-ই তো 'কপাল' আমার, কপাল আমার!

হযরতের ধ্যাননিমগ্নতা সমাপ্ত হলো। তাঁর মুখমণ্ডলে আমাদের স্থূল চোখেও যেন নতুন এক জ্যোতির্ময়তা দেখতে পেলাম, হয়ত কদম মোবারাকের সান্নিধ্যের জ্যোতির্ময়তা! তখন আমরা সঙ্গে ছিলাম এ অনুভূতি এখনো হৃদয়ে আনন্দের পুলকশিহরণ জাগায়! বাবে জিবরীল দিয়ে বের হয়ে হযরত একটু দাঁড়ালেন। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে পূর্বদিকে তাকিয়ে থাকলেন। ধীরে ধীরে তাঁর চোখ আবার অশ্রুসিক্ত হলো। বুঝলাম, তিনি জান্নাতুলবাকীর সৌভাগ্যবান বাসিন্দাদের স্মরণ করছেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে সালাম নিবেদন করছেন। তারপর তিনি সবুজ গম্বুজের দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, আর

তখনই তাঁর চোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়লো। তাতে আমাদেরও হৃদয় বিগলিত হলো এবং আমাদেরও চোখ থেকে অশ্রুর ধারা নেমে এলো।

***

এবার আমরা রওয়ানা হবো মক্কার পথে পবিত্র হজ্বের উদ্দেশ্যে। আমার জীবনের প্রথম হজ্ব! স্বভাবতই অন্তরে অদ্ভুত এক শিহরণ জাগছে বারবার! যে সৌভাগ্য আমারই নির্বুদ্ধিতায় হাতছাড়া হতে চলেছিলো, আল্লাহর অশেষ দয়া ও রহমতে আবার তা আমার কিসমতের দুয়ারে উপস্থিত! জাহিল বান্দাকে আর কতভাবে তুমি রহম করো হে মাওলা!

তোমার রহম ও করম দেখে মনে বড় আশা জাগে; এভাবেই তোমার অধম বান্দা যত, তাদের তুমি টেনে টেনে নিয়ে যাবে হে আল্লাহ! আমরা পথ হারাবো, তুমি পথ দেখাবে! আমরা ভুল করবো, তুমি শোধরে দেবে! তুমি যে রাহীম! তুমি যে রাহমান!

মদীনা শরীফ থেকে বিদায়ের বেদনা অন্তরে অবশ্যই ছিলো, কিন্তু এ আনন্দেও অন্তর পরিপূর্ণ ছিলো যে, এখন আমাদের সফর হবে আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে, লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইকের ঝাণ্ডা নিয়ে! আগামী সূর্যোদয়ের আগেই ইনশাআল্লাহ আমাদের নছীব হবে বাইতুল্লাহর দীদার! হৃদয়ের গভীরে বেদনার সঙ্গে আনন্দের এই যে অপূর্ব মিলন তার অনুভব অনুভূতি অন্তত আমার পরিচিত কোন বর্ণমালায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শুধু প্রার্থনা করি হে ভাই, এই মিলনের স্বাদ ও শান্তি আল্লাহ যেন তোমাকেও দান করেন। তখন শুধু ভুলে যেয়ো না এ অভাগা ভাইকে! মাটির উপরে, কিংবা নীচে যেখানেই থাকি, তোমার কাছ থেকে কিছু উপহার যেন আমার নামে আসে। যুগের যত দীর্ঘ ব্যবধান হোক তোমার আমার মাঝে, আমি তোমার জন্য হে ভাই দু'আ করেছি, তুমিও আমার জন্য দু'আ করো।

ধীরে ধীরে সবুজ গম্বুজ থেকে দূরে চলে এলাম। চলে আসতে হলো। বারবার ফিরে তাকাই এবং দেখতে পাই! একসময় আর দেখতে পেলাম না। তবু বারবার ফিরে তাকাই এবং মিনার দেখতে পাই! এক সময় আর দেখতে পেলাম না। হৃদয়ের পর্দায় তবু যেন আছে সবুজের ছোয়া! আমার হাবীব! আবার আমি আসবো, ইনশাআল্লাহ আবার আমি আসবো!

তৃতীয় পর্ব

হজ্বের কাফেলায়

মুসাফিরখানায় এসে হযরত আমাদের একত্র করলেন। ইহরামের মাসায়েল বয়ান করলেন। হজ্বের হাকীকত ও ফযীলত আলোচনা করলেন। মনে হলো হযরত যেন পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত আদায় করলেন। বিদায় হজ্বে রওয়ানা হওয়ার সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবা কেরামকে হজ্ব সম্পর্কে হিদায়াত দান করেছিলেন।

নিজের জন্য এটি বড় সৌভাগ্যের বিষয় মনে হলো যে, জীবনের প্রথম হজ্বের সফর মদীনা শরীফ থেকে শুরু হচ্ছে! নবীজীর বিদায় হজ্বের সফর তো মদীনা থেকেই হয়েছিলো! এতটুকু সাদৃশ্যের বরকতে হয়ত অধম বান্দার টুটাফাটা হজ্বও আল্লাহ কবুল করে নেবেন। তাঁর রহমত তো তালাশ করে শুধু বাহানা, আর এটা তো খুব সুন্দর 'বাহানা'!

মদীনার পথে যারা হজ্বের সফর করেন তাদের মীকাত হলো যুলহোলায়ফা। মদীনা থেকে এর দূরত্ব সাত আট মাইল। আল্লাহর পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবা কেরামকে নিয়ে বিদায় হজ্বের ইহরাম যুলহোলায়ফা থেকেই করেছিলেন।

আমরা বাস টার্মিনালের উদ্দেশ্যে মুসাফিরখানা থেকে বের হলাম। সউদী আরবের সরকারী পরিবহন সংস্থা 'সাবকো'-এর বাসটার্মিনাল শহর থেকে বাইরে। আমার ইচ্ছা ছিলো হযরতের পিছনে বসবো, কিন্তু সম্ভব হলো না। অন্য গাড়ীতে বসতে হলো, তবে এই ফাঁকে একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়ে গেলো। অনেক ভাবনা চিন্তার পর এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোন বিশেষণ যোগ করা থেকে বিরত থাকলাম। কারণ, যদি বলি তিক্ত অভিজ্ঞতা তাহলে পূর্ণ সত্য বলা হয় না, কেননা এ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে আমি আমার হৃদয়ের গভীরে একটি স্নিগ্ধতা অর্জন করেছিলাম। যদি বলি মধুর অভিজ্ঞতা তাহলে অর্ধসত্য বলা হয়; কারণ এ অভিজ্ঞতা আমার হৃদয়ের আবরণে ক্ষত সৃষ্টি করেছিলো এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিলো।

তুমি যদি জানতে চাও সে অভিজ্ঞতার কথা, আমি বলবো না। কারণ তাতে আমি অনেক ছোট হয়ে যাবো। তবে সেদিন যে শিক্ষা অর্জন করেছিলাম তা তোমাকে বলতে পারি; সেটা এই-

'কেউ যদি কোন মিনতি করে আমি তা রক্ষা করবো; যদি না পারি, কোমলভাবে তার মিনতি তার হাতে তুলে দেবো, কিন্তু তার মনে ব্যথা দেবো না, এমনকি বিব্রত হওয়ার মত কোন কথাও তাকে বলবো না।'

স্খলন অবশ্যই ঘটে, তবু সেই ঘটনা স্মরণ করে এ শিক্ষা এখনো আমি পালন করে যাওয়ার চেষ্টা করি।

গাড়ীর চাকা চলতে শুরু করলো এবং আমার অন্তর দুলতে শুরু করলো। ক'দিন আগে এই আলোকনগরীতে আগমন করেছিলাম অন্তরে আনন্দের শিহরণ নিয়ে, আজ এখান থেকে আমাদের নির্গমন হতে চলেছে বিচ্ছেদ-বেদনার দহন নিয়ে। হে আল্লাহ, আগমন ও নির্গমন দু'টোই যেন হয় কল্যাণময়। জীবনের যে সোনালী দিনগুলো তুমি সোনার মদীনায় অতিবাহিত করার তাওফীক দিলে, তোমার দরবারে তা যেন কবুল হয়। হে আল্লাহ, আমার মাঝে গান্দেগি ছিলো, দুর্গন্ধ ছিলো। এই সব নিয়েই হে আল্লাহ, মদীনায় আমার আগমন ঘটেছিলো। তোমার কাছে হে আল্লাহ, সেদিন প্রার্থনা করেছিলাম, আমার সমস্ত অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধ থেকে মদীনাকে তুমি পাকছাফ রাখো এবং মদীনার পবিত্রতা দ্বারা আমাকে পবিত্র এবং মদীনার সুবাস দ্বারা সুবাসিত করে দাও। হে আল্লাহ, তোমার প্রতি সুধারণা, আমার দু'আ তুমি কবুল করেছো এবং মদীনার পবিত্রতায় পবিত্র এবং মদীনার সুবাসে সুবাসিত হয়ে আজ আমি মদীনা হতে বিদায় গ্রহণ করছি।

***

দেখতে দেখতে যুলহোলায়ফার মীকাত এসে গেলো। এখন এটি বীরে আলী নামে পরিচিত। বাংলাদেশের হাজীদের ধারণা, এটি হযরত আলী (রা)-এর কূপ। এখানে এসে তারা সেই কুয়া তালাশ করে এবং না পেয়ে হতাশ হয়। প্রথম কথা, এখানে একসময় যে কুয়াটি ছিলো এখন তার অস্তিত্ব নেই। কালের করাল গ্রাসে অনেক কিছু হারিয়ে যায়; সময়ের স্রোতে অনেক কিছু ভেসে যায়। মদীনা শরীফে পূর্বযুগের অনেক কুয়া এখন নেই; নেই অনেক প্রসিদ্ধ খেজুরবাগানের অস্তিত্ব। তের শতকের বিখ্যাত কিতাব 'আখবারুল ওয়াফা'-এর পাতায় পাতায় মদীনার যে চিত্র পাওয়া যায়, যে চিহ্ন ও স্মৃতিচিহ্নের উল্লেখ দেখা যায় তার কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। সেই নুরানি যুগের সাক্ষী হয়ে অটল অবিচল আছে শুধু পাহাড়-পর্বতগুলো। তাও বা সময়ের থাবা থেকে রক্ষা পেলো কোথায়! প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এখানেও সমানে চলছে পাহাড়-কর্তন।

তো বলছিলাম, বীরে আলীর কোন অস্তিত্ব এখন এখানে নেই। দ্বিতীয়ত যা ছিলো সেটি হযরত আলী (রা)-এর কুয়া নয়, বরং অনেক পরের যুগে আলী নামের অন্য কোন ব্যক্তির কুয়া।

মদীনায় একটি কুয়া অবশ্য এখনো আছে পরিত্যক্ত অবস্থায়, যার পানি আমাদের পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করেছিলেন। সে কুয়া আমরা দেখেছি। কুয়াটি দেখে আমার মনে হয়েছে, যদি যত্ন করা হতো তাহলে সেই কুয়ার পানি এখনো পাওয়া সম্ভব হতো। উম্মত যেখানে নবীর সুন্নাতই ছেড়ে দেয়, সেখানে নবীর স্মৃতি ধরে রাখার প্রেরণা আর আসবে কোত্থেকে?!

এক সময় এখানে যুলহোলায়ফায়– এমনকি হযরত হাফেজ্জী হুযূরের প্রথম হজ্বের সময়ও– হাজীদের ইহরাম গ্রহণের কোন সুব্যবস্থা ছিলো না। পানির ইন্‌তিযাম ছিলো নামমাত্র। গোসল করার কথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিলো না। ছোট ও জীর্ণ একটি মসজিদ ছিলো শুধু। তাই তখন অনেকেই মদীনা শরীফ থেকে গোসল করে ইহরাম বেঁধে নিতো। আবার অনেকে ইহরামের লেবাস পরতো মদীনায়, কিন্তু ইহরাম ধারণ করতো এখানে যুল্‌হোলায়ফায়।

গোসল করা অবশ্য ফরয বা ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। গোসলের সমস্যা হলে শুধু অযু করাই যথেষ্ট। আর ইহরামের লিবাস পরা দ্বারাই মানুষ মুহরিম হয়ে যায় না। ইহরাম শুরু হয় দু'রাকাত নামাযের পর ইহরামের নিয়তে তালবিয়া পড়া দ্বারা। এ বিষয়টি মনে রাখা খুব জরুরি। ইহরাম যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে তো পুরো হজ্বই বাতিল, সবকিছু বেকার। বহু হাজীর কথা শুনেছি এবং নিজের চোখে কিছু দেখেছি, ইহরাম সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান নেই, অথচ দিব্বি 'আলহাজ্ব' হয়ে দেশে ফিরে আসছেন! সারা জীবনে একবার মাত্র ফরয, ইসলামের এ মহাগুরুত্বপূর্ণ রোকনটি সম্পর্কে আমাদের এমন অবহেলা ও অজ্ঞতা সত্যি মর্মান্তিক।

যার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে তার প্রথম কর্তব্য হলো একজন অভিজ্ঞ আলিমের নিকট হজ্বের গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল জেনে নেয়া। তারপর হজ্বের আহকাম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন কিতাব সঙ্গে রাখা, যাতে প্রয়োজনে তা থেকে সাহায্য নেয়া যায়। সবচে' ভালো হয় বিশ পঁচিশজনের একটি কাফেলায় একজন আলিমকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া, যিনি হজ্বের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল বিষয়ে সফরসঙ্গীদের সাহায্য করতে পারেন।

একথাগুলো এখানে বিশেষভাবে বলার কারণ যুলহোলায়ফায় দেখা একটি ঘটনা। ইহরাম গ্রহণ করে সকল যাত্রী যখন বাসে ফিরে এসেছেন তখন জানা গেলো ভারতের সম্ভবত রাজস্থানের এক হাজী ছাহেব শুধু ইহরামের লিবাস পরে চলে এসেছেন। না অযু, না গোসল, না নামায, না ইহরামের নিয়ত, আর না তালবিয়া। এমনকি তালবিয়া কি 'বস্তু' সেটাই জানা নেই বেচারার। আরো আশ্চর্যের বিষয়, হাজী ছাহেবের যারা সফরসঙ্গী তারা কেউ খেয়াল করেননি। আমাদের সফরসঙ্গী মাওলানা হাবীবুল্লাহ মেছবাহ 'হাজী বেচারা'র সঙ্গে আলাপ করে বিষয়টি জানতে পারেন। পরে গাড়ীর চালককে অনেক করে বুঝিয়ে গাড়ী ফেরানো হয় এবং হাজী ছাহেবকে যথা নিয়মে ইহরাম করানো হয়।

মাওলানা হাবীবুল্লাহ মেছবাহ এখন দুনিয়ায় নেই। আল্লাহ তাকে বেলা-হিসাব জান্নাত নছীব করুন। হজ্বের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছি, পরিচিত-অপরিচিত, বাংলাদেশী-অন্যদেশী হাজীদের হজ্বের খোঁজ খবর নিতেন। আল্লাহর রহমতে বহু হাজীর হজ্ব তার ওছিলায় ছহী-শুদ্ধ হয়েছে। আমার বিশ্বাস, অনেক হজ্বের ছাওয়াব তার আমলনামায় সেবার জমা হয়েছিলো। যেসকল আলিমকে আল্লাহ হজ্বের তাওফীক দান করেন, আমি মনে করি, এটা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।

ফিরে আসি আমাদের নিজেদের কথায়, নিজেদের চিন্তায়। যুলহোলায়ফার সমস্ত ব্যবস্থা এখন অত্যন্ত উন্নতমানের। অযুখানা, গোসলখানা ও ইস্তিনজাখানা যেমন আরামদায়ক তেমনি পর্যাপ্ত এবং মহিলা ও পুরুষদের সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা। এমনকি সুগন্ধি সাবানও রয়েছে গোসলখানায়।

স্বাস্থ্যগত দিক লক্ষ্য করে হযরত হাফেজ্জী হুযূরকে গোসলের পরিতবর্তে শুধু অযু করার পরামর্শ দেয়া হলো। হযরত মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, এই যুলহোলায়ফায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করে ইহরাম গ্রহণ করেছেন, আর আমি অধম উম্মতি এত আরামের ইন্তিযাম থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুসরণ করবো না!

হযরত পূর্ণ ইতমিনানের সঙ্গে গোসল করলেন। অথচ আমার মত যুবক 'ভিড়ের' ভয়ে গোসল না করার চিন্তা শুরু করেছিলাম। মাসআলার অবকাশ অবশ্যই রয়েছে, তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হজ্ব কিন্তু মাসআলার নাম নয়; হজ্ব হলো ইশক ও মুহাব্বাত এবং প্রেম ও ভালোবাসার নাম। হজ্বের প্রতিটি আমলের মাধ্যমে বান্দাকে প্রমাণ করতে হয় যে, সে এখন যুক্তি ও বুদ্ধির খোলস থেকে বের হয়ে এসেছে। সে এখন হৃদয়ের রাজ্যে এবং প্রেম ও ভালোবাসার জগতে প্রবেশ করেছে। প্রতিটি পদে ও পদক্ষেপে এখন সে তালাশ করবে যে, আল্লাহর নবী কীভাবে হজ্ব করেছেন? কোথায় কোন্ আমল কীভাবে আদায় করেছেন। প্রতিটি আমলে সে অনুসরণ করবে তার নবীকে, অন্তত অনুসরণ করার চেষ্টা করবে, যাতে তার হজ্ব অন্তত ছুরতের দিক থেকে নবীর হজ্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। তাই আমাদের হযরত অসুস্থতা সত্ত্বেও গোসলের সুন্নত থেকে বিরত থাকতে রাজি হননি। আসলে বাইরের হজ্ব তো আমরা সবাই করি, কিন্তু ভিতরের হজ্ব ক'জন করি?!

গোসলের পর ইহরামের সাদা লেবাস পরে আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম। কালীন বিছানো বিরাট শানদার মসজিদ। লোকে লোকারণ্য। সকলে রওয়ানা হয়েছেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ডাকে মিনা-আরাফায় হাজির হওয়ার জন্য, মিল্লাতে ইবরাহীমের প্রতি আনুগত্যের নতুন শপথ গ্রহণের জন্য। আশিক ও প্রেমিকের জন্য রয়েছে আলাদা লেবাস; সেই শুভ্র-পবিত্র লেবাস তারা এখানে ধারণ করছেন। হাজার হাজার মানুষ, কিন্তু নেই কোন গোল বা শোরগোল! পূর্ণ প্রশান্ত ও ভাবগম্ভীর পরিবেশ!

ইহরামের সাদা লেবাসে পুরো মসজিদে এক অভাবনীয় সুন্দর দৃশ্য হলো। কোথাও যেন কোন কলংক নেই, কালিমা নেই; ময়লা নেই, দাগ নেই। বাইরের শুভ্রতা সবার ভিতরের জগৎকেও যেন শুভ্র-পবিত্র করে দিলো। মনে হলো মসজিদে যেন এক নূরানি জামা'আতের সমাবেশ! এরা যেন সুদূর অতীতের সেই নূরানি জামা'আতের অবশেষ! ধীরে ধীরে ভাবতন্ময়তা আমাকে এমন আচ্ছন্ন করলো যে, সময়ের ব্যবধান মুছে গেলো। অতীতের রাজপথ ধরে আমি চলে গেলাম পিছনে, অনেক পিছনে। আধুনিক সভ্যতার কোন চিহ্ন নেই সেখানে; আছে শুধু মরুভূমির বালু, আর উটের কাফেলা। আমি যেন দেখতে পেলাম সেই নূরানী কাফেলাকে। আমিও যেন স্নাত হলাম সেই নূরানিয়াতে! ঐ যে ইহরামের সাদা লেবাসে কারা দাখিল হলো, নামাযে

দাঁড়ালো, রুকু করলো, সিজদায় গেলো! কাদের নূরানি আওয়ায শুনতে পেলাম, লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক ...

লাব্বাইক ধ্বনির মাঝেই আমি আমার তন্ময়তা থেকে জাগ্রত হলাম এবং বুঝতে পারলাম, আসলে এতক্ষণ আমার ভাবনায় ও চেতনায় অতীত ও বর্তমানের লাব্বাইক ধ্বনির তরঙ্গমিশ্রণ ঘটেছিলো। কিংবা আমি বর্তমানের লাব্বাইক ধ্বনিতে অতীতের লাব্বাইক ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি শুনেছিলাম!

হযরত নামাযে দাঁড়াবেন, কাছে গিয়ে বললাম, হযরত! আমার ইহরামের লেবাস ঠিক করে দিন। হযরত মৃদু হেসে আমার চিবুক স্পর্শ করলেন এবং ইহরামের চাদরটা ঠিক করে দিলেন। এটা তো নিজেই পারতাম, আসলে অন্তরের ইচ্ছা ছিলো, ইহরামের লেবাসে হযরতের পবিত্র হাতের স্পর্শ গ্রহণ করার। স্পর্শ তো অন্য কিছু! স্পর্শই তো সবকিছু! ফুলের স্পর্শ কি তোমার মাঝে কোন অনুভূতি সৃষ্টি করে না! তাহলে ফুলের মত পবিত্র যারা, তাদের স্পর্শ কি তোমার মাঝে পবিত্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করবে না!

নামায শেষ হলো। ইহরামের নিয়ত করে হযরতের সঙ্গে আমরা তালবিয়া পাঠ করলাম। আমি আমার জীবনের প্রথম হজ্বের, ফরয হজ্বের মুহরিম হয়ে গেলাম। পরিচিত জীবন ও জগৎকে পরিত্যাগ করে আমরা নতুন লেবাসে নতুন এক জগতে প্রবেশ করলাম। আমি সেই জগতের আসল বাসিন্দা না হলেও তাদের কাতারে শামিল হয়ে গেলাম। দিলের তখনকার অনুভব-অনুভূতি কেমন ছিলো তা কীভাবে বোঝাবো?! আর মানুষকে তা বোঝানোর প্রয়োজনই বা কী?! আফসোস শুধু এই যে, জীবনের দীর্ঘ পথে চলতে গিয়ে সেগুলো নিজের মাঝে ধারণ করে রাখতে পারিনি। ইশক ও মুহাব্বাতের 'জিয়ন-কাঠি'র ছোঁয়ায় আমি যেন তখন এক জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠেছিলাম। এখন নিজেকে মনে হয় সেই জীবন্ত মানুষটির প্রাণহীন ছবি! তবু এখনো আল্লাহ যতটুকু রেখেছেন সে জন্য আল্লাহর শোকর। বান্দা যখন শোকর করে, আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দেন।

হযরত আমাদের নিয়ে মুনাজাত করলেন। হজ্বের ইহরাম গ্রহণ করে এবং ইহরামের শুভ্র লেবাস ধারণ করে আল্লাহর দরবারে এটা আমার প্রথম মুনাজাত। তখন এমনই আত্মহারা অবস্থা যে, হৃদয়ের আকুতি নিবেদন করার মত কোন শব্দ খুঁজে পেলাম না। ভিতরে ভিতরে আবেগের তরঙ্গে শুধু দোল খেলাম, আর হযরতের মুনাজাতের সঙ্গে আমীন আমীন বলে গেলাম।

মুনাজাত শেষ হলো, হযরত বললেন, হজ্বের ফযীলত তো বয়ান করে শেষ করা যাবে না; তবে আর কোন ফযীলত যদি নাও থাকে, এতটুকু ফযীলতই তো যথেষ্ট যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ্ব করেছে, আর হজ্বের অবস্থায় কোন অশ্লীলতা ও অনাচার করেনি, সে হজ্ব থেকে ফিরে আসবে ঐ দিনের মত যেদিন তার মা তাকে জন্মদান করেছে।'

সুবহানাল্লাহ! আমাদের সামনে এখন সুযোগ এসেছে সারা যিন্দেগির সমস্ত গোনাখাতা থেকে পাকছাফ হওয়ার। সুতরাং খুব হুঁশিয়ার থাকা চাই, নফস ও শয়তানের ধোকায়

যেন না পড়ে যাই এবং কোন প্রকার গোনাহ ও নাফরমানি যেন না হয়ে যায়। অশ্লীল ও ফাহেশা কথাবার্তা যেন না হয়, কারো সাথে কোন রকমের ঝগড়া-বিবাদ যেন না হয়। তুমি যদি হকের উপর থাকো তবু ঝগড়া-বিবাদ না করা চাই। দিলের মধ্যে এ কথা সর্বদা ইয়াদ রাখা চাই যে, ইহরামের লেবাস তো কাফনের লেবাস, মুরদা মানুষের লেবাস। মুরদা মানুষ কিভাবে গোনাহ করতে পারে?! মুরদা মানুষ কিভাবে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতে পারে?! মওতের মুরদা তো আমাদের হতেই হবে, তাহলে ইহরামের মুরদা আমরা কেন হতে পারবো না?! তো আজ থেকে ইহরামের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা মুরদা হয়ে গেলাম। আল্লাহ না করেন যদি কখনো ভুল হয়ে যায়, পরস্পরকে আমরা ইয়াদ করিয়ে দেবো যে, ভাই, আমরা তো এখন ইহরামের মুরদা ইনসান! সঙ্গে সঙ্গে ইস্তিগফার করে নেবো। ভুল হয়ে যাওয়া বড় খাতরার বিষয় না, বড় খাতরার বিষয় হলো ভুলের উপর গাফলাত। গাফলাত থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।'

সুবহানাল্লাহ! এসব কথা কি আগে শুনিনি! পড়িনি! কিন্তু বহুবার পড়া ও শোনা কথাগুলোই যখন হযরতের যবান থেকে বের হয়ে আসে তখন তা অন্য রকম হয়ে যায়! অন্তরের গভীরে গিয়ে যেন আঘাত করে; কঠিন আঘাত নয়, কোমল আঘাত; ধীরে ধীরে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার মত।

হযরতের কথা শেষ হওয়ার আগেই মাওলানা মুমিনুল্লাহ ছাহেব একটা চিৎকার দিলেন, যেন জিগরফাটা চিৎকার! পুরো হজ্বের সফরে এই মানুষটিকে মুরদা মানুষই মনে হয়েছে আমার। হাঁটা-চলায় এবং ওঠা-বসায় তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন, কিন্তু অন্য জগতে! হযরত অনেকবার তাঁর প্রশংসা করেছেন। এখনো তিনি বেঁচে আছেন এবং পৃথিবীর আলো-বাতাসকে নূরানিয়াত দান করছেন। তাঁর স্নেহ-শিশিরে আমি সবসময় সিক্ত। আমার জন্য তিনি যে সকল দু'আ করেন ইনশাআল্লাহ যদি তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়, আমি বড় ভাগ্যবান। আল্লাহ তাঁকে সুন্দর দীর্ঘ জীবন দান করুন, আমীন।

হযরতের নছীহত শুনে খুব আপ্লুত হলাম এবং মনে মনে প্রার্থনা করলাম, হে আল্লাহ! তোমার দেয়া ইহরামের কাফনে মুরদা সেজে তোমার ঘরে রওয়ানা হয়েছি। হে আল্লাহ, আমি যেন মুরদা হই, আমার হজ্ব যেন জীবন্ত হয়।

হযরতের পিছনে পিছনে মসজিদ থেকে বের হলাম। হযরত দাঁড়িয়ে দেখলেন, সবাই এসেছে কি না? শেষ মানুষটি না আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন; তারপর বাসের দিকে রওয়ানা হলেন। আমার মনে হলো, তিনি এখানে একটি সুন্নত আদায় করলেন, কাফেলার সঙ্গীদের 'খবরগিরি' করার সুন্নত। আমাদের পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের সময় অনেক আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন, যাতে হজ্বের সফরে যারা শরীক হতে চায় তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। যোহরের পর মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা হয়ে যুলহোলায়ফায় তিনি আছর আদায় করেছেন এবং পরবর্তী দিন যোহর পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করেছেন, যাতে বিলম্বে আসা লোকেরা

কাফেলায় শামিল হতে পারে। এখানেও নবীজী তাঁর আমল দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন, কাফেলার যিনি আমীর, তার কর্তব্য হলো অন্য সবার প্রতি লক্ষ্য রাখা। হযরত যেন কিছু সময় অপেক্ষা করার মাধ্যমে সেই সুন্নত আদায় করলেন। পুরো সফরেই দেখেছি, আমরা হযরতের আরামের যতটা না খেয়াল রেখেছি, তিনি আমাদের খেয়াল রেখেছেন তার চেয়ে বেশী। আমরা হজ্বের প্রতিটি আমল ঠিকমত করতে পারছি কি না সেদিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিলো। একটি কথা বলতে ইচ্ছে করে, আমাদের আমীরে কাফেলার হজ্ব ছিলো যেন সেই মহান আমীরে কাফেলার হজ্বের প্রতিচ্ছায়া। কিতাবে যা পড়েছি তাই যেন স্বচক্ষে অবলোকন করেছি।

***

গাড়ীর চাকা সচল হলো। গাড়ী চলতে শুরু করলো বাইতুল্লাহর পথে। এখন আমি বাইতুল্লাহর মুসাফির! স্বপ্ন এখন শুধু স্বপ্ন নয়; আমার জীবনের স্বপ্ন এখন পূর্ণ পেখম মেলা ময়ূর!

আল্লাহ যে তাঁর খলীলকে আদেশ করেছিলেন–

'মানুষের মাঝে ঘোষণা দাও হজ্বের, আসবে তারা তোমার কাছে পদব্রজে এবং সকল শীর্ণ বাহনের উপর; আসবে তারা সকল দূরবর্তী পথ থেকে।'

তখন থেকে শুরু হয়েছে হযরত ইবরাহীম খালীলের দাওয়াতি কাফেলার যাত্রা। আমি এখন সেই কাফেলার লাব্বাইক বলা মুসাফির। তোমার শোকর হে আল্লাহ, তোমার শোকর!

এমন মোবারক সফর যেন গাফলতের ঘোরে কেটে না যায়, সেজন্য হযরতের নির্দেশে মাওলানা ফযলুল হক আমীনী ছাহেব কিছু কথা বললেন। অধিকাংশ যাত্রী উর্দুভাষী, তাই তিনি উর্দুতে বললেন। তার আশ্চর্য সুন্দর ও 'সাফসুতরা' উর্দু শুনে হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেলো আমার প্রিয় উস্তায মাওলানা আব্দুল হাই বরিশালী ছাহেবের কথা। তিনি আমীনী ছাহেবের সহপাঠী। তিনিও 'খুবছূরত' উর্দু বলেন! মানুষের মন বড় অদ্ভুত! কাউকে যখন মনে পড়ে না, সবরকম উপলক্ষ থাকা সত্ত্বেও মনে পড়ে না। যখন মনে পড়ে, ক্ষীণতম উপলক্ষেও মনে পড়ে যায়। খুব আফসোস হলো। রামাযানের সফরে হুযুরের সাথে দেখা করেছিলাম, এবার দেখা করে আসা হয়নি, অথচ তিনি আমার মুহসিন উস্তায। আরবী ভাষার প্রতি আমার দিলে যে মুহব্বত তা তাঁরই ছোহবতের বরকত। এজন্য 'এসো আরবী শিখি' কিতাবটি আমি হুযুরের নামে উৎসর্গ করেছি। খুব অনুশোচনা হলো যে, এমন মুহসিন উস্তাযের কথা ভুলে গেলাম! তখন আর কী করতে পারি! হুযুরের জন্য দিলভরে দু'আ করলাম। হযরতের কাছেও দু'আ চাইলাম, আল্লাহ যেন তাঁকে বাইতুল্লাহর মকবূল সফর নছীব করেন। আমীনী ছাহেবের প্রতিও মনে মনে কৃতজ্ঞ হলাম, তাঁর ওছিলায় অন্তত এখন তো মনে পড়লো।

লালবাগ মাদরাসায় তাঁরা দু'জন যখন দাওরাতুল হাদীছ পড়েন, আমি তখন ইবতেদা আউয়ালের এক নাদান ছাত্র। সেই দৃশ্যটি এখনো মনে পড়ে; একটি ভুল কাজ করতে দেখে বরিশালী হুযূর আমাকে কাছে ডেকে বলেছিলেন, আপনিও ছাত্র, আমিও ছাত্র। আমার কোন ভুল দেখলে আপনি আমাকে সতর্ক করবেন, আপনার কোন ভুল দেখলে আমি আপনাকে সতর্ক করবো। ... কী প্রজ্ঞা! কী স্নেহ ও মমতা! এমনই ছিলেন সেযুগের 'ছাত্র'!

পরে তো তিনি আমার উস্তায হলেন এবং বড় মুহসিন উস্তায। তাঁর হক আদায়ের ক্ষেত্রে সবসময় আমার ত্রুটি হয়েছে, এবারও হলো। আল্লাহ মাফ করুন।

হয়ত প্রসঙ্গ থেকে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটলো, কিন্তু মানুষের বুকে যে দিল, তারও তো কিছু দাবী থাকে! অনেক সময় প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত হয়েও সে দাবী পুরা করতে হয়।

***

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পথ এগিয়ে গেছে। সেই পথ ধরে বাস ছুটে চলেছে, আর বাসের ভিতরে তালবিয়ার সমধুর আওয়ায ধ্বনিত হচ্ছে–

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক।

ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়ালমুলকা লা-শারীকা লাকা।

(আমি হাযির! হে আল্লাহ, আমি হাযির! তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির! সকল প্রশংসা তোমার, সকল নেয়ামত তোমার এবং তোমারই জন্য সকল রাজত্ব। তোমার নেই কোন শরীক।)

তালবিয়ার মাঝে ইশক ও মুহব্বতের কী স্বাদ ও লয্যত আল্লাহ রেখেছেন তা তো জানেন শুধু আল্লাহর আশিক ও প্রেমিক বান্দাগণ। আমাদের মত মুরদা দিলেও তালবিয়া যখন ভাবের এমন তরঙ্গ সৃষ্টি করে, তখন তাদের দিলের অবস্থা কী হয় ! কী হতে পারে!

হযরতের দিলের ভিতরে তাকাবার কোন জানালা যদি থাকতো! বাইরে এমন শান্ত সমাহিত রূপ, ভিতরেও কি তাই! নাকি দিলের দরিয়ায় উঠছে মউজের পর মউজ!

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক!

ইহরামের লেবাস এবং তালবিয়া তো অন্য কিছু নয়, মেযবানের পক্ষ হতে মেহমানের ইকরাম! তোমার শোকর, হে আল্লাহ, তোমার শোকর!

আয়নার মত ঝকঝকে মসৃণ সড়কে বোঝা যায় না, গাড়ী চলছে না থেমে আছে! মরুভূমির উপযোগী উপমা নয়, তবু মনে হলো, নদীর শান্ত পানির উপর দিয়ে তরতর করে যেন ভেসে চলেছে।

এ যুগের সফর কত আরামের, আর সে যুগের সফর ছিলো কত কষ্টের! তবু কেন আমাদের মাঝে এত অভাব শোকরের! ছয় সাত ঘণ্টায় ইনশাআল্লাহ আমরা পৌঁছে যাবো মক্কা শরীফে! অথচ খুব বেশী দূর অতীতের কথা নয়, আমাদের হযরত বলেছেন তাঁর জীবনের প্রথম হজ্বের কথা! তখন উটের কাফেলা ছিলো, বাসের সফরও ছিলো। কিন্তু বর্তমানের আরামদায়ক বাসের সাথে তার কোন তুলনাই চলে

না। যখন মরুভূমির লু হাওয়া চলতো, হযরতের ভাষায়, 'বাসের ভিতরে সবাই যেন ভুনা হয়ে যেতো।' দু'একজন মারাও যেতো এবং মরুভূমিতেই তাদের দাফনের ব্যবস্থা করে কাফেলা আগে রওয়ানা হয়ে যেতো। পাকা রাস্তা বলতে কিছুই ছিলো না। দু'দিনের বেশী লেগে যেতো বাসের সফরে, আর উটের সফর ছিলো নয় দশদিনের।

আমার সৌভাগ্য, এবার কোন চেষ্টা না করেই হযরতের পাশে বসার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি আরয করলাম, হযরত! আমার একটি আবদার আছে। কীভাবে কীভাবে আল্লাহ আমার উপর এত দয়া করেছেন। জীবনের প্রথম হজ্বের সফর, তার উপর আপনার ছোহবতের নেয়ামত! কীভাবে আল্লাহর শোকর আদায় করবো!

হযরত! আপনি আমাকে এখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্বের সফরের ঘটনা শোনাবেন; মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত পুরো ঘটনা।

ধারণা ছিলো হযরত হয়ত এখন কথা বলা পছন্দ করবেন না; হয়ত এখন তিনি নিজের মাঝে বিভোর থাকাই পছন্দ করবেন। কিন্তু না, তিনি বরং খুশী হয়ে বললেন, চলো, তোমার ওছিলায় একটি বরকতপূর্ণ মুযাকারা হোক, তাতে হয়ত আমাদের সফরও কিছুটা জানদার হবে।

হযরত খুব স্বাদ ও লয্যত নিয়ে বয়ান করলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্বের পুরো ঘটনা। কীভাবে তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছেন; পথে কোথায় কোথায় মনযিল করেছেন। কীভাবে মক্কায় প্রবেশ করেছেন; মিনায় গমন করেছেন, আরাফায় ওকূফ করেছেন, মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করছেন, রামীজামারা ও কোরবানি করেছেন এবং মক্কায় ফিরে এসে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছেন? বিশদভাবে সবকিছু বয়ান করলেন। তিনি এমন জোশ ও উদ্দীপনা এবং জাযবা ও উচ্ছ্বাসের সাথে বর্ণনা করলেন যেন বৃদ্ধের অবয়বে তারুণ্যের ছবি! শুরু থেকে শেষ সমস্ত ঘটনা যেন তাঁর চোখের সামনে! বুখারী-মুসলিমের কিতাবুলহজ্ব অধ্যায়ে বিদায় হজ্বের বর্ণনা পড়েছি খুব বেশী দিন হয়নি। কিন্তু আজ যা শুনলাম তাতে কলব ও রূহ যেন আবার তাজা হলো, ইশক ও মুহাব্বাত যেন নতুন শাওক ও জাযবা লাভ করলো, বরং আমি যেন হজ্বের সফরে হজ্বের নতুন তারবিয়াত হাছিল করলাম। আমার মনে হলো, হজ্বের সফরে এভাবে যদি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্বের বয়ান শোনা হয় তাহলে তা অশেষ বরকতের কারণ হতে পারে। ক'জন হাজী ছাহেব জানেন বিদায় হজ্বের বয়ান! বাইতুল্লাহর আশেক এবং নবীর প্রেমিক যারা তাদের জন্য এ অজ্ঞতা কত লজ্জার বিষয়?!

পূর্ণ গতিতে গাড়ী এগিয়ে চলেছে মক্কার পবিত্র ভূমির দিকে, আর হযরত বয়ান করে চলেছেন পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্বের মোবারক সফরের কাহিনী। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে আছি তাঁর নূরঝলমল চেহারার দিকে। আমার কানে যেন মধুবর্ষণ এবং হৃদয়ে যেন আলোর প্লাবন। আমার সমগ্র অস্তিত্বে

যেন আনন্দের শিহরণ। আমার স্রষ্টার প্রতি, আমার আল্লাহর প্রতি শোকর ও কৃতজ্ঞতার গভীর অনুভূতিতে হৃদয়-মন আপ্লুত হলো। হজ্বের সফরে আমিও আজ মদীনা থেকে মক্কার যাত্রী! এই যে ক্ষীণতম সাদৃশ্য, এরও কোন বরকত রয়েছে নিশ্চয়! তাই তো আজকের আরামের সফরের মাঝেও অনুভব হলো সেই নূরানী কাফেলার নূরানী সফরের কিছুটা স্নিগ্ধতা! কিছুটা পবিত্রতা! আমি যেন এযুগের 'শীতল' গাড়ীর আরামের যাত্রী নই; আমি যেন সে যুগের উত্তপ্ত মরুর উটের কাফেলার মুসাফির। সময়ের সীমারেখা যেন মুছে গেছে ভাবের এবং অনুভবের প্রবল প্রবাহে। উটের দুলুনিতে দোল খেয়ে, আনন্দের তরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে আমিও যেন এগিয়ে চলেছি সেই কাফেলার পিছনে পিছনে।

হযরত বললেন, 'নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল হোলায়ফা থেকে রওয়ানা হয়ে রওহা নামক স্থানে মনযিল করলেন। মদীনা থেকে রওহা দুই রাত্রির দূরত্ব। এখনো তা রওহা নামেই পরিচিত। আমার প্রথম সফরের সময়ও উটের কাফেলা রওহায় মনযিল করতো। পরে আর সেখানে মনযিল হতো না।

মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর এটা ছিলো নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় মনযিল।'

আমি আরয করলাম, হযরত! নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথে সফর করেছেন এবং যেখানে যেখানে মানযিল করেছেন, এখনো যদি সে পথেই সফর হতো এবং মানযিলে মানযিলে কিছুক্ষণ গাড়ী থামতো তাহলে কি ভালো হতো না? এযুগের মুরদা সফরগুলো সেই সফরের অনুকরণের বরকতে কিছুটা কি জানদার হতো না?

তিনি বললেন, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয় এবং তাতেই কল্যাণ।

তারপর তিনি বললেন, রওহা উপত্যকায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন, আমার আগে সত্তরজন নবী এখানে নামায পড়েছেন।

স্থূল চোখে যদিও রওহার সেই পবিত্র উপত্যকা আমার দেখা হলো না, কিন্তু কল্পনার দৃষ্টিকে বাধা দেবে কে? কল্পনার চোখে তো আমি দেখতে পেলাম সেই উপত্যকায় সেই নূরানী কাফেলার মানযিল এবং আমার হৃদয়-মন আপ্লুত হলো অভূতপূর্ব এক অনুভবে!

হযরত বললেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় মানযিল ছিলো আলআছায়া। মদীনা থেকে এর দূরত্ব সাতাত্তর মাইল। চতুর্থ মানযিল ছিলো আলআরজ। এর দূরত্ব নব্বই মাইলের কিছু বেশী।

হযরত বললেন, প্রত্যেক মানযিলে অবতরণের পর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেলার সকলের খোঁজ-খবর নিতেন এবং বিভিন্ন কাজ সকলের মাঝে বন্টন করে দিতেন। তিনি নিজেও ছাহাবা কেরামের সঙ্গে কাজে শরীক হতেন। এটা ছিলো তাঁর সারা জীবনের আদত শরীফ।

হযরত বললেন, 'নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের পঞ্চম মানযিল ছিলো আবওয়া। যত দিন উটের সফর ছিলো তত দিন আবওয়া ছিলো হজ্বের কাফেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মানযিল।'

এবারও আমি কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম আবওয়ার উপত্যকা এবং সেই নূরানী কাফেলার রাতের মানযিল। আমি দেখতে পেলাম আকাশে তারাদের ঝিলিমিলি, আর মরুপ্রান্তরে শত শত মশালের আলোকসজ্জা। আকাশ ও পৃথিবী সেখানে যেন একসাথে আলোকিত হয়েছিলো।

আমাদের নবীজী শৈশবে মা আমেনার সঙ্গে মদীনায় এসেছিলেন। মদীনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে আবওয়ার বালুভূমিতেই মা আমেনা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এখানে এই বালুভূমিতেই তাঁর কবর হয়েছিলো। পরে একসফরে আবওয়ার বালুভূমি অতিক্রমকালে পেয়ারা নবী মা আমেনার কবর যিয়ারত করেছিলেন। তাঁর চোখের পানিতে সিক্ত হয়েছিলো মায়ের কবর।

বিদায় হজ্বের সফরেও হয়ত নবীজী মা আমেনার কবর যিয়ারত করেছিলেন, কিতাবের বর্ণনায় যদিও তার উল্লেখ নেই। হযরতকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার প্রথম হজ্বের সফরে কি আবওয়ায় মা আমেনার কবরের চিহ্ন ছিলো?

হযরত বললেন, না, কোন চিহ্ন ছিলো না।

হযরত বললেন, হাফিয ইবনুল কাইয়িম (রহ)-এর বর্ণনামতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ষষ্ঠ মানযিল ছিলো ওয়াদি উসফান, আর বুখারীর বর্ণনামতে মাররুয্-যাহরান।

উসফান উপত্যকা অতিক্রমকালে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু বকর! এটি কোন্ উপত্যকা? তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি উসফান উপত্যকা। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর নবী হূদ ও ছালিহ আলাইহিমাস-সালাম দু'টি লাল উটে সওয়ার হয়ে এ উপত্যকা অতিক্রম করেছেন। তাঁরা বাইতুল্লাহর হজ্বের নিয়তে তালবিয়া পড়ছিলেন।

হযরতের পাক যবানে এ বয়ান শুনে আমার অন্তরে অভূতপূর্ব এক ভাবের উদয় হলো। উসফান উপত্যকা কত দূর কে জানে? হে ওয়াদি উসফান! তোমাকে সালাম! আমার পেয়ারা নবীর সেই পবিত্র সফরের প্রতিটি মানযিলকে সালাম!

হযরত বললেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী মানযিল ছিলো সারিফ। মক্কা থেকে এর দূরত্ব মাত্র ছয় মাইল। সারিফের বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, ওমরাতুল কাযা-এর সফরে এখানেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছেন এবং ওমরা শেষে ফেরার পথে এখানেই একটি গাছের নীচে তাঁবুতে হযরত মায়মূনা (রা)-এর সঙ্গে বাসর যাপন করেছেন। বহু বছর পর সারিফেই হযরত মায়মূনা (রা) মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং সেই গাছের নীচেই

তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো। ৫১ হিজরীতে উম্মুল মুমিনীনদের মাঝে তিনিই সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেছেন।

হযরত বললেন, প্রথম হজ্বের সফরে আমি সারিফে এসেছিলাম। সেখানে তখন ছোট একটি মসজিদ ছিলো এবং লোকেরা বলতো, মসজিদটির অবস্থান হযরত মায়মূনা (রা)এর কবরের পাশেই; তবে কবরের কোন আলামত তখন সেখানে ছিলো না।

আমাদের গাড়ী ছুটে চলেছে মক্কার পথে। কত দূরত্ব দু'টি কাফেলার মাঝে! কত ভিন্নতা দু'টি সফরের মাঝে! দূরত্ব সময়ের এবং সম্পর্কের! ভিন্নতা পবিত্রতার এবং শুভ্রতার! তবু তো আছে একটি নৈকট্য! একটি অভিন্নতা! লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের নৈকট্য এবং লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইকের অভিন্নতা! এটা ভাবলে অন্তরের গভীরে কিছুটা তো সান্ত্বনা আসে! আশা ও আশ্বাসের একটুখানি পরশ তো লাগে!

হযরত বললেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ মানযিল ছিলো মক্কার নিম্নভূমিতে, মক্কা ও তানঈমের মধ্যবর্তী স্থান যী-তোয়ায়। নবীজী এখানে রাত্রিযাপন করেছেন, ফজর আদায় করেছেন এবং গোসল করেছেন।

হযরত বললেন, মক্কায় প্রবেশ করার আগে গোসল করা মুস্তাহাব, যদি সম্ভব না হয় তাহলে অযু করে নেয়াও যথেষ্ট।

হযরত বললেন, সেদিন ছিলো রোববার। আল-আযরাক উপত্যকা হয়ে মক্কার উর্ধ্বভূমির দিক দিয়ে দিনের বেলা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন। আল-আযরাক উপত্যকা অতিক্রম করার সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মূসাকে দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি উচ্চ স্বরে তালবিয়া পড়ে চলেছেন।

বুখারী শরীফে এ হাদীছ পড়েছি, কিন্তু হযরতের যবানে শোনার পর আমার সামনে অন্তর্জগতের যেন এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। সেখানে দৃশ্য এবং অদৃশ্য একাকার হয়ে যেন অব্যাখ্যাত এক সৌন্দর্য-মহিমা উদ্ভাস লাভ করলো। কী ব্যাখ্যা এই হাদীছে নববীর?! কোন কোন বরেণ্য মুহাদ্দিছ তো বলেছেন, এখানে কোন রকম রূপকতা নেই, বরং হাকীকতই উদ্দেশ্য। কারণ নবিগণ জীবিত এবং রিযিকপ্রাপ্ত। সুতরাং এ অবস্থায় তাঁদের হজ্ব করা অসম্ভব নয়। যেমন মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুসা (আ)-কে তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়া অবস্থায় দেখেছেন।

কোন কোন গবেষকের মতে এটা ছিলো রূহের জগতের বিষয়। সম্ভবত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতেনি দৃষ্টির সামনে হযরত মূসা (আ)-এর রূহ দৃশ্যমান হয়েছিলো।

তাহলে কি আমরা একথা ভাবতে পারি যে, আমাদের পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি মদীনায় শুয়ে আছেন, তাঁর পবিত্র রূহ এখনো আল্লাহর ঘরে হজ্ব করেন এবং তাঁর এতীম উম্মত পৃথিবীর দূরদূরান্ত থেকে এসে কীভাবে হজ্ব করে তা

অবলোকন করেন! রূহানিয়াতের জগতে যারা অত্যুচ্চ মর্যাদার অধিকারী তাঁদের অন্তর্দৃষ্টির সামনে হয়ত অনেক রহস্য উদ্ভাসিত হয়!

এ ভাব ও ভাবনায় হৃদয় ও আত্মা এমনই উদ্বেলিত হলো যে, আমি .. আমি জানি না, কোন ভাষায় কীভাবে তা প্রকাশ করা যায়! আমি আমার দিলের ভাবনা হযরতের সামনে পেশ করলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'এই সব ফিকির বান্দাকে আসল মাকছূদ থেকে গাফেল করে দেয়। বান্দার জন্য তো আল্লাহর রহমতই যথেষ্ট!'

***

মরুভূমির দিগন্তে সূর্য অস্ত গেলো। পথে একটি জলাশয়ের মত স্থান ছিলো। সবুজ ঘাস ছিলো। সেখানে বাস থামলো। হযরতের সঙ্গে আমরা মাগরিব আদায় করলাম। সেই নামাযের কথা আজো মনে পড়ে। হযরতের আদেশে মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেব নামায পড়ালেন। অপূর্ব এক বেদনা যেন ঝরে ঝরে পড়ছে তার তেলাওয়াত থেকে। ভিতরের সব তরঙ্গ যেন কালামের মাধুর্যকে আশ্রয় করে বাইরে এসে আছড়ে পড়ছে। সবসময় এমন হয় না। হৃদয় যখন অন্য রকম হয় তখনই শুধু এমন হয়। এখানে এই কাফেলায় যতজন মানুষ ততটি হৃদয় এবং প্রতিটি হৃদয়েই রয়েছে কিছু সিক্ততা! কিছু আর্দ্রতা! কিছু ভাব! কিছু তরঙ্গ! এতগুলো হৃদয়ের মাঝে একটি হৃদয়, হোক না তা পাপের কালিমায় মলিন, একেবারে মাহরূম যাবে না, আল্লাহর রহমতের কাছে এ আশা অবশ্যই করা যায়!

মধ্যপথে একটি বিশ্রামক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ের জন্য বাস থামলো। হযরত আমাকে তাম্বীহ করে বললেন, মাগরিবের সময় বাস থেকে নামা ও ওঠার সময় আমি খেয়াল করেছি, তুমি তালবিয়া পড়োনি। ফিকাহর কিতাবে দেখোনি, সওয়ারি থেকে নামার সময় এবং সওয়ারিতে ওঠার সময় উচ্চ স্বরে তালবিয়া পড়া সুন্নত!

আমি খুব লজ্জিত হলাম। এই তো আমাদের অবস্থা! গাফলতের উপর গাফলত! তবু দিলের ভিতরে নেই কোন অনুতাপ-অনুশোচনা! হযরতের মত শফীক ও হাকীম মুরুব্বীর ছায়ায় রয়েছি বলেই না সতর্ক হওয়ার সুযোগ পেলাম। আমাদের হযরত এখন এ দুনিয়ায় নেই। সত্যিকার অর্থেই আমরা এখন এতীম। সারা জীবন তিনি যত হজ্ব করেছেন, যত মানুষ তাঁর ছোহবতে হজ্ব আদায় করেছেন তাদের সকলের পক্ষ হতে আল্লাহ তাঁকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

এবার বাস থেকে নামার সময় (এবং ওঠার সময়) উচ্চ স্বরে তালবিয়া পড়লাম। লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লাশারীকা লাকা লাব্বাইক ...

বাস থেকে নেমে জরুরত থেকে ফারেগ হলাম এবং সামান্য কিছু খাবার গ্রহণ করলাম। আমি একা এক কোণে বসে খেতে চেয়েছিলাম। মাওলানা মুমিনুল্লাহ ছাহেব এসে বসলেন এবং বললেন, মেহেরবানি করে যদি কবুল করেন তাহলে আজ আপনি আমার মেহমান! আমি বুঝতে পারলাম, কেন তিনি আমাকে মেহমান বানাতে চান! কিন্তু এমন মানুষের দাওয়াত কবুল না করে উপায় কী! সুতরাং শোকরগুজারির সাথেই কবুল করলাম।

এঁরা আসলেই অন্য জগতের মানুষ। এঁদের কাছ থেকে যিকির আযকারের শিক্ষা যেমন নেয়া উচিত, তেমনি মাকারিমে আখলাকের শিক্ষাও গ্রহণ করা উচিত। এখনো মনে আছে, রুটি ও গোশতের টুকরো ছিঁড়ে তিনি আমার মুখে তুলে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে হয়ত তুলে দিয়েছিলেন অন্যকিছুও। না হলে আমার চোখে তখন পানি আসবে কেন?! মুসাফিরের দিল বড় নরম হয়। আর আমরা দু'জনই ছিলাম বাইতুল্লাহর মুসাফির। তিনি বড় মুসাফির, আমি এক ক্ষুদ্র মুসাফির। তবু সেদিন আমি দিলভরে দু'আ করেছিলাম তাঁর জন্য। দু'আ করার জন্য তো বড় হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

সেখানেই এশার নামায পড়া হলো। বাস ছাড়ার তখনো কিছুটা দেরী। অনেক বাস থেমেছে। বাস আসছে, থামছে, আবার রওয়ানা হয়ে যাচ্ছে। কয়েক হাজার হাজীর উপস্থিতিতে পুরো এলাকা গমগম করছে। কেউ ব্যস্ত পানাহারে, গল্পগুজবে; কেউ মগ্ন একা একা পায়চারিতে। একজন শুধু নিমগ্ন বালুর উপর বিছানো জায়নামাযে! জায়নামায তো তাঁর জীবনের সঙ্গী, এমনকি হজ্বের মত কঠিন সফরেও।

সেদিন সেখানে একজন 'কালো' হাজীর শুভ্র হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছিলাম। ঘটনা যদি লিখতে যাই তাহলে তো সফরনামা হয়ে যাবে সফরের চেয়ে অনেক দীর্ঘ! শুধু এইটুকু বলি, তার সঙ্গে আমার ভাষার ব্যবধান ছিলো। কিন্তু হৃদয়ের তাপ এবং ঈমানের উত্তাপ দিয়ে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সুদূর আফ্রিকাতেও আছে আমার ভাই!

***

দূর থেকে আলো দেখা গেলো, আলোকিত মক্কার আলো! যেন আল্লাহর ঘরের প্রথম আভাস! এ আলো আরেকবার দেখেছিলাম রামাযানে। তাতে ছিলো প্রথম অবলোকনের অনাস্বাদিতপূর্ব এক শিহরণ। আজ ছিলো হারিয়ে যাওয়া প্রিয়তমকে ফিরে পাওয়ার সেই আনন্দ যা কিছুক্ষণের জন্য মানুষের অনুভব অনুভূতিকে বিবশ করে রাখে। শহরের আলোকে এবং আলোর শহরকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে শুধু দেখতেই থাকলাম। কখন যে দু'চোখ থেকে অশ্রুর ধারা নেমে এসেছে, বুঝতে পারিনি। আমার অবস্থা তো ছিলো কাফেলার আর সবার থেকে ভিন্ন। আমি তো নিজের নির্বুদ্ধিতায় এই পবিত্র শহরের আলো হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার আল্লাহ দয়া করে আবার সেই হারানো আলো দেখার তাওফীক দিয়েছেন। তোমার শোকর হে আল্লাহ, তোমার শোকর!

যাদের দৃষ্টি আছে তারা হয়ত এ আলো ছাড়িয়ে দেখতে পান অন্য কোন আলোর উদ্ভাস! তাদের হৃদয়ের জগতে হয়ত জেগে ওঠে অন্যরকম কোন ভাবতরঙ্গ। তখন ইশক ও মুহাব্বাতের জোরওয়ার মউজ হয়ত তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় অন্য কোন রহস্যালোকে! আমি শুধু দেখতে পেলাম বিদ্যুতের লাল আলোর অপূর্ব সজ্জা! তাতেই হৃদয় ও আত্মা উদ্বেলিত হলো। আসন্ন মিলনের সুখানুভূতি সমগ্র অস্তিত্বের পরতে পরতে যেন অপূর্ব এক শিহরণ জাগালো। বাসের সকল যাত্রী, আশেকানে হারাম তখন নতুন জাযবায়, নতুন উদ্দীপনায় পড়ে চলেছেন হজ্বের তালবিয়া–

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শরীকা লাকা লাব্বাইক ...

শহর যে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, অথবা আমরা যে ধীরে ধীরে শহরের দিকে এগিয়ে চলেছি তা স্পষ্ট অনুভব করা যায়। দূরত্ব যত কমে আসছে বুকের কম্পন এবং হৃদয়ের স্পন্দন ততই বেড়ে চলেছে। জানি না, ভিতরের এ অবস্থাকে কিসের সাথে তুলনা করা যায়!

শহরের আভাস দেখা যাওয়ার পর থেকে হযরত নিজেও বারবার এ দু'আ পড়লেন এবং আমাদেরও পড়ার তারগীব দিলেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَّنَا بِهَا قَرَاراً وَ رِزْقاً حَسَناً

হে আল্লাহ এই শহরে আমাদের সুস্থিতি দান করুন এবং হালাল রিযিক দান করুন।

শহরের ভিতরে জনাকীর্ণ রাস্তায় বাস ধীরে ধীরে চলছে। একসময় দেখতে পেলাম হারামের আলোকিত মিনার! সেই মিনার যা দু'দিন আগে শোকার্ত হৃদয়ে ফিরে ফিরে অশ্রুঝাপসা চোখে দেখছিলাম এবং একসময় যা দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো আমাকে কান্নার সাগরে ভাসিয়ে। সেই মিনার আজ আবার দেখতে পেলাম উদ্বেলিত হৃদয়ে, আনন্দ ঝলমল চোখে।

বাস থামলো হারামকে বেষ্টনকারী 'গোলসড়ক' বা রিংরোডে এসে। এবার আমাদের চোখের সামনে আলোকিত হারাম। কয়েক মুহূর্ত যেন স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেলো। তারপর হযরতকে অনুসরণ করে কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْداً طَيِّباً مُبَارَكاً ، اَللّٰهُمَّ أَنْزِلْنِيْ مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

সকল প্রশংসা আল্লাহর; অশেষ, উত্তম ও বরকতময় প্রশংসা। ইয়া রাব্ব! আপনি আমাকে দান করুন বরকতময় অবস্থানক্ষেত্র। আপনিই তো সর্বোত্তম অবস্থানক্ষেত্র দানকারী!

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক ...

আবেগের আতিশয্যে আমি তখন আত্মহারা। চোখের সামনে ভেসে উঠলো রামাযানের আটাশ তারিখের সেই মুহূর্তটি। ঠিক এখান থেকেই গাড়ীতে উঠে বিদায় হয়েছিলাম। তখন কি কল্পনায়ও ছিলো, এত অল্প সময়ের ব্যবধানে এমন আশ্চর্য উপায়ে আল্লাহ তাঁর না-দান বান্দাকে আবার ফিরিয়ে আনবেন হারামের পবিত্র অঙ্গনে! বান্দার যা কল্পনায়ও ছিলো না, আল্লাহ তাঁর অশেষ রহমতে এবং অসীম কুদরতে তাই বাস্তব করে দেখালেন। শোকর আলহামদু লিল্লাহ!

বাস থামলো, হযরতের সঙ্গে আমরা বাস থেকে নামলাম।

হযরতের ভক্ত মুরিদ জনাব ক্বারী মীযান সেখানে হযরতের প্রতীক্ষায় ছিলেন, আর ছিলেন ফারুক ভাই। আমার খবর তিনি জানতেন না। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক তাকিয়ে থাকলেন, তারপর হযরতের উপস্থিতি ভুলে বে-ইখতিয়ার আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তার মুখে ছিলো শুধু 'আলহামদু লিল্লাহ! আলহামদু লিল্লাহ!'

জানি না, আল্লাহর ওয়াস্তে মুহাব্বাত আর কাকে বলে?! আল্লাহ তাকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

হাজী মীযান বাংলাদেশের সিলেট জেলার অধিবাসী। হজ্ব-মৌসুমে বাড়ী ভাড়ার তেজারত করেন। নম্র-ভদ্র মানুষ। মিসফালায় হারামের নিকটবর্তী একটি বাড়ীতে তিনি হযরতের থাকার ইনতেযাম করেছেন। মোটামুটি প্রশস্ত একটি কামরায় সবার থাকার ব্যবস্থা।

***

আমাদের অবস্থা তখন যাকে বলে, 'ক্লান্তিতে চূর চূর'। সুতরাং মনের গোপন ইচ্ছা তো ছিলো, বাকি রাত আরাম করে ফজরের পর তাওয়াফে কুদূম করবো। আমাদের ধারণায়ও ছিলো না, হযরত তখনই তাওয়াফের কথা বলবেন! কিন্তু বয়সে বৃদ্ধ এই চিরতরুণ মানুষটি হারামে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলেন। সুতরাং তারুণ্যের লাজ রক্ষা করতে আমরাও দু'চারজন প্রস্তুত হলাম এবং হযরতের অনুগমন করলাম।

হযরত যখন লজ্জা ও বেদনামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, 'মিয়াঁ, এই নাপাক কদম এই পাক যমীনে রাখতে শরম লাগে, ডর লাগে' তখন নিজেদের ধিক্কার দেয়া ছাড়া আর কী করার ছিলো! আমাদের না লজ্জা-শরম আছে, না ডর-ভয় আছে! আমাদের তো এই মাকামের পরিচয় ও মা'রিফাতই নেই! আর লজ্জা ও ভয় তো আসে মা'রিফাত থেকে! যিনি মা'রিফাতের যত উচ্চ স্তরে উপনীত হবেন তিনি ততই লজ্জিত ও শরমিন্দা হবেন, ততই ভীতসন্ত্রস্ত হবেন। তাই আমাদের ভয়-সংকোচহীন আনন্দ যেমন স্বাভাবিক তেমনি হযরতের 'শরম ও ডর'ও অস্বাভাবিক কিছু নয়, বরং তিনি যাদের উত্তরসূরী তারা তো হারামে প্রবেশ করার সময় বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। কারো কারো সম্পর্কে তো বর্ণিত আছে যে, লোকজনকে তিনি নিজের থেকে দূরে থাকতে বলতেন এই ভয়ে যে, যদি তাঁর উপর আসমানের আযাব নাযিল হয় তাহলে তারা যেন বিনা দোষে শুধু সঙ্গে থাকার কারণে বিপদগ্রস্ত না হয়। কবির ভাষায় তাঁদের ভাবনা হতো এমন–

কাবাঘরের তাওয়াফ করিতে চাই/ দুয়ারে এসে হায়, অনুমতি না পাই/ গায়ব থেকে আসে আওয়ায বারেবার/কী করেছো বাইরে, সাহস করো ভিতরে আসার?

হযরত আমাদের সতর্ক করে বললেন, তাঁর আওয়াযে এমন ভয়ভীতি ছিলো যে, ভাবতে সত্যি অবাক লাগে! তিনি বললেন, মিয়াঁরা, হুঁশিয়ার, সাবধান! মদীনায় ছিলো জামাল (সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতা), এখানে হলো জালাল (প্রতাপের প্রখরতা)। সেখানে তুমি ছিলে পেয়ারে উম্মতি, এখানে তোমাকে প্রকাশ করতে হবে পূর্ণ আবদিয়াত ও বন্দেগি। এখানে তুমি দাখেল হবে গোলামের লেবাসে। খুব সাবধান! এখানে যেন আবদিয়াতের খেলাফ কোন কিছু প্রকাশ না পায়; না যবানে, না 'আদা ও আন্দাযে'।

হযরত হারাম শরীফে দাখেল হলেন এবং অবনত দৃষ্টিতে ধীর নম্র পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন। তিনি আগে, আমরা তাঁর পিছনে। আমার বুক দুরু দুরু করছে! কেমন যেন

একটা জড়োসড়ো অবস্থা লজ্জায় শরমে, ভয়ে ভীতিতে! রামাযানে তো এ অবস্থাটা ছিলো না! তখন তো ছিলো আনন্দের শিহরণ এবং আবেগের উদ্দীপনা!

হে আল্লাহ! কত ভুল পথে চলেছে এ দু'টো পা; এখন কোন সাহসে এগিয়ে যাবো তোমার ঘরের দিকে! কত গোনাহ করেছে এ চোখ দু'টো; কোন মুখে তাকাবো তোমার ঘরের দিকে! কীভাবে অবলোকন করবো কালো গিলাফের সৌন্দর্য! তোমার রহমত, হে আল্লাহ, তোমার রহমত শুধু ভরসা!

যেখান থেকে বাইতুল্লাহ দেখা যায় সেখানে এসে হযরত দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে অবনত দৃষ্টি উত্তোলন করে তাকালেন। হযরতকে অনুসরণ করে আমরাও তাকালাম এবং দেখতে পেলাম কালো গিলাফে ঢাকা চিরসুন্দর সেই বাইতুল্লাহ! ভক্তি-মুহাব্বাতে আপ্লুত কণ্ঠে হযরতের সঙ্গে আমরাও উচ্চারণ করলাম–

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفاً وَ تَكْرِيْماً وَ مَهَابَةً وَ زِدْ مَنْ شَرَّفَه وَ كَرَّمَه مِمَّنْ حَجَّه اَوِ اعْتَمَرَه

تَشْرِيْفاً وَ تَكْرِيْماً وَ تَعْظِيْماً وَ بِرًّا ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

হে আল্লাহ! তুমি এই ঘরের মর্যাদা ও মহিমা এবং সম্মান ও সমীহ বৃদ্ধি করে দাও। যারা হজ্ব করে, ওমরা করে এবং এই ঘরকে তা'যীম ও সম্মান করে তাদেরও ইয্যত, সম্মান, মর্যাদা ও ছাওয়াব বাড়িয়ে দাও। হে আল্লাহ তুমিই তো 'সালাম'; শান্তি তো তোমারই পক্ষ হতে বর্ষিত। সুতরাং হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে সুখে-শান্তিতে জীবিত রাখুন।

কা'বা শরীফ দেখার সময় এই দু'আ পড়া সুন্নত! আল্লাহর ঘরের ইয্যত ও মর্যাদা তো আমার-তোমার দু'আর মুহতাজ নয়; এ তো শুধু বান্দাকে নতুন কিছু দান করার বাহানা! এ সময় দু'আ কবুল হওয়ার খোশখবরি এসেছে ছহীহ হাদীছে। আমি প্রাণভরে দু'আ করলাম ঘরের মালিকের দরবারে। দু'আর সঙ্গে কবুলিয়াতের আশাও হলো অন্তরে। হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ) লিখেছেন, দু'আ করার সময় কবুলিয়াতের আশা হওয়া দু'আ কবুল হওয়ারই আলামত।

হযরত ধীরে ধীরে নেমে এলেন তাওয়াফের চত্বরে। তাঁর এই নেমে আসার দৃশ্যটি আমার আজীবন মনে থাকবে। জীবনে বহুবার নছীব হয়েছে বাইতুল্লাহর মাতাফে নেমে আসার। উম্মেহানির যে সিঁড়ি দিয়ে হযরত নেমেছিলেন আমি সেখান দিয়েই নামি। এটা জরুরি নয়, তবু মনে হয়, কিছুটা আশ্বাস যেন হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। আল্লাহর অলীকে ভালোবাসলে আল্লাহ কি খুশী হবেন না! ভালো না বাসলে যখন অখুশী হন!

হযরতকে অনুসরণ করে আমরা নেমে এলাম মাতাফে। পুরো মাতাফ তখন তরঙ্গময় এক জনসমুদ্র! বাইতুল্লাহর কাছে গিয়ে হাজারে আসওয়াদ চুমু দিয়ে তাওয়াফ শুরু করার কথা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। হযরত তাই হাজারে আসওয়াদের বরাবর হয়ে সেদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তারপর দু'হাত তুলে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে

তালু দ্বারা হাজারে আসওয়াদের দিকে ইশারা করলেন এবং হাতের তালুতে চুমু খেলেন। তারপর তাওয়াফ শুরু করলেন।

হযরত কী করেছেন তা আমরা দেখেছি, কীভাবে করছেন তা দেখার দৃষ্টি আমাদের ছিলো না! তবু এটাকেই আজ বড় সৌভাগ্যের মনে হয় যে, তাঁকে দেখেছিলাম ঘরের সামনে ঘরের মাতাফে। আহ! নূরানি মানুষটির সেই ঝিলমিল চেহারা, যা অন্তরে এখনো সমুজ্জ্বল, যদি আজকের মানুষকে দেখাতে পারতাম! মসজিদ থেকে সিঁড়ির অল্প ক'টি ধাপ পার হয়ে তিনি যখন মাতাফে নামলেন এবং ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন, প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর লেবাসের শুভ্রতা এবং চেহারার উজ্জ্বলতা আরো যেন প্রখরতা লাভ করছিলো।

কেউ যদি ভাবে, এটা ভক্তির আতিশয্য, ভাবতে দাও; আমি শুধু বলবো, আমার তো তাতে লাভই হয়েছিলো! সেই ভক্তিটুকু আমাকে তো শক্তি যুগিয়েছিলো! এবং আশ্চর্য কী, এখনো তুমি যদি সেই ভক্তিতে একাত্ম হতে পারো, তুমিও হয়ত পাবে সেই হৃদয়ের কিছুটা সান্নিধ্য-পরশ! যুগে যুগে এ পথে যে যা পেয়েছে, ভক্তিগুণেই তো পেয়েছে! যুক্তিগুণে কে কবে কী পেয়েছে বলো!

হযরতকে অনুসরণ করে আমরাও তাওয়াফ শুরু করলাম। বাইতুল্লাহর দিকে না তাকিয়ে নযর নীচে রাখা হলো তাওয়াফের আদব। এ বিষয়ে হযরত আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। তাই আমাদের তাওয়াফ ছিলো নীচের দিকে। মন কিন্তু বারবার বলছিলো, দেখি না একটু কেমন সুন্দর কালো গিলাফে ঢাকা আমার আল্লাহর ঘর!

তবে প্রেমের তত্ত্বজ্ঞানী আজমের এককবি বলেছেন অন্য কথা–

না দেখে পেতে চাই তোমার দেখা হে প্রিয়তম!/ হে চিরসুন্দর, চিরউজ্জ্বল, চিরউত্তম/ প্রিয়ার তনু দেখা যায় শুধু কি চোখের তারায়!/ নেই কি তার আলোকছবি দিলের পর্দায়!

তাওয়াফ চলছে। হযরতের পিছনে পিছনে আমরা এগিয়ে চলেছি, কিংবা কোন ঢেউ, কোন জোয়ার, কোন স্রোত যেন আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

জীবনের বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অবস্থায় হযরত হাফেজ্জী হুযূরকে আমি দেখেছি। নামাযে ও তিলাওয়াতে যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি দরসে হাদীছের মসনদে এবং মুরীদানের সামনে মসজিদের মিম্বরে, তেমনি দেখেছি লক্ষ মানুষের উত্তাল জনসভায়। সর্বত্রই তিনি ছিলেন আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। তাঁর তুলনা ছিলেন শুধু তিনি। আজ তাঁকে দেখলাম আল্লাহর ঘরে তাওয়াফের হালাতে।

তাঁর তাওয়াফ দেখছিলাম। কারণ সেই তাওয়াফ থেকে আমাকে শিখতে হবে নিজের তাওয়াফ। কিতাবের পাতা থেকে অবশ্য আমরা জেনেছি, কেমন ছিলো ছাহাবা কেরামের তাওয়াফ, তাবে'ঈন, তাবয়ে তাবে'ঈন এবং পরবর্তীদের তাওয়াফ কিন্তু নামায বলো, তাওয়াফ বলো, দ্বীনের কোন আমল শুধু পড়ে শেখার বিষয় নয়, দেখেও শেখার বিষয়। ছাহাবা কেরাম শিখেছেন আল্লাহর নবীকে দেখে, তাবেঈন শিখেছেন ছাহাবা কেরামকে দেখে, তাবয়ে তাবে'ঈন শিখেছেন তাবে'ঈনকে দেখে।

এভাবে প্রত্যেক পরবর্তী শিখেছেন পূর্ববর্তীকে দেখে। আমাদের সামনে এখন আছেন আল্লাহর এই নেক বান্দা! তাই আমি মদীনা শরীফ থেকে শুরু করে হজ্বের শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিটি বিষয় দেখার, শেখার এবং অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। এটা অবশ্য ঠিক যে, দৃষ্টি যেমন দেখা তো তেমনই হবে! যোগ্যতা যেমন শেখা তো সেভাবেই হবে! সর্বোপরি সাধ্য যেমন অনুসরণ তো সে পরিমাণেই হবে! তবু আমি চেষ্টা করেছি দেখার, শেখার এবং অনুসরণ করার।

আল্লাহর ঘরের তাওয়াফে দেখা হযরত হাফেজ্জী হুযূর ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ। তাঁর হৃদয় ও আত্মার ব্যাকুলতা এবং তাঁর কলব ও রূহের অস্থিরতা, এগুলো তো ভিতরের বিষয়! তা বোঝার সাধ্য আমাদের কোথায়?! বাইরে থেকে যতটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে তিনি আল্লাহর আশিক বান্দা ও প্রেমিক দাস! ইশক ও আবদিয়াত এবং প্রেম ও দাসত্ব, এ দুইয়ের অপূর্ব এক মিলন ঘটেছে তাঁর মাঝে। হাসান বছরীর তাওয়াফ কেমন ছিলো; জিলানী ও জোনায়দ বোগদাদীর তাওয়াফ কেমন ছিলো; মারূফ কারখী ও বিশরে হাফী এবং রূমী ও তাবরেযীর তাওয়াফ কেমন ছিলো জানি না; আমি জানি না কেমন ছিলো যুগে যুগে আল্লাহর আশিক বান্দাদের তাওয়াফ! তবে হযরতের তাওয়াফ দেখে বারবার ভেবেছি, তাঁদের তাওয়াফ কি আরো সুন্দর, আরো সজীব ছিলো! আরো বেশী ছিলো সেই তাওয়াফের শানে ইশক ও শানে বন্দেগি! আমার শুধু মনে হয়েছে, হযরতের এই যে তাওয়াফ, এর হাজার ভাগের একভাগ যদি কারো নছীব হয় তাহলে অবশ্যই সে খোশনছীব!

হযরত ইফরাদ হজ্বের ইহরাম করেছেন, আমরাও। সে হিসাবে এটা ছিলো শুধু তাওয়াফে কুদূম, যার পরে সা'ঈ নেই। সুতরাং এর শুরুতে রামাল ও ইযতিবা নেই। তবে তাওয়াফে যিয়ারাতের পরবর্তী সা'ঈ যদি এখন করে নেয়া হয় তাহলে এখানে রামাল ও ইযতিবা করতে হবে। আমরা তাওয়াফে যিয়ারাতের পরবর্তী সা'ঈ এখনই করে ফেলবো, তাই তাওয়াফের প্রথম তিনচক্করে রামাল ও ইযতিবা করলাম। তাওয়াফে যিয়ারাতের সময় যে প্রচণ্ড ভিড় হয় সেদিক থেকে এখন সা'ঈ করে নেয়া তুলনামূলক সহজ, বিশেষত মাযূর ও দুর্বলদের জন্য।

আমরা চিন্তিত ছিলাম, মাতাফের এই জনসমুদ্রে হযরত কীভাবে কী করবেন, যেখানে জোয়ানদেরও হিমশিম অবস্থা! কিন্তু তাঁকে মনে হলো এসব চিন্তার উর্ধ্বে! তিনি শান্ত, নিশ্চিন্ত! তিনি শুধু কালো গিলাফের হাতছানিতে আকুল ও ব্যাকুল!

তাওয়াফ শুরু হতেই বোঝা গেলো, হযরতের বিষয় আসলেই অন্যকিছু! তাঁর উপর রয়েছে রহমতের ছায়া এবং রহমানের মায়া! তিনি একটু একটু অগ্রসর হন, আর কোন এক অদৃশ্য ব্যবস্থায় সামনের জনতরঙ্গ একটু একটু সরে যায়! এমনকি প্রথম তিনচক্করে তিনি রামালও করলেন পূর্ণ শানের সাথে, একেবারে নির্বিঘ্নে। ইযতিবার হালাতে তাঁর রামাল ছিলো দেখার মত দৃশ্য! সেদিনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যারা তাঁর বার্ধক্যের কথা বলেছেন, তাদের প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নেই। তারা তো তাদের

মত করেই ভাববেন, বলবেন! কিন্তু তারা যদি আজ এখানে থাকতেন, অবশ্যই অনুতপ্ত হতেন নিজেদের 'মূর্খতার' জন্য!

জনাব আখতার ফারূক ছাহেব এখন দুনিয়াতে নেই। আল্লাহ তাকে জান্নাত নছীব করুন। তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন, তাওয়াফের সময় হযরতকে বেষ্টনীতে রাখার, কিন্তু শেষে অবস্থা এমন হলো যে, আমরা যুবকেরা হযরতের 'বেষ্টনীতে' নির্বিঘ্নে তাওয়াফ সমাপ্ত করলাম!

এই সফরে যতবার হযরতের সঙ্গে তাওয়াফ করেছি ততবার আমরা এ অভিনব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। আর প্রতিদিন তিনি তাওয়াফও করেছেন অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী! হযরত পাহাড়পুরী হুযূর জীবনের প্রথম বাইতুল্লাহর সফর করেছেন হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ)-এর সঙ্গে। তখন একদিন হযরত নাকি আমার হুযূরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আজ কয় তাওয়াফ হয়েছে? হুযূর ভেবেছিলেন, উত্তর শুনে হযরত খুশী হবেন, কিন্তু তিনি বললেন, মিয়াঁ তোমরা তো জোয়ান মানুষ, আরো বেশী তাওয়াফ করতে পারো না!

হুযূর বলেন, আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত আজ কয়টি তাওয়াফ করেছেন?

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে আফসোসের সাথে বললেন, এখন তো বুড়া হয়ে গেছি, আগের মত আর পারি না, আজ মাত্র পনের তাওয়াফ করেছি।

এটা আসলে শুনে বোঝার বিষয় নয়, দেখে অনুভব করার বিষয়। পুরো সফরে হযরতের যে অবস্থা দেখেছি, আল্লাহর গায়বি মদদ ছাড়া এর অন্য কোন ব্যাখ্যা আমি অন্তত খুঁজে পাইনি। শুধু বুঝেছি, যা কিছু তিনি করেছেন আত্মার শক্তিতে করেছেন, দেহের শক্তিতে নয়। রূহানিয়াতের শক্তি যখন সাহায্য করে, জিসমানিয়াতের শক্তি তখন গৌণ হয়ে যায়। গায়বের সঙ্গে যখন বন্ধন স্থাপিত হয় তখন মানুষ অন্য মানুষ হয়ে যায়। পুরো হজ্বের সফরে হযরতকে আমার মনে হয়েছে তেমনি অন্য এক মানুষ, যিনি সবসময় আমাদের মাঝে ছিলেন, কিন্তু সবসময় আমাদের ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাই তাঁর কাছ থেকে আমরা কিছু নিতে পারিনি, বরং দিতে পেরেছি শুধু কষ্ট, কখনো শরীরে, কখনো মনে; কখনো দেহে, কখনো আত্মায়।

তাওয়াফের সাত চক্কর শেষ হলো। ভাবছি, হযরত এখন অগ্রসর হবেন মাকামে ইবরাহীমের দু'রাকাতের জন্য। কিন্তু না, তাঁর ব্যাকুল দৃষ্টিত হাজারে আসওয়াদ ও মুলতাযামের দিকে! দৃষ্টির ব্যাকুলতার অর্থ হয়ত বুঝতে পারছি। আমাদের মত প্রেমহীন হৃদয়েও তো আছে কিছু ব্যাকুলতা হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করার! আমাদের উত্তাপহীন বুকেও তো আছে কিছু তৃষ্ণা মুলতাযামের স্পর্শ লাভ করার! কিন্তু মজবূর অবস্থায় দূর থেকে শুধু দেখা ছাড়া উপায় কী, আশিক ও প্রেমিকদের ভাষায় যার নাম দৃষ্টির চুম্বন এবং দৃষ্টির স্পর্শ! এটাও তো সৌভাগ্যের বিষয়! দূর থেকে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে হযরত হয়ত এখন সে সৌভাগ্যই অর্জন করছেন। কিন্তু না, আমাদেরকে অবাক করে

তিনি বললেন, হাজারে আসওয়াদ না হোক, অন্তত মুলতাযামে পৌঁছার চেষ্টা করি; আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট না দিয়ে যদি সম্ভব হয়ে যায়!

অবাক হওয়ার পর একসঙ্গে আমরা সবাক হলাম, হযরত! যে সঙ্গীন অবস্থা, তাতে ...!

তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, কোশিশ তো করতে পারি! বান্দার শাওক দেখে আল্লাহর যদি দয়া হয়ে যায়!

একজন বৃদ্ধের সামনে একজন যুবকের এরপর আর কিছু বলার থাকে না। বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহি বলে তিনি অগ্রসর হলেন; আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন-

اَللّٰهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الْوَلِيْدِ

এই দু'আটি পড়ো, আর আগে বাড়ো, তবে দেখো, আল্লাহর কোন বান্দার যেন কষ্ট না হয়। কারণ মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম!

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে বাইতুল্লাহর মাতাফে মুলতাযামের পথে হযরত এ দু'আটি শিখিয়েছেন। আল্লাহর রহমতে আমি এর উপর আমল করছি, আর আল্লাহ আমাকে সাহায্য করছেন এবং রক্ষা করছেন। এ রক্ষাকবচ মৃত্যুর সময় শয়তানের হামলা থেকেও যেন রক্ষা করে, তখনো যেন আল্লাহ সাহায্য করেন; যারা আমীন বলবে তাদেরও।

হযরত অগ্রসর হলেন এবং .. এবং আল্লাহ তাঁকে মদদ করলেন। সামনের যে-ই দেখে এই নূরানী ছুরতের মানুষটিকে সে-ই সসম্ভ্রমে পথ করে দেয়। এভাবে কাউকে কোন কষ্ট না দিয়ে সত্যি সত্যি তিনি মুলতাযামের কাছে পৌঁছে গেলেন, আর আমরা! তাঁর পিছনে থেকে আমরাও নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেলাম। 'পিছনে' থাকার লাভ জীবনের সর্বক্ষেত্রে, কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে চাই এবং পিছিয়ে পড়ি, কিংবা পথ হারিয়ে ফেলি!

প্রিয় বন্ধু! তোমাকে আমি দেখেছি, কিংবা দেখিনি; তবে আমাদের মাঝে তো রয়েছে (ইলমের এবং) ঈমানের বন্ধন! তোমাকে আমি ভালোবাসি এবং তোমার কল্যাণ কামনা করি। একজন কল্যাণকামী বন্ধুর কাছ থেকে এই 'সন্দেশ'টুকু তুমি গ্রহণ করো; জীবনের বন্ধুর পথে আলোকিত কোন মানুষের পিছনে পথ চলার চেষ্টা করো। আরেকটি কথা, চাঁদের 'দাগ' দেখে ভুলে যেয়ো না চাঁদের সৌন্দর্য; তদ্রূপ কখনো ভুল করো না 'অগ্নিকবলিত' মানুষকে আলোকিত মানুষ বলে।

হযরত কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং সতৃষ্ণ নয়নে মুলতাযামের পানে তাকিয়ে থাকলেন। সামনে আল্লাহর যে বান্দা মুলতাযামে বুক লাগিয়ে রেখেছিলেন তিনি হয়ত তৃপ্ত হলেন, কিংবা অন্য বান্দাকে সুযোগ দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এবং অতৃপ্তির মাঝে আরো গভীর তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, তা'আলা ইয়া শায়খ! (হে শায়খ, আপনি আসুন)

তিনি সরে আসায় হযরত সুযোগ পেলেন এবং দু'হাত উপরে তুলে মুলতাযামে বুক লাগিয়ে দিলেন। আমি তাঁর পিঠের সাথে বুক লাগিয়ে রাখলাম এবং .. এবং মনে হলো, মুলতাযামের শীতলতা আমাকেও স্পর্শ করলো! অনুভব যদি করা যায় তাহলে এক স্পর্শ থেকে অন্য স্পর্শের শীতলতা অবশ্যই লাভ করা যায় এবং স্পর্শপরম্পরায় পরম স্পর্শের সান্নিধ্যে উপনীত হওয়া যায়। মুলতাযামে বুক লাগিয়ে আমরা কি শুধু মুলতাযামের স্পর্শ লাভ করি! এখানে কি নেই অতীতের এবং দূর অতীতের স্পর্শ!

হে আল্লাহ! তোমার আশিক বান্দার বুক লেগে আছে তোমার মুলতাযামে, আর তোমার অধম বান্দার বুক লেগে আছে তাঁর পিঠের সঙ্গে। হে আল্লাহ! শরীর থেকে শরীরে তো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়; তাহলে আমার বুকেও কি আসবে না তোমার মুলতাযাম থেকে তোমার রহমতের কিছু প্রবাহ!

হে আল্লাহ! তোমার পেয়ারা বান্দা তোমার কাছে কী 'চাইছেন' আমি জানি না; আমার শুধু মিনতি, তাঁর সমস্ত চাওয়া থেকে আমারও যেন হয় কিছু পাওয়া!

হযরত দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন বিশ বছরের বেশী হলো। যখনই আমি হযরতের কবর যিয়ারত করি, কবরের বুক বরাবর দাঁড়াই, মুলতাযামের সেই দৃশ্য আমার সামনে ভেসে ওঠে এবং .. থাক, এবং-এর পরেরটুকু বুকের ভিতরেই থাক। কিছু কথা বুকের ভিতরে থেকে যাওয়াই ভালো।

ধীরে ধীরে হযরত মুলতাযাম থেকে সরে এলেন এমনভাবে যেন তাঁর পিছনে যে আছে সে জায়গা পেয়ে যায়। পিছনে ছিলাম আমি, কিন্তু আল্লাহর অন্য বান্দার পিপাসা হয়ত ছিলো আরো বেশী, কিংবা আল্লাহর ডাক তিনি হয়ত শুনেছেন আরো বেশী! তিনি সুযোগ পেলেন, আমি পেলাম না, তবে আফসোস হলো না। কারণ তিনি যে দেশের, যে গোত্রের, যে বর্ণের এবং যে ভাষারই হোন তিনি তো আমারই ভাই! তার প্রাপ্তি তো আমারও প্রাপ্তি! তাই বিনা আফসোসে শুধু 'গিবতার' নযরে একবার তার দিকে তাকিয়ে পিছনে সরে এলাম এবং তাওয়াফের তরঙ্গপ্রবাহে ভাসতে ভাসতে মাকামে ইবরাহীমী থেকে কিছুটা দূরে এসে থামলাম।

হযরত দু'রাকাত আদায় করে সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করলেন। আমরাও কোনরকম তাঁকে অনুসরণ করে গেলাম।

হে বন্ধু! এবার আমি একটি শব্দ উচ্চারণ করবো, যা শুধু কানেই নয়, হৃদয়েরও গভীরে রিমঝিম সুর সৃষ্টি করে, 'যামযাম'! আহ, কী মধুর উচ্চারণ! মাতৃমমতার সুধা যেন ঝরে ঝরে পড়ে! আবার বলি, 'যামযাম'! আহ, শুধু উচ্চারণেই হৃদয়ের তৃষ্ণা যেন নিবারিত হলো! আবার, 'যামযাম'! আহ, হৃদয়ের তৃষ্ণা যেন আরো তীব্র হলো!

ঐ যে যামযামের সিঁড়ি! হযরত এগিয়ে গেলেন, আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম। যামযামের অন্তহীন ফোয়ারা যেন পরম মমতায় আমাদের টেনে নিয়ে এলো! যামযামের এ মমতা সবার জন্য! তুমি পাপী, গোনাহগার? যামযামের মমতা তোমারও জন্য, যদি তুমি অনুতপ্ত হও!

আমি মুজরিম, অপরাধী! যামযামের মমতা আমারও জন্য, যদি হৃদয় আমার অনুশোচনায় দগ্ধ হয়!

মুমিনের মাঝে এবং মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য কী? আল্লাহর পেয়ারা হাবীব বলেছেন, 'যামযামের পানি'! মুনাফিক যামযাম তৃপ্তিভরে পান করে না, করতে পারে না। মুমিন যত পান করে, তার তৃপ্তি হয় না। আকণ্ঠ পান না করে তার তৃষ্ণা যেন নিবারিত হয় না।

এই সিঁড়ি দিয়ে জীবনে প্রথম নেমেছিলাম একা একা; আজ আবার নামলাম হজ্বের মৌসুমে আল্লাহর নেক বান্দার পিছনে পিছনে। আমার মত স্থূল হৃদয়েও অনুভূত হলো দুয়ের পার্থক্য! তখন ছিলো কিছু কিছু, এখন হলো অনেক কিছু!

প্রাণভরে পান করলাম যামযামের সুশীতল পানি। আমি তৃপ্ত হলাম, আমি কৃতার্থ হলাম এবং অন্তরের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম। আরেকটি সৌভাগ্য; হযরত আমাকে গ্লাস ভরে যামযাম পান করালেন। আবার, আবার আমি সময়ের রাজপথ ধরে দূর অতীতে চলে গেলাম! আমি যেন সেই পবিত্র হাত থেকে যামযাম পান করলাম, যে পবিত্র হাত থেকে ইনশাআল্লাহ একদিন আলকাউছার পান করবো! হে আল্লাহ, তোমার রহমতের কাছে এটা তো অসম্ভব কোন চাওয়া নয়! হে আল্লাহ, যারা আমীন বলবে তারাও যেন আলকাউছারের হাযিরান হয়, আমীন।

প্রিয় পাঠক! বারবার ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে এই যে, দু'আ উশুল করে নেয়া, তুমি কি বিরক্ত হও?! আমি কিন্তু জানতাম না, আল্লাহর এক বান্দা আমাকে এ কৌশল শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'লেখকদের বিরাট সুযোগ যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার মানুষের দু'আ হাছিল করে যাওয়ার।' তাছাড়া আমীন বলে দু'আ করে তুমি তো আর বঞ্চিত হবে না!

***

এর পর ছাফা ও মারওয়া! মা হাজেরার ছাফা ও মারওয়া! ইবরাহীম খলীল ও ইসমাঈল যাবীহ (আ)-এর ছাফা ও মারওয়া! এবং সাইয়েদুল মুরসালীন ও রাহমাতুল-লিল আলামীনের ছাফা ও মারওয়া!

হযরত রওয়ানা হলেন ছাফা-মারওয়ার উদ্দেশ্যে। তাঁর সবকিছু অন্যরকম! আমরা তাওয়াফ করে ক্লান্ত, তাওয়াফের পর তিনি আরো প্রাণবন্ত! আমরা কিছুটা নির্জীব, তিনি আরো সজীব! দেহনির্ভর আত্মা এবং আত্মানির্ভর দেহ– এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য আছে বন্ধু, বিরাট পার্থক্য আছে! সজীব আত্মা ধারণ করেন যারা তাদের উত্তরসূরী কিয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই থাকবে এবং এবং তাদের সান্নিধ্য হবে আমাদের মত মানুষের জন্য কল্যাণকর।

হযরত ছাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করার হাকীকত ও ফযীলত বয়ান করলেন এবং সা'ঈর বিভিন্ন আদব স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি আমাদের সতর্ক করে বললেন, 'দেখো; সাইয়েদেনা হযরত ইবরাহীম (আ) এখানে সা'ঈ করেছেন, তারপর দোজাহানের সরদার হুযূরে আকদাস ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে সা'ঈ

করেছেন। ছাহাবা কেরাম সা'ঈ করেছেন। যুগে যুগে আল্লাহর বেশুমার আশেকান সা'ঈ করেছেন। আজ আল্লাহ আমাদেরও নছীব বুলন্দ করেছেন এখানে সা'ঈর মাকামে হাযির করে। জানি না আর কখনো নছীব হবে কি না! সুতরাং এটাকেই শেষ সুযোগ মনে করে কাজে লাগাতে চেষ্টা করো। হুযূরে কলব যেন থাকে, আদবের যেন কমি না হয়।'

এ কথাগুলো কি নতুন কিছু! কিন্তু হযরতের যবানে যখন শুনলাম, মনে হলো নতুন শুনলাম।

হযরত সা'ঈর নিয়ত করে ছাফা পর্বতে আরোহণ করলেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলেছেন, তাঁকে অনুসরণ করে বললেন–

نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ ، إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমিও তা দিয়ে শুরু করছি। নিঃসন্দেহে ছাফা ও মারওয়া হচ্ছে আল্লাহর শা'আইর (ও বিশেষ নিদর্শনাবলী) থেকে গণ্য।

হযরত বাইতুল্লাহ-অভিমুখী হয়ে হাত তুলে হামদ-ছানা করলেন, দু'আ করলেন, তারপর তাকবীর বলে অবতরণ করলেন। আমরা তাঁকে অনুকরণ করে গেলাম এ আশায় যে, এভাবে আমাদেরও আমল সুন্নাতের অনুগামী হবে। কারণ আমরা নিজেরা তো জানি না কিছু! অথচ তিনি হলেন ইশকের পথের পুরোনো পথিক! কবি যে বলেছেন–

পানের জলসায় তুমি তো আনাড়ী আগন্তক/ দেখো আমি সুরায় কত পানি মেশাই কেমনে ঠোঁট লাগাই!/ আমার চুমুক দেখে দাও চুমুক, দোলাও মাথা/ জমবে নেশা, পাবে ভিন্ন স্বাদ, ভিন্ন মজা।

ক'দিন আগে রামাযানে দু'বার সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করেছি। তাতে আল্লাহ যে আত্মিক শক্তি ও রূহানি সুকূন দান করেছেন তাতে আমি কৃতার্থ, কিন্তু হযরতকে অনুসরণ করে আজকের যে সা'ঈ, সত্যি তা অতুলনীয়! অজানা রহস্যের নতুন দিগন্ত যেন উন্মোচিত হলো! ইশক ও মুহাব্বাত এবং প্রেম ও ভালোবাসার নতুন ঝর্নাধারা যেন হৃদয় থেকে উৎসারিত হলো। বর্তমানের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অতীতের মাঝে সমর্পিত হওয়া যেন আরো সহজ হলো।

ছাফা পাহাড় থেকে হযরত যখন নেমে আসতেন, মনে হতো, আসমান থেকে নূরের ফিরেশতা নেমে আসছেন! তাঁর পিছনে আমরা যেন রহমতের দরিয়ায় অবগাহন করার জন্য নেমে আসছি!

হযরত যখন মারওয়ায় আরোহণ করতেন, মনে হতো, নূরের ফিরেশতা ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করছেন! তাঁর পিছনে আমরা যেন আলোর রজ্জু ধারণ করে আছি!

দুই সবুজের মাঝে আশি বছরের বৃদ্ধ যখন দৌড়তেন, মনে হতো, তিনি তিনি নন, অন্য কেউ! এ যুগের জন্য তিনি যেন সে যুগের প্রতিনিধি! তিনি যেন তাঁদের

প্রতিচ্ছবি! তাঁর পিছনে আমরা যেন ছুটছি এ যুগের সীমানা ছেড়ে সে যুগের সীমানায় প্রবেশ করার জন্য এবং সে যুগের পবিত্রতাকে একটু হলেও স্পর্শ করার জন্য!

হায়, কী দিন, রাত পার হলো! কেমন সৌভাগ্যের মুহূর্তগুলো চলে গেলো! এই পঁচিশটি বছরের বিনিময়ে হে আল্লাহ, তুমি যদি ফিরিয়ে দিতে সেই শুভ্র-সমুজ্জ্বল দিনগুলো! তুমি কবুল করো হে আল্লাহ, আমার সব ভালোকে আরো ভালো বানিয়ে এবং সব মন্দকে ভালোতে বদল করে! তুমি কী না পারো হে আল্লাহ!

সপ্তম চক্কর শেষ হলো মারওয়ায়। হযরত বাইতুল্লাহর অভিমুখী হয়ে অনেক্ষণ দু'আ করলেন হৃদয়কে বিগলিত করে এবং চোখের অশ্রুতে স্নাত হয়ে। সেই মুনাজাতে তাঁর বিগলিত রূপ দেখে আমরা অন্তত বুঝতে পারলাম, এমন করে মুনাজাত করা হয়! পিছনের যুগে এমন করে মুনাজাত করা হতো! এবং এমন মুনাজাতই ধারণ করতে পারে 'সেই মুনাজাতের' সামান্য কিছু ফায়য ও ফায়যান! আমাদের জন্য তো এতটুকু সৌভাগ্যই যথেষ্ট যে, আমরা এমন মুনাজাত দেখেছি এবং আমীন, আমীন বলেছি।

মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিছবাহ এখন দুনিয়াতে নেই; তার কবর হোক জান্নাতের বাগিচা! ফেরদাউস হোক তার 'আবাদী' ঠিকানা! তাকে সেদিন দেখেছিলাম হযরতের পিছনে দাঁড়িয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে। চোখের পানিতে ধোয়া তার চেহারা যেন ছিলো শাবনামে ধোয়া তাজা ফুল! তার আঁসু-ভেজা আওয়াযের সেই কথাটি এখনো মনে পড়ে; তিনি বলেছিলেন, আমাদের হযরতকে কবে আমরা চিনতে পারবো! কবে চিনতে পারবে আমাদের দেশের মানুষ! তাঁর ডাকেই যদি দেশ সাড়া না দিলো তাহলে তাঁর পরে কী হবে?!

আমি বলেছিলাম, আগে 'আমরা' তো চিনতে চেষ্টা করি! আগে 'আমরা' তো মানতে চেষ্টা করি! তারপর না হয় ভাববো দেশের মানুষের কথা।

***

হযরতের সঙ্গে আমরা ফিরে এলাম হাজী মীযানের ঘরে। আমার থাকা খাওয়ার ইনতিযাম ছিলো আলাদা। কিন্তু হাজী মীযান বললেন, আজকের খানা আমার পক্ষ হতে দাওয়াত। হযরত বললেন, দাওয়াতের খানা খেয়ে যাও।

দাওয়াত ছিলো হযরতের, খাবার ছিলো আমাদের। তিনি খেলেন দু'তিন লোকমা, আমরা সাবাড় করলাম পুরো দস্তরখান! একজন অর্জন করেন, আর বহুজন কাছে থেকে তার ফল ভোগ করে; শুধু দুনিয়ার ফল, কিংবা আখেরাতেরও ফল। দুর্ভাগা তারা যারা শুধু দুনিয়ার ফলে তৃপ্ত থাকে, আর বদনছীব তারা, দু'টো থেকেই বঞ্চিত যারা।

আজকের দস্তরখানে মোলাকাত হলো 'মুশাক্কাল'-এর সঙ্গে এবং প্রথম মোলাকাতেই মুহাব্বাত হয়ে গেলো। কারণ, জানলাম, মুশাক্কাল হযরতের খুব প্রিয়। হাজী মীযানের জানা ছিলো, তাই হযরতের জন্য মুশাক্কালের ইনতিযাম রেখেছেন। মুশাক্কাল মানে টিনের কৌটায় কলার সঙ্গে অন্যান্য ফলের মিশ্র জুস। খেলাম। নাহ, ঠিক মত বলা

হলো না, বলা উচিত, পান করলাম, একটু একটু করে, স্বাদ বুঝে বুঝে! এমন সুস্বাদু যে, বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলা যায়,'একটি কৌটায় একত্রে সকল ফলের স্বাদ!'

সফরের শেষ পর্যন্ত হযরত আমাকে বহুবার মুশাক্কাল পান করিয়েছেন, আমিও মাঝে মাঝে তাঁর খিদমতে পেশ করেছি। যে স্নেহমাখা হাসি উপহার দিয়ে তিনি মুশাক্কালের কৌটা হাতে নিতেন, তা মনে হলে এখনো আনন্দে আপ্লুত হই। কবি মোটেই অতিশয়োক্তি করেননি–

'তোমার চিবুকের তিলক, তোমার অধরের মধুর হাসি/একটির জন্য দেবো হৃদয়, একটির জন্য প্রাণ!

আমার বুড়ো হযরতের চিবুকে তিলক ছিলো না, শুধু হাসিটুকুর জন্যই আমি বিলিয়ে দেবো আমার হৃদয় ও প্রাণ!

***

হারাম শরীফ দিন-রাত খোলা থাকে। তাই নিয়ত করেছি, ব্রিফকেসটা কামরায় রেখে হারাম শরীফেই রাত যাপন করবো। হারাম শরীফে হযরতের প্রিয় স্থান হলো উম্মেহানি। হযরত থেকে বিদায় নিয়ে উম্মেহানিতে চলে এলাম। তাহাজ্জুদের তখনো কিছু বাকি। ই'তিকাফের নিয়তে সেখানেই শুয়ে পড়লাম। চোখের সামনে আল্লাহর ঘর! দু'চোখভরে দেখছি কালো গিলাফের সৌন্দর্য! এরই মাঝে দু'চোখভরে আল্লাহ দান করলেন প্রশান্তির ঘুম! আল্লাহ যখন জেগে থাকার শান্তি দান করেন তখনো তাঁর শোকর! আল্লাহ যখন নিদ্রার প্রশান্তি দান করেন তখনো তাঁর শোকর। তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামত তোমরা অস্বীকার করবে!

ফজরের পূর্বে হযরত উম্মেহানিতে এলেন এবং সেখানেই ফজর আদায় করলেন। ইশরাকের পর তিনি তাওয়াফ করলেন, আমরাও তাঁর অনুগমন করলাম।

প্রিয় পাঠক! হযরতের সঙ্গে এই দ্বিতীয় তাওয়াফেরও আছে এমন কিছু কথা যা শুনতে তোমার ভালো লাগার কথা, কিন্তু আমাকেও তো কিছু সংযম শিখতে হবে! সুতরাং থাক সে প্রসঙ্গ। শুধু বলি, হযরতের সঙ্গে এই সফরের যা কিছু ভালো, আল্লাহ যেন তোমাকেও দান করেন। সফরনামার সেতুবন্ধনের মাধ্যমে তুমিও তো আমার হযরতের সফরসঙ্গী! ছোট্ট করে শুধু একবার আমীন বলো, আমার জন্য এবং তোমার জন্য। নিয়ত করে দেখো না, আল্লাহর রহমতের খাযানা কত অফুরন্ত! আমাদের রব তো বলেছেন, 'লা-উবালী!' (আমি দিতেই থাকবো,) কোন পরোয়া করবো না। রহমতের আশা করো রহীমের শান হিসাবে, বান্দার ক্ষুদ্রতা হিসাবে নয়!

***

তাওয়াফের পর হযরত বাসায় চলে গেলেন, আমি উম্মেহানিতে ঘুমিয়ে থাকলাম। ফারূক ভাইও সঙ্গে থেকে গেলেন এবং আমার প্রতি অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করলেন। শাওয়াল থেকে এ পর্যন্ত মাদরাসার কাজ কীভাবে করেছেন! কত প্রতিকূলতার মাঝে কেটেছে তার দিন রাত, শোনালেন, অনুযোগ করে বললেন, অন্তত আপনার চলে যাওয়া উচিত হয়নি আমাকে একা রেখে।

এই ভালো মানুষটিকে আমি শ্রদ্ধা করি। সর্বকল্যাণ আল্লাহ তাকে দান করুন। পরে তিনি কয়েকবার হজ্ব করেছেন। গত বছর ২৮ হিজরীতে হজ্বের এক সপ্তাহ আগে দেশের বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে আসার পথে এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, পথিমধ্য হতেই হাসপাতালে নিতে হয়েছিলো এবং শাব্দিক অর্থেই তার জীবনাশংকা দেখা দিয়েছিলো। চিকিৎসক এবং আপন-পর কারো কথাই তিনি শুনেননি, হাসপাতাল ছেড়ে সোজা গিয়ে উঠেছেন বিমানে। তার এককথা, মৃত্যু যদি আসে, আল্লাহর ঘরের সফরেই আসুক! আমি বলবো না, এটা ঠিক ছিলো, শুধু বলবো কবির ভাষায়–

আমি বুঝি না জ্ঞানীদের ভাষা, যুক্তির শব্দমালা!/ আমাকে শোনাও মজনুর কাহিনী, দেখাও পানশালা/ আমি হতে চাই প্রেমের 'শহীদ' লায়লার দুয়ারে/ কিংবা তার গলিতে, কিংবা মরুপথের অভিসারে!

তিনি সুস্থ হলেন আল্লাহর ঘরে গিয়ে যামযামে আকণ্ঠ হয়ে। তারপর হজ্ব করেছেন এবং ফিরেও এসেছেন। আল্লাহ তাকে দীর্ঘায়ু করুন। হয়ত প্রসঙ্গ থেকে সরে গেলাম, কিন্তু প্রিয় পাঠক, ভালো লাগেনি তোমার!

***

নয়টার দিকে ঘুম থেকে উঠে হারাম শরীফ থেকে বের হলাম কিছু সময়ের জন্য। প্রথমে গেলাম আবুজেহেলের বাড়ী।

না, পাঠক! আঁতকে ওঠার কিছু নেই; আবু জেহেলের বাড়ী এখন 'পাবলিক টয়লেট', বাংলায় যাকে বলে গণশৌচাগার। হারাম থেকে খুব দূরে নয়। ভাবতে সত্যি অবাক লাগে, এত কাছে ছিলো লোকটা হারামের! হযরত ওমর তো ছিলেন অনেক দূরে! আর আল্লাহর পেয়ারা হাবীব দু'আ তো করেছিলেন দু'জনেরই জন্য! দূরের ওমর পেয়ে গেলেন, পেলো না কাছের আবুজেহেল! অথচ ওমর ছুটে এসেছিলেন তালোয়ার হাতে মাথা নিতে, কিন্তু কাছে এসে দিলেন মাথা পেতে!

হযরতকে একসময় বলেছিলাম কথাটা, তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'আবুজেহেলের পথে তাকাব্বুর ছিলো বাধা, আর হযরত ওমর (রা)-এর পথে 'খুলূছ' ছিলো ওয়াছিলা! (অর্থাৎ তাঁর অন্তরে যখন হকের পরিচয় ছিলো না, হকের প্রতি তখনো তাঁর খুলূছ বা আন্তরিকতা ছিলো।)'

তিনি আরো বলেছিলেন, 'হযরত ওমর আল্লাহর নবীর জান নিতে এসেছিলেন, কিন্তু তাতে শারাফত ছিলো, বাহাদুরি ছিলো, আর আবুজেহেলের প্রতিটি আচরণে ছিলো ইতরতা ও কামিনাপন। শরীফ ও কামিনা তো সমান হতে পারে না!'

টুকরো টুকরো এরকম অনেক কথা হযরত বলেছেন পুরো সফরে। দু'একটি মনে আছে, আর সব হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে। কত ভালো হতো, যদি লিখে রাখতাম!

বলছিলাম আবুজেহেলের বাড়ীর কথা; পরিষ্কার, তবু ঢোকামাত্র নাকে দুর্গন্ধ লাগলো। বুঝতে পারলাম না, সউদী হুকুমত আবুজেহেলের বাড়ীকে এতটা ইজ্জত দিলো কেন

বুঝে? আবুজেহেলের বাড়ী কি হতে পারে হাজী ছাহেবানদের 'বাইতুলখালা'! তারা তো আল্লাহর ঘরের মেহমান!

যাক, এটা গুরুতর কিছু নয়, নিছক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। আবুজেহেলের বাড়ীতে যতক্ষণ ছিলাম, অস্বস্তিতেই ছিলাম, কিন্তু উপায় ছিলো না। আমার জানা মতে এর চেয়ে কাছে আর কোন বাইতুলখালা ছিলো না। পরবর্তী সফরে অন্য বাইতুলখালার খোঁজ পেয়ে আর যাইনি ওখানে।

হায় আবুজেহেল, তোমার বাড়ীতে 'বর্জ্য' ত্যাগ করতে এসেছি সে দোষ কিন্তু আমার নয়; নিজের কপাল নিজেই তুমি পুড়িয়েছো আল্লাহর নবীর শানে গোস্‌তাখি করে!

তোমার কি মনে পড়ে, আল্লাহর নবী বাইতুল্লাহর ছায়ায় নামায পড়ছিলেন! তিনি যখন আপন প্রতিপালকের সামনে সিজদায়, তুমি তখন হে 'মূর্খতার পিতা', তাঁর দেহের উপর উটের আবর্জনা ফেলেছিলে! সুতরাং আজ তুমি সানন্দে গ্রহণ করো লক্ষ লক্ষ হাজী ছাহেবানের ঘন ও তরল উভয় প্রকার আবর্জনা!

তোমার তো বড় খাহেশ ছিলো সরদারি জাহির করার, তাই হে মূর্খতার পিতা, মউতের সময় আবদার করেছিলে তোমার মুণ্ডুটা যেন গর্দানসহ লম্বা করে কাটা হয়, যাতে মানুষ বুঝতে পারে, এটা কোরায়শ-সরদারের মুণ্ডু! সাধে কি আর তোমাকে বলা হয় মূর্খতার পিতা! কার হাতে যেন তুমি কতল হয়েছিলে! হাঁ, মদীনার দুই 'বাচ্চা' আনছারীর হাতে! হায়, তোমার এ যুগের বন্ধুরা যদি তোমার পরিণতি থেকে কিছুমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করতো!

***

হারাম শরীফে ফেরার পথে সেই দোকানে গেলাম যেখানে রামাযানে আমার সামান আমানত রেখেছিলাম। দূর থেকে দেখতে পেলাম দোকানের মালিককে। বড় ভালো লাগলো। কাছে গিয়ে সালাম দিলাম, বললাম, চিনতে পেরেছেন? রামাযানে আমার সামান আমানাত রেখে আপনি বড় উপকার করেছিলেন!

তিনি চিনলেন এবং আন্তরিকভাবে মুছাফাহা করে বললেন, হাঁ, তোমার কথা খুব মনে আছে।

বললাম, আপনি দু'আ করেছিলেন, আল্লাহ যেন আবার আমাকে আল্লাহর ঘরে ফিরিয়ে আনেন; দেখুন, আল্লাহ মেহেরবানি করে আপনার দু'আ কবুল করেছেন!

তিনি খুশী হয়ে বললেন, আল্লাহ আমাদের সবার আমল কবুল করুন। তোমার সামান কোথায়?

বললাম, এবার আমি আমার শায়খের সঙ্গে এসেছি, সামান সেখানে আছে।

তিনি আমাকে ঠাণ্ডা শরবত দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। কিছুক্ষণ পর তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হারাম শরীফে ফিরে এলাম। এই রকম মানুষের দেখা এখন সেখানেও বিরল। আশ্চর্য সময়ের পরিবর্তন!

যোহরের পর হযরত উম্মেহানিতে বসলেন, হয়ত তাঁর ইচ্ছে ছিলো তিলাওয়াত করবেন, আল্লাহর ঘরের সৌন্দর্য অবলোকন করবেন এবং মোরাকাবায় নিমগ্ন

থাকবেন, কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের হুজুমের কারণে পুরো সফরে সে সুযোগ তাঁর কমই হয়েছে। কেউ মুছাফাহা করে, দু'আ চায়, কেউ হজ্বের মাসআলা জিজ্ঞাসা করে, কিংব অন্য কোন সমস্যার কথা বলে। অনেকে এমন অপ্রয়োজনীয় কথাও বলতো যে, আমরা অসংযম প্রকাশ করতাম। কিন্তু হযরত ছিলেন হযরতের মত! কখনো কারো প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখিনি তাঁকে। একবার শুধু কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'মানুষও কী সব বেহুদা কথা নিয়ে চলে আসে!'

একদিন তো এক ভালো মানুষ হযরতকে বটগাছে ভোট দেয়ার খোশখবর দিয়ে রাজনীতির প্রসঙ্গ জুড়ে বসলো। হযরত তাকে তাঁর সেই বিখ্যাত 'তওবা-দর্শন' বোঝালেন এবং হারাম শরীফে সময়ের কদর করার নছীহত করলেন।

কেউ বুঝতেই চাইতো না যে, এভাবে তারা আল্লাহর নেক বান্দার আধ্যাত্মিক নিমগ্নতায় কত বড় বিঘ্ন সৃষ্টি করে!

উম্মেহানিতে দেখা হয়ে গেলো আল্লাহর সেই বান্দার সঙ্গে, রামাযানে আমাদের যিনি তার গাড়ীতে করে জিদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি এসেছেন হযরত হাফেজ্জী হুযূরের ছোহবত গ্রহণ করতে। আমার আসার খবর তার জানার কথা নয়, এমনকি চেনারও কথা নয়। কিন্তু আমি যেমন তাকে চিনলাম, তিনিও চিনলেন এবং খুশী হলেন। আমি কৌতুক করে বললাম, আপনার এবং আপনার গাড়ীর বুজুর্গি ভোলার মত নয়! শেষ পর্যন্ত আপনারা দু'জনে মিলে আমাদেরকে বিমানের উদরে চালান করেই ছাড়লেন! আমি কিন্তু মনে মনে আপনার গাড়ীকে সাধুবাদ জানাচ্ছিলাম যে, হয়ত ওর ওছিলায় বিমান 'ফেল' করা সম্ভব হবে!

তিনি বললেন, বিশ্বাস করুন, এরপর একদিনের জন্যও ইঞ্জিনটা কোন গড়বড় করেনি। সেদিন কেন যে এমন হলো তা আলেমুল গায়বই ভালো জানেন। তবে বাংলাদেশ বিমানও কিছু কম যায়নি! যেন পণ করে বসেছিলো, আপনাদের না নিয়ে ওড়াল দেবেই না!

এই মানুষটি আমার মনে থাকার আরেকটি বড় কারণ, তিনি আমাকে একটি কিতাব হাদিয়া দিয়েছিলেন, আর আমাকে যদি কেউ কিতাব হাদিয়া দেয়, সারা জীবন তাকে মনে রাখার চেষ্টা করি।

***

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায সৌদী আরবের প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলিম। তিনি হযরতের সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায় জানিয়ে লোক পাঠালেন। সম্ভবত ঢাকস্থ সৌদী রাষ্ট্রদূত জনাব ফুয়াদ আব্দুল হামীদ আলখতীবের মাধ্যমে তিনি হযরতের সফর সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। হযরত আছরের পর তাঁকে সময় দিলেন। সউদী আরবের শাসকসম্প্রদায়কে বলা হয় আলেসউদ, আর সউদী শাসকসম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের বংশধরকে বলা হয় আলেশায়খ। ধর্মীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে আলেশায়খের উপদেশ ও নির্দেশনাকে সউদী সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। বিন বায হলেন আলেশায়খ পরিবারের বর্তমান প্রধান

ব্যক্তি। প্রথমত বংশীয় পরিচয়ের সূত্রে, দ্বিতীয়ত শায়খের উচ্চ ব্যক্তিত্ব ও ধার্মিকতার কারণে বর্তমান বাদশাহ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং তাঁর মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেন। হক কথা বলার ক্ষেত্রে তিনি বেশ নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী, তবে প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলে সর্বমহলে তাঁর বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। বহু বছর ধরে তিনি দৃষ্টিহীনতার শিকার, কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি অতিশয় প্রখর, একথা হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী লিখেছেন। মূলত তাঁর লেখার মাধ্যমেই আমি বিন বাযের মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জেনেছি। আমার মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিলো এই মহান আলিমে দ্বীনকে নিকট থেকে না হোক, অন্তত দূর থেকে একবার দেখার। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষ এখন তৈরী হলো। তদুপরি হযরত আমাকে আদেশ করলেন দোভাষীর দায়িত্ব পালন করার।

যথাসময়ে শায়খ বিন বায হযরতের অবস্থানস্থলে তাশরীফ আনলেন। অত্যন্ত সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী শায়খ বিন বায পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে হযরতের সঙ্গে মিলিত হলেন। মনে হলো নিজস্ব সূত্রে হযরতের জীবন ও কর্ম এবং মাকাম ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে, বিশেষত বাংলাদেশে ইসলামী খেলাফাত কায়েমের জিহাদে তাঁর সর্বসাম্প্রতিক তৎপরতা সম্পর্কে আগেই তিনি অবগতি অর্জন করে নিয়েছেন। শায়খের আচরণ ও উচ্চারণে সেটা সুস্পষ্ট ছিলো। সাধারণ সৌজন্য বিনিময়ের পর, আমার ধারণা ছিলো, শায়খ হযরতের ইরান সফর সম্পর্কে জানতে চাইবেন, কিন্তু তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিলো বাংলাদেশে দ্বীনী তালীম ও তারবিয়াতের ক্ষেত্রে আলিমসমাজের ভূমিকা সম্পর্কে। বোঝা গেলো, সাময়িকতার সীমাবদ্ধতা থেকে তিনি যথেষ্ট মুক্ত, যা অনেক ক্ষেত্রে দুঃখজনভাবেই অনুপস্থিত দেখা যায়।

হযরত সংক্ষেপে, কিন্তু সবদিক গুছিয়ে জবাব দিলেন। দ্বীনের খিদমত এবং ইলমের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে, সর্বোপরি বাংলাদেশের মুসলমানদের দ্বীনী তারবিয়াত এবং যাবতীয় বিদ'আত ও কুসংস্কারের মোকাবেলায় ওলামা-মাশায়েখের বিরাট ত্যাগ ও কোরবানির কথা তুলে ধরলেন। আমি অবাক হলাম, হযরত তাঁর দীর্ঘ জীবনের প্রিয় সঙ্গী ছদর ছাহেবের কথা এখানেও বিস্মৃত হলেন না, যিনি বহু আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। হযরত খুব মুহাব্বাতের সঙ্গে ছদর ছাহেব (রহ)-এর কীর্তি ও কর্ম আলোচনা করলেন, বরং এমনভাবে বললেন, যেন তিনি ছদর ছাহেবের অসমাপ্ত কাজ আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করছেনমাত্র। তাঁর এ বিনয় ও আত্মবিলোপ শায়খ বিন বাযকে প্রভাবিত করেছিলো। আমি সাধ্যমত তাঁর বক্তব্য আরবীতে তরজমা করলাম।

শায়খ বিন বায বাংলাদেশের দ্বীনী মাদরাসাগুলোর বর্তমান অবস্থা, বিশেষ করে মাদরাসা নূরিয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা জানতে চাইলেন।

হযরত এ বিষয়ে নিজে কিছু না বলে তাঁর পক্ষ হতে আমাকে বলতে বললেন। আমার তাৎক্ষণিক কোন প্রস্তুতি ছিলো না। উপস্থিত যতটুকু সম্ভব বললাম। নিজের কাছেই মনে হলো, উপস্থাপন সুন্দর হয়নি। তবু শায়খ বিন বায সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং

মাদরাসার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। শায়খ নিজের থেকে পরামর্শ দিলেন, এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরী করে হজ্বের পরপর যেন বাদশাহ এবং শায়খের বরাবরে পেশ করা হয়। এরপর বিষয়টি তিনি ব্যক্তিগতভাবে তদারক করবেন। শায়খ আরো বললেন, আফসোস! আপনার পরিচয় অনেক বিলম্বে পেলাম, নয়ত বহু আগেই আপনার প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতাম। কারণ আমি আন্তরিকভাবে বাংলাদেশে মুসলমানদের দ্বীনী তারাক্কী কামনা করি।

শায়খের বক্তব্য হযরতের সামনে পেশ করলাম, তিনি খুশী হয়ে শায়খকে জাযাকাল্লাহু জানালেন।

এরপর বাংলাদেশের ইসলামী সিয়াসাত এবং ইসলামী হুকুমত সম্পর্কে আলোচনা হলো। ইসলামী আন্দোলনের বিভক্তির কারণ কী? মুসলমানদের মাঝে ঐক্যের উপায় কী? এ বিষয়ে আপনার কর্মপরিকল্পনা কী? মোটামুটি এগুলো ছিলো শায়খের প্রশ্ন। হযরত প্রতিটি প্রশ্নের আশ্চর্যরকম যুক্তিনির্ভর ও নির্দ্বিধ জবাব দিলেন। তাঁর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো ছিলো এই–

(ক) ঈমান ও আকীদার মৌলিক বিষয় অমীমাংসিত রেখে ইত্তেহাদ বা ঐক্য হয় না এবং এ বিষয়ে অনমনীয় হওয়াকে ইফতেরাক বা বিভেদ সৃষ্টি করা বলে না।

(খ) সমস্ত 'কালিমাগো' মানুষকে আমি আমার দ্বীনী ভাই মনে করি। এজন্য দলমত নির্বিশেষে সকলকে তাওবার দাওয়াত দিয়েছি এবং খেলাফত কায়েমের মেহনতে শরীক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছি। (এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বহুল আলোচিত তাওবাদর্শন সংক্ষেপে তুলে ধরেছিলেন।)

(গ) ঐক্যের সঠিক পন্থা হলো ঈমান ও আকীদার মৌলিক প্রশ্নে একমত হওয়া, উম্মতের সর্বসম্মত কোন বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি না করা এবং প্রকাশ্য শরীয়তবিরোধী না হওয়ার শর্তে আমীরের পূর্ণ আনুগত্য করা।

ইরান সফরের পর ওখানকার শিয়া হুকুমত সম্পর্কে হযরতের প্রতিক্রিয়া ও মতামত কী? এটা ছিলো শায়খের শেষ প্রশ্ন।

এ বিষয়ে হযরত মদীনায় যা বলেছেন মোটামুটি তাই বললেন। তবে এখানে তিনি পালটা প্রশ্ন করলেন, ইরানকে আপনি মুসলিম দেশ এবং মুসলিম সরকার মনে করেন কি না?

এমন একটি প্রশ্ন যে এদিক থেকে আসতে পারে তা আমরা যেমন ভাবিনি, সম্ভবত শায়খ বিন বাযেরও ভাবনায় ছিলো না। বস্তুত এটি ছিলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন, কিন্তু শায়খ বিন বায খুব সম্ভব তাঁর অবস্থানগত সংবেদনশীলতার কারণে এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বললেন, বিষয়টির রাজনৈতিক দিক আলোচনা করা আমাদের কাজ নয়। শুধু শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ আলোচনা করাই আমাদের জন্য সঙ্গত হবে।

এ পর্যায়ে হযরতের একজন সম্মানিত সফরসঙ্গী কিছু বলতে উদ্যোগী হলেন। আমি বিচলিত বোধ করলাম এবং নিজের অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা না করেই জোরালোভাবে

বললাম, শায়খ এবং হযরতের মাঝেই এ আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। আপনার কিছু বলার থাকলে হযরতকে বাংলায় বলুন; হযরত মুনাসিব মনে করলে তা গ্রহণ করবেন।

যাকে উদ্দেশ্য করে আমার একথা বলা তিনি রুষ্ট হলেন, তবে নিবৃত্ত হলেন।

হযরত তখন শায়খের কথার সূত্র ধরে বললেন, আহলে সুন্নাতের আলিমগণ শিয়াসম্প্রদায়ের যে সকল আকীদাকে কুফুরি সাব্যস্ত করেছেন আমিও সেগুলো কুফুরি মনে করি। তবে ইরানের বর্তমান শিয়ানেতৃত্বের আকীদা ও বিশ্বাস কী তা আমার জানা নেই। এ সম্পর্কে ইসলামী উম্মাহর সর্বসম্মত ফতোয়া আসা দরকার বলে আমি মনে করি এবং সেটা আপনার উদ্যোগেই হতে পারে। বাকি, পর্দাহীনতাকে যে কঠোরতার সাথে সেখানে রোধ করা হয়েছে তার প্রশংসা করতেই হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত সউদী বিমানে বিমানবালা নিয়োগের বিষয়ে শায়খের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শায়খ বললেন, এসব বিষয়ে আমি যথাসম্ভব আমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।

শেষ পর্যায়ে হযরত ইরানের কিয়াদাতে ওলামার প্রশংসা করে বললেন, আমি মনে করি, প্রতিটি মুসলিম দেশেই কিয়াদাতে ওলামা (শাসনক্ষেত্রে আলিমনেতৃত্ব) কায়েম হওয়া উচিত।

দীর্ঘ একঘণ্টার আলোচনা বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশেই সম্পন্ন হলো। আলোচনা শেষে শায়খকে হযরত ফলফলাদি দ্বারা আপ্যায়িত করলেন। আরবদের ঐতিহ্যবাহী গাহওয়া অবশ্য পরিবেশন করা সম্ভব হলো না। হজ্বের পর আবার দেখা হবে এ আশাবাদ জানিয়ে শায়খ বিন বায বিদায় নিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি চোখের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত, কিন্তু তার চলাফেরা এত সাবলীল যে, অবাক হতে হয়। চোখের দৃষ্টিশক্তিরহিত কোন মানুষকে আমি চলা ফেরায় এমন সাবলীল দেখিনি।

মজলিসের পর মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেব আমাকে জাযাকাল্লাহু বললেন, সম্ভবত মাদরাসা নুরিয়ার বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। তিনি বললেন, মাদরাসার কাজ ফেলে চলে গিয়েছিলেন, এখন আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন। সুতরাং প্রতিবেদনটি হজ্বের আগেই তৈরী করে ফেলুন। আমি বললাম, আগে দেখুন না, হযরত কী বলেন! তাঁর আদেশ ছাড়া তো আমাদের কিছু করা ঠিক হবে না। আরো বললাম, আমাদের পক্ষ হতে হযরতকে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া আমার ভালো মনে হয় না। তিনি যদি মুনাসিব মনে করেন, নিজেই আমাদের বলবেন।

আমার এ কথা বলার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিলো। এখানে থাক সে প্রসঙ্গ।

মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিছবাহ হারামে যাওয়ার পথে মজলিসে আমার ভুমিকার প্রশংসা করে বললেন, বিষয়টি হযরতের সামনে তুলে ধরা দরকার। আমি বললাম, আপনি তো হযরতের আস্থাভাজন ব্যক্তি, আপনি বলুন, আপনার কথা ওযনদার হবে। তিনি যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন এবং আমাকেই অনুরোধ জানালেন।

এশার পর উম্মেহানিতে হযরতকে একান্তে পেয়ে বললাম, হযরত! ইজাযত হলে কিছু আরয করতে চাই। ইজাযত পেয়ে বললাম, হযরত! ইরান ও তার শিয়া হুকুমতের বিষয়টি এখন খুবই নাযুক। এ সম্পর্কে আপনার কোন মতামত ও মন্তব্য না আসাটাই উত্তম। কেননা এর ভুল ব্যাখ্যা হওয়ার আশংকা রয়েছে। ফলে বাংলাদেশের যমীনে ইসলামী হুকুমত কায়েমের যে খাব আপনি দেখছেন তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, একটি অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার কারণে। বিশেষ করে ইরানের সফরে হযরতের সফরসঙ্গী যারা এ বিষয়ে তাদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ তাদের মন্তব্য হযরতের নামেই সম্পৃক্ত হয়ে যাবে।

হযরত গম্ভীর মনোযোগের সাথে আমার কথা শুনলেন এবং মনে হলো বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করলেন।

আমি যুবক বয়সের সামান্য এক তালিবে ইলম। আমার সবকিছু নূরিয়া মাদরাসার ছোট্ট পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ। হযরতের ইসলামী সিয়াসাতের যে মেহনত, তার সাথে আমার প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। তবু বিবেকের দাবী মনে করে তাঁর খিদমতে কথাগুলো আরয করেছিলাম। কেননা বিভিন্ন আলামত দেখে প্রবল আশংকা জেগেছিলো যে, হযরতের মহান ব্যক্তিত্ব, যা এখন বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বিরাট নেয়ামত, আমাদের অসতর্ক কোন কথায় বা কাজে বিতর্কিত হয়ে পড়তে পারে। আর সেটা তাঁর নিজের জন্য লাভক্ষতির কিছু না হলেও বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য হবে বিরাট দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু যা হবার শেষ পর্যন্ত তা হয়েই গেলো। একেবারে আপনজনদের হাতে তাঁর যিন্দেগির খাব বড় বে-দরদির সাথে খুন হলো এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ক্ষতবিক্ষত হৃদয় থেকে শুধু রক্তক্ষরণ হতে থাকলো। এত বিরাট মানুষ এমন অসহায় হতে পারেন তা তাঁকে যারা ভিতর থেকে না দেখেছে তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। হজ্বের সফরনামায় সঙ্গত হবে না, নতুবা এখানে আমার কিছু কথা বলার ছিলো। কে জানে, এ অংশটুকুও মুছে ফেলা ভালো ছিলো কি না, তবে যা লিখেছি, বিবেকের অনুরোধে লিখেছি। ভুল হলে আল্লাহ যেন মাফ করেন।

এ সফরনামার অর্ধেক পাঠক হয়ত সেসময়টুকু দেখেনি যখন হযরত হাফেজ্জী হুযূরকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েমের সত্যি সত্যি একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো। আমি সে সম্ভাবনা দেখেছি এবং তার করুণ পরিণতিও দেখেছি। সুতরাং আজ কিংবা কাল, জীবন যদি বিশ্বস্ত থাকে, এ বিষয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাই. ইতিহাসের আমানত ইতিহাসের হাওয়ালা করার জন্য।

শুরু হলো হজ্বের আমল

আজ আটই যিলহজ্জ, পবিত্র হজ্বের সূচনাদিন। ভোর থেকেই 'হালচাল' শুরু হয়ে গেলো। হজ্বের প্রথম তরঙ্গপ্রবাহ যেন সবাইকে দোলা দিয়ে গেলো। কাফেলার পর কাফেলা লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক রবে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো।

সারা জীবন আমার বুকের কম্পন এবং হৃদয়ের স্পন্দন যে মধুর স্বপ্নের বাস্তাবায়নের জন্য নিবেদিত ছিলো সেই শুভলগ্ন আজ সমুপস্থিত। সত্যি সত্যি আমি আজ স্বপ্নের প্রথম সৌভাগ্যের সীমানায় প্রবেশ করলাম। শোকর আলহামদু লিল্লাহ!

ইহরামের সাদা লেবাসে নূরানী ফিরেশতার ছুরতে লক্ষ লক্ষ হাজীর মক্কা থেকে মিনায় গমনের যে দৃশ্য ও মানযার, সত্যি তা অপূর্ব! কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায় মিনা-অভিমুখী এ শুভ্র শোভাযাত্রকে! নাহ, এ আসলেই তুলনাহীন! অন্তত আসমানের নীচে এর কোন তুলনা নেই। এ নূরানী কাফেলার নূরানিয়াত যে অবলোকন করবে তার অবশ্যই মনে হবে, না এই উম্মত সম্পর্কে হতাশ হওয়া ঠিক নয়! এখনো আছে, এই উম্মাহর ভবিষ্যৎ এখনো আছে! প্রয়োজন শুধু বিশ্বপর্যায়ে একটি কিয়াদাতে রাশেদা বা আদর্শ নেতৃত্বের, যা ইনশাআল্লাহ মিনা-আরাফার কাফেলা থেকেই বেরিয়ে আসবে একদিন!

সময় এগিয়ে চলেছে; এশরাক পার হয়ে সূর্য কিছু উপরে উঠেছে। মিনায় রওয়ানা হওয়ার জন্য আমরা সবাই প্রস্তুত। এখন শুধু গাড়ীর অপেক্ষা! অপেক্ষা নয়, ব্যাকুল প্রতীক্ষা! কিন্তু গাড়ী আসে না; আসে না তো আসেই না! ব্যাকুলতা থেকে শুরু হলো অস্থিরতা! আর যেন দেরী সয় না! জীবনের সেই প্রথম অস্থির প্রতীক্ষার মধুর অনুভূতিটুকু আজো বড় মধুর করে মনে পড়ে।

শায়খ বিন বায হযরতের সুবিধার কথা বিবেচনা করে রাবেতা আলমে ইসলামীর পক্ষ হতে একটি আরামদায়ক গাড়ী এবং একজন পথপ্রদর্শকের ব্যবস্থা করেছিলেন।

অবশেষে যথাসময়ের কিছু পরে সেই গাড়ী উপস্থিত হলো। হযরতের সঙ্গে আমরা মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

'মিনায় রওয়ানা হলাম', কথাটা খুব সহজ, কিন্তু এর ভাব ও মর্ম বড় কঠিন! মিনা তো কোরবানির ময়দান! দুনিয়ার সমস্ত মুহাব্বাতকে আল্লাহর মুহাব্বাতের ছুরি দিয়ে কোরবান করার ময়দান! সেই ময়দানে যারা রওয়ানা হবে তাদের তো এখনই প্রতিজ্ঞা করতে হবে আল্লাহর হুকুমের সামনে নফসের সব খাহেশাতকে বর্জন করার! আল্লাহর মুহাব্বাতের মোকাবেলায় সমস্ত মুহাব্বাতকে কোরবান করার! কিন্তু কোথায় আমার দিলের সেই হালাত! দিল তো হে আল্লাহ, তোমারই হাতে! তুমি পয়দা করে দাও দিলের সেই কাইফিয়াত ও অবস্থা যা তোমার পছন্দ! তোমার খলীল ইবরাহীমের, তোমার যাবীহ ইসমাঈলের সেই ত্যাগ ও কোরবানির সামান্য কিছু ছায়া ও ছোঁয়া আমাদেরও কলবে দান করো হে আল্লাহ!

যুলহোলায়ফায় ইহরাম ধারণের পর থেকে হযরতের হিদায়াত মোতাবেক তালবিয়ার আমল তো জারি ছিলো এবং তার স্বাদ ও লয্যত আলহামদু লিল্লাহ অনুভূত হচ্ছিলো, কিন্তু মিনার উদ্দেশ্যে গাড়ীতে আরোহণের সময় হযরতের সঙ্গে যখন উচ্চারণ করলাম–

লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারিকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'ইমাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারিকা লাক।

তখন হৃদয়ের জগতে যে ঝড় উঠলো, যে উথাল-পাতাল ঢেউ জাগলো তা আসলেই শুধু অনুভবের বিষয়। কী যে অদ্ভুত কম্পন ও শিহরণ! কী যে অপূর্ব আবেগ ও উদ্দীপনা! মুহূর্তের মাঝে যেন বদলে গেলো দিলের দুনিয়া-জাহান! লক্ষ লক্ষ হাজী ছাহেবানের 'কোরবানি' হবে মিনার ময়দানে! সবাই পুলিকত, আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ কোরবানির জামাতে শামিল হতে পেরে! আমি, আমার মত গোনাহগার, কমযোর, মাজবূর বান্দাও তাদের একজন! এ সৌভাগ্যের, এ খোশনছীবির সুন্দর শোকরানা আর কী হতে পারে তালবিয়া ছাড়া!

লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারিকা লাকা লাব্বাইক ...

গাড়ী চলছে খুব ধীর গতিতে, প্রায় থেমে থেমে। সাধারণভাবে মক্কা থেকে মিনায় যেতে বিশমিনিটের বেশী লাগার কথা নয়। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে যে হাঁটা-পথ তৈরী করা হয়েছে তাতে দূরত্ব একেবারেই কমে গিয়েছে। চল্লিশ মিনিটে যাওয়া যায় সহজেই। হাঁটতে সক্ষম যারা তাদের অনেকে সেভাবে যায়ও। এদিকে গাড়ীর এমন ভয়াবহ যানজট ছিলো যে, মিনার এলাকায় প্রবেশ করতেই তিনঘণ্টা লেগে গেলো। তারপরো ছিলো আমাদের নির্দিষ্ট মুআল্লিমের তাঁবু খুঁজে বের করার সমস্যা। প্রায় দুপুর হয়ে গেলো মুআল্লিমের তাঁবুতে পৌঁছতে।

এ পুরো সময়টা হযরতকে আমরা দেখেছি ধৈর্যের অবিচল নমুনারূপে। গাড়ী আগে বাড়ে না, চালক পথ খুঁজে পায় না, ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় ফিরে আসে। সবাই পেরেশান এবং কিছুটা ক্ষুব্ধ। কিন্তু হযরত অন্য জগতে! হয়ত হৃদয়-সাগরের

বেলাভূমিতে! কিংবা সাগরের তলদেশে! মাঝে মাঝে তাঁর কণ্ঠে জাগে তালবিয়ার সুমধুর ধ্বনি, আমাদেরও বলেন, তালবিয়া পড়ো ভাই, তালবিয়া পড়ো! লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারিকা লাকা লাব্বাইক ...

তারপরই তিনি আবার আত্মসমাহিত তার ভাবের জগতে।

মিনার সীমানা থেকে তাঁবুর রাজ্য শুরু হয়ে গেলো। সত্যি তাহলে আমি এখন মিনার ময়দানে! আমার হৃদয়জগতে যেন এক বিপ্লব সৃষ্টি হলো। সারা জীবনের মধুর স্বপ্নের পূর্ণতা লাভের পথে আমি আরেক ধাপ এগিয়ে গেলাম। কোথাও দূরে, কোথাও কাছে পাহাড়শ্রেণী অনির্বচনীয় এক ভাবগম্ভীরতা সৃষ্টি করে রেখেছে। সেই ভাবগম্ভীর পরিবেশ থেকে আমার অন্তর যেন এই বার্তা লাভ করছে, তুমি হে আল্লাহর বান্দা! এখন এক নতুন জগতে প্রবেশ করেছো, যা এত দিনের পরিচিত জীবনের কোলাহল ও শোরগোল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটা প্রেমের জগৎ! এটা আল্লাহর প্রেমিকদের জগত! নিজেকে তাই এ ময়দানের জন্য অন্যভাবে প্রস্তুত করে নাও হে আল্লাহর বান্দা!

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা এ সকল পাহাড় সাক্ষী! চারহাজার বছর আগে এখানে এই পবিত্র ভূমিতে রচিত হয়েছিলো আল্লাহর রাস্তায় কোরবান করার এবং কোরবান হওয়ার অনন্য ইতিহাস! এখানে আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর মুহাব্বাতকে কবুল করে প্রিয়তম পুত্রের মুহাব্বাতকে কোরবান করেছিলেন। পুত্রের গলায় নয়, আসলে তিনি তো ছুরি চালিয়েছিলেন দুনিয়ার সমস্ত গায়রুল্লাহর গলায়! ইবরাহীমী কাফেলার প্রত্যেক সৌভাগ্যবান যাত্রীকে তাই এখানে আজ মুহাব্বাতের কোরবানি করতে হবে। আল্লাহর মুহাব্বাতের পথে যা কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায় সবকিছুর গলায় ছুরি চালাতে হবে। আল্লাহ ছাড়া আমার আপন কিছু নেই। আমার যা কিছু প্রিয়, যা কিছু প্রিয়তম সব আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত!

এখানে এই পবিত্র ভূমিতে সৌভাগ্যবান পিতার সৌভাগ্যবান সন্তান নিজেকে পেশ করেছিলেন আল্লাহর রাস্তায় কোরবান হওয়ার জন্য। এখানে মরুভূমির বালুকণা এবং পাহাড়শ্রেণী হয়ত সেদিন শুনেছিলো এমন কোন অভিব্যক্তি—

'হে আল্লাহ! তোমার প্রেমে নিজেকে আমি উৎসর্গ করবো। তুমি যদি চাও, তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি জান কোরবান করবো। আমার গলায় ছুরি চলুক, তবু আমার কলবে তোমার মুহাব্বাত যিন্দা থাকুক! তুমি যদি আমাকে কবুল করো হে আল্লাহ, তাহলে তো না যিন্দেগির ফিকির, না মওতের পরোয়া!'

আল্লাহকে ভালোবেশে, আল্লাহর মুহাব্বাতে অবিচল থেকে এই যে অতুলনীয় ত্যাগ ও কুরবানি, এর জন্যই তো পিতা ইবরাহীম হলেন খালীলুল্লাহ, আর পুত্র ইসমাঈল হলেন যাবীহুল্লাহ! আল্লাহর মুহাব্বাতকে সর্বোচ্চে রাখার এবং আল্লাহর রাস্তায় সর্বস্ব কোরবান করার আবেগ ও জাযবা এবং শিক্ষা ও দীক্ষাই এ পবিত্র ভূমি থেকে নিয়ে যেতে হবে মিল্লাতে ইবরাহীমীর প্রত্যেক পিতা ও পুত্রকে।

আল্লাহর কী শান! এতদিন ছিলাম শুধু পুত্র, আল্লাহ আমাকে মিনাভূমিতে এনেছেন পিতৃত্ব লাভের পর! কাকে বলে সন্তানের মুহাব্বাত এবং সেই মুহাব্বাতের কোরবানি তাকি আমি বিন্দুমাত্র বুঝতাম, যদি সন্তানের পিতা না হতাম! ছোট্ট মেয়েটির চাঁদমুখ মনে পড়ে মনটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো। অদ্ভুত এক কল্পনা জেগে উঠলো মনে! আমি যেন আমার মেয়ের গলায় ছুরি বসিয়ে দিলাম বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে। অন্তরে অপূর্ব এক প্রশান্তি অনুভব করলাম। কোরবানির দিন কথাটা হযরতকে বলেছিলাম। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন। আহ! এমন হযরত এখন কোথায় পাবো আমি, আমরা!

জীবনের বিরাট অংশ চলে গেছে গাফলাতের মধ্যে। তারপরো আল্লাহ মেহেরবানি করেছেন এবং এখানে এই পবিত্র ভূমিতে ডেকে এনেছেন; খালীলুল্লাহ ও যাবীহুল্লাহর 'কোরবানগাহে' দাওয়াত দিয়ে এনেছেন। এখনো কি গাফলাতের ঘোরেই কেটে যাবে আমার সময়! এখানেও কি আমি লিপ্ত থাকবো বেহুদা কথায়-কাজে! পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে, আত্মস্বার্থের হীন চিন্তায়, কিংবা এ সমস্যা সে সমস্যার সমালোচনায়!

পথ হারিয়ে গাড়ী প্রদক্ষিণ করছিলো বিভিন্ন পথ। আমি দূরের পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এই সব কথা ভাবছিলাম। বিদায় হজ্বে আজকের এ তারিখেই তো এই মিনাভূমিতে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব এসেছিলেন লক্ষ ছাহাবার নূরানি কাফেলা নিয়ে! কেন এসেছিলেন তিনি? কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতকে কী শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তিনি? কেন এসেছিলেন ছাহাবা কেরাম? কী শিক্ষা নিয়ে যেতে? কিংবা কী শিক্ষা রেখে যেতে?

তারপর যুগে যুগে আল্লাহর কত পেয়ারা বান্দা, কত আশিক ও মজনু-দিওয়ানা এসেছেন এখানে! কত হাসান বাছরী, কত জোনায়দ-জিলানী, কত মুসলিম-বুখারী, কত রাযী-গাযালী এসেছেন এখানে এই পবিত্র ভূমিতে! তারাও এখান থেকে নিয়ে গেছেন কোরবানির শিক্ষা এবং রেখে গেছেন কোরবানির শিক্ষা! আর আজ! আমার মত পাপী বান্দা মাওলার দাওয়াতে মেহমান হয়ে এসেছি এখানে! হে আল্লাহ, যে উদ্দেশ্যে আমাকে এনেছো তা অর্জন করার তাওফীক দাও। তোমার খালীলের, যাবীহের এবং তোমার হাবীবের কলবে তোমার প্রতি যে ইশক ও মুহাব্বাত ছিলো, তোমার পথে কোরবান হওয়ার এবং কোরবান করার যে পাক জাযবা ছিলো তার কিছু হিসসা তুমি ছাহাবা কেরামকে দান করেছো, তাবেঈন ও তাবয়ে তাবেঈনকে দান করেছো, যুগে যুগে তোমার আশিক ও প্রেমিক বান্দাদের দান করেছো, হে আল্লাহ, তার কিছু ছিটেফোঁটা আজ আমাকেও দান করো। হে আল্লাহ, এ পাক যমীনে এসে আবার নিজের কর্মদোষে বঞ্চিত যেন না হই। হে আল্লাহ, এখানে সেই কোরবানির কাহিনী ছাড়া আর সবকিছু যেন ভুলে যাই এবং ভুলে থাকি।

***

মুআল্লিমের তাঁবুতে পৌঁছে হযরত সামান্য সময় বিশ্রাম নিলেন এবং তাঁবুতে বাজামা'আত যোহর আদায় করলেন, আর আফসোস করে বললেন, জোয়ানির সময় তো মাসজিদুল খায়ফের জামাতে শরীক হতাম।

নামাযের পর সামান্য কিছু খাবার গ্রহণ করে তিনি তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে গেলেন। হযরতের জগৎ ছিলো অন্য, আর পুরো তাঁবুর পরিবেশ ছিলো ভিন্ন। আরেকজন মানুষ ছিলেন অন্য রকম। খোঁজ নিয়ে জানলাম, তিনি হযরত মাওলানা তাজাম্মুল আলী ছাহেব। দেশে তাঁর কথা অনেক শুনেছি আমার মুহসিন মাওলানা কাযি মু'তাসিম বিল্লাহ ছাহেবের কাছে; দেখার সুযোগ হয়নি। আজ সৌভাগ্য হলো এমন পবিত্র স্থানে। কাযি ছাহেবের কাছে শুনে শুনে যে গায়েবানা আকিদত ও মুহাব্বাত দিলে পয়দা হয়েছিলো তা আরো পরিপুষ্ট হলো। তিনি মাদানী (রহ)-এর খলীফা। তিনি আগে বেড়ে হযরতের সঙ্গে মুছাফাহা করলেন। আমি মুছাফা করে আমার প্রতি মাওলানা কাযী মু'তাছিম বিল্লাহ ছাহেবের শফকত ও স্নেহের কথা বললাম, শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি খাছ দু'আ করবেন। কারণ কাযী ছাহেব তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র। আমার কৌশল সফল হলো, তিনি অত্যন্ত সস্নেহ আচরণ করলেন। দু'আ দিলেন। তারপর তাঁবুর এক কোণায় গিয়ে এমনভাবে লুকোলেন এবং ডুবে থাকলেন যে, মনে হলো কোন কিছুর খোঁজে তিনি নিখোঁজ হয়ে গেছেন।

আছরের জামাতের পর হযরত কিছু নছীহত করলেন। যে সময় এখন আমাদের যিন্দেগি থেকে পার হয়ে যাচ্ছে তার গুরুত্ব ও ফযীলত বয়ান করলেন। সময়ের অপচয় ও গাফলত সম্পর্কে সতর্ক করলেন এবং আগামীকালের অকূফে আরাফার মহান আমল সম্পর্কে হিদায়াত দান করলেন। আল্লাহর রহমতে হযরতের নছীহত সবার মাঝে বিরাট আছর করলো। অন্যান্য তাঁবু থেকেও বহু লোক হাযির হয়েছিলো, তাদের মাঝেও নতুন চেতনা ও জাগরণ সৃষ্টি হলো। পর্দার ভিতরে আল্লাহর বান্দীরা ছিলো, তাদের কথার আওয়াযও বন্ধ হয়ে গেলো। সবাই নিজ নিজ ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল হলো। আছরের আগের এবং পরের পরিবেশে আসমান-যমীনের পার্থক্য দেখা দিলো, আলহামদু লিল্লাহ।

হজ্বের সফরে আল্লাহর নেক বান্দাদের ছোহবত কত যে কল্যাণপ্রসূ তার চাক্ষুষ নমুনা যেন আল্লাহ দেখালেন। হযরতের কথাগুলো ছিলো খুবই সাধারণ কিন্তু শ্রোতাদের অন্তরে তার প্রভাব ছিলো অসাধারণ ! এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবী আল্লাহর এক নেক বান্দার নছীহতের মজলিস সম্পর্কে লিখেছেন (ভাব)–

'কথার আছর ভাষার সৌন্দর্যে হয় না, দিলের দরদে হয়। তাঁর ভাষায় শব্দের কারুকাজ ছিলো না, কিন্তু প্রতিটি শব্দ ছিলো দিলের দরদে ভেজা, তাই ভেজা শব্দগুলো মজলিসের সবার চোখ ভিজিয়ে দিলো।'

মাওলানা আলী মিয়াঁ একথাগুলো লিখেছেন হযরত থানবী (রহ)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা ওছিউল্লাহ ফতেহপুরী (রহ) সম্পর্কে, যিনি হজ্বের সফরে রওয়ানা

হয়ে পানির জাহাযে ইন্তিকাল করেছিলেন এবং তাঁর দাফন হয়েছিলো সাগরের তলদেশে। সেই মজলিস আমি দেখিনি, দেখার কথাও নয়। কিন্তু কিতাবে পড়া সেই মজলিসের বাস্তব নমুনা যেন আল্লাহ দেখালেন মিনার পবিত্র ভূমিতে হযরত থানবী (রহ)-এর আরেক খলীফা হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ)-এর মাঝে। চোখে পানি আসার মত কোন কথা তিনি বলেননি, অথচ মজলিসে প্রায় সবার চোখে পানি এলো। কেউ কেউ শব্দ করে কাঁদলো। কে জানে কিভাবে এটা হয়! কে জানে দিলের দরদ কেমন হয় এবং দরদে ভেজা শব্দ কেমন হয়!

***

নয় তারিখের রাত মিনায় যাপন করা সুন্নত। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্বের আট তারিখ বৃহস্পতিবার ফজরের নামায মক্কায় পড়ে এশরাকের পর মিনায় রওয়ানা হয়েছেন এবং মিনায় রাত যাপন করেছেন। আর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন শুক্রবার ফজরের নামায আদায় করে সূর্যোদয়ের পর। সুতরাং মিনায় পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করা হলো সুন্নত।

কিন্তু আফসোস! সারা জীবনব্যাপী একটি ফরয আদায় করার জন্য এত দূরদারাজ থেকে এত কষ্টের সফর করে মানুষ আসে, অথচ সামান্য একটু আরামের জন্য অনেকেই মক্কা থেকে সরাসরি, কিংবা মিনা থেকে রাতেই আরাফায় চলে যায়। এত কষ্টের সফর হলো, অথচ সুন্নতের উপর আমল না করে বিরাট ফযীলত থেকে বঞ্চিত হলো। কেন এমন হয়! কেন আমরা বুঝতে পারি না যে, হজ্বের সফর হচ্ছে ইশক ও মুহাব্বাতের সফর এবং ত্যাগ ও কোরবানির (শিক্ষা গ্রহণের) সফর! অথচ বিনা ওযরে সুন্নত তরক করার কারণে ইবাদতের সফর হয়ে যায় গোনাহের সফর! মোল্লা আলী আলকারী লিখেছেন–

মক্কায় রাত যাপন করলে জায়েয তো হবে, কিন্তু সুন্নত তরক করার কারণে গোনাহগার হবে।

এ প্রবণতা সম্ভবত আরো আগে থেকেই চলে আসছে, যার কারণে তের শতকের সুপ্রসিদ্ধ কিতাব ফাতাওয়া শামীতে বলা হয়েছে–

এ যামানার মানুষ যা করে– অর্থাৎ আট তারিখে (আগেভাগে) আরাফায় চলে যাওয়া– এটা ভুল এবং সুন্নাহর খেলাফ। এ কারণে তাদের বহু সুন্নত ছুটে যায়; তন্মধ্যে একটি হলো মিনার পাঁচওয়াক্তের নামায'।

আমাদের মত গোনাহগারদের হজ্বের সফর কবুল হওয়ার ওয়াছিলা তো শুধু এই যে, অন্তত বাহ্যিকভাবে যেন তা আল্লাহর নবীর হজ্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। কবুলিয়াতের এত বড় ওয়াছিলাকে যদি নিজের হাতেই আমরা নষ্ট করে ফেলি তো এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে! অবশ্য যদি কঠিন কোন ওযর হয়, আর দিলে আফসোস থাকে তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ মাফ করবেন।

নয় তারিখে মিনার রাত বড় বরকতের রাত। হাদীছ শরীফে এর ফযীলতের কথা এসেছে। সুতরাং যথাসম্ভব বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগি ও দু'আ-ইস্তিগফারে মশগুল

থাকাই কর্তব্য। কিন্তু মিনার বরকত ও ফযীলতওয়ালা রাত বহু মানুষেরই উদাসীনতা ও গাফলত এবং বেহুদা গল্পগুজব ও অর্থহীন ব্যস্ততার মাঝেই কেটে যায়। তবে আশা ও সান্ত্বনার কথা এই যে, হযরত হাফেজ্জী হুযূরের মত আশিকদিল ও প্রেমিকহৃদয় বান্দারা তাঁদের আহাযারি ও রোনাযারি দ্বারা হজ্বের সফরকে যিন্দা-সজীব এবং জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে রাখেন এবং আল্লাহর গাফেল বান্দাদের হুঁশিয়ার করতে থাকেন। আল্লাহর এ সকল নেক বান্দার ফয়য ও বরকতেই হজ্ব এখনো যিন্দা রয়েছে; মিনা-আরাফা-মুযদালিফায় চৌদ্দশ বছরের নূরানিয়াত ও রূহানিয়াত ক্ষীণধারায় হলেও এখনো বহমান রয়েছে।

হযরত হাফেজ্জী হুযূর বলতে গেলে সারা রাতই মুছল্লায় নামাযে, কিংবা মুনাজাতে নিমগ্ন ছিলেন। আমার চোখে যখন ঘুম নেমে এলো তখনো তিনি মুছল্লায় নামাযে, আবার যখন চোখ খুললো তখনো তিনি মুছল্লায় মুনাজাতে। নামাযে দাঁড়িয়েছেন তো দাঁড়িয়েই আছেন; সিজদায় মাথা রেখেছেন তো পড়েই আছেন; আবার মুনাজাতে হাত তুলেছেন তো নীরব কান্নায় চোখের পানি ঝরছে আর ঝরছে। জীবনে এ আমার পরম সৌভাগ্য যে, হজ্বের সফরে হযরত হাফেজ্জী হুযূরের ছোহবত নছীব হয়েছিলো। তাঁর ছোহবতের বরকতেই এ যুগের মানুষ হয়েও আমি দেখতে পেয়েছি অতীতের হজ্ব ও যিয়ারাতের কিছুটা ঝিলিমিলি! দেখতে পেয়েছি সে যুগের আলোর উদ্ভাস! আল্লাহর আশিক বান্দাদের মিনায় রাতযাপনের যে লেখাচিত্র কিতাবের পাতায় পড়েছি তারই বাস্তব চিত্র যেন সবাই দেখেছে হযরত হাফেজ্জী হুযূরের মাঝে। আগামী যুগে যারা মিনা-আরাফায় হাযির হবে তারা কি শুনতে পাবে এমন কান্না! দেখতে পাবে এমন অশ্রু ঝরা! আল্লাহ যেন করেন; কিয়ামত পর্যন্ত যমযমের ধারা যেন বইতে থাকে এবং বইতে থাকে বিগলিত হৃদয়ের অশ্রুধারা। এখানে অশ্রু ঝরেছে আল্লাহর পেয়ারা হাবীবের! আখেরি যামানায় এখানে অশ্রু ঝরবে ইমাম মেহদীর! আমাদের দু'ফোটা অশ্রু যেন মিশে যায় সেই পবিত্র অশ্রুর ঝর্নায়!

***

ফজরের পর সূর্যোদয় হলো, আমার জীবনের নতুন এক সূর্যোদয়। আল্লাহর পেয়ারা হাবীব নয় তারিখ সূর্যোদয়ের পর তাঁর নূরানী কাফেলা নিয়ে আরাফার ময়দানে রওয়ানা হয়েছিলেন। গোটা মুসলিম উম্মাহ সেই নূরানী কাফেলাকে অনুসরণ করে চলেছে চৌদ্দশ বছর ধরে ভাষা, বর্ণ ও ভূগোলের সকল সীমানা অতিক্রম করে । সেই নূরানী কাফেলার অনুসারীদের জামাতে আমিও আজ শামিল হবো, এ সৌভাগ্যবার্তাই যেন বয়ে এনেছে আজ আরাফার দিগন্ত থেকে উঠে আসা লাল সূর্যটি। এই লাল সূর্যের উদয়ের প্রতীক্ষায় কত সূর্যোদয় আমি অবলোকন করেছি আমার জীবনের কত প্রভাতে! সেই নূরানি ফজর এবং সোনালী প্রভাত আজ সমুপস্থিত! শোকর আলহামদু লিল্লাহ!

মিনার সর্বত্র এখন অভূতপূর্ব এক সাজ সাজ ও চল্ চল্ চঞ্চলতা! অথচ কোথাও কোন হৈচৈ নেই! আয়োজন আছে, তোড়জোড় আছে, কিন্তু গোলযোগ ও শোরগোল নেই!

এত লক্ষ মানুষের সমাবেশ যদি অন্য কোথাও হতো! যদি এভাবে একসঙ্গে স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে চলার হুকুম হতো! কল্পনা করা যায়, কেমন হুলস্থুল অবস্থা হতো! শত শত গাড়ীর বহর রাস্তায়, হাজার হাজার মানুষ গাড়ীর অপেক্ষায়; একটি গাড়ী এসে দাঁড়ায়, চোখের পলকে ভর্তি হয়ে যায়। খালি গাড়ী দেখে হাজী ছাহেবান ছুটে যান, কিন্তু এটা তাদের গাড়ী নয়, শুনেই থেমে যান! জোর করে ওঠার কোন চেষ্টা নেই! ঘটনার ক্ষেত্র থেকে দূরে বসে মনে হতে পারে, খুব সামান্য কথা! কিন্তু মিনায়, আরাফায়, মুযদালিফায় যানবাহনের জন্য হাহাকার অবস্থায় এমন সংযম খুব সহজ কথা নয়। এই কাফেলা সেই কাফেলার অনুগামী বলেই এখনো তাতে রয়েছে সেই নূরানিয়াতের কিছুটা আলোকছায়া!

চোখের সামনে অভূতপূর্ব দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখছি, আর মনের ভিতরে বিভিন্ন ভাবনার তরঙ্গদোলায় দোল খেয়ে চলেছি।

হযরতের জন্য রাবেতার পক্ষ হতে গাড়ী নির্ধারিত রয়েছে, কিন্তু গাড়ীর দেখা নেই। বোঝাই যায়, জনসমুদ্র এবং গাড়ী-সাগর পাড়ি দিয়ে আমাদের তাঁবু পর্যন্ত আসা কঠিন হয়ে পড়েছে। যারা এটা বোঝে না, তারা ক্ষুব্ধ হয়, যারা বোঝে তারা ক্ষুব্ধ না হলেও উদ্বিগ্ন হয়। হযরতের মাঝে অবশ্য উদ্বিগ্নতারও কোন ছায়া ও ছাপ নেই। তিনি শান্ত-নিরুদ্বিগ্ন এবং যিকির-তাসবীহাতের মাঝে আত্মসমাহিত! চারপাশের বিপুল চঞ্চলতার মাঝে এমন আত্মসমাহিত রূপ দেখতে কী যে ভালো লাগে! কিন্তু এমন রূপ খুব বেশী কি দেখা যায় এই কোলাহলপূর্ণ জীবনের অঙ্গনে!

অবশেষে গাড়ী এলো এবং চালকের বক্তব্য হলো, শোকর করো যে, শেষ পর্যন্ত গাড়ী আনতে পেরেছি।

তার কথায় এমন একটা কিছু ছিলো যে, হযরতও মৃদু হাসলেন। আমরা প্রথমে আল্লাহর শোকর আদায় করলাম, তারপর, এখন মনে নেই মিসরী না, ইয়ামানী, তাকে শুকরিয়া জানালাম।

মিনা ছেড়ে যাচ্ছি, কিন্তু ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ নেই। কারণ আবার আমরা ফিরে আসবো মিনায়। হৃদয়ে এখন শুধু আনন্দের তরঙ্গ; কারণ কাফেলা চলেছে আরাফার অভিমুখে! আমিও সেই কাফেলার যাত্রী এবং আরো সৌভাগ্য, আল্লাহর এক পেয়ারা বান্দার 'সহযাত্রী'!

চালক যদি পথ না চেনে তাহলে গাড়ী কীভাবে পৌঁছতে পারে মানযিলে? মিনা থেকে আরাফার পথে আমরা যে গাড়ীর যাত্রী ছিলাম, তার ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন যেমন সত্য তেমনি সত্য উম্মত আজ যে গাড়ীর যাত্রী তার ক্ষেত্রেও। একঘণ্টার পথ যখন চার ঘণ্টায়ও খুঁজে পাওয়া গেলো না, বরং ঠিকানা ছাড়াই গাড়ী থেকে নেমে যেতে হলো পথের উপর, তখন এ প্রশ্নটাই আমার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো দীর্ঘক্ষণ। উম্মতের গাড়ীর চালকেরাও যেন আজ পথ চেনে না, মানযিল জানে না। ছিরাতুল মুস্তাকীম হারিয়ে এপথে সেপথে ঘুরে ঘুরে তারা হায়রান, আর ঠিকানাহীন পথের উপর নেমে গিয়ে উম্মত এখন পেরেশান।

নয় তারিখের ফজর থেকে তালবিয়ার সঙ্গে শুরু হয়েছে তাকবীরে তাশরীক। এটা চলবে তের তারিখের আছর পর্যন্ত। কিন্তু শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা কী পরিমাণ তার বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো ফজরের সময়। আমাদের তাঁবুতে হযরতের কাফেলা ছাড়া কাউকে তাকবীরে তাশরীক পড়তে শোনা গেলো না। হযরত তাশরীকের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং সম্ভবত আমীনী ছাহেব তাঁর বক্তব্য সবার কানে পৌঁছে দিলেন তখনই শুধু তাকবীরে তাশরীকের আওয়ায ধ্বনিত হলো। পরবর্তীতে বিভিন্নজনকে আমি জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, অনেকেরই জানা নেই, তাকবীরে তাশরীক কী ও কেন? যারা জানেন তারা অনেকে যুক্তি দিলেন, আমাদের তো ঈদের জামাত নেই; সুতরাং তাকবীরে তাশরীক থাকবে কেন?

বাস যখন বিভিন্ন মোড় ঘুরছে এবং রাস্তা পরিবর্তন করছে, হযরত তখন উচ্চ স্বরে তালবিয়া পড়ছেন; আমরাও তাঁকে অনুসরণ করে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করছি–

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ....

যেদিকে তাকাও শুধু হাজীদের কাফেলা! ইহরামের লেবাসে শুধু নূরানিয়াতের শুভ্রতা! যেদিকে কান পাতো শুধু তালবিয়ার সুমধুর ধ্বনি! শুধু লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইকের বন্দেগি ও হাযিরি!

হাযির, হে আল্লাহ, আমি হাযির! গোনাহগার বান্দা তোমার, তোমার দুয়ারে হাযির!

অপূর্ব এক আনন্দের তরঙ্গদোলায় আন্দোলিত আমার হৃদয় যেন গেয়ে উঠলো, আরাফা! আরাফা! আমার স্বপ্নের, আমার ভালোবাসার হে আরাফা! এসেছি! আমি এসেছি তোমার জাবালে রহমতের পাদদেশে তোমার নূরানিয়াতের পরশে ধন্য হতে!

আর তখন যেন শুনতে পেলাম আরাফার আকাশ থেকে, আরাফার বাতাস থেকে আশ্চর্য মধুর এক অভিনন্দন, মারহাবা! মারহাবা! জাবালে রহমতের ভূমিতে তোমাকে মারহাবা!

আমি আপ্লুত হলাম, আমি কৃতার্থ হলাম! উদ্বেলিত হৃদয়ের সবটুকু কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে বলে উঠলাম, তোমার শোকর হে আল্লাহ, তোমার শোকর!

গোনাহগার নাফরমান বান্দাকেও তুমি স্বাগত জানাবে, এ আশাই তো করি তোমার রহমতের কাছে হে আল্লাহ!

গাড়ীর চালক অবশেষে হতাশা প্রকাশ করে বললো, তোমাদের তাঁবু বের করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর আর কী বলা যায়! গাড়ী থেকে নামতে হলো দিকঠিকানাহীন -ভাবে। সূর্য তখন মাথার উপর। ছিলাম শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ীর ভিতরে, এখন ....। গরমে আমাদের পর্যুদস্ত অবস্থা ছিলো দেখার মত! আর হযরত হাফেজ্জি হুযূরের সুকূন ও প্রশান্তির অবস্থাটি ছিলো আরো বেশী দেখার মত। জায়নামায বিছিয়ে তিনি পথের পাশে বসলেন। যেন পেয়ে গেছেন তাঁর ঠিকানা! পানির বোতল এগিয়ে দিলাম। সামান্য পানি পান করলেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মধুর হেসে বললেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিলো মসজিদে নামিরার কাছে। তিনি সেখানে গোছল করেছিলেন এবং ...।

আমি শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম তাঁর নূরানী চেহারার দিকে! বর্তমানের আমরা যখন তাঁবুর ছায়ার জন্য পেরেশান তিনি তখন সময়কে অতিক্রম করে পৌঁছে গেছেন সেই দূর অতীতে 'রহমতের তাঁবুর কাছে! কে জানে, তাঁর অন্তর্চক্ষু তখন কী কী দৃশ্য অবলোকন করছিলো!

এখন তাঁবু তালাশ করা নিরর্থক, তবু সে চেষ্টা করা হলো কিছুক্ষণ। আশপাশের তাঁবুতে খোঁজ নেয়া হলো; কেউ জানে না আমাদের মুআল্লিমের ঠিকানা। একটি তাঁবুর কিসমত ভালো ছিলো। হযরতকে দেখতে পেয়ে এবং হয়ত বা চিনতে পেরে সাদরে ও সমাদরে তারা নিজেদের তাঁবুতে নিয়ে গেলো। আর হযরতকে যারা বরণ করলো, আমাদেরও তারা গ্রহণ করলো। যিনি বরণীয় তাঁর পিছনে থাকলে তুমিও হবে গ্রহণীয়, একথা আরাফার তাঁবুতে যেমন সত্য হলো তেমনি তা সত্য হবে তোমার ইবাদতে, মুনাজাতে; তোমার যিন্দেগির সবকিছুতে; এমনকি তোমার আখেরাতের সব ঘাঁটিতে!

যিলহজ্বের নয় তারিখে যাওয়ালের পর মুহরিম অবস্থায় আরাফার হাযিরি হলো হজ্বের মূল রোকন। কোন কারণে এটা যদি ফওত হয়ে যায় তাহলে হজ্বই ফওত হয়ে গেলো। পরবর্তী কোন বছর অবশ্যই তা কাযা করতে হবে। এজন্য হাসপাতালের অজ্ঞান রোগীকেও বিশেষ ব্যবস্থায় আরাফার ময়দান ঘুরিয়ে নেয়া হয়, যাতে তার মূল হজ্ব আদায় হয়ে যায়। শরীয়তের পরিভাষায় এটা হলো অকূফে আরাফা (আরাফায় অবস্থান)।

আরাফার দিন উম্মতের জন্য বিশেষ রহমতের দিন; জাবালে রহমতের মাঠে রহমতের মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার দিন। সুতরাং আজ আল্লাহর গোনাহগার বান্দাদের যেমন পরম আনন্দের দিন তেমনি অভিশপ্ত শয়তানের চরম লাঞ্ছনা ও হতাশার দিন। হযরত তালহা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরাফার দিন শয়তানকে যেমন হীনতা, দীনতা ও তুচ্ছতায় ভারাক্রান্ত এবং ক্রোধান্বিত দেখা গেছে তেমন আর কখনো দেখা যায়নি। এটা শুধু একারণে যে, সে আল্লাহর রহমত নাযিল হতে দেখে এবং আল্লাহকে বান্দার বিরাট বিরাট গোনাহ মাফ করে দিতে দেখে; তবে বদরের দিন সে যা দেখেছে সেদিনটি ছাড়া। (অর্থাৎ তার সেদিনের লাঞ্ছনা ও বিপর্যস্ততার অবস্থাও একই রকম)

হে বন্ধু! সমুদ্রের তুমি কূল পাবে, কিনারা পাবে; সমুদ্রের তলদেশও খুঁজে পাবে, কিন্তু পাবে না আরাফার ময়দানে আল্লাহর রহমতের কোন কূল-কিনারা, কিংবা তার তলদেশের ঠিকানা।

তুমি যদি এমন অপরাধ করে থাকো যাতে পাহাড় গুঁড়িয়ে যায়, আসমান ভেঙ্গে পড়ে এবং সাগরের পানি কালো হয়ে যায় তবু তুমি গ্রহণ করো রহমত ও মাগফিরাতের সুসংবাদ। এখানে তোমাকে হাযির করা হয়েছে বঞ্চিত করার জন্য নয়, অনুগ্রহ করার জন্য। জীবনে যার বরবাদি ছাড়া কিছু নেই, অনুতাপের দু'ফোঁটা অশ্রু দ্বারা সেও আজ পেয়ে যাবে আল্লাহর রহমতের কোলে আশ্রয়।

আজ তো সেই দিন যেদিন স্বয়ং আল্লাহ নূরের ফিরেশতাদের সামনে বান্দার ইহরামের নূরানিয়াত নিয়ে গর্ব করেন।

মুসলিম শরীফের এ হাদীছ বারবার পড়েছি; আজ হযরতের যবানে শুনলাম। শব্দ অভিন্ন, কিন্তু স্বাদ ও প্রসাদ ছিলো ভিন্ন। তাতে অন্তরে জাগ্রত হলো নতুন ভাব ও ভাবনা এবং নতুন চিন্তা ও চেতনা।

হযরত বললেন, মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরাফার দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের যে পরিমাণে জাহান্নাম থেকে আযাদ করেন তেমন অন্য কোনদিন নয়। আর (এই দিন) আল্লাহ তা'আলা বান্দার খুব নিকটে আসেন, তারপর ফিরেশতাদের মজলিসে বান্দাকে নিয়ে গর্ব করেন, আর বলেন, দেখো, এই পাগল বান্দারা কী চায়!

হযরত আমাদের আরেকটি হাদীছ শুনালেন, যা আমার জানা ছিলো না। এ হাদীছ শুনে তো তাঁবুর গোটা মজলিস সুবহানাল্লাহর আনন্দধ্বনিতে দুলে উঠলো! আর আমার অন্তর্সত্তা আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো, পেয়ে গেছি! আমার রাব্বে কারীমের মাগফিরাত আমি পেয়ে গেছি!

হযরত বললেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচে' বড় গোনাহগার তো সে, যে আরাফার ময়দানে অকূফ করে, তারপরো ভাবে যে, আল্লাহ হয়ত তাকে মাফ করেনি।

সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লহ!! ছুম্মা সুবহানাল্লাহ!!! আর কী চাও তুমি হে 'আলহাজ আব্দুল্লাহ'! লাব্বাইক বলে হাযির হলে, আর মাগফিরাতের খোশখবর পেয়ে গেলে! তারপর কেন তুমি তাওবা-ইস্তিগফার করবে না! কেন দু'আ-মুনাজাত করবে না! কেন কাঁদবে না! কেন হাসবে না! আরাফার তপ্ত বালু কেন আজ তোমার একফোঁটা অশ্রুর সাক্ষী হয়ে থাকবে না! একফোঁট অশ্রু, অনুতাপের এবং আনন্দের!

আরাফার দিন হলো দু'আ ও মুনাজাতের দিন, দিল খুলে চাওয়ার এবং আঁচলভরে পাওয়ার দিন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

'শ্রেষ্ঠ দু'আ হলো আরাফার দিনের দু'আ।'

হে প্রেমিক! তোমার প্রেমাস্পদের পরম করুণায় জীবনের স্বর্ণসুযোগ এখন তোমার সামনে। সুতরাং আঁচল বিছাও এবং ভিক্ষার পাত্র মেলে ধরো। যা কিছু চাওয়ার চেয়ে নাও এবং চাইতে থাকো; ক্লান্তিহীনভাবে চাইতে থাকো। অন্তরের যা কিছু কামনা-বাসনা, দিলের যা কিছু আরযু ও তামান্না মাওলার দরবারে পেশ করতে থাকো। আজ তো শুধু কবুলিয়াতের দিন! জীবনের এই দুর্লভ সুযোগ যেন অবহেলায় হাতছাড়া না হয়ে যায়।

হযরত বললেন, 'আরাফার দিনের জন্য বিশেষ কোন দু'আ নেই, তবে–

سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ

এগুলোর বড় ফযিলত হাদীসে এসেছে (এবং আরাফায় তা পড়ার কথা এসেছে।) সুতরাং হাকীকত ও মর্ম বুঝে বুঝে হুযূরে কলবের সাথে এই কালিমাগুলো বারবার পড়া উচিত। অবশ্য তালবিয়াও যথানিয়মে চলতে থাকবে।'

আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম হযরতের নছিহতের উপর আমল করার।

আরাফার দিনে কীভাবে দু'আ ও মুনাজাত এবং আহাযারি ও রোনাযারি করতে হয়! কীভাবে আবদিয়াত ও বন্দেগি এবং বিনয়কাতরতা ও দাসত্ব নিবেদন করতে হয়! কেমন ছিলো আরাফার ময়দানে আল্লাহর নবীর দু'আ ও রোনাযারি! কেমন ছিলো ছাহাবা কেরামের এবং যুগে যুগে আল্লাহর পেয়ারা বান্দাদের মুনাজাত ও আহাযারি, তা কিতাবের পাতায় অবশ্যই পড়েছি এবং তাতে আপ্লুত হয়েছি। কিন্তু কিতাবের শুকনো পাতা, আর চোখের ভেজাপাতা তো এক নয়। দু'আ ও মুনাজাতের এবং আহাযারি ও রোনাযারির বর্ণনা, আর যিন্দা নমুনা তো এক নয়! সেই যিন্দা নমুনা আরাফার ময়দানে আল্লাহ আমাদের দেখিয়েছেন হযরত হাফেজ্জি হুযূরের মাঝে।

ভিখারীর মত দু'হাত পেতে 'মাওলা গো' বলে ডাক দিয়ে তিনি যখন চোখের পানি ছেড়ে দিলেন, আর চারপাশে কান্নার রোল পড়ে গেলো তখন চোখের সামনে থেকে সময়ের পর্দা যেন সরে গেলো! সেই আলোকিত অতীত যেন এখানে দৃশ্যমান হলো! আমি যেন দেখতে পেলাম সেই নূর-যামানার দু'আ-মুনাজাতের সামান্য আলোছায়া, যার চিত্র এঁকেছেন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এভাবে—

'নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, আরাফার ময়দানে তিনি দু'আ করছেন, উভয় হাত বুক পর্যন্ত তুলে রেখেছেন, যেন এক ভুখা মিসকীন! (দু' লোকমা খাবারের জন্য দাতার দুয়ারে হাত ছড়িয়ে রেখেছে।)'

আজকের এই হযরত হাফেজ্জি তো বিচ্ছিন্ন কেউ নন! আজকের এই দু'আ ও মুনাজাত এবং এই আহাযারি ও রোনাযারিও তো নয় বিচ্ছিন্ন কিছু! এটা তো স্মরণ ও অনুসরণের অটুট এক পরম্পরা, বর্তমান থেকে অতীত-অভিমুখে! এটা তো আলো ও নূরের অব্যাহত এক ধারা, অতীত থেকে বর্তমানের দিকে!

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই নূরানী দু'আ ও মুনাজাতের নমুনা দোহরানোর জন্যই তো এদিনে এই পবিত্র ময়দানে আল্লাহর পেয়ারা বান্দাগণ প্রতিবছর হাযির হন! নবুয়তের যামানা থেকে দূরত্ব যত বিস্তৃত হবে, নূর ও নূরানিয়াত তত দুর্বল হবে, এটা স্বাভাবিক, তবু তো, এ দু'আ সেই দু'আরই প্রতিচ্ছবি! এবং এ কান্না সেই কান্নারই প্রতিধ্বনি!

হযরতের রোনাযারি আমাদেরও হৃদয় স্পর্শ করলো এবং তাতে আমাদেরও হৃদয় বিগলিত হলো। সামান্য একটু হলেও আমাদেরও চোখের পাতা ভিজে উঠলো। আমীন, আমীন বলে আমরাও শামিল হয়ে গেলাম যুগে যুগে আরাফার ময়দানে আল্লাহর পেয়ারা বান্দাদের আহাযারি ও রোনাযারির জামাতে!

তাঁবুর বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে এবং তপ্ত বালুর উপর দাঁড়িয়ে হযরতের মুনাজাত চলছে তো চলছে! 'নিষ্পাপ' দু'টি চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে তো ঝরছে! চোখের

অশ্রুবর্ষণ যত বাড়ছে রহমতের বারিবর্ষণ তত যেন মুষলধারে চলছে! মুনাজাতের বিলাপ যেন থামবে না, রহমতের বারিধারাও বন্ধ হবে না! দিতে থাকো হে আল্লাহ! বান্দার যোগ্যতার মাপে নয়, দিতে থাকো তোমার রহমতের শানে! আমাদের আঁচল ভরে, পাত্র উপচে পড়বে; নিতে নিতে আমরা ক্লান্ত হয়ে যাবো, তবু তোমার দেয়া থামবে না, দানে তুমি তো কখনো ক্লান্ত হও না!

সময়ের অনুভূতি কারো ছিলো না। আমরা নিমগ্ন ছিলাম, সমর্পিত ছিলাম এবং বিভোর ছিলাম প্রার্থনার মাধুর্যে এবং প্রাপ্তির তৃপ্তিতে। আমরা ডুবে ছিলাম মুনাজাতের মাস্তিতে এবং কবুলিয়াতের শান্তিতে।

এক সময় মুনাজাত সমাপ্ত হলো, কিন্তু হযরতের দিলের আবেগ ও জাযবা যেন আরো উদ্দীপ্ত হলো; ইশক ও মুহাব্বাতের মউজ যেন আরো উচ্ছ্বসিত হলো। হযরত এলান করলেন, 'আমি এখন আল্লাহর দরবারে সিজদায় যাবো, যাদের ইচ্ছা এবং যতক্ষণ ইচ্ছা তারা সিজদায় শরীক হতে পারে।'

তাঁর দিলের জাযবা যেন সবার মাঝে সঞ্চারিত হলো; ইশক ও মুহাব্বাতের মউজে সবাই যেন আন্দোলিত হলো। গরম ছিলো প্রচণ্ড, বালু ছিলো উত্তপ্ত, কিন্তু হযরতের কলবের 'গরমি' এবং হৃদয়ের উত্তাপ ছিলো আরো তীব্র। উত্তপ্ত বালুর উপর তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আহা! এ চোখ দু'টো দেখেছিলো সেই নূরানি মানুষটির ইশকের বেতাবি ও বেকারারিতে সিজদায় লুটিয়ে পড়া! কিছুক্ষণ ব্যাকুল হয়ে দেখলাম, তারপর বেকারার হয়ে শামিল হলাম সেই সিজদায়।

এ কিসের সিজদা, তা আমাদের জানা ছিলো না! উত্তপ্ত বালুর উপর কেন এ লুটিয়ে পড়া, তা আমাদের উপলব্ধিতে ছিলো না, তবু উত্তপ্ত বালুর উপর মাথা রেখে আমরাও শামিল হলাম সেই সিজদায় শুধু এ প্রত্যাশায়, এ সিজদা আল্লাহর দরবারে আল্লাহর এক পেয়ারা বান্দার আশিকানা সিজদা! এ সিজদায় রহমতের দরিয়ায় অবশ্যই নয়া জোশ পয়দা হবে এবং দান ও বখশিশের ছয়লাব শুরু হবে। এ সিজদায় যদি শামিল থাকা যায়, কিছু না কিছু আসতে পারে আমাদেরও হিস্‌সায়!

হযরত সিজদায় পড়ে আছেন এবং ইশক ও মুহাব্বাতের ঊর্ধ্বজাগতিক রহস্যলীলায় ডুবে আছেন। হয়ত তাঁর আত্মা তখন দেহসত্তার জড়বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলো, কিংবা তাঁর দেহসত্তা বিলীন হয়ে গিয়েছিলো আত্মার আলোকসত্তায়! একটা কিছু হয়েছিলো! নইলে এমন তপ্ত বালুর উপর এমন দীর্ঘ সিজদা! সময় যে নিজস্ব গতিতে বয়ে চলেছে সে চেতনা হয়ত তাঁর লোপ পেয়েছিলো। আশেক-মজনু যারা, এরকম সময় থাকে না তাদের কোন সময়-চেতনা। কারণ সিজদা মানে তো পরম প্রিয়তমের নিকটতম সান্নিধ্য অর্জন! তখন হয়ত সময়ের গতি থেমে যায় এবং বাহ্যজগতের অনুভব-অনুভূতি লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু যারা শুধু সঙ্গ-শিহরণে শিহরিত হয়েছিলো এবং হযরতের সঙ্গে সিজদায় গমন করেছিলো তারা কতক্ষণ বরদাশত করতে পারে এই রিয়াযাত ও মুজাহাদা! তারা আর কতক্ষণ প্রদর্শন করতে পারে ইশক ও মুহাব্বাতের চরম পরাকাষ্ঠা! তাই একজন দু'জন করে তাদের সংখ্যা কমে আসতে লাগলো। তবে

মাথা তোলার পর দেখা গেলো, সামান্য সময়ের 'সিজদাসান্নিধ্যে' তাদেরও চেহারা ছিলো নূর-ঝলমল! তারাও যেন মহাদাতার দানভাণ্ডার থেকে লাভ করেছে পাত্রের প্রশস্ততা অনুযায়ী, বরং তার চেয়ে বেশী!

একঘণ্টা পার হয়ে গেলো! তিনি তখনো সিজদায়! তপ্ত বালুতে মাথা রেখে জারজার হয়ে কেঁদে চলেছেন, কেঁদেই চলেছেন! চোখের পানিতে ভিজে উঠেছে তপ্ত বালু, তবু তাঁর কান্নার বিরাম নেই! তবু তাঁর অশ্রু ঝরার বিরতি নেই! ভিখারী যেভাবে লুটিয়ে পড়ে থাকে তেমনি পড়ে আছেন দয়ালু দাতার শাহানশাহি দরবারে!

একসময় সিজদায় তিনি একা! আমরা শুধু তাকিয়ে আছি সিজদায় লুণ্ঠিত মানুষটির দিকে অবাক বিস্ময়ে এবং আফসোস ও অনুতাপ নিয়ে । ইবাদত যেমন সৌভাগ্যের, প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টিতে ইবাদতের দৃশ্য অবলোকন করাও তো সৌভাগ্যের! তুমি তোমার মাওলাকে বলতে পারবে, রাব্বে কারীম! আমি হাযির ছিলাম আরাফার ময়দানে! আমিও দেখেছি তোমার আশিক বান্দার সেই দীর্ঘ সিজদা! কিছুক্ষণ আমিও শামিল ছিলাম! আমিও ভালোবেসেছিলাম সেই সিজদাকে এবং সিজদায় লুটিয়ে থাকা তোমার প্রেমিক বান্দাকে!

ইশক ও মুহাব্বাতের কী তরঙ্গজোয়ার জেগেছিলো তোমার আশিক বান্দার কলবে তা আমি জানি না! কী ছিলো তোমার কাছে তাঁর আবেদন ও নিবেদন এবং আকুতি ও মিনতি তা আমি শুনিনি! কেমন ছিলো তাঁর অন্তরের দহন ও জ্বলন তা আমি দেখিনি! আমি শুধু শুনেছি তাঁর জারজার কান্না, আর দেখেছি অঝোরধারে অশ্রু ঝরা! হে আল্লাহ, অক্ষম এক দর্শক হিসাবে আমিও সেই কান্নার, সেই অশ্রুনিবেদনের এবং সেই চাওয়া-পাওয়ার সামান্য কিছু হকদার! তোমার পেয়ারা হাবীব যে বলেছেন–

'এরা এমন কাউম যাদের কাছে বসে থাকা মানুষও বঞ্চিত হয় না।'

তোমার সেই আশিক বান্দার কাছে আমি তো বসে ছিলাম হে আল্লাহ!

আরাফার ময়দানে সেদিন আমি আল্লাহর অন্য এক বান্দাকেও দেখেছিলাম! তিনিও এখন নেই দুনিয়ার বুকে। কাকরাইলের বড় হুযূর হযরত মাওলানা আব্দুল আযীয ছাহেব (রহ)। মক্কা শরীফে তিনি আমাদের হযরতের অবস্থানক্ষেত্রে এসেছিলেন এবং কিছু সময় তাঁর সঙ্গে যাপন করেছিলেন। এখনো স্পষ্ট মনে আছে, তাঁকে প্রথম দেখে আমার অন্তরে যে কথাটি জাগ্রত হয়েছিলো! 'যেন এই মাত্র জান্নাত থেকে নেমে এসেছেন জান্নাতি লেবাসে!'

আব্বাকে তিনি খুব মুহাব্বাত করতেন। আমাদের বাড়ীতেও এসেছেন একাধিকবার! আমি আব্বার পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে মুছাফাহা করেছিলাম। তিনি সস্নেহ আচরণ করেছিলেন এবং দু'আ দিয়েছিলেন। তাঁর একটা কথা এখনো কানে বাজে, বলেছিলেন, 'মিয়াঁ হজ্ব তো করবা তোমরা নওজোয়ানেরা! আমরা বুড়ারা তো শুধু আসি, আর হাযিরা দিয়ে যাই! আমি একটা উত্তর দিয়েছিলাম, তাতে তিনি এবং হযরত হাফেজ্জি হুযূর হেসেছিলেন, মৃদু হাসির চেয়ে একটু বেশী! আমি বলেছিলাম,

হযরত! আপনাদের বার্ধক্যের সঙ্গে আমাদের জোয়ানি আমি বদল করতে তৈয়ার আছি এবং তাতে আমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

যতক্ষণ ছিলেন হযরত হাফেজ্জি হুযূরের সামনে তিনি দু'যানু হয়ে বসেছিলেন যেন মক্তবের শিশু! হযরতকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে দাওয়াত ও তাবলীগের টুটাফাটা যা মেহনত 'চলতেছে' তা তো শুধু আপনার নেক তাওয়াজ্জুহের বরকত।

হযরত বলেছিলেন, 'বহুত মোবারক মেহনত। তবে 'গুলু' হইতে বাচন চাই।'

হযরতের কামরা থেকে বের হওয়ার সময় তিনি আমার হাত ধরে রেখেছিলেন, তাই আমি তাঁর সঙ্গে হাঁটছিলাম। তখন স্নেহ-মমতার অপূর্ব একটি প্রবাহ অনুভব করছিলাম, আর শিহরিত হচ্ছিলাম। আব্বাকে যারা ভালোবাসতেন, আব্বার পরিচয়ে তারা আমাকে স্নেহ করতেন। সেই সূত্রে দেশে বিভিন্ন সময় আমি তাঁর স্নেহ লাভ করেছি, কিন্তু হজ্বের সফরে সবকিছু অন্যরকম; কিছু কিছু মানুষ তখন মাটির পরিবর্তে যেন নূরের মানুষ হয়ে যায়! হয়ত তাঁদেরই বরকতে মাটির মানুষগুলোরও হজ্ব কবুল হয়ে যায়।

বড় হুযূর আমার হাত 'বগলদাবা' করে হাঁটছিলেন, কোন কথা নেই, শুধু নীরবে হাঁটা। আমি তখন রীতিমত ঘামতে শুরু করেছি। এ অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম! হঠাৎ তিনি বললেন, 'তুমি তো হযরতের নাতিন জামাই হয়েছো, না! এই নাও শাদির মুখতাছার হাদিয়া!' এই বলে তিনি দশটি রিয়াল আমার হাতে দিলেন। আমি তো থ! কী বলা উচিত! কী করা উচিত বুঝতে পারছি না। তিনি বুঝতে দিলেনও না। সালাম দিয়ে আগে বেড়ে গেলেন! আমি নিশ্চল অবস্থায় তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। পরে হযরতকে ঘটনা জানালাম। তিনি কৌতুক করে চলতি আরবীতে বললেন, 'মালেশ', এটা বরকতের পঁয়সা। মুশাক্কাল খাবে, আমাকেও খাওয়াবে!

তাই করেছিলাম। সেই বরকতের পঁয়সা দিয়ে মুশাক্কাল খেয়েছিলাম, হযরতকেও খাইয়েছিলাম। হযরত যখনই মুশাক্কাল খেতেন, শেষটুকু আমাকে দিয়ে বলতেন এটুকু তুমি খেয়ে নাও। আমি খেতাম এবং বিশ্বাস করো ভাই, তাতে অন্য একটা স্বাদ যেন অনুভব করতাম! হজ্বের পরে একদিন হযরতকে হুইল চেয়ারে করে হারাম শরীফে নিয়ে যাচ্ছি, বাক্কালার সামনে এসে বললাম হযরত মুশাক্কাল নিয়ে আসি! আমার কাছে ছিলো শুধু একটি রিয়াল। তাই একটি কৌটা এনে তাঁকে দিলাম। তিনি পরোক্ষ দৃষ্টিতে আমার হাতের দিকে তাকালেন, তারপর পকেট থেকে পঞ্চাশ রিয়াল বের করে বললেন, তোমার জন্যও আনো। আমি আনলাম এবং বাকি রিয়াল ফেরত দিতে চাইলাম। তিনি বললেন, তোমার কাছে রেখে দাও। আমি বুঝলাম, তবু, 'কৌতুক' করে বললাম, হযরত! এটা কি আমানত! তিনি তাঁর সেই চিরপরিচিত হাসিটি উপহার দিয়ে বললেন, 'মুহাব্বাত কি আলামাত'! এই ছন্দ মিলিয়ে কথা বলাটা আসলে তিনি পেয়েছিলেন হযরত হাকীমুল উম্মতের কাছ থেকে।

হজ্বের সফরে হযরতের 'ছোহবত' ও সঙ্গ এমনই আশ্চর্য মধুর হয়েছিলো আমার জন্য! হায়, আবার যদি ফিরে আসতো সেই দিনগুলো, এমনকি জীবনের সবগুলো দিনের বিনিময়ে!

স্মৃতির তরঙ্গপ্রবাহে কোথায় চলে গিয়েছি! ফিরে আসি বড় হুযূরের প্রসঙ্গে। মক্কা শরীফে একদু'বার দেখেছিলাম তাঁকে, আজ দেখলাম আরাফার ময়দানে। আমরা যে তাঁবুতে উঠেছিলাম তিনি অবস্থান করছিলেন তার পাশের তাঁবুতে।

আরাফার ময়দানে তাঁকে দেখেছিলাম অন্য এক রূপে! যেন 'প্রতিটি ফুলের আলাদা রঙ-সুবাস'-এর জীবন্ত ব্যাখ্যা!

একটা রুমালঢাকা হয়ে তাঁবুর এক কোণে বসেছিলেন। যেন সবার নযর বাঁচিয়ে পর্দার আড়ালে অভিসার! হঠাৎ হঠাৎ করে ভেসে আসছিলো কান্নার আওয়ায! এমন দৃশ্য আর দেখিনি কখনো! আরাফার ময়দানে তাঁর কাছে দু'আ চাওয়ার বড় ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু রুমালের আড়াল থেকে বের হলে তবে তো! শুধু মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ! তোমার কাছে তোমার এ পেয়ারা বান্দার যা চাওয়া ও পাওয়া তাতে আমাকেও শামিল করো।

দূরে জাবালে রাহমাত দেখা যাচ্ছে! ইহরামের সাদা লেবাসে পুরো পাহাড় শুভ্র-সফেদ অপরূপ এক সাজ ধারণ করেছে, যেন রহমতের সাজ! প্রতিবছর এই দিনে একবার করে এ অপরূপ সাজ ধারণ করে জাবালে রাহমাত। এই পাহাড়ের পাদদেশেই তো সেই দূর অতীতে আজকের এই দিনে ছাহাবা কেরাম জমায়েত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর নবী বিদায় হজ্বের অকূফ করেছিলেন। 'বিদায় হজ্ব'! কত সহজ শব্দ! কিন্তু কত বেদনাদায়ক তার মর্ম! কার বিদায়! উম্মতকে এতীম বানিয়ে উম্মতের পেয়ারা নবীর বিদায়! সেদিন সবকিছুতেই ছিলো বিদায়ের সুর! এই আরাফার ময়দানেই আল্লাহর নবী ছাহাবা কেরামকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, আচ্ছা, আমি কি আমার রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছি?

লক্ষ কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠেছিলো, অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ!

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পবিত্র শাহাদাত অঙ্গুলি আসমানের দিকে তুলে আবেগময় কণ্ঠে বলেছিলেন, হে আল্লাহ, সাক্ষী থাকুন! হে আল্লাহ, সাক্ষী থাকুন!

কেমন ছিলো আরাফার আজকের দিনের সেই নূরানি মাজমার দৃশ্য!

আল্লাহর নবীর হজ্ব দেখেছেন ছাহাবা কেরাম। তাঁরা যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তার পূর্ণ বিবরণ রেখে গেছেন পরবর্তীদের জন্য, আমাদের জন্য। তাঁরা বলেছেন-

যখন সূর্য ঢলে পড়লো তখন তিনি রওয়ানা হলেন। বাতনুল ওয়াদিতে উপস্থিত হয়ে উটনীর উপর সওয়ার অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে এক মহান খোতবা দান করলেন। তারপর বিলালকে আদেশ করলেন, আর বিলাল আযান দিলেন। অনন্তর তিনি দু'রাকাত যোহর এবং দু'রাকাত আছর আদায় করলেন। একত্রিত উভয় নামায থেকে ফারিগ হয়ে তিনি কাছওয়া উটনীতে আরোহণ করলেন এবং মাওকিফে তাশরীফ

আনলেন এবং কিবলামুখী হয়ে অকূফ করলেন। তাঁর মাওকিফ বা অবস্থানক্ষেত্র ছিলো জাবালে রাহমাতের পাদদেশে প্রস্তরখণ্ডগুলোর নিকটে। অকূফের সময় তিনি দু'আ-মুনাজাতে ও রোনাযারিতে নিমগ্ন ছিলেন।

কী কী দু'আ তিনি করেছেন মাওলার দরবারে, তার বিশদ বিবরণ এসেছে ছাহাবা কেরামের যবানে। আল্লাহর নবী সেদিন তাঁর উম্মতের সমস্ত গোনাহের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাতের দু'আ করেছেন এবং আল্লাহ তা কবুল করেছেন, কিন্তু যালিমের জন্য মাগফিরাতের দু'আ কবুল করেননি। কেউ যদি কারো উপর যুলুম করে, কেউ যদি কারো হক নষ্ট করে, তা মাফ হবে না যতক্ষণ না মাযলূম নিজে তা মাফ করে দেয়। কিন্তু উম্মতের দরদে দরদী নবী কি উম্মতের পূর্ণ মাগফিরাত ছাড়া শান্তি পেতে পারেন! আর আল্লাহ তা'আলা কি পারেন তাঁর পেয়ারা হাবীবের আব্‌দার রক্ষা না করে!

মুযদালিফার রাতে আল্লাহর নবী আবার দু'আ করলেন। আল্লাহর কাছে তিনি এই বলে আব্‌দার জানালেন, আয় রাব্ব, আপনি তো মাযলূমকে আপনার পক্ষ হতে খুশী করে যালিমকে মাফ করে দিতে পারেন! উম্মতের জন্য পেয়ারা হাবীবের কত পেয়ারা আব্‌দার! এমনকি যালিম উম্মতির জন্যও ছিলো তাঁর কত দরদ-ব্যথা!

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পেয়ারা হাবীবের এ দু'আও কবুল করলেন এবং বললেন, আপনি শান্ত হোন হে নবী! আপনি আনন্দিত হোন হে রাসূল! আপনার উম্মতের যালিমকেও আমি মাফ করে দেবো (যদি সে অনুতপ্ত হয়ে মাফ চায়), আর মাযলূমকে আমি নিজের পক্ষ হতে খুশী করে দেবো।

জাবালে রাহমাত আবছা হয়ে এসেছে। আমাদের হযরত তখনো সেই সিজদায়! সূর্য প্রায় অস্ত যাওয়ার সময় তিনি সিজদা থেকে মাথা তুললেন, যেন অনেক দূরের অন্য কোন জগৎ থেকে ফিরে এলেন! আহ্, তুমি যদি দেখতে তখন আমাদের হযরতকে! দীর্ঘ সিজদার মাধ্যমে ইশক ও মুহাব্বাতের রহস্যময় জগৎ থেকে ভ্রমণ করে আসা আমাদের হযরতকে! কী নূরঝলমল চেহারা! কী আলোকিত অভিব্যক্তি! সমগ্র মুখমণ্ডল -জুড়ে পরম মিলনের এবং পরম প্রাপ্তির কী অপূর্ব উদ্ভাস!

আরাফার দিনে সূর্যাস্তের সময় আল্লাহর পেয়ারা নবীর পবিত্র মুখমণ্ডলের উদ্ভাস কেমন ছিলো তার সামান্য ছায়া, সামান্য আভাস তুমি যদি বুঝতে চাও তাহলে তোমাকে দেখতে হবে তোমার যুগে আরাফার ময়দানে আল্লাহর কোন নেক বান্দার চেহারা! সেই পবিত্র উদ্ভাসেরই ছায়া পড়েছিলো যুগে যুগে হাসান বাছরী, জোনায়দ-জীলানী এবং আল্লাহর অসংখ্য নেক বান্দার চেহারায়! যুগের ব্যবধান যত দূরবর্তী হোক, এখনো তুমি দেখতে পাবে তা, অবশ্য যদি দেখতে চাও। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, সেই ছায়া সেদিন আল্লাহ আমাদের দেখিয়েছেন হযরতের নূরঝলমল চেহারায়!

বুক দুরু দুরু করছিলো, তবু একটু একটু করে সাহস সঞ্চয় করলাম। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মুখে আসে আসে করেও যেন আসে না। কারণ, জানি না, কিছু বলার এটা উপযুক্ত সময় কি না!

হযরত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি কি তাঁর ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা দেখতে পেলাম! নাকি এটা নূরের কোন উদ্ভাস! জানি না, তবে তাঁর চোখের মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রশ্রয়ের আভাস পেলাম। আমার সাহস এবার চূড়ান্ত হলো। আমি আরো কাছে এসে একেবারে কানের কাছে মুখ এনে বললাম, হযরত! দু'আ করুন, আল্লাহ যেন দ্বীনের এবং আরবীভাষার খেদমতের জন্য আমাকে কবুল করেন, আমার কলমকে যেন আল্লাহ শক্তি দান করেন। নিজে তো আল্লাহর কাছে অনেক চেয়েছি, তবু আজকের এ সুযোগটি আমি হারাতে চাই না। আপনি খাছাভাবে আমার জন্য দু'আ করুন।
হযরত হাসলেন তাঁর চিরকালের সেই মৃদু-মধুর হাসি এবং বললেন–

تَقَبَّلَ اللهُ مِنْكَ

তুমভি কাহো –

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

আমি বললাম এবং হৃদয়ের পরতে পরতে আশ্চর্য এক প্রশান্তি অনুভব করলাম।
হযরত বললেন, ভাই! আমি তো তোমার জন্য, তোমার বিবির জন্য, তোমাদের বাচ্চীর জন্য অনেক দু'আ করেছি।
সূর্য অস্ত গেলো। সূর্য যতবার উদিত হবে ততবার অস্ত যাবে, দিনটি তোমার জন্য আনন্দের হোক, কিংবা বেদনার। কিন্তু আজকের সূর্যাস্ত কি সামান্য একটি সূর্যের সাধারণ কোন অস্ত যাওয়া! কত স্বপ্ন ছিলো হৃদয়ে আজকের এই পবিত্র দিনটিকে কেন্দ্র করে! কত ব্যাকুলতা ছিলো! কত অস্থির প্রতীক্ষা ছিলো! কত আশা ও প্রত্যাশা ছিলো! আমার জীবনে আজ সেই স্বপ্নের, সেই আশা ও প্রত্যাশার সূর্য উদিত হয়েছিলো এবং সেই সূর্য এই মাত্র অস্ত গেলো।
আরাফার পবিত্র দিনটি আমার জীবনে এসেছিলো আমাকে নূরের স্নানে স্নাত করার জন্য, আমাকে 'আলইয়াওমা আকমালতু লাকুম'-এর সেই নূরানি কাফেলায় শামিল করার জন্য এবং এভাবে আমাকে আমার রবের একান্ত সান্নিধ্য দান করার জন্য। মহাসৌভাগ্যের সেই পবিত্র দিনটি এই মাত্র গত হলো। আমি গাফিল ছিলাম, হয়ত গাফলাতের মাঝেই থেকে গেলাম। কারণ আজকের মহাসৌভাগ্যের দিনেও আমার ঘুম পেয়েছিলো। জাবালে রাহমাতের ময়দানেও আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই যে কবি বলেছেন, 'অভাগী কী ঘুম পেয়েছিলো তোরে!'
কেউ আমাকে জাগায়নি। আজকের দিনে কে কাকে জাগাবে! সবাই তো মশগুল নিজ নিজ চিন্তায়, নিজ নিজ সওদায়! সবাইকে আজ চাইতে হবে এবং পেতে হবে। তোমার চাওয়া তোমাকেই চাইতে হবে এবং তোমার পাওয়া তোমাকেই পেতে হবে। সুতরাং তুমি যদি ঘুমিয়ে পড়ো, কে তোমাকে জাগাবে!
কিন্তু আমি পেয়েছিলাম একটি কোমল হাতের মধুর স্পর্শ, মায়ের কোমল হাতের মমতার স্পর্শ যেমন হয়! যে স্পর্শ সন্তানকে ঘুম থেকে জাগায় না, আরো 'আদুরে' বানায়, আরো নিদ্রামগ্ন করে! আমারও তাই হলো, আমার নিদ্রার আবেশ আরো গাঢ়

হলো। তবে আমার ঘুম ভাঙ্গলো, সেই কোমল স্পর্শের সঙ্গে যখন একটি কোমল ডাক কানে এলো। চোখ মেলে তাকালাম। আমার হযরত আমাকে ডাকছেন- 'থাক গায়ে হো! উট্ঠো! জাগো! ওয়াক্ত গুযার রাহা হায়!

(ক্লান্ত হয়ে পড়েছো! ওঠো, জাগো; সময় তো চলে যায়!)

আমার মনে হয়, এ ঘুমের মাঝেও কিছু প্রাপ্তি ছিলো। ঘুম না হলে কি পেতাম এ কোমল স্পর্শ! এ কোমল ডাক! ঘুম না হলে কি দেখতাম আরাফার ময়দানে আমার হযরতের মাতৃমমতার এ অপূর্ব রূপ!

ইনি তো আল্লাহর নবীর ওয়ারিছ! ইনি সে যুগেও ছিলেন এ যুগেও আছেন, আগামী যুগেও থাকবেন। আর আল্লাহর নবীর ওয়ারিছ যারা তাদের দিলে থাকে উম্মতের প্রতি নবীওয়ালা দরদের কিছু না কিছু হিস্সা। তারা শুধু নিজের কথা ভাবেন না। তারা শুধু নিজের প্রাপ্তির চিন্তায় মশগুল থাকেন না। তাদের দরদী দিলে অন্যের কথাও জাগরূক থাকে। তাদের চোখ থেকে অন্যের জন্যও অশ্রু ঝরে। তারা নিজেরা যেমন জাগ্রত থাকেন, তেমনি ঘুমিয়ে থাকা গাফিলদেরও জাগাতে চেষ্টা করেন, দরদের সাথে, কোমলতা ও মমতার সাথে।

হে বন্ধু! গাফলতের যিন্দেগিতে কখনো তুমি যদি পাও এমন কোমল স্পর্শ এবং এমন মমতাপূর্ণ ডাক, সেই স্পর্শকে সম্মান করো, সেই ডাকে সাড়া দিও এবং জেগে ওঠার চেষ্টা করো।

পাকিস্তানী হাজীদের দেখলাম, মোবারকবাদ বিনিময় করছে, হজ্বে মাবরূক, হজ্বে মাবরূর বলে। সবার চোখে-মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস। আরাফার ময়দান আসলেই তো একজন মুসলিমের নবজন্ম লাভের ক্ষেত্র। আরাফার অকূফের মাধ্যমে এখন সে 'হাজী' হয়ে গেলো। হজ্বের বিরাট মুজাহাদাপূর্ণ ইবাদতের মাধ্যমে সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে গেলো যে দিন তার মা তাকে জন্মদান করেছে। সুতরাং নবজন্ম লাভের আনন্দ ও অভিনন্দন খুবই স্বাভাবিক।

সেদিন সূর্য অস্ত যায় যায়, এমন সময় হযরত আমাকে যা বলেছিলেন, হয়ত আমি তা রক্ষা করতে পারিনি, তবু মনে হয়, হে প্রিয় পাঠক! তোমাকে তা জানানো দরকার, যাতে তুমি অন্তত আমল করতে পারো এবং তোমার আমলের ওছিলায় আল্লাহ তা'আলা আমার বে-আমলি মাফ করে দেন। তিনি বলেছিলেন, 'মিয়াঁ আবু তাহের! এখন তুমি নতুন মানুষ; এখন তুমি হাজী আবু তাহের! হাদীছের খোশখবর অনুযায়ী হজ্বের মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে নিষ্পাপ করে দিয়েছেন। এখন তোমার কর্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলা এই যে এত বড় নেয়ামত দান করেছেন তার কদর করা। যিন্দেগি ভর চেষ্টা করবা কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার এবং তাওবা ইস্তিগফারের মাধ্যমে নিজেকে পাকছাফ রাখার।

এই আরাফার ময়দানে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব উম্মতের কাঁধে দ্বীনের আমানত রেখে গেছেন। আজ আরাফার ময়দানে হাযির হয়ে তুমিও এই নবুওয়তি আমানতের 'হামিল' হয়ে গেছো। সুতরাং এখান থেকে এই 'আযম' নিয়ে রওয়ানা হও যে,

তোমার যিন্দেগি তুমি আল্লাহর দ্বীনের জন্য ওয়াকফ করে দেবে। তা না হলে হজ্ব হয়ে যাবে শুধু রসমি হজ্ব।'

হযরতের প্রতিটি কথা আমি আমার সমগ্র সত্তা দিয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা করলাম এবং ভিতরে বিরাট এক আলোড়ন ও তোলপাড় অনুভব করলাম। এর মধ্যে হযরত বললেন, 'তুমি তো আগেই আমার হাতে বাই'আত হয়েছো; আজ নতুন করে বাই'আত হও, বাইআত আলাল জিহাদ হাত্তাল মামাত।'

আসমান থেকে নেমে আসা সৌভাগ্যের হাতছানি মনে করে সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিলাম। হযরত বাই'আত করলেন। তাঁর বলে দেয়া কথাগুলো আমি উচ্চারণ করছি। প্রতিটি শব্দ যেন অন্তরসমুদ্রে এক একটি ঢেউ সৃষ্টি করছে। কলবের জাহানে যেন নতুন এক ইনকিলাব পয়দা হলো; হৃদয়ের জগতে সৃষ্টি হলো নতুন এক বিপ্লব। জ্যোতির্ময়তা, নূরানিয়াত ও তাজাল্লিয়াতের যে তরঙ্গপ্রবাহ হযরতের হাতধরা অবস্থায় সেদিন অন্তর্সত্তায় অনুভব করেছিলাম, হায় যদি আজো তা প্রবহমান থাকতো, অন্তত তার একটি ক্ষীণ ধারা! সব কিছু কোথায় হারিয়ে গেলো! কিন্তু হে আল্লাহ্ আমি তোমার রহমত থেকে নিরাশ নই। তুমি আবার দিতে পারো এবং আরো বেশী দিতে পারো। তুমি দিলে বাধা দেয়ার কেউ নেই, আর তুমি বাধা দিলে দেয়ার কেউ নেই।

***

সূর্য যখন পূর্ণ অস্ত গেলো, হযরত তখন গাড়ীতে আরোহণ করলেন। যদিও গাড়ীর চালক তাড়াহুড়া করছিলো, কিন্তু হযরত সূর্যাস্তের পর রওয়ানা দেয়ার বিষয়ে অবিচল ছিলেন। এমনকি একবার তিনি সাফ বলে দিলেন, গাড়ীওয়ালাকে চলে যেতে বলো, আমরা নিজেদের ইন্‌তিযামে যাবো। চালক তখন আপসে আপ ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। হযরতের ইসতিগনা ও তাওয়াক্কুলের এরকম আরো কিছু নমুনা সফরের বিভিন্ন সময় দেখতে পেয়েছি। কিন্তু এখানেও একই কথা, 'দেখা যথেষ্ট নয়, গ্রহণ করো এবং মান্য করা কর্তব্য। নচেৎ তোমার দেখা সাক্ষী হয়ে থাকবে তোমারই বিপক্ষে।

গাড়ীতে ওঠার সময় হযরত নিজেও তালবিয়া বললেন, আমাদেরও বলালেন–

লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান্‌নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক।

গাড়ী চলতে শুরু করলো আরাফা থেকে মুযদালিফা অভিমুখে। আমরা একা তো নই; লাখ লাখ হাজী, হাজার হাজার গাড়ী। সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও কিছু কষ্ট, কিছু সমস্যা তো হবেই; কিছু গোলযোগ, কিছু বিশৃংখলা তো থাকবেই! কিন্তু তুমি যদি এসে থাকো প্রেম ও ভালোবাসার স্বাদ গ্রহণ করার জন্য, তোমার দিল যদি উন্মুখ থাকে ইশক ও মুহাব্বাতের লয্‌যত হাছিল করার জন্য তাহলে অবশ্যই তুমি ভাববে তেমন করে যেমন ভেবেছেন আমাদের হযরত এবং ভেবেছেন যুগে যুগে আল্লাহর নেকবান্দারা!

একটু এগিয়ে গাড়ী যখন থেমে গেলো, হযরত জানালা দিয়ে তাকালেন। দূরের পাহাড়গুলো তখন আবছা দেখা যায়। তিনি বললেন, 'আরাফার ময়দান বোধ হয়

আমাদের ছাড়তে চায় না; আমরাও কি ছাড়তে চাই! তবু যেতে হবে, কারণ মাওলার ডাক এসেছে মুযদালিফা থেকে। তবে গাড়ী যতক্ষণ চলবে না ততক্ষণ ভাববো, কোন এক বাহানায় মাওলা আমাদের আরো কিছুক্ষণ রাখতে চান আরাফার ময়দানে, জাবালে রাহমাতের ছোহবতে!'

শোনো, আল্লাহর পাগল কী বলে শোনো! দেখো, মাওলার আশেক মজনু যারা তাদের ভাবনা কেমন হয় দেখো! এমন করে যদি ভাবতে পারো, এমন করে যদি বলতে পারো তাহলে সার্থক তোমার বাইতুল্লাহর সফর।

থেমে থাকা গাড়ী আবার সচল হলো। আমি তাকালাম বাইরে, আমার প্রিয় আরাফার পাহাড়গুলোর দিকে। বিদায় আরাফা, বিদায়! জীবনের অত্যন্ত মধুর একখণ্ড স্মৃতি বুকে ধারণ করে তোমাকে বিদায়! আমার উপস্থিতি তোমাকে মলিন করেছে, তবু তুমি আমাকে বরণ করেছো, তবু তোমার প্রশস্ত বুকে আমাকে তুমি ধারণ করেছো, সে জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে তোমাকে আমি ভালোবাসবো; আজীবন ভালোবেসেই যাবো। প্রিয় আরাফা, আমি কি পারবো আবার ফিরে আসতে তোমার বুকে! জানি না, তিনি জানেন; তিনি যদি দয়া করেন! তবে আবার আমি শুরু করবো নতুন করে স্বপ্ন দেখা! স্বপ্ন ছাড়া জীবন তো কখনো হয় না জীবনের মত! আমি স্বপ্ন দেখবো। যিনি স্বপ্ন দেখাবেন, তিনিই স্বপ্নকে পূর্ণতা দান করবেন।

পিঁপড়ের গতিতে এগুচ্ছে গাড়ীর দীর্ঘ সারি। হেঁটে গেলে অনেক আগে পৌঁছে যাওয়া যায়; যাচ্ছেনও আল্লাহর অনেক বা-হিম্মত বান্দা! ছোট ছোট সামান পিঠে, কাঁধে বা মাথায় নিয়ে আমাদের গাড়ী অতিক্রম করে করে চলে যাচ্ছেন তারা, অনেক মহিলাও আছেন, পিঠে থলিয়ার ভিতর ঝুলছে তাদের শিশু! শুধু মাথাটা বের করে আছে, আর অবাক চোখে তাকিয়ে আছে জনস্রোতের দিকে! দেখতে বড় ভালো লাগে। এরা অধিকাংশ নাইজেরিয়ান, কিংবা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের! এদের দিলটা বড় সাদা, হাস্যোজ্জ্বল মুখের দাঁতগুলো যেমন!

একসময় বাস যেখানে এসে আটকা পড়লো তার একটু সামনে মসজিদে নামিরা। এর কিছু অংশ মাওকিফের অন্তর্ভুক্ত, আর কিছু অংশ বাতনে ওরায়নার অন্তর্ভুক্ত, যা মাওকিফ নয়। শুনেছি মসজিদের ভিতরে মেঝেতে লাল দাগ দিয়ে মাওকিফবহির্ভূত অংশকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। দুপুরে দূর থেকে মসজিদের মিনার দেখেছি, জামাতে শরীক হওয়ার তাওফীক হয়নি। হজ্বের ইমাম এই মসজিদে যোহরের সময় যোহর ও আছর একত্রে পড়ান, তারপর হজ্বের গুরুত্বপূর্ণ খোতবা দান করেন। এখানেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাদিবসের ঐতিহাসিক খোতবা দান করেছেন, যা বিদায় হজ্বের ভাষণ নামে পরিচিত।

এখন হজ্বের খোতবা কখন হয়, কিভাবে হয়, বোঝার উপায় নেই। হাজীদের খুব কম অংশই মসজিদে নামিরায় হাযির হতে পারে, তদুপরি রয়েছে ভাষার সমস্যা। আরাফায় হজ্বের খোতবা সকলে শুনতে এবং বুঝতে পারে তার উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা অবশ্যই হওয়া দরকার।

***

থামতে থামতে এবং চলতে চলতে অবশেষে অনেক রাতে গাড়ী মুযদালিফায় পৌঁছলো। মিনা থেকে মুযদালিফা হয়ে আরাফায় যেতে হয়। আরাফা থেকে ফেরার পথে মুযদালিফায় রাত যাপন করে ভোরে মিনায় ফিরে আসতে হয়। মক্কা থেকে মিনা এবং (মুযদালিফা পার হয়ে) আরাফা; আবার আরাফা থেকে মুযদালিফা, মিনা ও মক্কা; এই হলো হজ্বের সফর। মক্কা থেকে মিনা তিন মাইল, মিনা থেকে আরাফা ছয় মাইল। সুতরাং মক্কা থেকে আরাফার দূরত্ব নয় মাইল।

আবু হানীফা (রহ)-এর মাযহাবে মুযদালিফায় রাত যাপন করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, পক্ষান্তরে ফজরের পরে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে অবস্থান করা হলো ওয়াজিব। অর্থাৎ মুযদালিফায় রাত যাপন এবং ফজরের পর অবস্থান গ্রহণ, দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা আমল। যারা ফজরের আগেই মুযদালিফা থেকে বের হয়ে যায় তারা হজ্বের একটি ওয়াজিব তরক করে, সুতরাং তাদেরকে ওয়াজিব তরকের ক্ষতিপূরণরূপে দম দিতে হবে।

আরেকটি বিষয়, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের 'দুর্বলদের'কে চাঁদ অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তারা ভিড়ের কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে এবং আগেভাগে রামী করে ফেলতে পারে। তবে তিনি তাদেরকে সূর্যোদয়ের পরে রামী করার আদেশ করেছিলেন। এদের মাঝে ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা, উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা (রা) এবং বালক আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাসকে বললেন, 'আপনি আমাদের দুর্বলদের এবং আমাদের নারীদের নিয়ে চলে যান; তারা যেন মিনায় ফজর পড়ে।'

নারী, বালক ও অক্ষম বৃদ্ধরাই হলো 'দুর্বল'; অসুস্থরাও এর অন্তর্ভুক্ত, এমনকি যারা এদের নিয়ে যাবে তারাও। সুতরাং এদের উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না এবং গোনাহও হবে না, বরং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত এই 'অবকাশ' গ্রহণ করাই উত্তম। শরী'আতের প্রতিটি বিধানেই এভাবে বান্দার প্রতি রয়েছে অশেষ দয়া ও করুণা।

মুযদালিফায় পৌঁছার পর হযরত জামাতের সাথে মাগরিব ও এশা আদায় করলেন, যেমন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।

সারা জীবন আছর পড়েছি আছরের সময়, আজ আছর পড়লাম যোহরের সঙ্গে যোহরের সময়। সারা জীবন মাগরিব পড়েছি মাগরিবের সময়, আজ মাগরিব পড়লাম মুযদালিফায় এশার সঙ্গে এশার সময়। কারণ এটাই আল্লাহর হুকুম। আর আমি তো আল্লাহর আশিক বান্দা। আমি তো শরী'আতের নির্দিষ্ট কোন আহকাম ও বিধানের অনুগত নই, আমি শুধু আল্লাহর অনুগত বান্দা। তাঁর হুকুমে আমি আজ সারা জীবনের

অভ্যস্ত আমলও ছেড়ে দেবো। আশিক ও প্রেমিক তো দেখে শুধু, তার মাশুক ও প্রেমাস্পদের কী ইচ্ছা!

আমরা তো নগণ্য উম্মত; শ্রেষ্ঠ রাসূল এবং শ্রেষ্ঠ আশিক হাবীবে খোদা ও মাহবূবে ইলাহী মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এভাবেই আল্লাহর আদেশ পালন করেছেন এবং আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন।

আমার ধারণা ছিলো মাগরিব ও এশার পর হযরত রীতিমত নফল নামাযে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং যিকির ইবাদতে মশগুল হবেন। কিন্তু না, তিনি বরং বিশ্রামের আয়োজন শুরু করলেন। আমি অবাক হলাম। কারণ একজন বৃদ্ধের জন্য এটা স্বাভাবিক হলেও রাতের ইবাদতে তাঁকে তো আমরা চিরতরুণ দেখে এসেছি! তাই এ রাতের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি মৃদু হাসলেন। ছোটদের কোন অবুঝ প্রশ্নের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম উত্তর হতো এই মৃদু-মধুর হাসিটুকু! তিনি বললেন, মিয়াঁ! প্রত্যেক কাজে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করার মধ্যেই হলো কামিয়াবি। আর মুযদালিফার রাতে তিনি ফজর পর্যন্ত বিশ্রাম করেছেন। তারপর আগে আগে ফজর আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত অকূফ করেছেন। এমনকি এই রাতে তিনি তাহাজ্জুদও পড়েননি! উম্মতের আরামের কথা চিন্তা করে তিনি এই সুন্নত জারি করেছেন। কারণ যোহর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কেটেছে আরাফায় দু'আ-মুনাজাত ও রোনাযারিতে। আবার পরদিন মিনায় রয়েছে রামী ও কোরবানির কঠিন আমল, তারপর মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারাত। সুতরাং আজকের রাতে বিশ্রাম করাই উত্তম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন−

...

তোমার শরীরেরও রয়েছে তোমার উপর হক।

সুবহানাল্লাহ! হযরতের বক্তব্যে রাহমাতুল লিল আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের নতুন একটি সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হলো।

মুযদালিফায় খোলা আকাশের নীচে রাত যাপনের স্বাদ ও আনন্দই আলাদা। তদুপরি এই স্বাদ ও আনন্দকেই শরী'আত বলেছে ইবাদত!

হযরত শুয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। এটা তাঁর সারা জীবনের নেক আদত। যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় তিনি শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়তেন, আবার সময় হওয়ামাত্র চোখ খুলে যেতো। তখন তাঁকে মনে হতো একদম তাজাদম। এটা যদি অর্জন করতে পারতাম, জীবনের অনেক মূল্যবান সময় আমি ঘুমের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতাম।

একটু দূরে কিছুটা একা হয়ে আমি ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। এলো না, এলো বিভিন্ন রকম চিন্তা। উপরে তারাভরা আকাশ এবং একটি প্রায়পূর্ণ চাঁদ; নীচে মুযদালিফার মরুভূমির বালু। আকাশের সৌন্দর্য আমাকে যেমন মুগ্ধ করলো তেমনি বালুর কোমল শয্যা অন্য রকম একটি সুখের অনুভূতি দান করলো। লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন

মুযদালিফার ময়দানে, কিন্তু তেমন কোন সাড়া-শব্দ নেই। নৈশব্দের অপূর্ব এক পরিবেশ।

জীবনে তারাভরা আকাশ আরো দেখেছি; পূর্ণিমার চাঁদের সৌন্দর্যও উপভোগ করেছি, কিন্তু মুযদালিফার আকাশে তারাদের সৌন্দর্য মনে হলো অন্যরকম। যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেই মিটিমিটি হাসছে! এত আপন মনে হয়নি আকাশের তারাকে কখনো। আর চাঁদ! দশ তারিখের চাঁদ যেন পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে সুন্দর এবং উজ্জ্বল! চারদিকে বিদ্যুতের আলোর প্লাবনে জোসনার স্নিগ্ধতা অনুভব করার সুযোগ নেই, কিন্তু 'সেই রাত্রে' তো এখানে বিদ্যুতের আলো ছিলো না, ছিলো শুধু জোসনার স্নিগ্ধ আলো! হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতিকে একত্র করে আমি কিছুটা হলেও অনুভব করতে চাইলাম মুযদালিফার সেই রাত্রের স্নিগ্ধতা! সেই রাত্রের নূর ও নূরানিয়াত! অদ্ভুত এক ভাব ও ভাবনা এবং চিন্তা ও কল্পনা মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখলো। আমি ভাবলাম, যুগ যুগ ধরে প্রতিবছর এই রাত্রে মুযদালিফার আকাশ যেন এখানে রাত্রিযাপনকারীদের বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে সেই রাত্রের মুযদালিফা-ভূমির চিত্র! একটি চাঁদ এবং তাকে ঘিরে বহু তারার সমাবেশ। সেই রাত্রে এ মুযদালিফায়ও তো ছিলেন একজন 'মানব-চাঁদ' এবং সোয়া লক্ষ 'মানব-তারকা'! সুতরাং তুমি যদি দেখতে চাও তাহলে আজকের মুযদালিফার চাঁদ-তারায় ঝলমল আকাশে অবশ্যই দেখতে পারো সেই রাত্রের মুযদালিফাভূমির সেই আলোকিত দৃশ্য! কারণ আকাশের এই চাঁদ দেখেছিলো সেই রাত্রে মুযদালিফার বালুভূমিতে নিদ্রিত 'সেই চাঁদকে! এবং এই তারকারা দেখেছিলো 'সেই তারকাদের'!

বুঝতে পারিনি কখন মাওলানা হাবীবুল্লাহ মেছবাহ পাশে এসে শয্যা রচনা করেছেন। আমার চোখে ঘুম নেই, তিনিও বিনিদ্র! এবং মুখের আয়নায় বোঝা গেলো, তাঁরও হৃদয়রাজ্যে চলছে ভাব ও ভাবনার নানা রকম তরঙ্গ! কৌতুক করে বললেন, কী হলো, 'ঘুম আসে না, দু'কলা জেগে রই'!

অবাক হয়ে বললাম, আচ্ছা! এমন কবিও তাহলে বাস করে আপনার অন্দর মহলে!

তিনি মৃদু হেসে বললেন, আসুন 'দুই মিছবাহ' কিছুক্ষণ সঙ্গবিনিময় করি।

আমি বললাম, এক মিছবাহ প্রজ্বলিত, অন্য মিছবাহ নির্বাপিত। ভালোই হবে, প্রদীপ থেকে প্রদীপ প্রজ্বলিত হবে!

মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিছবাহ বয়সে আমার বড়, জ্ঞানে আরো বড়, আর অন্তর্জ্ঞানে তো অনেক বড়! মুযদালিফার রাতে তাঁর সামান্য সময়ের সঙ্গ-সাহচর্য আমার জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর হয়েছিলো। হজ্ব সম্পর্কে তাঁর অনুভব অনুভূতি আমাকে অভিভূত করেছিলো। আমার কিছু বলার ছিলো না, শুধু তাঁর কথা শুনেছি, আর অন্তরে অনুভবে সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছি।

মুযদালিফার ঐ সামান্য সময়ের সঙ্গ দুই অন্তরের মাঝে 'আল্লাহর জন্য' ভালোবাসার যে বন্ধন সৃষ্টি করেছিলো তা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অটুট ছিলো। পরে মাদরাসাতুল মাদীনায় তিনি তাঁর এক পুত্রের তা'লীম-তারবিয়াতের দায়িত্ব আমার হাতে অর্পণ

করেছিলেন। আমি চেয়েছিলাম আপন পুত্রের মতই তাকে ভালোবাসতে এবং তার কিছু উপকার করতে।

ফজর হয়ে গেলো এবং হযরত যথাসময়ে জাগ্রত হলেন। নিদ্রা থেকে সদ্য-উত্থিত হযরতের তরতাজা চেহারা দেখে হঠাৎ একটি চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। ভাবলাম, মুমিনের স্বপ্ন যদি হয় নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ, তাহলে মুমিনের ঘুমের মাঝে কি ঘটে না 'নবুওয়তের নিদ্রার' সামান্য ছায়াপাত! আর তিনি যদি হন 'আলউলামাউ ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া'-এর অন্তর্ভুক্ত তাহলে কি 'আলআয়নু তানামু ওয়াল কালবু ইয়াকাযান'-এর আলো এখানেও কিছুটা প্রতিবিম্বিত হয় না!

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে মুযদালিফার সেই রাত্রে ঘুম থেকে জেগে ওঠা আমাদের হযরতের নূর-ঝলমল চেহারা দেখে কেন জানি এ চিন্তাটা এসেছিলো। আমার মনে হয়েছিলো, নবীজীর যারা হাকীকী ওয়ারিছ তাঁদের চক্ষু ও হৃদয়ের ক্ষেত্রে এ সত্যের হয়ত কিছু প্রতিফলন ঘটে থাকে। তাঁদের চক্ষু নিদ্রিত হয়, কিন্তু হৃদয়ে 'জাগৃতি'র সামান্য হলেও ছায়াপাত ঘটে। চক্ষুর সঙ্গে হৃদয়ও যদি নিদ্রিত হয় তাহলে কি জাগ্রত হওয়ার পর এমন স্নিগ্ধ, সজীব ও উদ্ভাসিত হতে পারে কেউ!

ধীরে ধীরে পুরো মুযদালিফা জেগে উঠলো এবং অকল্পনীয় এক পেরেশানির সম্মুখীন হলো। আমাদের দুই মিছবাহের ভাগ্য ভালো; ঘুম আসেনি, তাই অযুর প্রয়োজন হয়নি। সঙ্গী মিছবাহকে হাসতে হাসতে বললাম, একরাত্রের জন্য হলেও আমরা ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর যোগ্য অনুসারী হয়ে গেলাম। তিনি কত বছর যেন এশার অযু দিয়ে ফজর পড়েছেন! একরাত্রের জন্য হলেও তো আমাদের এশা ও ফজর এক অযুতে হলো। মিছবাহ সংশোধনী এনে বললেন, আমরা কিন্তু এক ধাপ এগিয়ে আছি; মাগরিবের অযু দিয়ে এশা ও ফজর আদায় করেছি।

মিছবাহ নিজেই আবার আমাকে সতর্ক করে বললেন, এমন পবিত্র স্থানে এধরনের লঘু আলোচনা ঠিক নয়। আমি লজ্জিত হয়ে ইস্‌তিগফার করলাম।

হযরত বোতলের পানি দিয়ে শুধু অযু করলেন এবং নামাযের পর জরুরত থেকে ফারিগ হলেন। অন্যদের অভিজ্ঞতা ছিলো খুবই ভয়াবহ।

মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় লক্ষ লক্ষ মানুষের এত বিশাল সমাবেশে মানবীয় দুর্বলতার এ বিষয়টি কেন যে যথাযথ গুরুত্বের সাথে ভাবা হচ্ছে না, তা বুঝতে পারি না। কষ্ট অনেক রকমের আছে এবং সেগুলো আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নেয়ার জন্যই হজ্বের সফর। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্বলতা ও পাকপবিত্রতার বিষয়টি অন্যরকম। এটা কষ্ট নয়, যন্ত্রণা এবং এই অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে আল্লাহর মেহমানদের মুক্ত রাখা আল্লাহর ঘরের খাদেমদের কর্তব্য।

হজ্বের সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিন পর বিদায়ী রাষ্ট্রদূত হিসাবে জনাব ফুয়াদ আব্দুল হামীদ আল খতীব নুরিয়া মাদরাসায় এসেছিলেন হযরত হাফেজ্জি হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হজ্বের সফর কেমন

হয়েছে? আমি এই যন্ত্রণার কথা বলে তাকে অনুরোধ করেছিলাম, বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের নযরে আনার।

যাক, এগুলো তো হলো 'অন্যকথা'। ফজরের জামাত হলো। জামাত শুরু হয়েছিলো আমাদের কাফেলার কয়েকজনকে নিয়ে, সালাম ফেরানোর পর দেখি বিশাল এক জামা'আত!

এখন মুযদালিফার অকূফ। হযরত বললেন, 'এখন খুব অল্প সময়, কিন্তু খুব মূল্যবান সময়। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসময় মুযদালিফায় অকূফ করেছেন এবং উম্মতের জন্য দু'আ করেছেন। হযরত আব্বাস বিন মিরদাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার সন্ধ্যায় তাঁর উম্মতের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেছেন। তখন তাঁর দু'আ (এভাবে) কবুল করা হলো (যে, আল্লাহ বললেন,) আমি উম্মতকে মাফ করে দিলাম, তবে যালিমকে নয়, বরং যালিম থেকে আমি মাযলূমের পক্ষে (বদলা) নেবো।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরয করলেন, আয় রাব্ব! আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে মযলূমকে জান্নাত থেকে দান করে যালিমকে মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু আরাফার সন্ধ্যায় তাঁর এ আব্দার কবুল হয়নি। যখন মুযদালিফায় 'ছোবাহ' যাপন করলেন তখন তিনি সেই দু'আর পুনরাবৃত্তি করলেন এবং একসময় হেসে দিলেন! আবু বকর এবং ওমর (রা) তা দেখে আরয করলেন, আপনার প্রতি আমাদের আব্বা-আম্মা কোরবান, এ তো এমন মুহূর্ত যখন আপনার হাসবার কথা নয়! তাহলে আপনার হাসির রহস্য কী! আপনার দন্তকে আল্লাহ হাস্যোজ্জ্বল রাখুন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর দুশমন (শয়তান) যখন জানতে পারলো যে, আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করেছেন এবং আমার উম্মতকে মাফ করে দিয়েছেন তখন সে মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলো এবং নিজের মওত ও বরবাদি চাইতে লাগলো, আর তার বিলাপ দেখে আমার হাসি পেয়ে গেলো।

হযরত বললেন, মুযদালিফার অকূফ এমনই বরকতপূর্ণ যে, এর উছিলায় আল্লাহ তা'আলা উম্মতের যালিমদেরও মাফ করেছেন। আমাদের মাঝে এমন কে আছে যে জীবনে কখনো কারো উপর কোন যুলুম করেনি এবং কারো কোন হক নষ্ট করেনি! সুতরাং এই মওকাকে গনীমত মনে করতে হবে এবং সারা জীবনের সমস্ত যুলুম থেকে আজ আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত চাইতে হবে এবং প্রতিজ্ঞা করতে হবে, বাকি জীবন জেনেশুনে কারো উপর কোন যুলুম করবো না। আর অতীতে বান্দার কোন হক নষ্ট করার কথা যদি জানা থাকে তাহলে তার প্রতিকারের চেষ্টা অবশ্যই করবো, অন্তত মাযলূম থেকে মাফ নেয়ার চেষ্টা করবো।'

এর পর শুরু হলো হযরতের দু'আ-মুনাজাত। তাতে সে কী কাকুতি-মিনতি! সে কী রোনাযারি-আহাযারি! যেন গতকাল সন্ধ্যায় যা বাকি ছিলো আজ তিনি তা পূর্ণ করেই ছাড়বেন! এ যেন শেষ মুহূর্তের প্রার্থনা ও মিনতি!

সে মুনাজাতে আমরা শরীক হলাম শুধু বাইরে থেকে! কারণ তাঁর অন্তর্জগতের স্পর্শ লাভ করা তো .....!

'হে আল্লাহ, আজ মুযদালিফায় তোমার যত বান্দা হাযির হয়েছেন, যত লক্ষ হাজী তোমার দরবারে হাত তুলেছেন তাদের মধ্যে আমার চেয়ে বড় যালিম কেউ নেই। কতভাবে কত মানুষের উপর যুলুম করেছি! কত মানুষের হক নষ্ট করেছি! বিশেষ করে হে আল্লাহ কত তালিবে ইলমের আমানত আমার দ্বারা খেয়ানত হয়েছে! হে আল্লাহ, তুমি আমাকে মাফ করো এবং সবাইকে আমার পক্ষ হতে উত্তম বিনিময় দান করো।

হে আল্লাহ, এখানে যারা হাত তুলেছে সবাইকে তুমি মাফ করো। আম্মা-আব্বাকে মাফ করো। আপনজনদের মাফ করে দাও। হে আল্লাহ, উম্মতের সকল নর-নারীকে মাফ করো।'

এই ছিলো হযরতের দু'আ! আমরা শুধু আমীন, আমীন বলেছি, আর আশা করেছি, নিজেকে যিনি 'বড় যালিম' বলেছেন তাঁর সান্নিধ্যের বরকতে আমাদের মত 'ছোট' যালিমদেরও আল্লাহ মাফ করবেন, ইনশাআল্লাহ! মুযদালিফায় একটি 'জোড়া হাত'ও যদি কবুল হয়ে থাকে, তার বরকতে অন্যসব হাতও ইনশাআল্লাহ কবুল হয়ে যাবে। কবুল না করার জন্য কি আসমান থেকে এত বড় দাওয়াত, এত বিশাল আয়োজন! কবুল না হওয়ার জন্যই কি এ উন্মুক্ত আকাশ, এই ঝিরঝির বাতাস!

***

সূর্যোদয়ের পূর্বে হযরত গাড়ীতে উঠলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে তালবিয়া বললেন-

লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক।

আল্লাহর রহমতে আমাদের সঙ্গে রাবেতার গাড়ী ছিলো তাই সুন্নত সময়ে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা দেয়া সহজ হয়েছিলো। অনেকে শুধু গাড়ীসমস্যার কারণে সূর্যোদয়ের অনেক পরে মুযদালিফার সীমানা অতিক্রম করেছেন। মজবূরির বিষয় তো আলাদা, অন্যথায় যাদের হাঁটার সুযোগ আছে তাদের অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুযদালিফার সীমানা পার হয়ে মিনায় প্রবেশ করা। এটা সুন্নত।

জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা সূর্যোদয়ের আগে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হতো না। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে সূর্যোদয়ের পূর্বে রওয়ানা হয়েছিলেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হলো কাফির-মুশরিকদের আচার-আচরণের বিরোধিতা করা। না হলে বুঝতে হবে, হজ্বের মূল শিক্ষা হতেই সে বঞ্চিত হয়েছে।

মুযদালিফা থেকে মিনায় যাওয়ার পথে গাড়ী থামিয়ে আমরা রামীর কংকর সংগ্রহ করেছিলাম। কারণ হযরত বললেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফা থেকে মিনায় যাওয়ার পথে (ইবনে আব্বাস, মতান্তরে ফযল বিন আব্বাস)-কে কংকর কুড়িয়ে নেয়ার আদেশ করেছিলেন।

কংকর অবশ্য মুযদালিফা থেকেই রাত্রে সংগ্রহ করে নেয়া যায় এবং সেটাই ভালো। কারণ পথে তো আর গাড়ী থামে না! এমনকি মিনা থেকে নিলেও সমস্যা নেই, তবে রামীর স্থান থেকে কংকর নেয়া মাকরূহ।

মুযদালিফা থেকে মিনায় যাওয়ার পথে পড়ে একটি উপত্যকা, যার নাম ওয়াদি মুহাচ্ছাব। এর গভীর অংশটাকে বলে বাতনে মুহাচ্ছাব। এটি মূলত মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী একটি স্থান। মিনার অংশ নয়, আবার মুযদালিফারও অংশ নয়। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফা থেকে মিনার পথে বাতনে মুহাচ্ছাবে এসে সওয়ারিকে তাড়া দিয়েছিলেন এবং গতি দ্রুত করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো আযাবের স্থান তাড়াতাড়ি পার হওয়া।

আমাদের হযরত এ পর্যন্ত ত্রিশবারের বেশী হজ্ব করেছেন। আধুনিক যুগের হাওয়াই জাহাযের হজ্ব যেমন করেছেন তেমনি করেছেন পুরোনো যুগের পানির জাহায এবং উটের কাফেলার হজ্ব। তাই হজ্বের সব আহকাম যেমন তাঁর জানা তেমনি সকল স্থানও তাঁর পরিচিত। হঠাৎ দেখি, দু'দিকের জানালা দিয়ে তিনি উৎকণ্ঠিতভাবে তাকাচ্ছেন, যেন কোন স্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা! তাঁর অস্থিরতা দেখে অবাক হলাম। কেননা অস্থিরতার উৎস জানা ছিলো না। আমিও তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ তাকাতে লাগলাম এবং একটু পরে বিষয়টি পরিষ্কার হলো। একটি সাইনবোর্ডের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, হযরত, এই যে বাতনে মুহাচ্ছাব! সেদিকে তাকিয়ে তাঁর চেহারা ফেকাশে হয়ে গেলো। ভয়ার্ত কণ্ঠে তিনি আদেশ করলেন, 'ড্রাইভারকে' বলো জোরে চালাতে। কিন্তু তাকে বোঝাতে বোঝাতে এবং সে বুঝতে বুঝতে বাতনেমুহাচ্ছাব পার হয়ে গেলো। হযরত তখন শান্ত হলেন।

কিতাবে বাতনে মুহাচ্ছাবের কথা পড়েছি এবং পড়িয়েছি, কিন্তু বাতনে মুহাচ্ছাবকে ভয় পেতে শিখলাম আজ এই ভয় পাওয়া দেখে! যে পরম সত্যের কথা 'আহলেদিল' বলে আসছেন যুগ যুগ ধরে তা আজ আবার উদ্ভাসিত হলো আমার সামনে, 'কিতাবের ইলম তোমাকে দান করবে শুধু জ্ঞান, যদি অর্জন করতে চাও অন্তর্জ্ঞান এবং আত্মার পরিশুদ্ধি তাহলে তোমাকে যেতে হবে এমন কারো ছোহবতে যিনি তা অর্জন করেছেন অন্য কারো ছোহবত থেকে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ স্থানটি যে উৎকণ্ঠা ও ভয়ভীতির সাথে দ্রুত অতিক্রম করেছেন তা দেখেছেন ছাহাবা কেরাম। ফলে তা তাঁদেরও মাঝে সংক্রমিত হয়েছে এবং তাঁরাও সেরকম ভয় ও উৎকণ্ঠা নিয়ে দ্রুত বাতনে মুহাচ্ছাব পার হতেন। এভাবেই চলে আসছে এই ভয় ও উৎকণ্ঠার পরম্পরা, অবশ্য ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে, তবু চলে আসছে এবং তা কিতাব থেকে নয়, ছোহবত থেকে। কিতাব থেকে শুধু তথ্য আসে, তত্ত্ব নয়।

মুহাচ্ছাব মানে অবরুদ্ধ। ইয়ামানের আবরাহা যে হস্তিবাহিনী নিয়ে বাইতুল্লাহ ধ্বংস করার মতলবে এসেছিলো সে এখানেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলো। এখানেই আল্লাহ তা'আলা দাম্ভিক আবরাহা ও তার হস্তিবাহিনীকে ক্ষুদ্র 'আবাবীল পাখী' দ্বারা ধ্বংস

করেছিলেন। 'আবাবীল পাখীর' ঝাঁক ঠোঁটে করে ছোট ছোট কংকর এনে হাতির পালের উপর বর্ষণ করেছিলো, যেন বোমারুর বোমা বর্ষণ! বিরাট বিরাট হাতি ও তার আরোহী মরে সাফ হয়ে গিয়েছিলো ক্ষুদ্র আবাবীলের আরো ক্ষুদ্র কংকরের আঘাতে। এটা ঘটেছিলো পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মগ্রহণের চল্লিশ দিন আগে।

আযাবের স্থানগুলো পার হওয়ার সময় আল্লাহর নবী এমনই ভয়গ্রস্ত ও উৎকণ্ঠিত হতেন, যেমন বর্ণিত আছে তাবুক-সফরে ছামূদের বিরান বস্তি পার হওয়া সম্পর্কে। আমাদের হযরতের আজকের ভয়-উৎকণ্ঠার মাঝে আমি যেন নববী ভয় ও উৎকণ্ঠারই 'ছায়া' দেখতে পেলাম।

বাতনে মুহাচ্ছাবের সতর্কীকরণ ফলক দেখে বুঝলাম, গত রাতে হযরতের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিলো, আমরাই তাঁকে অযথা পেরেশান করেছি। ঘটনা এই, মুযদালিফায় এসে মাগরিব ও এশা আদায় করার পর হঠাৎ শোর উঠলো, মুহাচ্ছাব! মুহাচ্ছাব! অমনি শুরু হলো হুড়াহুড়ি ও ছোটাছুটি। অর্থাৎ চিলে কান নেয়ার প্রবাদ শুধু বঙ্গসন্তানের জন্য নয়!

হযরত তাঁর সফরসঙ্গীদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এটা বাতনে মুহাচ্ছাব হতে পারে না। কারণ আমরা নেমেছি মুযদালিফার মাঝামাঝি অংশে, আর মুহাচ্ছাব হচ্ছে মিনার দিকে মুযদালিফার শেষ প্রান্তে। কিন্তু 'আমীরের' কথায় 'মামুরদের' ইতমিনান হলো না। হযরত ত্রিশবার হজ্ব করেছেন তো কী হলো, তারাও কি আর দু'চারবার করেননি! সুতরাং সবার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত হযরত আরো দূরে সরে এসে রাত্রিযাপন করলেন।

এখন যখন বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেলো তখন পেলাম আরেকটি শিক্ষা। একবারও হযরত বললেন না, 'গতরাতে অযথা আমাকে পেরেশান করেছো'; তাঁকে দেখে মনে হলো, গতরাতে কিছুই হয়নি!

অন্যরাও একটিবার বললেন না, 'আমরা ভুল করেছি, আমাদের কারণে আপনার পেরেশানি হয়েছে'; তাদের দেখে মনে হলো, গতরাতে কিছুই ঘটেনি!

বারবার দেখেছি এবং ভালো ভালো মানুষকে দেখেছি, তারা হযরতের চেয়ে বেশী বুঝতেন এবং অদ্ভুত ভাষায় তা প্রকাশও করতেন! এই 'অতিবুঝ' কতবার যে কত বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তা ভেবে এখনো আমি বেদনাহত হই। এসব ক্ষেত্রে হযরতের সহনশীলতাও ছিলো সত্যি বিস্ময়কর ! মুযদালিফার সেই ঘটনা এখন আমাকে অনেক শিক্ষা দান করে এবং সেই সহনশীলতা থেকে আমিও সামান্য কিছু গ্রহণের চেষ্টা করি।

আমরা যদি মুরব্বীর চেয়ে একটু কম বুঝি, জীবনে অনেক বিড়ম্বনা থেকে বেঁচে যাই। কিন্তু খুব সহজে এ দুষ্ট ব্যাধি থেকে আমাদের মুক্তি আছে বলে মনে হয় না। শুধু কামনা করি, আল্লাহ যেন তাওফীক দান করেন। আমীন।

***

মিনায় পৌঁছা হলো সকাল সকাল। তবে তাঁবু খুঁজে পেতে কিছুটা বিলম্ব হলো। তারপরো গতকালের পেরেশানি থেকে আল্লাহ হেফাযত করেছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্ব বর্ণনাকারীগণ বলেছেন–

'তিনি মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হয়ে জামরাতুল আকাবায় উপস্থিত হলেন এবং সূর্যোদয়ের পর সওয়ার অবস্থায় জামরাতুল আকাবায় রামী করলেন। একটির পর একটি (এভাবে সাতটি) কংকর তিনি নিক্ষেপ করলেন। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর বললেন। আর প্রথম কংকরটি নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া অব্যাহত রাখলেন।

হযরত বললেন, রামীর সমস্ত আদাব যেন আমরা রক্ষা করি এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে জামারার খুব কাছে গিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের পিঠে কংকর রেখে শাহাদাত আঙ্গুলের সাহায্যে যেন প্রতিটি কংকর নিক্ষেপ করি।

জামারাহ মোট তিনটি। মক্কা থেকে মিনার দিকে আসার সময় প্রথম যে জামারাহ, সেটি হলো জামরাতুল আকাবাহ। দশ তারিখে রামী হলো শুধু জামরাতুল আকাবায়। সেখান থেকে সোজা মিনার দিকে কিছু সরে এলে দ্বিতীয় জামরাহ। মিনার দিকে আরেকটু সরে হলো তৃতীয় জামরাহ। এগারো ও বারো তারিখে তিনটি জামারায় রামী করতে হয়; প্রথমে তৃতীয়টি, তারপর দ্বিতীয়টি, তারপর প্রথমটি। কারণ মিনার দিক থেকে তৃতীয়টি হয়ে যায় প্রথম।

হযরতের সঙ্গে আমরা তিনজন রওয়ানা হলাম। অন্যদু'জন মাওলানা আতাউল্লাহ ও মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিছবাহ। তাঁবু ছিলো জামরাহ থেকে বেশ দূরে, এক মাইলের কম নয় কিছুতেই। হাজার হাজার মানুষ যাচ্ছে কংকর নিক্ষেপ করতে, আবার হাজার হাজার মানুষ একই পথে ফিরে আসছে কংকর নিক্ষেপ করে। ফলে এমন প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছে যে, দুর্বলদের জন্য তা রীতিমত আশংকাজনক। আসা-যাওয়ার পথ ভিন্ন হলেই কিন্তু অর্ধেক চাপ কমে যেতো।

আমরা উচ্চ স্বরে তালবিয়া পড়ছি, আর হযরতকে ভিড়ের চাপ থেকে নিরাপদ রেখে এগিয়ে চলেছি। অন্তরে তখন অদ্ভুত এক উত্তেজনা! শয়তান আমাদের খোলা দুশমন। শয়তানের ধোকায় পড়ে কত মানুষ বরবাদ হয়েছে, আর সামনে কত মানুষ বরবাদ হবে কে তার হিসাব রাখে! আমার জীবনে যত ভুল-বিচ্যুতি ঘটেছে এবং যত অন্যায়-অপরাধ আমি করেছি তা সবই শয়তান এবং নফসের প্ররোচনায়। শয়তানই ভিতরের নফসের মাধ্যমে আমাকে গোমরাহ করে। কিন্তু মানুষ ভুলে যায় যে, শয়তান তার বড় দুশমন। শয়তান হযরত আদম-হাওয়া (আ)কে জান্নাত থেকে বের করেছে। শয়তানই এখানে মিনার ময়দানে বাপ-বেটাকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে একে একে তিনবার তিন জামারার স্থানে। কিন্তু তাঁরা কংকর মেরে মেরে শয়তানকে বিতাড়িত করেছেন। শয়তানের সাথে মানুষের চিরশত্রুতার সেই স্মৃতিকে জাগ্রত করার জন্যই আজ আমরা চলেছি জামরাতুল আকাবায়। শয়তানের প্রতীকরূপে যে

স্তম্ভটি স্থাপন করা হয়েছে, শয়তানকে উদ্দেশ্য করে তাতে আমরা কংকর নিক্ষেপ করবো।

জামরাহ যত নিকটবর্তী হচ্ছে, মানুষের চাপ তত প্রচণ্ড হচ্ছে। কিন্তু বরাবরের মত এখানেও হযরতকে মনে হলো শান্ত এবং নিজের মাঝে নিজে সমাহিত। পথ চলতে কখনো তাঁর দৃষ্টি উপরে ওঠে না; এখানেও তাঁর দৃষ্টি অবনত। তবে বোঝা যায়, ভিতরে তাঁর আলোড়িত হচ্ছে একটি মুজাহাদার চেতনা এবং দুশমন শয়তানকে পরাভূত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা! আমি কাছে কাছে থাকার চেষ্টা করলাম যাতে তাঁকে ভিড় থেকে দূরে রাখা যায়; তার চেয়ে বড় কথা, যেন তাঁর পবিত্র স্পর্শ থেকে আমারও মাঝে রাময়ুল জামরাহর সত্যিকার চেতনা সঞ্চারিত হয়।

দীর্ঘ পরিশ্রম এবং কিছু বিশ্রাম গ্রহণের পর জামরাহর নিকটে পৌঁছলাম। জামরাহ আমি আগে দেখিনি, এই প্রথম। দেখে কিন্তু হতবুদ্ধি হলাম! শুধু একটি গোল স্তম্ভকে কেন্দ্র করে এত বিশাল জনসমুদ্র! প্রত্যেককে পৌঁছতে হবে এর নিকটে এবং একে একে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করে আবার ফিরে আসতে হবে একই পথে। প্রথমে মনে হলো এক অসম্ভব বিষয়! দ্বিতলব্যবস্থা বলে কিছুটা রক্ষা। তারপরো হযরতের বয়সের যে কারো জন্য এতে রয়েছে জীবনের ঝুঁকি! কিন্তু দেখা গেলো, যাকে নিয়ে এত চিন্তা তিনি নিশ্চিন্ত এবং আরো পরে দেখা গেলো, তাঁরই বরকতে আমাদেরও কংকর নিংক্ষেপ সম্পন্ন হলো নিরাপদে। কতটা নিরাপদে তা বুঝতে পেরেছিলাম বারো তারিখের রামী করতে এসে। সে প্রসঙ্গ পরে।

হযরত বললেন, নীচে দিয়ে চলো। আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম, যদিও আমার মনে হলো, উপর দিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। বারো তারিখে সেই মনে হওয়ার মাশুল আদায় করেছিলাম চরমভাবে।

হযরতকে আল্লাহ কী গুণ দিয়েছিলেন তা আল্লাহ জানেন; আমরা শুধু বাইতুল্লাহর তাওয়াফের মত এখানেও সেই গুণের আশ্চর্য প্রকাশ দেখতে পেলাম। দেখলাম এবং অভিভূত হলাম। হযরত এককদম এককদম আগে বাড়েন, আর সামনে একটু একটু করে ফাঁক তৈরী হয়! প্রচণ্ড হতে প্রচণ্ড একেকটি চাপ আসে, যা শক্ত জোয়ানকেও কাবু করে ফেলার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু সব চাপ যেন তাঁকে আলতো করে ছুঁয়ে চলে যায়।

দূর থেকে যা মনে হয়েছিলো অসম্ভব, দেখতে দেখতে তা হয়ে গেলো সহজ-সম্ভব! আমরা অনেকটা কাছে এসে পড়েছি, তবু হযরত অপেক্ষা করলেন। একটু একটু করে আগে বাড়লেন। কোন ব্যস্ততা নেই, কোন তাড়া নেই, এমনকি নেই কোন ভাবাবেগেরও প্রকাশ!

জামরা-স্তম্ভের চারপাশে দেয়ালের যে বৃত্ত, হযরত একেবারে তার কাছে পৌঁছে গেলেন এবং পূর্ণ ইতমিনানের সাথে সুন্নাত মোতাবেক একটি একটি করে কংকর নিক্ষেপ করলেন, আর আল্লাহু আকবার বললেন। ছাহাবা কেরাম তো নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রামী লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন! আমি বিশ্বাস

করলাম, আমাদের হযরতের রামী সেই সুন্নাতেরই অনুসরণের সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা। তাই আমি কিতাবের পড়া ছেড়ে শুধু তাঁকে অনুসরণ করে রামী সম্পন্ন করলাম। ভাবলে এখনো অন্তরে বড় প্রশান্তি আসে, হযরত হাফেজ্জী হুযূর ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের মাথায় কংকর রেখে আল্লাহু আকবার বলে শাহাদত আঙ্গুলের সাহায্যে রামী করছেন, আর তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আমি অধম তাঁকে অনুসরণ করছি! আহ কী প্রাণ ছিলো, কী মধুরতা ছিলো সেদিনের সেই রামীতে! প্রেমের উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত যারা তাদেরও অন্তরে কী অপূর্ব উত্তাপ সৃষ্টি করে একজন আশিকের ছোহবত এবং একজন প্রেমিকের সান্নিধ্য!

প্রিয় ভাই, প্রার্থনা করি, জীবনের সফরে এবং বিশেষ করে হজ্বের সফরে আল্লাহ যেন তোমাকে কোন আশিক বান্দার ছোহবত ও সান্নিধ্য দান করেন, আমীন।

আল্লাহর শোকর, কংকর নিক্ষেপ করার পর নিরাপদেই বের হয়ে এলাম উত্তাল জনতরঙ্গের ভিতর থেকে। তাঁবুতে ফেরার জন্য আবার দীর্ঘ পথচলা। আমরা ক্লান্তিতে জর্জরিত। দেহের সবটুকু শক্তি যেন নিঃশেষিত! ইচ্ছে করছে এখানেই কোথাও বসে পড়ি এবং যতক্ষণ না ক্লান্তি দূর হয় বসেই থাকি! হযরতও ক্লান্ত ছিলেন এবং ক্লান্তির ছাপ তাঁর চেহারায় ছিলো। কিন্তু বলতেই হয়, ক্লান্তির মাঝেও তিনি ছিলেন সজীব সতেজ! এই সজীবতা সেই প্রেমিকের যিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একটি মধুর অভিসারের স্বাদ লাভ করেছেন এবং ফেরার পথে সেই স্বাদ-আনন্দেই বিভোর হয়ে আছেন।

***

আগে হাজী ছাহেবানদের মুখে শুনেছি, আজ নিজের চোখে দেখলাম, হজ্বের আহকাম ও মাসায়েল সম্পর্কে কত মর্মান্তিক অজ্ঞতা ও বেখবরি উম্মতের! কী আরব, কী আজম, কী তুর্কী-আফগান, কী ইরান-তুরান, সবার একই অবস্থা! একই রকম দুর্দশা! ভিন্ন শুধু পরিমাণ ও মাত্রা! আশ্চর্য, সারা জীবনের একমাত্র 'ফরীযা' আদায় করা হচ্ছে জ্ঞানে ও মননে কতটা অপ্রস্তুত অবস্থায়! কথাগুলো যদিও খুব সহজে লিখছি, কিন্তু একটি বেদনাদায়ক সত্য লিখছি, প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষ হাজী তো হয়ে যায়, অথচ নিছক আহকাম ও মাসায়েলের দিক থেকেও খুব কম মানুষের হজ্ব ছহীহ-শুদ্ধ হয়। তাই আবারো বলতে ইচ্ছে করে, অন্য দেশের কথা জানি না, আমাদের দেশ থেকে এত কষ্টের হজ্ব যারা করবেন, হোক ফরয বা নফল, তারা যেন নির্ভরযোগ্য আলিমের তত্ত্বাবধানে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে আসেন, আহকাম ও মাসায়েলের দিক থেকে যেমন তেমনি ভাব ও ভাবনা এবং চিন্তা ও চেতনার দিক থেকেও। তাহলে অন্তত হজ্বের ন্যূনতম শুদ্ধতা নিশ্চিত হয় এবং হজ্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও অর্জিত হয়। আরো ভালো হয় প্রতিটি কাফেলায় একজন বিজ্ঞ আলিমের উপস্থিতি যদি নিশ্চিত করা যায় এবং এটা কঠিন কিছু নয়, যদি বিষয়টিকে অপরিহার্য প্রয়োজন বলে গ্রহণ করা হয়।

যা বলছিলাম, জীবনের প্রথম জামরার আবেগময় স্থানে অদ্ভুত অবস্থা দেখলাম। অনেকেই ধীরে সুস্থে জামরা-স্তম্ভের কাছে যাওয়ার কষ্ট করতে রাজী নয়। যেন খুব তাড়া! দূর থেকেই ঝটপট কংকর ছুঁড়ে ফিরে যেতে হবে! জামরা-স্তম্ভের যে বৃত্ত, সবগুলো কংকর সেই বৃত্তের ভিতরে পড়ছে না, পড়ছে হাজীদের মাথায়। তাতে রামীর আমল ছহী হচ্ছে না, রামীর শিক্ষা, জামরার দীক্ষা সে তো পরের কথা! কিন্তু কে করে সেই চিন্তা!

আরো ভয়াবহ ব্যাপার, অনেকে বড় বড় পাথর ছুঁড়ে মারছেন, তাতে শয়তানের কপাল তো ফাটে না, কপাল ফাটে বেচারা হাজীর, আর কপাল ভাঙ্গে যে পাথর ছুঁড়ছে তার নিজের!

ছাতা ও জুতা-চপ্পলের তো রীতিমত বৃষ্টিবর্ষণ! শয়তানের প্রতি এরূপ যুদ্ধংদেহী আক্রোশ বাহ্যত প্রশংসারই বিষয়! যেন সারা জীবন শয়তানের হাতে যত ভোগান্তি হয়েছে, আজ এই সুযোগে মনের ঝাল মিটিয়ে তারই শোধ তোলার চেষ্টা! হাসি পায়, কান্নাও আসে! চোখের সামনে দেখলাম একজন হাজীর মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে! বেচারাকে ধরাধরি করে যে একপাশে নিয়ে যাওয়া তারও উপায় নেই। আল্লাহ রহম করুন এবং ছহীহ বুঝ দান করুন। শয়তানকে মারতে এসে শয়তানের ফাঁদে পড়ে আমল বরবাদ করার এ দৃশ্য সত্যি দুঃখজনক!

***

ইফরাদ হজ্বে কোরবানি ওয়াজিব নয়। সুতরাং এখন মাথা মুড়ালেই মোটামুটি হজ্বের ইহরাম থেকে মুক্ত। সবঘটনা কত তাড়াতাড়ি ঘটে যায়! সময়ের স্রোত কত দ্রুত বয়ে যায়! সেদিন পেয়ারা হাবীবের প্রিয় মদীনা থেকে বিদায় হলো এবং যুলহোলায়ফার মসজিদে হজ্বের ইহরাম হলো। লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক-এর সমধুর ধ্বনি কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হলো। লাব্বাইকের সেই সুর মুর্ছনায় যেন বিভোর ছিলাম এক'টি দিন! কী অপূর্ব তরঙ্গশিহরণ প্রবাহিত হতো হৃদয়ের গভীরে! দেখতে দেখতে আরাফার সূর্য অস্ত গেলো, জাবালে রহমতের সান্নিধ্য থেকে বিদায় নিতে হলো, তবু ছিলো লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইকের সমধুর ধ্বনি!

মুযদালিফার রাত ভোর হলো, মিনার পথে সূর্য উদিত হলো, প্রেমিকের বিরহী হৃদয়ের জন্য তবু ছিলো লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইকের আশ্বাসবাণী!

এখন জামরার পর লাব্বাইকের ধ্বনি আর নেই! হঠাৎ করে যেন সকল প্রাণপ্রাচুর্য ফুরিয়ে যাওয়ার মত! ছিলো লিবাসুল ইহরামের শুভ্রতাটুকু, তাও এখন শেষ হওয়ার পথে!

কী ছিলো ইহরামের হাকীকত এবং কতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি তা! ইহরামের হাকীকত তো হলো জীবন ও জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ তা'আলার ইশক ও মুহাব্বাতে নিজেকে ফানা ও বিলীন করে দেয়া! ফানাইয়্যাত তো অনেক দূরে, আমি কি পেরেছি ইশক ও মুহাব্বাতের সাধারণ কোন মাকাম হাছিল করতে! কিংবা পেরেছি এই প্রতিজ্ঞাটুকু গ্রহণ করতে যে, এখন থেকে হজ্বের শিক্ষা ও দীক্ষা ধারণ করার

সাধনায় আত্মনিয়োগ করবো! তাহলে কিসের ইহরাম হলো! আরাফা-মুযদালিফায় কিসের অকূফ হলো! কিসের লাব্বাইক হলো! কিসের হজ্ব হলো!

কিন্তু না, দিলের এ বেচায়ন হালাতের মাঝে হযরতের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো অন্য রকম সান্ত্বনা। তিনি বললেন, 'কিছু হয়নি, দিল থেকে তা মনে করতে পারা হাকীকতে কিছু হওয়ার আলামত! মাওলা যাকে কিছু দান করেন তাকেই কিছু না হওয়ার ইহসাস দান করেন। জানা-অজানা ভুলত্রুটির জন্য শরমিন্দা হও এবং ইস্‌তিগফার করো, আর আল্লাহর রহমতের কাছে আশা করো যে, তিনি এই টুটাফাটা আমল কবুল করেছেন। ভয় 'করন' চাই, আবার ভয়ের সঙ্গে আশাও 'করন' চাই। শুধু ভয় এবং শুধু আশা দু'টাই শয়তানের হাতিয়ার। ভয় দ্বারা শয়তান নিরাশ করে, আর আশা দ্বারা গাফেল করে। দিলে যখন ভয়-আশা দু'টাই থাকে তখন আল্লাহর দরবারে কবুলিয়াত হাছিল হয়।'

হযরতের মুখে এই সান্ত্বনাবাণী শুনে যেন হুঁশ হলো। আস্তাগফিরুল্লাহ! তাহলে এটা ছিলো শয়তানের হামলা! শয়তান তাহলে অন্তরে নিরাশার অন্ধকার সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছিলো! একজন কামিল রাহবারের হিদায়াত ছাড়া শয়তানের এসকল সূক্ষ্ম চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক হওয়া কীভাবে সম্ভব?

যাক, হযরতের সান্ত্বনা অন্তর থেকে নিরাশার অন্ধকার দূর করে দিলো এবং আশা ও প্রত্যাশার স্নিগ্ধ আলো জ্বেলে দিলো। তাই প্রশান্ত চিত্তে মাথা মুড়িয়ে ইহরাম থেকে মুক্ত হলাম।

হঠাৎ সেই ঘটনাটি মনে পড়লো যা স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিলো! প্রথম লেখার সময়, এমনকি বারবার সম্পাদনার সময়ও মনে পড়েনি। এখন মনে পড়লো এবং এমন স্পষ্টভাবে, যেন গতকালের ঘটনা।

মিনায় তখন মাথা মুড়ানোর জন্য কিছু কিছু পাকিস্তানি ও হিন্দুস্তানি ক্ষুর-ব্লেড নিয়ে ঘুরতো এবং যেখানে সেখানে বসেই তিন রিয়ালের বিনিময়ে মাথা মুড়িয়ে দিতো। আমার মাথা যিনি মুড়িয়েছিলেন তিনি হিন্দুস্তানের কেরালার অধিবাসী, জামালুল ইসলাম। মাথা মুড়ানো চলছে হঠাৎ মনে হলো মাথায় একফোঁটা 'গরম পানি' পড়লো! অবাক হয়ে মাথা তুলে তাকালাম, জামালুল ইসলামের চোখে পানি! মায়া হলো; নিশ্চয় অনেক দিন হয়েছে দেশ থেকে এসেছেন। স্ত্রী-সন্তানের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু না, ছয় বছর হলো জামালুল ইসলাম পাক ভূমিতে এসেছেন। তেমন কোন কাজ নেই, সে জন্য দুঃখও নেই। কারণ ছয়টি হজ্ব করেছেন এবং বলতে গেলে বিনা মেহনতে!

তাহলে কষ্ট কিসের! কষ্ট হলো, বুড়ো মা-বাবাকে হজ্ব করাতে চান, কিন্তু সঙ্গতি নেই! প্রতিবার যখন হজ্ব করেন, খুব কষ্ট হয়, বুড়ো মা-বাবার কথা ভেবে! দেশে নাকি তার 'সুখা রুটির' ইন্‌তিযাম ছিলো, তবু বুড়ো মা-বাবা তাদের একমাত্র সন্তানকে পাঠিয়েছেন এ আশায় যে, তাদের আল্লাহর ঘরে আসার কোন না কোন ব্যবস্থা হবে। বুড়ো মা-বাবার দিলের খাব এখনো পুরা হলো না, মনে হলেই 'না-লায়েক বেটার'

চোখে পানি এসে যায়। আজও তাই হয়েছে। কী যে হলো, আমারও চোখে পানি এসে গেলো এবং আবেগের আতিশয্যে নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বের হয়ে গেলো, কেঁদো না আমার ভাই! দেখে নিও আল্লাহ চাহে তো আগামী বছরই তোমার মা-বাবার হজ্বের ইনতিযাম হয়ে যাবে।

কেন আমার মুখে এ কথা এসেছিলো, জানি না! সেই বুড়ো-বুড়ির আল্লাহর ঘরের যিয়ারত নছীব হয়েছিলো কি না, তাও জানি না! জামালুল ইসলামের মুখের ছবি এবং চোখের পানি সবই মুছে গিয়েছিলো আমার স্মৃতি থেকে। আজ হঠাৎ মনে পড়লো খুব স্পষ্টভাবে। আমি শুধু আশা করতে চাই, জামালুল ইসলামের বুড়ো মা-বাবা একদিন পানির জাহাযে চড়েছিলো এবং রহমতের দরিয়া পাড়ি দিয়ে পাক যমিনে হাযির হতে পেরেছিলো, আর মাথা মুড়িয়ে কোনভাবেই 'ছয়টি' রিয়াল নিতে রাজি না হওয়া জামালুল ইসলামের চোখে খুশির ঝিলিক দেখা দিয়েছিলো।

মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিছবাহকে আল্লাহ রহম করুন। হজ্বের সফরে তার সঙ্গ আমার বড় উপকারে এসেছিলো। আমরা একসঙ্গে মাথা মুড়িয়েছিলাম। তখন তিনি একটি সুন্দর ঘটনা শুনিয়েছিলেন, যা পরে কিতাবেও পড়েছি–

এক বুজুর্গ নয় তারিখের রাতে মিনায় স্বপ্ন দেখেন; দু'জন ফিরেশতা, একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছেন, এবার কত মানুষ হজ্ব করতে এসেছে? অপরজনের উত্তর, ছয় লাখ। প্রথমজন জিজ্ঞাসা করলেন, এদের মধ্যে কতজনের হজ্ব মাকবূল হয়েছে? অপর -জনের উত্তর, মাত্র ছয়জনের।

বুজুর্গের চোখ খুলে গেলো। ভয়-সন্ত্রস্ততায় তিনি ঘর্মাক্ত হলেন আর ভাবলেন, ছয়জন ভাগ্যবানের তালিকায় আমার নাম আর কীভাবে আসবে! সব কষ্ট-সাধনা তাহলে বেকার গেলো! হায়, আমার তাহলে কী উপায় হবে!

দশ তারিখের রাত্রে মুযদালিফায় বুযুর্গ আবার স্বপ্ন দেখেন, ঐ দু'জন ফিরেশতা; একজন জিজ্ঞাসা করছেন, শুধু ছয়জনের হজ্ব কবুল হলো, আর সবার হজ্ব বেকার গেলো! দ্বিতীয় ফিরেশতা বললেন, না, বরং এই তাদের ওছিলায় পুরো ছয়লাখের হজ্ব আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নিয়েছেন।

সুবহানাল্লাহ! রাব্বুল আলামীনের রহমতের দরিয়ায় যখন জোশ আসে তখন এমনই হয়! রহমতের একেকটি মওউজ আসে, আর বান্দার সব গান্দেগি ও নাপাকি ভাসিয়ে নিয়ে যায়; ছয়জনের বাহানায় ছয় লাখ পার হয়ে যায়! সুতরাং আল্লাহর রহমত থেকে কখনো নিরাশ হয়ো না। তিনি যখন দয়া করে এনেছেন তখন কিছু না কিছু দিয়েই বিদায় করবেন। তাই তো আল্লাহর পেয়ারা হাবীব বলেছেন, সবচে' গোনাহগার ঐ ব্যক্তি যে আরাফায় হাযির হলো এবং অকূফ করলো, তারপরো ধারণা করলো যে, আল্লাহ হয়ত তাকে মাফ করেননি।

আল্লাহর পেয়ারা হাবীব আরো বলেছেন, বান্দা আল্লাহ সম্পর্কে যে ধারণা করে, আল্লাহ বান্দার সঙ্গে সে আচরণই করেন।

হাদীছে কুদসীতে স্বয়ং আল্লাহ বলেন, 'আমি তো বান্দার ধারণার কাছে থাকি!'

সুতরাং আল্লাহর রহমতের কাছে আমি আশা করি, তিনি আমার হজ্ব কবুল করেছেন এবং সমস্ত গোনাহ মাফ করে আমাকে সেই দিনের মত নিষ্পাপ করে দিয়েছেন যেদিন মা আমাকে জন্মদান করেছিলেন।

সবচে' গোনাহগার 'আরাফাতী'ও আল্লাহর রহমতের কাছে এ আশা করতে পারে এবং আল্লাহ তাতে খুশী হন, তবে শর্ত হলো, বেয়াদবি করো না, গাফলাতে ডুবে থেকো না, ঝগড়া-বিবাদ করো না, আর আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দিও না। তাহলে অন্তত তাঁদের ওছিলায় তোমার হজ্ব কবুল হয়ে যাওয়ার আশা করতে পারো।

***

পঁচিশ বছরের জীবনে আমার কখনো কোরবানি করার খোশ নছীব হয়নি; এবারও হলো না। আব্বাকে কোরবানি করতে দেখেছি। আব্বার সঙ্গে কোরবানির হাটে গিয়েছি বহুবার; প্রথমে অবুঝ আনন্দের আকর্ষণে, পরবর্তীতে কিছুটা অনুভব-অনুভূতি সঙ্গে করে। কোরবানির হাটে আব্বাকে দেখেছি। কেমন দেখেছি তা হয়ত বুঝিয়ে বলতে পারবো না, শুধু বলতে পারি, সেখানে আব্বার মত কাউকে কখনো দেখিনি। রওয়ানা হওয়ার আগে আব্বা দু'রাকাত নামায পড়েন। সে নামাযে আব্বার দাড়ি তো ভেজে, জায়নামাযও ভেজে। মোনাজাতে সেকি কাকুতি-মিনতি! দেখেছি, শিখতে পারিনি। খরিদ করার পর আব্বার প্রথম কাজ হলো পশুটিকে 'আদর' করা এবং আশ্চর্য, কোন পশুকে দেখিনি আব্বার আদর প্রত্যাখ্যান করতে!

কয়েকবছর আগে– আব্বার তখন খুব বিপর্যস্ত জীবন এবং জীবনে সেই একবার তিনি শরিকে কোরবানি করেছেন– কোরবানির হাটে আব্বার সঙ্গে আছি; দেখি, চোখে ধরে এমন একটি গাভীর দিকে মায়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলছেন, দিলের তামান্না, তোকে কোরবানি দেই, যাবি আমার সঙ্গে! আমার যে তাওফীক নাই তোকে নেয়ার।

প্রিয় পাঠক, এমন বাবার কোরবানি দেখা সন্তানকে কি ভাগ্যবান বলা যায় না! প্রার্থনা করি, প্রতিটি মুসলিম সন্তান যেন দেখতে পায় আমার বাবার মত কোরবানি।

আব্বা কোরবানির পশু বাড়িতে আনেন ঈদের দু'একদিন আগে। সেই পশুকে তিনি এমন যত্ন করেন যেন তাঁর আদরের সন্তান! কত বার যে তাঁর তিরস্কার শুনেছি গরুটার ঠিকমত 'খেদমত' হচ্ছে না বলে! কোরবানির গরুর চারপাশে কয়েল জ্বেলে দেন, যাতে মশা কষ্ট না দেয়। একবার তো রীতিমত মশারি টানানোর ব্যবস্থা করেছিলেন! হাসছো তুমি! আমি কিন্তু সত্য কথা বলছি!

কোরবানির দিন আমরা গোসল করি; আব্বা কোরবানির পশুকে 'স্নান' করান। ঈদের নামায পড়ে আসার পর তিনি একেবারে বদলে যান! আমার কাছে একেবারেই অচেনা হয়ে যান! কোরবানির পশুকে যখন শোয়ানো হয় আব্বার চোখে তখন পানি এসে যায়, কখনো শব্দ করে কেঁদে ওঠেন। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে যখন ছুরি চালান তাঁর বেচায়ন অবস্থা হয় দেখার মত; যেন পশুর গলায় নয়, তিনি ছুরি বসিয়েছেন আপন সন্তানের গলায়! এমন কোরবানি আমি আর কারো দেখিনি! এমন মমতার সঙ্গে ছুরি হাতে নিলেই হয় কোরবানি, নইলে হয়ে যায় কসাই ও জবাই

কোরবানির প্রতিটি পশুকে আল্লাহ যেন দান করেন আমার বাবার মত কোরবানি 'কারনেওয়ালা'!

হয়ত প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়েছি। তবু কথাগুলো কেন বললাম জানো! গত বছর কোরবানির হাটে একটি দৃশ্য দেখেছিলাম, মনে হয়েছিলো, একটি 'পশু' একটি পশুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে! কোরবানির প্রতিটি পশুকে আল্লাহ যেন এমন পশু থেকে রক্ষা করেন।

হে ভাই! তুমি যখন কোরবানির হাটে যাবে, কোরবানির পশু খরিদ করবে এবং কোরবানির পশুর গলায় ছুরি চালাবে তখন আমার এ কথাগুলো মনে রেখো।

মূল কথায় ফিরে আসি। আল্লাহ তাঁর গোনাহগার বান্দাকে কোরবানির স্মৃতিবিজড়িত মিনায় হাযির করেছেন, অথচ কোরবানি করার তাওফিক নেই! মনটা বড় বিষণ্ন ছিলো। যদি সামান্যতম তাওফিকও থাকতো, অবশ্যই আমি মিনার ময়দানে কোরবানি করতাম! এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে যে, আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আ)-এর কোরবানির সঙ্গে তোমার কোরবানির একটি ন্যূনতম সাদৃশ্য স্থাপিত হবে! আল্লাহর পেয়ারা হাবীব এই মিনার ময়দানে কোরবানি করেছেন, সেই সুন্নাতের অনুসরণ হয়ে যাবে! আর তাতে তুমি মুহূর্তের মাঝে 'ফরস থেকে আরশে' পৌঁছে যাবে! কিন্তু হায়, সে তাওফিক কোথায় আমার!

হঠাৎ মনে হলো, নিজে কোরবানি করতে না পারি, আল্লাহর নেক বান্দাদের কোরবানি করা দেখতে তো পারি! কোরবানি করতে না পারা যদি হয় আফসোসের বিষয়, কোরবানির দৃশ্য দেখতে পারা তো হতে পারে সৌভাগ্যের বিষয়! কেয়ামতের দিন অন্তত বলতে তো পারবো, হে আল্লাহ, তাওফিক ছিলো না, তাই কোরবানি করতে পারিনি, তবে ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরে অনেক দূর পথ পাড়ি দিয়ে আমি পৌঁছেছিলাম মিনার কোরবানিগাহে এবং তোমার পেয়ারা বান্দারা যে কোরবানি করেছেন, মুহাব্বাতের সঙ্গে তাদের কোরবানি করার দৃশ্য দেখেছিলাম!

মাথা মুড়িয়ে যখন ইহরাম থেকে মুক্ত হলাম এবং গোসল করে নতুন লিবাস পরলাম তখন হযরত বললেন, 'মিয়াঁ আবু তাহের! খোশবু ইস্তিমাল করো না কেন! নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্বের বয়ানে তো রয়েছে, 'কোরবানি করার পর তিনি মাথা মুড়িয়ে ইহরাম থেকে বের হলেন এবং লিবাস পরার পর খোশবু ইস্তিমাল করলেন।'

মিয়াঁ, তোমার হজ্ব তো তখনই হজ্ব হবে যখন অন্তত যাহিরি ভাবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্বের সঙ্গে কিছু না কিছু মিল হবে। অনেক কিছুর মিল তো এখন আর সম্ভব না, যেগুলা সহজে সম্ভব সেগুলা তো ভুলে যাওয়া উচিত না!

প্রিয় পাঠক, এবার বোঝো, আল্লাহর নেক বান্দারা কীভাবে হজ্ব করেন এবং তাঁদের ছোহবতে হজ্ব আদায় করা কত কল্যাণকর!

আমার কাছে আতর ছিলো না, তার চেয়ে বড় কথা, খোশবু ব্যবহার করার কথা মনেও ছিলো না। খুব লজ্জিত হলাম এবং অভ্যাসমত হযরতের উদ্দেশ্যে বলে উঠলাম, জাযাকাল্লাহ!

হযরত মৃদু হেসে তাঁর আতরের শিশিটি হাদিয়া দিলেন এবং আমি আতর ব্যবহার করলাম। আমার সৌভাগ্য, হযরতের কাছ থেকে জীবনে বহুবার বহুকিছু হাদিয়া পেয়েছি। সবচে' মূল্যবান হলো দু'আর হাদিয়া, যা বিভিন্ন সময় কারণে, কিংবা বিনা কারণে খুশী হয়ে আমাকে দান করেছেন। তারপর সবচে' প্রিয় হাদিয়া আমার মনে হয়েছে মিনার ময়দানে কোরবানির দিনে এই আতরের হাদিয়া!

হযরত এখন দুনিয়াতে নেই, তাঁর কাছ থেকে পাওয়া অনেক হাদিয়াও আমার কাছে নেই, তবে আতরের শিশিটি আছে। ছোট্ট একটি শিশি এবং হয়ত খুব সাধারণ, কিন্তু পৃথিবীর কোন সম্পদের বিনিময়ে তোমাকে আমি তা দেবো না। যদি বলো, 'আল্লাহর ওয়াস্তে' তাহলে অবশ্য দিয়ে দেবো। তবে আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি তা চাইতে যেয়ো না।

সুযোগ পেয়ে আরয করলাম, হযরত! দিলের বড় ইচ্ছা, কোরবানিগাহে গিয়ে হাজী ছাহেবানদের কোরবানি করা দেখি। তিনি খুশী হয়ে ইজাযাত দিলেন। আমি তাঁবুর নম্বর এবং অন্যান্য চিহ্ন ঠিক রেখে একাই রওয়ানা হলাম। মিনার একপ্রান্তে অবস্থিত 'মানহার' বা কোরবানিক্ষেত্র আমাদের তাঁবু থেকে অনেক দূরে ছিলো।

জামরাতুল আকাবার রামী করার পর ক্লান্ত ছিলাম। সুতরাং ক্লান্তি বোধ করা স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু তখন আমার কোন ক্লান্তিবোধ ছিলো না; অন্তরে বরং উৎসাহ-উদ্দীপনার এবং আবেগ ও জাযবার অদ্ভুত এক তরঙ্গদোলা অনুভব করছিলাম। সেই মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছিলো, আমার বাবা যদি আজ আমাকে আল্লাহর মুহাব্বাতে কোরবানি করতে চান, কিংবা আমাকে যদি বলা হয়, তোমার কলিজার টুকরোটিকে আল্লাহর জন্য কোরবানি করো তাহলে হয়ত খুশিমনেই আমি রাজী হয়ে যাবো।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম এবং ভয়ে কম্পিত হলাম। এ ধরনের চিন্তা নিশ্চয় আদবের খেলাফ এবং শয়তানি ওয়াসওয়াসা! শয়তান কতভাবে যে আমাদের কমযোর দিলের উপর হামলা চালায়! আমি মনে মনে এবং জোরে জোরে ইস্তিগফার পড়লাম।

দীর্ঘ সময় হেঁটে মানহারে পৌঁছলাম। আশেকানে খালীল সেখানে হাজার হাজার। কেউ যাচ্ছেন কোরবানি করতে, কেউ ফিরে যাচ্ছেন কোরবানি করে। যারা যাচ্ছেন তাদের মুখমণ্ডলে আবেগ ও জাযবার অপূর্ব এক দীপ্তি! ঠিক কোন শব্দে সেটাকে প্রকাশ করা যায়, জানি না। যারা ফিরে যাচ্ছে তাদের মুখাবয়বে যেন কী এক প্রাপ্তির তৃপ্তি! কিসের প্রাপ্তি এবং কেমন তৃপ্তি তা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই। তবে দুই চেহারায় দু'রকমের অনুভূতি আমি স্পষ্ট অনুভব করছিলাম। যারা টোকেনের মাধ্যমে ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে কোরবানি করার প্রস্তাব রাখছেন তারা শুধু নষ্ট হয়ে যাওয়া গোশতের কথা ভাবছেন, কিন্তু একবারও ভেবে দেখছেন না, তখন কি অন্তরে জাগ্রত হবে কোরবানির এমন রূহানি জাযবা ও আবেগ-অনুভূতি! তখন কি কারো

মুখমণ্ডলে দেখতে পাবো ত্যাগের মহিমার এই উদ্ভাস এবং প্রাপ্তির তৃপ্তির এই আভাস! তখন হয়ত সেটা হবে পশু জবাইয়ের আনুষ্ঠানিকতা, কিন্তু কোথায় যাবে কোরবানির রূহানিয়াত ও নূরানিয়াত!

ভিড়ের ফাঁক খুঁজে খুঁজে মানহারের ভিতরে প্রবেশ করলাম। বিরাট জায়গা এবং আধুনিক ব্যবস্থা, তবে অব্যবস্থার কারণে প্রথম দিনেই যেন প্রতিটি ব্যবস্থা তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। একদল দক্ষ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী যদি এখানে নিযুক্ত হতো তাহলে পরিবেশ থাকতো পাকছাফ এবং কোরবানির পবিত্রতায় ভাবগম্ভীর!

মিনার কোরবানিগাহে হাযির হয়ে সেদিন যে শিক্ষা লাভ করেছিলাম এবং যে আবেগ-অনুভূতি অর্জন করেছিলাম সেটা ছিলো আমার জীবনের মূল্যবান এক সঞ্চয়। আল্লাহ যদি আমার অন্তরে এই ইচ্ছাটুকু জাগ্রত না করতেন! কোরবানির দৃশ্য অবলোকনের উদ্দীপনায় যদি এখানে হাযির না হতাম, তাহলে অনেক কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হতাম।

আরবের ভূমিতে আমি কোন উট দেখিনি, আজ দেখলাম। শত শত নয়, হাজার হাজার এবং অনেক হাজার! দুই তিন সারিতে দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে। এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ও রয়েছে কিছু উট। গ্রামের বেদুঈনরা নিয়ে এসেছে; কেউ পাঁচটা, কেউ দশটা, কেউ আরো বেশী। এই বেদুঈনরা যে তেলসমৃদ্ধ এবং সম্পদ উপচে পড়া সউদী আরবের নাগরিক, পোশাকে ও চেহারাসুরতে তা বোঝার উপায় নেই। আসলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য আছে সর্বত্র এবং তার চেহারা অভিন্ন। তবে স্বীকার করতে হবে, উটের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বেদুঈনদের আচরণ ছিলো খুব সহজ-সরল এবং অকপট। বাইরে দারিদ্য আছে, ভিতরে দৈন্য নেই। আমাদের দেশে! দুই দারিদ্র্যের মাঝে পার্থক্যটা এখানেই।

প্রথমেই যে বিষয়টি আমাকে মুগ্ধ করলো তাহলো উটগুলোর শান্ত স্বভাব এবং চোখের গভীর চাহনি। হয়ত নিছক কল্পনা, কিন্তু আমার মনে হলো, এখানে 'আসার' উদ্দেশ্য এরা জানে, বংশপরম্পরায় যেমন হয়ে এসেছে, তেমনি আজ এখানে এদেরকে আল্লাহর নামে কোরবানি করা হবে। কিন্তু তাদের মাঝে ভীতির কোন ছাপ নেই, বরং চোখের চাহনিতে যেন আত্মসমর্পণের ছায়াপাত। অথচ যারা কোরবানি করতে এসেছে তাদের অনেকের মাঝে তা ছিলো অনুপস্থিত। সেখানে অট্টহাসি ছিলো, শোরগোল ছিলো, আর ছিলো দামদস্তুর নিয়ে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়। তাতে মিনার কোরবানগাহে উপস্থিত একজন হাজী হিসাবে আমি ব্যথিত ও লজ্জিত হয়েছি এবং মনে মনে পশুগুলোর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছি।

বিদায় হজ্বে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানির বর্ণনায় এসেছে, 'কিছু উট তাঁর দিকে ছুটে ছুটে আসতে লাগলো এ আকাঙ্ক্ষায় যে তাদের কাকে দিয়ে তিনি কোরবানি শুরু করবেন!

এখানেও কিছু উটের মাঝে মনে হলো, দেখতে পেলাম কোরবানি হওয়ার সেই আকুতির ছায়াপাত! কে জানে, এরা সেই উটগুলোর বংশধর কি না!

এক বৃদ্ধ আরব হৃষ্টপুষ্ট বিরাট দু'টি উট খরিদ করলেন। তিনি দরদস্তুর করলেন না. উল্‌টো বেদুঈন উটওয়ালাকে কিছু রিয়াল বেশী দিলেন, বেদুঈন বেহদ খুশী হয়ে বারবার 'বারাকাল্লাহু ফী উযহিয়াতিকা' বলে বৃদ্ধকে দু'আ দিতে লাগলো। আমি অবাক হলাম এবং ভাবের তরঙ্গদোলায় আপ্লুত হলাম। বৃদ্ধকে তেমন সচ্ছল মনে হলো না, অথচ হৃদয়ের সচ্ছলতা!

আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম, যদি কিছু মনে না করেন, জানতে চাই, আপনি দরদস্তুর করেননি, বরং মূল্যের অতিরিক্ত দান করেছেন, এমনটা তো কেউ করে না, আপনি করলেন?!

কিছুক্ষণ তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, যেন বুঝতে চাইলেন, অন্তরের কথাটা বলা যায় কি না! শেষে বললেন, বেটা! এই পশু তো আমার সন্তানের ফিদয়া; আমার পুত্রের বদলি কোরবানি! এটা নিয়ে দামদস্তুর করা আমার দিল কীভাবে বরদাশত করতে পারে!

আমি শ্রদ্ধায় অভিভূত হলাম। আমার মন বলে উঠলো, এ রকম দু'একজন কোরবানি কারনেওয়ালার অছিলায় হয়ত আল্লাহ তাআলা আর সবার অনুভূতিহীন কোরবানিও কবুল করে নেবেন!

নূরানি চেহারার বৃদ্ধ আরব, উটদু'টিকে সাদরে নহর করার স্থানে নিয়ে গেলেন এবং সত্যি বলছি, আল্লাহর নামে কোরবান হবে বলে, মনে হলো, ওরা খুশী! আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উটদু'টিকে বসালেন, গলায়-পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলেন এবং ওরা যেন সে আদর গ্রহণ করলো!

বৃদ্ধ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে নহর করলেন। গল গল করে রক্ত প্রবাহিত হলো। দু'টি উটের একটিও নড়াচড়া করলো না; হাঁটু গেড়ে গলা উঁচিয়ে বসেই থাকলো। তারপর শুধু কাত হয়ে পড়ে গেলো। আমি অভিভূত দৃষ্টিতে দেখলাম আল্লাহর নামে কোরবান করা এবং আল্লাহর নামে কোরবান হওয়ার অভূতপূর্ব দৃশ্য! আমার চোখদু'টো ছলছল করে উঠলো। কাছে গিয়ে উটদু'টির গায়ে হাত বুলালাম। ভাবতে ইচ্ছা করলো, এরা আমার চেয়ে ভাগ্যবান, কিন্তু ভাবলাম না, কারণ সকল অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আমি যে ইনসান!

এক বাঙ্গালী হাজী, পশ্চিম বঙ্গের, বেদুঈন উটওয়ালাকে কাকুতি মিনতি করে কী যেন বোঝাতে চাচ্ছেন; কেউ কারো কথা বুঝতে পারছে না। আমি এগিয়ে গেলাম। হাজী ছাহেব বলতে চাচ্ছেন, উটটি তার খুব পছন্দ। এত পছন্দের উটটিকে কোরবানি করতে না পারলে আফসোসের সীমা থাকবে না। উটওয়ালা যা চায় তাই সে দিতে রাজী, কিন্তু তার কাছে যে অত টাকা নেই! হাজী ছাহেব কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন. ভাই! উটওয়ালাকে বুঝিয়ে বলুন, যেন একটু দয়া করে।

বাঙ্গালী হাজী ছাহেবের এ অভিব্যক্তি আমার ভালো লাগলো। বেদুঈনকে বুঝিয়ে বললাম। এই সরল বেদুঈন যেন সে যুগের আরব বেদুঈন! তিনি হাজী ছাহেবের

দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন, যাও, তুমি যা পারো তাই দিয়ে নিয়ে যাও।

আল্লাহর শোকর! কোরবানি করার জন্য না হলেও আমি এসেছিলাম কোরবানির দৃশ্য দেখার জন্য! এমন দৃশ্যের দর্শক হতে পারাও কি কম সৌভাগ্যের!

হঠাৎ কানে এলো উচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার! চমকে উঠলাম, ভীষণভাবে চমকে উঠলাম! এ আওয়ায তো আমার আব্বার আওয়ায! এমন আবেগ ও জাযবায় উদ্দীপ্ত কোরবানির তাকবীর তো শুনেছি শুধু আব্বার কণ্ঠে! পিছনে ফিরে তাকালাম। বিরাটদেহী এক 'আলহাজ্ব' কোরবানি করছেন বিরাট কোন উট নয়, গরু নয়, ছোট্ট একটি দুম্বা! জবাই শেষে ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ছুরির ডগা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে, আর চোখের পাতা থেকে ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু! এমন আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য সারা জীবনে কি দুবার দেখা যায়! আজ যদি এখানে আসা না হতো তাহলে কি এমন দৃশ্য দেখার নছীব হতো আর কখনো!

জান্নাত থেকে বিরাট এক উট আসতে পারতো, আসতে পারতো মোটাতাজা গরু, অথচ এসেছিলো ছোট্ট একটি দুম্বা! কারণ আল্লাহর কাছে তো পৌঁছে না রক্ত বা গোশত, পৌঁছে শুধু কলবের তাকওয়া। জানি না কোন্ দেশের হাজী তিনি! তবে তার আবেগময় কণ্ঠের তাকবীর এবং ছোট্ট দুম্বার কোরবানি আমাকে সেকথাই যেন আবার স্মরণ করিয়ে দিলো।

মিনার কোরবানিগাহে সেদিনের দেখা আরো অনেক দৃশ্যের কথা এখানে লিখতে পারি। সেদিন কোরবানি করার দৃশ্য যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছি অনেক জবাই করার দৃশ্য।

প্রিয় পাঠক, জবাই করার দু'একটি ঘটনা লিখবো? থাক! আমাদের তো কর্তব্য হলো জীবনে যখন যেখানে যা কিছু সুন্দর দেখি তা কুড়িয়ে নেয়া এবং সবার সামনে তুলে ধরা, আর যা কিছু অসুন্দর তা আড়াল করে রাখা। কবির ভাষায়–

গোলাবের খোশবু ছড়িয়ে পড়ুক তোমার গানের সুরে/ কাঁটার আঘাতে রক্ত ঝরা লুকিয়ে থাকুক বুকে।

মানহার থেকে বের হওয়ার সময় আমি অত্যন্ত আপ্লুত ছিলাম। অন্তরের অন্তস্তল থেকে প্রার্থনা করলাম, আল্লাহ যেন সবাইকে কোরবানি করার তাওফীক দান করেন এবং তা কবুল করেন। পশুর গলায় যখন ছুরি চালাই তখন যেন আল্লাহর মুহব্বত ছাড়া অন্যসব মুহব্বতের গলায় ছুরি চালাতে পারি। পশুকে কোরবানি করার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের পশুটিকেও যেন জবাই করতে পারি। সেই যে আমাদের কাজী কবি বলেছেন তার কোরবানি কবিতায়!

তাঁবুতে ফিরতে মাগরিবের পর হয়ে গেলো। যা দেখবো ধারণা ছিলো তাই দেখলাম; হযরত তাঁর মুছল্লায় যিকির-তাসবীহাতে মশগুল। দেখা করলাম। তিনি আমার আগে খোঁজ নিলেন আমার নামাযের; জিজ্ঞাসা করলেন, আছর ও মাগরিব জামাতের সাথে পড়েছি কি না! এভাবে পুরো সফরে তিনি সবার প্রয়োজনীয় তারবিয়াত করতেন।

হযরতকে মানহারের বিভিন্ন ঘটনা বললাম; সেই আরব ও তার উটদু'টির কথাও বললাম। তিনি খুব আশ্চর্য প্রকাশ করে বললেন, 'হতে পারে তোমার ধারণা সত্য! হতে পারে এগুলা সেগুলারই বংশধর।'

***

মানুষকে আল্লাহ এত দুর্বলতা দিয়ে কেন তৈরী করেছেন! মানুষের অনেক দুর্বলতার মধ্যে একটি হলো ক্ষুধা। 'হৃদয়ের' একটু নীচেই তো উদরের অবস্থান; তাই ভাবের রাজ্যেও ক্ষুধা এসে হানা দেয় অবলীলাক্রমে! আমারও ভাবের রাজ্য উধাও হয়ে গেলো ক্ষুধার হামলায়। সম্ভবত আজ সারা দিন কিছু খাওয়া হয়নি। হযরতের বিছানার চারপাশে তাকালাম। অন্যসময় কিছু না কিছু থাকে; এখন নেই। থাকলে হয়ত বলতাম ক্ষুধার কথা। এখন কিছু বলা মানে তাঁকে পেরেশান করা। তাই কিছু না বলে তাঁবু থেকে বের হলাম। বরং বলা ভালো, কেউ যেন আমাকে বের করলো! আমার ভিতেরর 'আমি' যেন বললো, তাঁবু থেকে বের হও, তোমার কারীম মেযবান তোমার জন্য দস্তরখান বিছিয়ে রেখেছেন; দু'কদম হেঁটে তোমাকে শুধু পৌঁছতে হবে দস্তরখান পর্যন্ত।

তাঁবু থেকে বের হয়ে অনির্দিষ্টভাবে হাঁটছি, আর মনে মনে বলছি, হে আল্লাহ, তোমার বান্দার ক্ষুধা পেয়েছে, ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। তুমি ছাড়া কে পারে বান্দার ক্ষুধার কষ্ট দূর করতে!

হাঁটতে হাঁটতে কত দূর এসেছি খেয়াল ছিলো না, হঠাৎ কে একজন হাত ধরে কোমলভাবে আকর্ষণ করলো! পিছনে ফিরে দেখি, এক আরব হাজী একটু দূরে তাদের দস্তরখান দেখিয়ে ইশারায় দাওয়াত দিচ্ছেন। আমার মুখে বিশুদ্ধ আরবী শুনে তিনি কিছুটা অবাক হলেন এবং পরিচয় নিলেন, তারপর আরো অন্তরঙ্গভাবে দাওয়াত দিলেন। কৃত্রিম সংকোচ বাঙ্গালীর একটি স্বভাবদোষ। ভিতরে হাঁ, হাঁ করলেও মুখে বলবে, না, না! আমিও না, না করে বললাম, আপনাদের দস্তরখানে আল্লাহ বরকত দান করুন, আপনারা খেতে থাকুন, আমার শরীক হওয়ার ইচ্ছে নেই।

আসলে এটা ছিলো অসত্য কথা; আমার তো শরীক হওয়ার ষোল আনা ইচ্ছে ছিলো! ভাগ্য ভালো, তিনি ছিলেন আরব! আর কালের ব্যবধান স্বীকার করে নিলেও সে যুগের আরবরক্ত তো এ যুগের আরবদের শিরায়ও প্রবাহিত। পথের মেহমানকে একজন আরব সহজে হাতছাড়া করে না। তিনি আমাকে প্রায় জোর করেই নিয়ে গেলেন। দস্তরখানের অন্য সকলে এমনভাবে আহলান ওয়া সাহলান বলে স্বাগত জানালেন যে, মুহূর্তে অপরিচয়ের সব সংকোচ দূর হয়ে গেলো।

রুটি ছিলো, আস্ত ভুনা দুম্বা ছিলো এবং তা ছিলো আজকের কোরবানির দুম্বা। তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম।

এরা ছিলেন ইয়ামানের হাজী এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। পাশেই তাদের তাঁবু ভিতরে যথেষ্ট গরম, তাই তারা তাঁবুর বাইরে খোলা জায়গায় দস্তরখান বিছিয়েছেন

কিন্তু মেহমান না হলে তো আরবদের দস্তরখান পূর্ণতা লাভ করে না! তাই দূর থেকে দেখে আমাকে তারা 'ধরে' এনেছেন!

এসব কেন হলো, কীভাবে হলো! আমি কেন তাঁবু থেকে বের হলাম এবং এদিকেই হেঁটে এলাম! তারা কেন তাঁবুর বাইরে দস্তরখান বিছালেন এবং আমাকে দেখে ডেকে আনলেন! এসব প্রশ্নের জবাব আমিও খুঁজে পাবো না, তুমিও পাবে না। শুধু বলতে পারি, তিনি বিশ্বজাহানের রিযিকদাতা; তদুপরি এখানে এই পাক ভূমিতে যাদের তিনি ডাক দিয়ে এনেছেন, আরব কিংবা আজম, নেককার কিংবা বদকার, সবাই তাঁর মেহমান এবং তিনি তাদের মেযবান!

আমি শুধু আসমানের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমার ক্ষুধা দূর হয়েছে হে আল্লাহ! বড় তৃপ্তির খাবার খেলাম; তুমি খাওয়ালে! কীভাবে কোন্ ভাষায় তোমার শোকর আদায় করবো, আমি জানি না হে আল্লাহ! যিনি বলেছেন কত না সত্য বলেছেন– খোদা তোমায় ডাকতে জানি না/ ডাকার মত ডাকলে খোদা কেমনে শোনে না!

আমি তো ডাকার মত ডাকিনি, তবু তিনি ডাক শুনেছেন এবং দস্তরখানে ডেকে এনেছেন। শোকর আলহামদু লিল্লাহ!

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে এবং খাওয়ার পর 'গাহওয়া'-এর মজলিসে অনেক কথা হলো। তাদের আরবী বোঝা আমার জন্য কষ্টকর ছিলো, তবে আমার আরবী তারা স্বচ্ছন্দে বুঝতে পারছিলেন। অধিকাংশ আরব এখন বিশুদ্ধ আরবী বলতে পারেন না, তবে মোটামুটি বুঝতে পারেন। আলোচনা হয়েছিলো ফিলিস্তীন সম্পর্কে, ইরাক-ইরান যুদ্ধ সম্পর্কে এবং মুসলিম উম্মাহর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে। আলোচনা যদিও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, কিন্তু হজ্বের সাথে সম্পর্কিত নয় বলে এখানে থাক সে প্রসঙ্গ। তবে গাহওয়া সম্পর্কে কিছু না বললেই নয়। আরবদের খুব প্রিয় পানীয় এবং আপ্যায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ছোট ছোট কাপে সামান্য পরিমাণ করে পরিবেশন করা হয়। সঙ্গে গোলমরিচের গুঁড়াজাতীয় কোন মশলা মেশানো হয়। তেতো, তবে স্বাদু, অন্তত আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। শরীরও বেশ সতেজ বোধ হয়। এখনো গাহওয়া আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু মাঝে মধ্যে কোন আরবের সান্নিধ্য ছাড়া পান করার সুযোগ বড় একটা হয় না।

যাই হোক, বড় তৃপ্তির সঙ্গে গাহওয়ার কাপে শেষ চুমুকটি দিয়ে আমি তাদেরকে জাযাকাল্লাহু বলে নিজের তাঁবুর দিকে রওয়ানা হলাম। অন্তর তখন আল্লাহর প্রতি শোকরের অনুভূতিতে ছিলো আপ্লুত। শোকর ও কৃতজ্ঞতার এমন অনুপম অনুভূতি হৃদয়ের গভীরে জীবনে খুব কমই হয়েছে। কারণ এমন ক্ষুধাও জীবনে খুব কমই লেগেছে। ক্ষুধার্ত মানুষের দেখা তো অনেক পেয়েছি, ক্ষুধার পরিচয় এমন করে আর কখনো পাইনি। সারা জীবন ক্ষুধার আগেই আল্লাহ খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন; সম্ভবত আজই প্রথম ক্ষুধার পরে খাদ্যের ব্যবস্থা হয়েছে। তাই আজ অন্যরকম এক উপলব্ধির সঙ্গে বুঝতে পারলাম রিযিক ও রায্যাকের পরিচয়।

তাঁবুতে ফিরে আসছি, হঠাৎ মনে পড়ে গেলো সেই হাদীছ– 'পাখীরা সকালে খালি পেটে নীড় ছেড়ে বের হয়, আর সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে আসে ভরপেটে। আমি তো কিছুটা সেই পাখীদের মতই হলাম! ক্ষুধার্ত পেটে তাঁবু থেকে বের হলাম, আর তৃপ্ত উদরে তাঁবুতে ফিরে এলাম! তোমার শোকর হে আল্লাহ, তোমার শোকর!

***

মিনায় আমি ও মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিছবাহ তাঁবুর বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচেই রাত যাপন করেছি। সেই রাতগুলোর সুখময় স্মৃতি কখনো ভোলার নয়। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ এবং মিটিমিটি অল্পক'টি তারকার দিকে তাকিয়ে কত রকম ভাব ও ভাবনার উদয়-অস্ত যে হতো আমাদের মনের আকাশে! সব যদি ধরে রাখা যেতো! সব যদি তুলে আনা যেতো কলমের কালিতে!

মনে পড়ে, তখন আমরা ভেবেছিলাম, ঠিক এই চাঁদ-তারাদেরই তো দেখেছিলেন আমাদের বাবা আদম! এই চাঁদ-তারারই আলোকসজ্জায় মুগ্ধ হয়েছিলেন আমাদের মা হাওয়া, যখন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর 'আদমকে', এই পবিত্র ভূমিতে! নির্জন মক্কাভূমিতে খোলা আসমানের নীচে শুয়ে থাকা শিশু ইসমাঈল এই চাঁদ-তারাদের দেখেই তো অবাক হয়েছিলেন! এই চাঁদ-তারাদের সঙ্গেই তো খেলা করেছিলেন! এই চাঁদ-তারাদের সম্পর্কেই তো শিশুসুলভ কত প্রশ্ন তিনি করেছিলেন মা হাজেরাকে! কিংবা হয়ত শিশু ইসমাঈলের জিজ্ঞাসা ছিলো শিশু ইসমাঈলেরই মত এবং মা হাজেরার উত্তর ছিলো মা হাজেরারই মত; অন্য শিশুদের মত নয় এবং নয় অন্য মায়েদের মত!

হয়ত শিশু ইসমাঈল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আম্মা! কোত্থেকে এসেছে এই চাঁদ-তারা? কীভাবে ভেসে বেড়ায় এগুলো আসমানে? মা হাজেরা হয়ত বলেছিলেন, বাবা! এগুলো সব আল্লাহর সৃষ্টি; এগুলো সব আল্লাহর কুদরত! আল্লাহর হুকুমে এভাবে আসমানে ভেসে বেড়ায়।

ঠিক এই চাঁদ-তারাগুলোই তো আমাদের পেয়ারা নবী ও তাঁর ছাহাবাগণ দেখেছিলেন এখানে 'এই মিনার আসমানে! এই চাঁদ ছিলো এবং ছিলো চাঁদের জোসনা! এই তারাগুলো ছিলো এবং ছিলো তাদের মিটিমিটি আলো! এই চাঁদেরই জোসনায় আল্লাহর নবী স্নাত হয়েছিলেন এখানে এই মিনার রাতে! আজ আমি– আমার মত তুচ্ছ এক উম্মতি– সেই চাঁদ-তারাদেরই তো দেখছি এই চাঁদ-তারাদের মাঝে, এই মিনার মরুভূমিতে, এই উন্মুক্ত আকাশের নীচে শুয়ে শুয়ে! এই চাঁদের জোসনার মাধ্যমে আমি তো আজ অবগাহন করছি সেই চাঁদেরই জোসনায়! ধন্য আমি, ধন্য আমার জীবন! কত দয়াবান তুমি হে আল্লাহ! কত মেহেরবান তুমি হে কারীম! তোমার পাক কালামে তুমি বলতে বলেছো, আমি বলছি হে আল্লাহ!

إِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আমার ছালাত এবং আমার হজ্ব এবং আমার জীবন, আমার মরণ সবই রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য!

হে আল্লাহ, আমরা তো বলেছি আমাদের মত, তুমি কিন্তু কবুল করে নাও তোমার মত! যেমন তোমার শানে করম! যেমন তোমার শানে রহম!

রাতের মিনায় আসমানের চাঁদ-তারাদের দেখে আমি অপূর্ব এক সান্ত্বনা লাভ করতাম। মধুর এক আবেগে আপ্লুত হয়ে ভাবতাম, আমি তো শুধু বর্তমানের নই; আমি তো অতীতেরও! মিনার আকাশের এই চাঁদ তো আমার কালিমালিপ্ত বর্তমানকে আড়াল করে আমাকে দেখায় আমার সুন্দর সমুজ্জ্বল অতীতকে। আজকের এই চাঁদের জোসনার মাঝে আমি তো অনুভব করি আমার সেই অতীতের স্নিগ্ধতা! আধুনিক জীবন এবং আধুনিকতার কোন বিড়ম্বনা আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না সেই স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল অতীত থেকে! যত দিন এই মিনার প্রান্তর আছে, এই আকাশ আছে, এই চাঁদ আছে এবং আছে চাঁদের জোসনা তত দিন আছে অতীতের সঙ্গে আমার এই পবিত্র বন্ধন।

প্রিয় পাঠক! এবার একটি স্বপ্নের কথা শোনো। অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছিলাম মিনার ময়দানে। আমার সামনে, পিছনে এবং ডানে,বাঁয়ে ধু-ধু প্রান্তর। কোথাও না আছে কোন তাঁবু, না তাঁবুবাসী। এমন সময় দেখি, আমার সামনে একটি ...

না, থাক; হযরত বলেছিলেন, বহুত মোবারক খাব, এ খাবের কথা কাউকে বলো না। আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি।

স্বপ্নটা এখানে লিখেছিলাম, মনের সঙ্গে মুজাহাদা করে আবার তা মুছে ফেললাম। আমার আম্মা বারবার সতর্ক করে বলছেন, 'সব কথা তো কাগজে লেখার বিষয় না।' আসলে লেখার চেয়ে না লেখার জন্য যে কত বেশী শক্তির প্রয়োজন তা এ সফরনামায় বারবার আমি অনুভব করছি।

যারা লেখেন তারা জানেন, কখনো একটি শব্দের, একটি বাক্যের, কখনো একটি তথ্যের, একটি বক্তব্যের লোভ সম্বরণ করা সত্যি কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ তা সম্বরণ করার মধ্যে সুপ্ত থাকে লেখার প্রকৃত সৌন্দর্য! আমার কলমের এই সামান্য জীবনে না লেখার জন্য আফসোস করেছি কম, লেখার জন্য আফসোস করেছি এবং লজ্জা পেয়েছি অনেক বেশী। প্রসঙ্গ থেকে সরে গেলাম, তবে আশা করি, আল্লাহর কোন না কোন বান্দার উপকারে আসবে।

***

ফিরে আসি আসল প্রসঙ্গে। এগার তারিখে যোহরের পর হযরতের সঙ্গে রামী করতে রওয়ানা হলাম। হযরত বেশ ক্লান্ত ছিলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি তাঁবুতে থাকুন, আমরা আপনার পক্ষ হতে রামী করে নেবো।

আমাদের নিয়ত ছিলো ভালো. কিন্তু বুঝ ছিলো কম। আসলে অনেক সময় মনে থাকে না. ইনি হযরত হাফিজ্জী হুযূর! ইনি এ যুগের মানুষ, কিন্তু সে যুগের সত্তা! আমরা ইবাদতে শক্তি ব্যয় করি, ইনি ইবাদতে শক্তি সঞ্চয় করেন!

মনে থাকে না বলেই হযরতকে আমরা যখন ভালো কথা বলি তখনো নিজেদের মত করেই বলি। আল্লাহর শোকর, অন্তত এ অনুভূতিটুকু আমার ছিলো। তাই বুঝতে অসুবিধা হয়নি, কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং সেটাই হলো। হযরতের চোখে পানি এসে গেলো। অন্যরকম এক আবেগের উথাল-পাতাল যেন তাঁর ভিতরে শুরু হলো, তবে গলার আওয়ায ছিলো শান্ত-সংযত। তিনি শুধু জানতে চাইলেন- কী ছিলো তাঁর গলার আওয়াযে এবং মুখের অভিব্যক্তিতে, এখনো তা ভেবে অবাক হই- তিনি জানতে চাইলেন, 'আমি কি খুব বুড়া হয়ে গেছি! আমি কি তোমাদের উপর বোঝা হয়ে গেছি!'

তারপর কিছুটা তিরস্কারের স্বরে বললেন, 'মাসআলা শেখাও কেন! আমি কি মাসআলা জানি না!'

তাঁর কথায় আমাদেরও চোখে পানি এসে গেলো। কেউ কিছু বলার আগে আমি আগে বেড়ে বললাম, না দাদা! আপনি তো এই নাতির চেয়ে জোয়ান! আপনি তো আমাদের সঙ্গে যাবেন না, আমরা আপনার সঙ্গে যাবো, বরং আপনার পিছনে পিছনে যাবো।

হযরত খুশী হলেন, আমাকে আলিঙ্গন করলেন এবং কপালে চুমু খেলেন। তাতে আমার যেন কপাল খুলে গেলো।

মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিছবাহ সম্ভবত সেই পবিত্র চুম্বনের স্নিগ্ধতাটুকু গ্রহণ করার জন্য আমার কপালে চুমু খেলেন, তারপর বললেন, আপনি তো খুব চালাক মানুষ আছেন! আমরা কী বললাম, আর আপনি কী বললেন!

মৃদু হেসে বললাম, এতে অবাক হওয়ার কী আছে! আপনারা হলেন মুরীদানের ভূমিকায়, আমি নাতির ভূমিকায়!

হযরতকে খুশী করার মত কথা বলতে পেরেছি বলে মাওলানা মুমিনুল্লাহ ছাহেবও অনেক দু'আ দিলেন। এই মানুষটির কথা তেমন করে বলা হলো না। সূর্যের আলোতে চাঁদ ঢাকা পড়ে যায় যে! হজ্বের পুরো মৌসুমে তিনি যেন ছিলেন ফুলের বাগানে মধুলোভী মৌমাছি। অনেক শিক্ষণীয় আচরণ ও উচ্চারণ তাঁর কাছ থেকেও পেয়েছি। কিন্তু কবির ভাষায়-

বেলি-চামেলি সুন্দর, সুন্দর রক্তজবা/ বুলবুলি চায় শুধু গোলাবের সুবাস

আল্লাহ যদি তাওফীক দেন, ইচ্ছে আছে, তাঁর এবং আরো কতিপয় নেকবান্দার হজ্বের আমল যেমন দেখেছি কাগজ-কলমের কাছে আমানত রাখবো।

ফিরে আসি আগের প্রসঙ্গে। মানুষের ঢল বা স্রোত যাই বলি তার মাঝে আমাদের ছোট্ট কাফেলাও শামিল হয়ে গেলো। জামরামুখী জনস্রোতের গতি ছিলো প্রবল; প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষ আমাদের অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। অভূতপূর্ব এক জোশ ও জাযবা সবার মাঝে। আমরা অবশ্য চলছি ধীর গতিতে হযরতকে মাঝখানে রেখে। বিপুল চঞ্চলতার মাঝে যেন একখণ্ড অচঞ্চলতার অন্য রকম সৌন্দর্য!

যদিও হযরতের হিম্মত ও জাযবা ছিলো আমাদের জন্য অনুকরণীয়, তবু বয়সের নির্মমতাকে একদম অস্বীকার তো আর করা যায় না! কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি ক্লান্ত

হয়ে পড়লেন। কিছু বলছেন না, কিন্তু বোঝা যায়, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। তবু যে হাঁটছেন সেটা তিনি বলেই সম্ভব হচ্ছে!

মক্কায় আসার পরপর সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম, হযরতের জন্য একটি হুইলচেয়ার সংগ্রহ করার কথা, যাতে তাঁর হারাম শরীফে আসা-যাওয়ায় কষ্ট কম হয় এবং মিনা-আরাফায়ও আসানি হয়, কিন্তু বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এমনও বলেছিলাম, সম্ভব হলে আমি একাই চিন্তা করতাম; এখন আসুন, সবাই মিলে ব্যবস্থা করি। মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেব আমাকে জোরদার সমর্থন করলেন। তারও খুব বেশী সামর্থ্য ছিলো না।

জানতাম, হযরতের সঙ্গে যারা ইরান সফর করেছেন তাদের 'সঙ্গতি' ছিলো, কর্তব্যও ছিলো, কিন্তু হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা হলো না। তখন আমার খুব আফসোস হলো যে, লিবীয় দূতাবাসের দেয়া রাহাখরচ কেন গ্রহণ করিনি! আসলে আমি তো জানতাম না, এমন অবস্থা হবে, আর আমাকে তা অসহায়ভাবে দেখতে হবে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে হযরত আরো কিছু দূর হাঁটলেন; তারপর ..। তখন হযরতের ছোট ছাহেবযাদা মাওলানা আতাউল্লাহ এমন এক কাজ করলেন যা মিনার প্রান্তরে পৃথিবীর সকল সন্তানের জন্য গৌরবের ইতিহাস হয়ে থাকলো। জীবনে সুখের ও আনন্দের যত দৃশ্য দেখেছি, নিঃসন্দেহে এটি তার মাঝে অন্যতম। এমন ঘটনা আগে ও পরে হয়ত আরো কিছু ঘটেছে, কিন্তু আমার জীবনে দেখা এটাই প্রথম ঘটনা এবং হয়ত বা শেষ ঘটনা।

কাউকে কিছু না বলে এবং হযরতকেও কিছু বুঝতে না দিয়ে তিনি তার বুড়ো বাবাকে, আমাদের প্রিয় হযরতকে কোলে তুলে নিলেন এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন রামী জামরার দিকে। মনেই হলো না যে, তার কোন কষ্ট হচ্ছে। হয়ত আসমান থেকে কোন শক্তি তার উপর ভর করেছিলো; কারণ আসমানেরও তো ভালো লেগে থাকবে যমিনের উপর এবং বিশেষ করে মিনার ময়দানে এমন পবিত্র দৃশ্য অবলোকন করে। মিনার ময়দান তো ..!

আবেগের আতিশয্যে এখানে একটি উপমা লিখেছিলাম, কিন্তু ভিতর থেকে কেউ যেন আমাকে 'আদবের খেলাফ' বলে সতর্ক করলো, তাই তা মুছে ফেললাম।

এমন হয়, উচ্ছ্বাসের প্রবাহে অনেক সময় আমরা সংযম হারিয়ে ফেলি। শরিয়ত কিন্তু সর্বক্ষেত্রে আমাদেরকে সংযম শিক্ষা দেয়, এমনকি নবীপ্রশস্তিরও ক্ষেত্রে!

আমরা সবাই অবাক বিস্ময়ে এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে এ দুর্লভ দৃশ্যটি দেখছি। হযরত কিছু বলছেন না, কিন্তু তাঁর চোখের পানি ও মুখের উদ্ভাস অনেক কিছুই বলছিলো। অশ্রুর প্রতিটি ফোঁটা 'ভাগ্যবান পুত্রের' জন্য যেন একটি করে দু'আ হয়ে ঝরছিলো!

প্রিয় পাঠক, মিনার মাঠের সেই দৃশ্য সেদিনও আমাকে মুগ্ধ করেছিলো, এখনো মুগ্ধ করে, যখন কল্পনায় দেখি সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যটি। তোমার কি খুব আফসোস হচ্ছে নিজের চোখে তা দেখতে পাওনি বলে! কেন, আফসোস হবে কেন! তুমি নিজেই তো পারো তোমার বাবার চোখে, মায়ের চোখে এমন অশ্রুজল আনতে, যা দ্বারা লেখা

হতে পারে শুধু তোমার নয়, তোমার আগামী প্রজন্মেরও সৌভাগ্যের কাহিনী। যদি পারো তো চেষ্টা করো মা-বাবার চোখে এরকম অশ্রুজল আনতে এবং তাদের চোখের 'অন্যরকম' অশ্রুজল থেকে বেঁচে থাকতে। আল্লাহ তাওফীক দান করুন আমাকে, তোমাকে, আদমের প্রত্যেক পুত্রকে এবং হাওয়ার প্রতিটি কন্যাকে। আমীন।

হযরত কিছুক্ষণ পুত্রের কোলে, কিছুক্ষণ পায়ে হেঁটে, আর আমরা সেই পবিত্র দৃশ্য দেখে দেখে অবশেষে পৌঁছে গেলাম রাময়ুল জামরার স্থানে।

আগের দিন দেখার সুযোগ হয়নি, আজ দূর থেকে দেখতে পেলাম মসজিদে খায়ফ। মিনার দিনগুলোতে আমাদের পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেই অবস্থান করেছেন এবং জামাতে নামায পড়িয়েছেন। তাই মিনায় অবস্থানকালে এই মসজিদের জামাতে নামায পড়া অতি উত্তম, তবে তাঁবু যাদের দূরে এবং যাদের পথ হারিয়ে ফেলার আশংকা তাদের জন্য নয়। তারা নিজ নিজ তাঁবুতে নামায পড়লেই ভালো। মনের নিয়তের বরকতে তাঁবুর নামাযেও তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এই মসজিদে নামায পড়ার, এমনকি 'সেই জামা'আতে' শামিল হওয়ার ফযিলত দান করতে পারেন। ভাণ্ডার তো আল্লাহর! তুমি যত আকুতি ও মিনতি জানাবে তাঁর দানের ভাণ্ডারে তত জোশ আসবে। তুমি যত চাইবে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী পাবে। আল্লাহর নবী যে বলেছেন, 'তুমি চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়ে যাবে, কিন্তু তোমাদের রাব দিতে দিতে ক্লান্ত হবেন না'– এ পবিত্র বাণীর ভাব ও মর্ম কিছুটাও কি আমরা উপলব্ধি করতে পারবো না!

তবে অলসতা করা ভালো নয়; যদি সুযোগ ও সামর্থ্য হয় তাহলে মসজিদে খায়ফের জামা'আতে শামিল হওয়ার চেষ্টা করাই উত্তম।

জনতরঙ্গ গতকালের চেয়ে কম নয়, বরং বেশী। তবু আল্লাহর রহমতে হযরত নির্বিঘ্নে ছোট জামরার রামী সম্পন্ন করলেন। মসজিদে খায়ফের দিক থেকে যেটি প্রথম, তাকেই বলা হয় ছোট জামরা।

প্রতিটি জামরার সামনে পরিচয় ফলকে আরবীর পাশাপাশি উর্দু এবং ফারসিতে লেখা রয়েছে যথাক্রমে ছোটা শয়তান, দরমিয়ানা শয়তান এবং বড়া শয়তান। বড় জামরার ফারসি নাম হলো, শয়তানে বুযুর্গ। অনেক বাঙ্গালী হাজী অবাক হয়ে জানতে চান, ছোট শয়তান, মেঝো শয়তান এবং বড় শয়তান তো বুঝলাম, কিন্তু শয়তান আবার 'বুযুর্গ' হয় কীভাবে! আসলে এটা আমাদের উপমহাদেশীয় বুযুর্গ নয়, ফারসি ভাষায় বড় যে কোন কিছুকেই বলা হয় বুযুর্গ। যাক এখন অবশ্য বুযুর্গের ঝামেলা নেই। কারণ পরিচয়ফলকগুলো অপ্রয়োজনীয় মনে করে অনেক আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবু অপ্রয়োজনীয় কথাগুলো কেন যে কলমে এসে গেলো!

ছোট জামরা থেকে ফারিগ হয়ে একটু সরে এসে খালি জায়গা দেখে হযরত দাঁড়ালেন এবং কিছুক্ষণ দু'আ করলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই জামরার মাঝে দু'আ করেছেন। সুতরাং এখানে দু'আ করা সুন্নত এবং এটা দু'আ কবুল হওয়ার স্থান। কিন্তু শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের সঙ্গত তাগাদার কারণে এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াবার

সুযোগ নেই। সউদী পুলিশ অবশ্য এতই ভালো মানুষ যে, ভিড় না থাকলেও, এমনকি অল্পক'জন থাকলেও তাদের 'তাড়া' চলতেই থাকে। এই ভালোমানুষিটা তাদের সবখানেই দেখা যায় এবং তা যথেষ্ট বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে।

এরপর হযরত মধ্যবর্তী জামরার রামী সম্পন্ন করলেন এবং কিছুটা সরে এসে এখানেও দু'আ করলেন। এটাও সুন্নত। আমরা পরম সৌভাগ্য ভেবে সেই দু'আ-মুনাজাতে শরীক হলাম। আল্লাহর কাছে তাঁর চাওয়া আমরা শুনতে পাইনি এবং আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর পাওয়া দেখতে পাইনি। আমরা শুধু বলেছি, হে আল্লাহ! এই মুনাজাতের মাধ্যমে আমরা তো শুধু সাদৃশ্য গ্রহণ করলাম 'সেই মুনাজাতের'। এখন তুমি আছো, তোমার ভাণ্ডার আছে, আর আছে আমাদের 'ভাঙ্গাচুরা' ভিক্ষার পাত্র! কবির ভাষায়–

যারা তোমার দুয়ারের ভিখারী/ হাত পেতেছি তাদেরই মত/ দীনতায় হীনতায় শরমে মরি/ দানের অসীমতায় তবু নই আশাহত।

মুনাজাত শেষ হলো এবং হযরতের মুখমণ্ডলকে প্রাপ্তির উদ্ভাসে উদ্ভাসিত মনে হলো। ধীরে ধীরে তিনি তৃতীয় জামারার দিকে অগ্রসর হলেন।

এটি বড় জামরা বলে পরিচিত। গতকাল শুধু এই জামরায় রামী করা হয়েছে। আল্লাহ আল্লাহ করে এটাও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। এখানে আর দাঁড়িয়ে মুনাজাত করা নেই। আল্লাহর নবী করেননি, আমরাও করবো না। তোমার অন্তরে যদি আকুতি জাগে এখানেও একটু মুনাজাত করার, করো না। কেন করবে না, সে প্রশ্নও করো না। হজ্ব তো প্রশ্ন করার নাম নয়, শুধু আত্মসমর্পণ করার নাম! তুমি আশিক, তুমি কৃতার্থ প্রেমিক, তুমি অনুগত বান্দা। তুমি প্রশ্ন করবে না, শুধু পালন করে যাবে। প্রশ্নই যদি করবে তাহলে তুমি এখানে কেন! এখানে যিনি এসেছিলেন তিনি তো পুত্রের গলায় ছুরি বসিয়েছিলেন কোন প্রশ্ন না করে!

***

হযরতের সঙ্গে এখান থেকে আমরা মক্কা শরীফে এলাম এবং তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করলাম। আজকের তাওয়াফ হলো হজ্বের ফরয তাওয়াফ। এই ফরয তাওয়াফ গতকালই অনেকে আদায় করেছেন। অনেকে আগামীকাল আদায় করবেন। দিন-রাত চলছে তাওয়াফ। কিন্তু জনসমুদ্রে এবং ইশকের দরিয়ায় কোন ভাটা নেই, শুধু জোয়ার, আর জোয়ার! আল্লাহ না করুন, ইশকের জোয়ারে যখন ভাটা আসবে তখন তো কেয়ামত নযদিক হয়ে যাবে!

তাওয়াফের সেই বিপুল জনতরঙ্গে বিসমিল্লাহ বলে যখন শামিল হলাম তখন হৃদয়-সমুদ্রে যে তরঙ্গদোলা অনুভূত হলো তার বর্ণনা দেয়ার শক্তি এই দুর্বল কলমের কোথায়! শুধু বলতে পারি, সেই তাওয়াফ ছিলো অন্যকিছু! সেই ঘূর্ণনের স্বাদ ছিলো অনন্য! কল্পনায় শুধু ভাবতে চেষ্টা করেছি, আল্লাহর নবী মিনা থেকে মক্কায় এসেছেন দশ তারিখে যোহরের আগে এবং তাওয়াফে যিয়ারাত করেছেন অগণিত ছাহাবাকে

সঙ্গে নিয়ে। সেই তাওয়াফেরই তো ধারবাহিকতা আমাদের হযরতের আজকের এই তাওয়াফ! এখানেও সেই একই কথা, শুধু সাদৃশ্যের জন্যই যা কিছু আশা ও প্রত্যাশা! তাওয়াফ সম্পন্ন হলো। একে একে সাত প্রদক্ষিণে আমরা হয়ে পড়লাম দুর্বল, নিস্তেজ; হযরত হলেন আরো সবল, আরো সতেজ।

প্রিয় পাঠক, আমার কথাকে যদি মনে হয় অতিশয়োক্তি, তোমাকে দোষ দেবো না। তুমি তো ছিলে না সেখানে! তুমি তো দেখোনি আশি বছরের সেই বৃদ্ধকে! কাকে বলে ইশকের জোয়ানি, তা বুঝতে হলে দেখতে হবে এমন কোন বৃদ্ধকে! কিন্তু হায়, হযরতের পরে যে নেই আর কোন হযরত! নাহ, আল্লাহ মাফ করুন, ভুল বলেছি। আসলে প্রত্যেক যুগেই থাকবে সে যুগের হযরত! আমাদের শুধু তালাশ করতে হবে এবং চিনে নিতে হবে। আর মনে রাখতে হবে, তোমার হযরত হবেন তোমারই যুগের!

তাওয়াফের শেষ প্রদক্ষিণের পর মাকামে ইবরাহীম থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে হযরত তাওয়াফের দু'রাকাত আদায় করলেন। 'অনেক দূরে' বললাম আমার চোখের দেখা থেকে, কিন্তু নামাযের পর সংক্ষিপ্ত মুনাজাতেও তাঁর চোখ থেকে যেভাবে অশ্রু ঝরলো তাতে মনে হলো, দূরে থেকেও মাকামের তিনি অনেক নিকটে! আসলে দূর ও নিকটের রহস্য তো আজো উদ্ধার করতে পারেনি মানুষ! কাছে থেকেও কতজন থাকে কত দূরে, আবার দূরে থেকেও কতজন থাকে কত কাছে!

এরপর যামযাম। বহুবার বলা হয়েছে যামযামের কথা, কিন্তু যামযামের কথা বলা কি শেষ হয়েছে! যামযামের কথা বলা কি শেষ হবে! যামযামের পানি কি শেষ হয়েছে! যামযামের পানি কি শেষ হবে! যত দিন আছে পিপাসা তত দিন আছে যামযাম! শুধু প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ, চিরকাল যেন থাকে আমাদের পিপাসা এবং যামযামের তৃপ্তি! চিরকাল যেন থাকে তোমার দানের প্রবাহ এবং আমাদের প্রাপ্তি!

হযরতের অনুগমন করে সিঁড়ি বেয়ে আমরা নীচে নামলাম, কাছে গেলাম এবং দেখলাম যামযামের পানির আগে হযরতের চোখের পানি! যামযামের পাড়ে দাঁড়িয়ে এভাবে কাঁদতে হয়, এভাবে কেউ কাঁদতে পারে, জানতাম না! কে জানে কী রহস্য হৃদয় থেকে উৎসারিত এ ঝর্নধারার! ইচ্ছে হলো, এ পানির স্বাদ একটু চেখে দেখি! কেমন লাগে জিহ্বায় যামযামের প্রেমিকের চোখের পানি!

তিনি আগে নিজে পান করলেন না; মায়ের মত মমতায় আগে আমাদের পান করালেন, তারপর নিজে পান করলেন।

প্রিয় পাঠক! যদি পারো, আল্লাহর কোন প্রেমিক বান্দার হাতে যামযামের পানি পান করে দেখো, এত স্বাদের যামযাম তখন হয়ে যায় আরো স্বাদের যামযাম! কত বছর হলো, জীবনের কত কিছুর কত পরিবর্তন হলো, কিন্তু সেই স্বাদ এখনো আমি ভুলিনি! যামযামের পানিতে ঠোঁট ভেজালে এখনো তা অনুভব করি! আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি, (ইনশাআল্লাহ) হযরত যখন আলকাউছারের পানি পান করবেন, তখন তাঁর যেন মনে পড়ে তাদের কথা, যামযামের পাড়ে যারা ছিলো তাঁর সঙ্গে! আমীন।

শিক্ষা এখানেও একটা ছিলো আমাদের জন্য! বয়স্ক, তবে হযরতের চেয়ে অনেক কম। জানি না কোন দেশের হাজী, যামযামের পাড়ে হযরতের সঙ্গে একটি 'অপ্রয়োজনীয়' আচরণ করে বসলেন। আমরা তো সবাই থ! হঠাৎ একি হলো! এমন ঘটনাও সম্ভব! কিন্তু হযরত! যেন সত্যি সত্যি বড় কোন অন্যায় হয়ে গেছে, এভাবে কাকুতি মিনতি করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

আসলে হযরত আমাদের শিক্ষা দিলেন, আনানিয়াত ও আমিত্বকে ফানা করার শিক্ষা! কিন্তু এত বড় শিক্ষা এত সহজে পাওয়া গেলে তার মূল্য কমে যায়। তাই তো অনেক কিছু দেখেও আমরা মূল্য বুঝিনি, না হযরতের, না তাঁর শিক্ষার। এখন ভাবি, তাঁর সঙ্গ ও সাহচর্যের জন্য যদি বেছে নেয়া হতো অন্যরকম কিছু মানুষ! এবং আশ্চর্য! ঠিক একথাটাই হজ্বের সফরে এক প্রসঙ্গে হযরত বলেছিলেন তাঁর সময়ের ছদর ছাহেব সম্পর্কে। আর নিজের সম্পর্কে! নূরিয়ায় শিক্ষকদের মজলিসে অনেক বার তিনি বলেছেন–

'হাকীমুল উম্মত (রহ) বলতেন, তোম লোগোঁনে মুঝে পাঁহচানা নেহী, কিন্তু নিজের সম্পর্কে এই কথা বলতে আমার শরম লাগে।'

হযরতের এ মন্তব্য যারা শুনেছেন তাদের অনেকে এখনো জীবিত আছেন।

হযরতের শরম লাগতো, তবে এটাই ছিলো তিক্ত সত্য; খুব কম মানুষ তাঁকে চিনতে পেরেছেন এবং আরো কম মানুষ তাঁর কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছেন।

সেদিন মাতাফে দাঁড়িয়ে হযরতকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লোকটা এমন অন্যায় আচরণ করলো, অথচ আপনার ...

তিনি বাধা দিয়ে বললেন, তুমি যদি মনে করো, হয়ত তোমার সামনের মানুষটি জান্নাতী তাহলে তো তার প্রতি নারায না হয়ে তাকে তুমি খুশী করারই কোশিশ করবে!

সুবহানাল্লাহ! যারা জান্নাতী, হয়ত তারাই শুধু ভাবতে পারেন এমন জান্নাতী ভাবনা!

রাত যাপনের জন্য হযরতের সঙ্গে আমরা আবার ফিরে এলাম মিনায়। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে যিয়ারাতের পর রাত যাপনের জন্য মিনায় ফিরে এসেছিলেন।

যাদের ওযর আছে তাদের কথা ভিন্ন, কিন্তু অনেকেই বিনা ওযরে শুধু আরাম ও অলসতার কারণে মক্কায় রাত যাপন করে, আর দিনে গিয়ে রামী করে আসে। এটা বড় অন্যায়।

মিনায় ফেরার পথে হযরত আমাকে বলেছিলেন, মওলভী আবু তাহের! আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুহাব্বাত করি। আমার মউতের পরে তুমি যখন আল্লাহর ঘরে আসবা তখন আমার নামে তাওয়াফ করবা।

বুড়ো মানুষটির এ আব্‌দার আমি রক্ষা করেছি। যখনই বাইতুল্লাহর যিয়ারাত নছীব হয় তাঁর নামে অবশ্যই তাওয়াফ করি।

প্রিয় পাঠক, আমার মউতের পর তুমি যদি আল্লাহর ঘর যিয়ারাত করো, আর আমার জন্য তাওয়াফ করো তাহলে আল্লাহ যেন তোমার সব গোনাহ মাফ করে দেন, হাশরের মাঠে তোমার পিপাসা যেন তিনি দূর করে দেন, আমীন।

বার তারিখে ফজরের পর আমি ও মাওলানা মিছবাহ, তাঁবু থেকে কিছু দূরে বড় যে পাহাড়, সেটার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পবিত্র ভূমিতে জীবনের প্রথম পর্বত-আরোহণ! অনভিজ্ঞদের কাছে দূর থেকে মনে হয়, পর্বত-আরোহণ এমন কী আর কঠিন! তরতর করে উঠে যাবো, কিন্তু উঠতে গিয়ে দেখা গেলো, শরীর রীতিমত 'তরতর' করছে এবং দরদর করে ঘাম ঝরছে! কখনো বড় কোন পাথরখণ্ড পথ রোধ করে দাঁড়ায়, তাই ঘুরে যেতে হয়; কখনো এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফিয়ে যেতে হয়; কখনো ভয়ে বুক কাঁপে, এই বুঝি পা পিছলে পড়ে গেলাম, আর শরীরটা একেবারে থেতলে গেলো! কিন্তু যৌবনের যা ধর্ম, ভয়ের মাঝেও অজানা একটি রোমাঞ্চ সর্বসত্তাকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখলো। ভীতি ও ক্লান্তি উপেক্ষা করে একটু একটু করে উপরে উঠতে লাগলাম। একসময় দেখি, হাঁটু ভেঙ্গে আসছে; এবার একটু জিরিয়ে নিতে হয়। এখন এই পঞ্চাশোর্ধ বয়সে বলতে লজ্জা করে, কিন্তু তখন সত্যি সত্যি আমি ছিলাম টগবগে এক যুবক! তাই ক্লান্তি আমাকে ততটা কাবু করতে পারেনি, কিন্তু যৌবনের শেষ প্রান্তের মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিছবাহর হলো নাজেহাল অবস্থা। আগে বুঝতে পারলে হয়ত তিনি এ সাহস করতেন না।

চূড়া এখনো অনেক উপরে, তবু যত দূর উঠেছি সেখান থেকে সমগ্র মিনাভূমি দেখা যায়, বিশাল প্রান্তর উঁচু-নীচু ঢেউয়ের মত। তাঁবু আর তাঁবু! যেন তাঁবুর বিশাল রাজ্য! এত উঁচু থেকে সাদা তাঁবুর সারিগুলো দেখতে বড় সুন্দর! যেন ছেলে-মেয়েদের ছোট ছোট খেলনাঘর! মানুষগুলো যেন এ যুগের এবং এ জগতের নয়, অন্য কোন যুগের, অন্য কোন জগতের!

মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিছবাহ বললেন, আমি আর পারবো না, এখান থেকেই নেমে যাবো। কিছুক্ষণ আমরা সেখানে বিশ্রাম নিলাম এবং কথা বললাম, নানান কথা; হজ্বের অনুভূতির কথা, সে যুগের এবং এ যুগের হজ্বের পার্থক্যের কথা। হযরতের তাওবার রাজনীতির এবং আমাদের ভবিষ্যতের কথা। তাঁর এ মন্তব্য এখনো মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন–

'অন্য দেশের কথা জানি না, আমাদের দেশে তো হযরত হাফেজ্জী হুযূর একজনই। তিনি এখন জাতির একমাত্র অভিভাবক। তাঁর অবর্তমানে জাতি সত্যিকার অর্থেই হয়ে পড়বে অভিভাবকহীন, এতীম। কোথায় তাঁর শূন্যস্থান কিছুটা হলেও পূরণ করার মত ব্যক্তিত্ব?! জাতির দুর্যোগে পথ দেখাতে পারেন, অভিভাবকের উচ্চ আসন থেকে উপদেশ দিতে পারেন, প্রয়োজনে তিরস্কার করতে পারেন এমন দ্বিতীয় আর কে আছেন?! তখন আমাদের কী অবস্থা হবে?! কার হাত ধরে আমরা পথ চলবো?!

বড় তিক্ত প্রশ্ন এবং জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা; উত্তর তারও জানা নেই, আমারও না। তাই সেই নির্জন পাহাড়ে অনেক্ষণ আমরা চুপচাপ বসে ছিলাম।

তিনি আরো বলেছিলেন, এ তো পরের কথা, আমি কিন্তু এখনই ফেতনার কালো থাবা দেখতে পাচ্ছি!

তিনি কোন ফেতনার কথা বলছেন, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিলো না। আমি বললাম, আসলে রাজনীতির পথ বড় পিচ্ছিল। সে পথে চলার যোগ্যতা আমাদের এখনো হয়নি। এ জন্য যে প্রশিক্ষণ, তারবিয়াত ও মোজাহাদার প্রয়োজন তা আমাদের নেই। সম্ভবত পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ না করেই আমরা মাঠে নেমে পড়েছি। রাজনীতিতে লোভ আছে, প্রলোভন আছে; আছে প্রতারণার বিভিন্ন রকম জাল। হযরত পর্যন্ত তো ঠিক আছে; তারপর? আমার তো মনে হয়, হযরত নিজেও এখন নিঃসঙ্গ বোধ করছেন। তিনি তো তাঁর জিহাদের আজর আল্লাহর কাছে পেয়ে যাবেন, দুর্গতি যা হবে, পরবর্তীদের।

আমি জানি, মিনার নির্জন পর্বতে এটা ছিলো আমাদের নিষ্ফল আলোচনা, তবু মনে হলো, লিখে রাখি কাগজের পাতায়।

হজ্বের সফর থেকে ফেরার পর সেই ফেতনা এমন অন্ধকার ঝড় হয়ে এসেছিলো যে, সবকিছু উড়ে গিয়েছিলো খড়কুটোর মত। হযরত শুধু দাঁড়িয়ে ছিলেন নিঃসঙ্গ। কেউ করেছে চালাকি, কেউ বোকামি; দু'টোরই দায় বহন করতে হয়েছে বুড়ো মানুষটিকে। সামান্য দয়া করেনি একজন বৃদ্ধের প্রতি কেউ; না যারা দূরের, না যারা কাছের!

মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিছবাহ সেখান থেকে নেমে গেলেন, পানির বোতলটা আমি রেখে দিলাম। উপর থেকে তার নেমে যাওয়া দেখতে থাকলাম। উপরে ওঠা কত কঠিন এবং নেমে যাওয়া কত সহজ! হয়ত এ জন্যই আমরা শুধু নামছি আর নামছি, উপরে ওঠার চেষ্টা করছি না।

মিনার পাহাড়ে আমি এখন একা। এ নিঃসঙ্গতা বড় ভালো লাগলো। নিঃসঙ্গতা সবসময় ভালো লাগে। পাহাড় বেয়ে বেয়ে আরো উপরে উঠলাম। চূড়ার প্রায় কাছাকাছি এসে দম ফুরিয়ে গেলো। তাছাড়া আর উপরে ওঠার উপায়ও নেই। চূড়া একেবারে খাড়া। জানি না, এখানে এর আগে আর কোন মানুষ এসেছিলো কি না! হয়ত সত্য নয়, তবু ভাবতে ভালো লাগলো, এখানে এই পাহাড়ের নির্জনতায় আমিই প্রথম মানুষ!

চারদিকে অসীম নির্জনতা। নীচের কোলাহল এখান থেকে কিছুই শোনা যায় না। কোথাও কোন শব্দ নেই। তবে বড় মধুর নৈশব্দ! জীবনে অনেক নির্জনতার মাঝে আমি সময় যাপন করেছি; নদীর নির্জনতা, প্রান্তরের নির্জনতা, অরণ্যের নির্জনতা; এবং প্রতিটি নির্জনতা থেকে আমি প্রশান্তি লাভ করেছি। কিন্তু পর্বতের নির্জনতা যে এমন ভাবগম্ভীর ও রহস্যময় তা জানা ছিলো না। আমি মুগ্ধ হলাম, অভিভূত হলাম। ইচ্ছে হলো, পবিত্র ভূমির পর্বতের এ নিঝুম নির্জনতায় হারিয়ে যাই, সারা জীবনের জন্য হারিয়ে যাই। এভাবে যারা হারিয়ে যায় তারাই তো পথ খুঁজে পায়!

সেদিন মিনার সেই পর্বতে অনেক্ষণ বসেছিলাম নৈশব্দের মাঝে এবং ডুবে ছিলাম নির্জনতার সাগরে। কত হাজার বছরের প্রাচীন মিনার এই পাহাড়!

তুমি কি কথা বলতে পারো হে পাহাড়! তুমি কি দেখেছিলে মিনা প্রান্তরে চার হাজার বছর আগের সেই অনন্য ঘটনা! প্রিয় পুত্রকে আল্লাহর নামে কোরবানি করার উদ্দেশ্যে এখানেই তো এসেছিলেন আল্লাহর খলীল সেদিন! তুমি কি দেখেছিলে পিতাকে পুত্রের গলায় ছুরি চালাতে আল্লাহু আকবার বলে!

তুমি কি দেখেছিলে আল্লাহর নবী ও তাঁর প্রিয় ছাহাবাদের এখানে এই প্রান্তরে!

হে নিস্প্রাণ প্রস্তর! হে নির্বাক পর্বত! তুমি কি আমার প্রশ্ন শুনতে পাও? তুমি কি কথা বলতে পারো? হয়ত পারো, হয়ত তুমি কথা বলো, কিন্তু আমি মানুষ তোমার কথা শুনতে পাই না; তোমার ভাষা বুঝতে পারি না। হায়, তোমার সঙ্গে যদি আমার বন্ধুত্ব হতো! তোমার কোলে যদি আমার একটু আশ্রয় হতো!

এতো কালো কেন পাহাড়ের পাথরগুলো! কি পাহাড়ও ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হয়, কোন ব্যথায়, কোন বেদনায়!

কিসের ব্যথা! কিসের বেদনা! কোরবানির শিক্ষা ভুলে যাওয়ার! প্রেম ও ভালোবাসার দীক্ষা বিস্মৃত হওয়ার!

এখানে কি আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়? এখন যদি মুষলধারে বৃষ্টি হতো! বৃষ্টি তো সবকিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়; আমার সকল পাপ ও পঙ্কিলতা তাহলে কি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যেতো বৃষ্টির পানিতে?

আকাশের দিকে তাকালাম, না কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। স্বচ্ছ নীল আকাশ। এখন যদি রাত হতো, পূর্ণিমার চাঁদ হতো, ফকফকে জোসনা হতো, কত ভালো হতো! আমার হৃদয়সাগরে আনন্দের কেমন ঢেউ-তরঙ্গ জাগতো!

হঠাৎ একটি দৃশ্য দেখে অবাক হলাম। একটি ক্ষুদ্র পোকা পাথরের গা বেয়ে বেয়ে উপরে উঠছে; আশ্চর্য! এখানেও তাহলে প্রাণ আছে! আমি ছাড়া আরো প্রাণী আছে! পোকাটির জন্ম কি এখানে এই পাহাড়ের কোলে! এখানেও কি জন্ম আছে, মৃত্যু আছে! জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে জীবন এবং জীবনের প্রয়োজন আছে! এই পোকাটিরও নিশ্চয় রিযিক আছে! আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে, রিযিকদাতা কীভাবে এখানে পাহাড়ের চূড়ায় এই ক্ষুদ্র প্রাণীর রিযিক পৌঁছে দেন!

সূর্য পাহাড়ের মাথার উপর উঠে এসেছে। এখন আমাকে 'অবতরণ' করতে হবে। পর্বতের নৈশব্দ ও নির্জনতার মায়া ত্যাগ করে আবার আমাকে যেতে হবে মানুষের কোলাহলের মাঝে। অবশ্য এই পর্বতের নির্জনতা যেমন মধুর তেমনি মিনা প্রান্তরের কোলাহলও আনন্দমধুর! কারণ এ কোলাহল আল্লাহর মেহমানদের কোলাহল! তবু মন আমার বড় বিষণ্ন হলো পর্বতের সঙ্গ ছেড়ে নেমে যেতে। আর কি কখনো আসা হবে এখানে আমার, কিংবা আমার রক্ত ধারণকারী কোন উত্তর পুরুষের!

বিদায় হে প্রিয় পর্বত, বিদায়! শুধু এই মিনতিটুকু জানাই, আমাকে মনে রেখো; তোমার অসীম নির্জনতার মাঝে আমার কয়েকটি শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ তুমি মনে রেখো। তুমি সাক্ষ্য দিও, এখানে আমি এসেছিলাম, এখানে আমি দু'ফোঁটা চোখের পানি ফেলেছিলাম!

ধীরে ধীরে অবতরণ করলাম সেই নাম না জানা পর্বত থেকে, সেখানে কিছু স্মৃতি রেখে এবং কিছু স্মৃতি বুকে নিয়ে।

নিজের ক্ষেত্রেও একই অভিজ্ঞতা হলো; উপরে ওঠা কত কঠিন! নীচে নামা কত সহজ! জীবনভর আমি যেন সাধনা করে যেতে পারি উপরে ওঠার, সকল নীচতা ও ক্ষুদ্রতা থেকে। যারা উপরে ওঠে আমি যেন তাদের সঙ্গে থাকি, যারা নীচে নামে আমি যেন তাদের সঙ্গ বর্জন করি।

***

দ্বিতীয় দিন কোরবানি করে এসে জনাব আখতার ফারূক ছাহেব বেশ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। তিনি রসপ্রিয় মানুষ। যেমন পারেন রস আহরণ করতে তেমনি পারেন বিতরণ করতে; যেমন মক্কা-মদীনায় তেমনি মিনা-আরাফায়। যতটা পারেন হাসতে, প্রায় ততটা পারেন হাসাতে। অবশ্য হযরতের অগোচরে। তবু দু'একবার তাকে মৃদু তিরস্কার হযম করতে হয়েছে। একবার হযরত বলেছিলেন, ভাই, হাঁসি-মাযাক কে লিয়ে তো পুরী যিন্দেগী পড়ী হ্যায়; ইয়ে তো রোনে কা মাকাম হ্যায়।

তো আখতার ফারূক ছাহেব বললেন, 'কোরবানি করেছি অর্ধেকটা, কিন্তু কোরবানি হয়ে গেছি পুরোটা।'

কথাটা বলে তিনি হাসলেন যদ্দুর, অন্যরা হাসলো তার অর্ধেক। আমিও রাজী ছিলাম তাদের হাসিতে যোগ দিতে, কিন্তু হাসির কারণটা তো বুঝতে হবে! তাই জিজ্ঞাসা করলাম, ঘটনা কী?

তিনি বললেন, এ তো আর দুম্বা ছিলো না, ছিলো আস্ত গরু। গলায় ছুরি চালালাম, অর্ধেকটা কাটা হলো, অমনি খেলাম এক লাথি। গিয়ে পড়লাম মড়া-পচা আরেক গরুর গায়ে। এরপর ছুরি হাতে নিলো সেই বেদুঈনের বাচ্চা, যে কিনা আগেই আমাকে জবাই করেছিলো অতিরিক্ত একশ রিয়াল খসিয়ে।

বুঝলাম, তিনি গরু জবাই করেছেন অর্ধেকটা, আর গরুওয়ালা তাকে জবাই করেছে পুরোটা।

এরপর তার বক্তব্য হলো, 'অন্তত পঞ্চাশ লাখ পশু 'জবাই' হচ্ছে, যার অর্থমূল্য কয়েকশ কোটি রিয়াল। তাহলে কত শত টন গোশতের অপচয় হবে! তার চেয়ে যদি পরিকল্পিত উপায়ে গোশত আহরণ করে আমাদের মত গরীব দেশে বিতরণ করা হতো, কত উপকার হতো!'

আমি মৃদু হেসে বললাম, একে তো একশ রিয়াল, তার উপর গরুর লাথি! ব্যথা বলুন, কষ্ট বলুন, কিছুটা হতেই পারে, তাই বলে কোরবানিতে অপচয় হবে কেন! ফসলের জন্য মাটিতে ফেলা বীজ কি অপচয়? মিনার কোরবানি তো সেই বীজ আল্লাহর হুকুম মেনে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য! কোরবানি কবুল হলে তো উম্মতের রিযিকে বরকত হবে! পক্ষান্তরে কোরবানি ভুলে আমরা যদি গোশতের ফিকিরে লেগে যাই, আর আল্লাহ রিযিক সংকীর্ণ করে দেন!

তাছাড়া এ 'অপচয়' তো চলেই আসছে! আল্লাহর নবীর যামানায় কি গরীব মিসকীন ছিলো না? তিনি কি আহরণ ও বিতরণের চিন্তা করেছিলেন?

আখতার ফারূক ছাহেব, তখন মনে হলো, আমার বক্তব্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছেন।

আসল কথা, বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা ও প্রবণতা আমাদের মনমানসকে এমনই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেও চলে আসে জাগতিক লাভলোকসানের মানদণ্ড। তাই নামাযের মাঝে সন্ধান করি শরীরচর্চার উপকারিতা; রোযার মাঝে তালাশ করি স্বাস্থ্যগত সুফল; যাকাতের মাঝে শুরু করি অর্থনৈতিক গবেষণা, আর বেচারা হজ্ব তো এখন লাভজনক পর্যটন! যাদের বুদ্ধি উর্বর তারা অবশ্য বলেন, হজ্ব হলো বার্ষিক বিশ্বমুসলিম সম্মেলন।

হয়ত এসব জাগতিক উপকার ইবাদতের মাঝে রয়েছে; হয়ত রয়েছে আমাদের অজানা আরো অসংখ্য উপকার । কিন্তু এগুলো তো গৌণ, অথচ এগুলোই যেন এখন মুখ্য!

আমরা ভুলে যাই যে, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্ব, এগুলো হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ ও বুনিয়াদ। ইবাদতের রূহ ও প্রাণ হলো আবদিয়াত ও দাসত্ব এবং আল্লাহ ও বান্দার মাঝে প্রেম ও মুহব্বতের সম্পর্ক এবং আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের আকুতি; সর্বোপরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে ঘোষিত আজর ও পুরস্কারের বিশ্বাস।

এটাই হলো ইসলামের ইবাদত-ব্যবস্থার প্রকৃতি। ইবাদতের নববী আকৃতি যেমন অটুট রাখা জরুরি তেমনি তার প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখাও অপরিহার্য। কিন্তু আফসোস, কিছু চালাক দুশমন এবং বহু নাদান দোস্ত আজ উঠে পড়ে লেগেছে ইবাদতের রূহ ও হাকীকতকে বিকৃত করার কাজে। অবশ্য আল্লাহর দ্বীন কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ নিজেই হিফাযত করবেন, এটা স্বয়ং আল্লাহর ওয়াদা।

জনাব আখতার ফারূক ছাহেবকে সেদিন আরো বলেছিলাম, আপনি যাকে ভালোবাসেন, যার সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টির জন্য আপনি ব্যাকুল সেই প্রেমাস্পদ যদি আপনাকে বলেন, আমার সঙ্গে মিলনের জন্য প্রতিদিন পাঁচবার তুমি আমার কাছে এসো।

আপনি গেলেন; তারপর বলতে লাগলেন, এতে আমার চমৎকার শরীরচর্চা হচ্ছে। (কিংবা একমাসের উপবাসে পাকস্থলীর যথেষ্ট উপকার হচ্ছে) তাহলে? তাহলে কি অপদার্থ প্রেমিক বলে আপনাকে তিনি খারিজ করে দেবেন না?

তারপর ধরুন, প্রেমাস্পদ বললেন, তুমি মুহব্বতের পরীক্ষা দাও আমার নামে একটি পশু কোরবানি করে। আপনি বললেন, কোরবানি তো হবে, কিন্তু গোশতের অপচয়? তো এ পরীক্ষার ফল কী দাঁড়বে?

তাছাড়া আপনি আজ গোশতের অপচয়ে পেরেশান, কাল যখন আপনার শত্রু বলবে, পশুহত্যা হচ্ছে নিষ্ঠুরতা, তখন?

আসলে যুক্তি ও বুদ্ধি সর্বদা প্রেম ও ভক্তির শূন্যস্থান পূরণ করে। কিন্তু বান্দার কাছ থেকে আল্লাহ তো যুক্তি ও বুদ্ধির ইবাদত চান না, তিনি তো চান আবদিয়াত ও দাসত্বের, প্রেম ও মুহব্বতের এবং আনুগত্য ও আত্মনিবেদনের ইবাদত।

***

বার তারিখে দুপুরের পর হযরতের সঙ্গে রওয়ানা হলাম রামী জামারার উদ্দেশ্যে। এগার ও বার তারীখের রামী হলো বাধ্যতামূলক, ওয়াজিব। পক্ষান্তরে তের তারিখের রামী হলো ঐচ্ছিক (এবং সুন্নত)। তবে প্রায় সকল হাজী বার তারিখের রামী করেই মক্কায় চলে যান। বার তারিখের সন্ধ্যায় মিনা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। অথচ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের তারিখে মিনায় রাত যাপন করেছেন এবং পরবর্তী দিন রামী করে মক্কায় ফিরেছেন। (মাযূর ব্যক্তি ছাড়া) ছাহাবা কেরাম সকলেই তাঁর সঙ্গে মিনায় অবস্থান করেছেন। মিনার প্রান্তর সেদিন এমন জনশূন্য হয়ে পড়েনি। সুতরাং ঐচ্ছিক হলেও যে অল্প ক'জন তের তারিখে মিনায় রাত যাপন করেন এবং পরবর্তী দিন রামী করেন তারা উত্তম কাজই করেন।

হযরত আজ বেশ সতেজ ছিলেন এবং পুরো পথ হেঁটেই অতিক্রম করেছেন। তবে ভিড়ের চাপ ছিলো অকল্পনীয়।

জামরায় বার তারিখের ভিড় হয় প্রচণ্ড, শুনেছি; সেটা যে কত প্রচণ্ড তা আজ প্রতক্ষ করলাম। যাকে বলে ভিড়ের চাপে পিষ্ট হওয়া তেমন অবস্থা কয়েকবারই হলো। জামরার প্রবেশমুখের কাছাকাছি এসে তো আমি বিচ্ছিন্নই হয়ে পড়লাম। কোনভাবেই আর হযরত বা তাঁর অনুগামীদের হদিস পেলাম না। ভীষণ পেরেশান অবস্থায় একপাশে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম, তারপর বিষণ্ন মনে একাই রামীর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলাম।

হযরত দোতালার পরিবর্তে নীচ দিয়ে রামী করা পছন্দ করেন। কেন করেন জানি না। দশ ও এগার তারিখে হযরতের সঙ্গে নীচে দিয়েই রামী করেছি। আজ ভাবলাম, উপর দিয়ে করি। মুক্ত আকাশ ও মুক্ত বাতাসে রামী করতে মনে হলো ভালোই লাগবে; নতুন অভিজ্ঞতাও হবে। এবং জীবনের ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতা হলো, যা মনে পড়লে এখনো বুক কেঁপে ওঠে। সেদিন যে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলাম, তা শুধু তাকদীরের দয়ায়।

উপরে উঠেই আটকা পড়ে গেলাম প্রচণ্ড ভিড়ের দ্বিমুখী চাপে। অর্থাৎ একদল রামী করতে যাচ্ছে, আরেকদল রামী করে ফিরছে একই পথে এবং দু'দিক থেকেই পিষে ফেলার মত চাপ। মনে হলো মানুষের মাঝে নয়, আমি চাপা পড়েছি দু'দিকের শক্ত দুই পাথরের মাঝখানে। শাব্দিক অর্থেই তখন আমার দম বন্ধ হওয়ার অবস্থা! পিছনে ফিরে আসার কথা হয়ত কল্পনা করা যায়, কিন্তু বাস্তবে তা আর সম্ভব নয়। জীবনে এই দ্বিতীয়বার মৃত্যুর শীতল স্পর্শ আমি অনুভব করলাম এবং সত্যি সত্যি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। মুখে কালিমা শরীফ জারি হয়ে গেলো। স্মরণ করতে চেষ্টা

করলাম হজ্বের সফরে মৃত্যুর কী ফযিলত হাদীছ শরীফে এসেছে! হে আল্লাহ, মৃত্যুর কষ্ট থেকে হেফাযত করো এবং ঈমানের সঙ্গে, আসানির সঙ্গে খাতেমা করো।

মনে হলো, আমি যখন পড়ে যাবো, হাজার হাজার হাজীর পদতলে আমার দেহ এমনভাবে পিষ্ট হবে যে, চেনার কোন উপায় থাকবে না।

এ অবস্থা আমার একার নয়, নাইজিরিয়ান পুরুষ ও মহিলাদের ছাড়া আর সবার প্রায় একই অবস্থা। ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসীর সে এক করুণ দৃশ্য! তবে সেটা কেয়ামতের ইয়া নাফসী ছিলো না। কারণ, দেখতে পেলাম, হতভাগিনী এক মা, হঠাৎ তার কোলের সন্তান কোল থেকে ছুটে গেলো এবং পড়ে গেলো! আর হতভাগিনী মা 'মেরী বাচ্চী! মেরী বাচ্চী' বলে কলিজার টুকরোকে তুলে নেয়ার চেষ্টা করলো এবং .. এবং নিজেও পড়ে গেলো।

যা ঘটার ঘটে গেলো চোখের পলকে এবং একেবারে চোখের সামনে! যাদের পদতলে পিষ্ট হলো হতভাগিনী মা ও তার শিশুসন্তান তাদেরও তখন কিছু করার ছিলো না।

আজ মনে হয়, হতভাগিনী মায়ের ঐ মর্মান্তিক মৃত্যুই তার জন্য ভালো ছিলো। কারণ যদি সে বেঁচে যেতো তাহলে সন্তানের শোকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিদিন তার মৃত্যু হতো, কিংবা হয়ত পাগলিনী হয়ে জীবন-মৃত্যুর অনুভবের ঊর্ধ্বে চলে যেতো।

মায়েরা এমনই হয়! আমার মা, তোমার মা, সকলের মা! কেয়ামতের ভয়াবহতা ছাড়া অন্য কিছু মায়ের মমতাকে পরাস্ত করতে পারে না, মৃত্যুভয়ও না। সেই মা বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের হাতে কত নিগ্রহ ভোগ করে! এক মায়ের কথা জানি, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে তিনি তার শিশুপুত্রকে রক্ষা করেছিলেন। সারা শরীর ঝলসে গিয়েছিলো বীভৎসরূপে। সেই পুত্র এখন সেই মাকে ...। হায়রে মা! হায়রে সন্তান!

রামীর সময় উন্মুক্ত আকাশ এবং খোলা বাতাস চেয়েছিলাম, তাই নীচের পরিবর্তে উপরে এসেছিলাম, এখন মনে হলো, পৃথিবীতে কোথাও কোন বাতাস নেই। দম বন্ধ হয়ে এখনই বুঝি মারা যাবো! এমন সময় গায়বি কুদরতে যেন একটু ফাঁক হলো এবং আমি রাজ্যের বাতাস পেলাম শ্বাস নেয়ার জন্য। বাতাস তাহলে এত মূল্যবান! বাতাস তাহলে এত বড় নেয়ামত! আমরা যখন আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হই তখন কি এই বাতাসেই শ্বাস গ্রহণ করি!

শ্বাস নিতে পেরে তো বেঁচে গেলাম, কিন্তু দেখা দিলো 'ছোট্ট' একটি বিপদ। আমার চোখের চশমাটি যে এতক্ষণ নাকের ডগায় বহাল ছিলো সেটাই তো আশ্চর্য! এবার তা ছিটকে পড়ে গেলো এবং আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চশমাটা হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলাম এবং পড়ে যেতে যেতেও বেঁচে গেলাম। বেঁচে গেলাম শুধু এজন্য যে, সেটা আমার মৃত্যুর নির্ধারিত সময় ছিলো না। নির্ধারিত সময় ছাড়া মৃত্যু আসে না, এক মুহূর্ত আগেও না, পরেও না। মৃত্যুর যখন সময় হয়, জীবনরক্ষার সকল ব্যবস্থা তখন অকার্যকর হয়ে পড়ে, সকল প্রচেষ্টা তখন মুখ থুবড়ে পড়ে।

إِنَّ الْمَنَايَا لَا تَطِيشُ سِهَامُهَا (মৃত্যুর তীর যখন ছুটে আসে তখন তা লক্ষ্যচ্যুত হয় না।)

কিন্তু মৃত্যুর সময় না হলে একেবারে অরক্ষণীয় অবস্থায়ও মানুষ বেঁচে যায়। ছুটে আসা তীর মাথার চুল ছুঁই ছুঁই করে চলে যায়। মৃত্যুর তীর ছুটে এসেছিলো ঐ হতভাগিনী মাকে লক্ষ্য করে এবং তা লক্ষ্যচ্যুত হয়নি, অথচ আমার মাথার চুল ছুঁই ছুঁই করে পার হয়ে গেলো।

এটা যদি হয় বিশ্বাস তাহলে কি মৃত্যুর ভয়ে কোন মুমিন সত্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে?! তবু হয়, কারণ বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ের গভীরে নয়, বিশ্বাস আমাদের দুই ঠোঁটের মাঝে।

***

চশমা হারিয়ে আমার চোখের সামনে যেন অন্ধকার নেমে এলো । চশমা ছাড়া আমি, বলতে কষ্ট হলেও, প্রায় ... ।

কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না; সবকিছু আবছা, সবকিছু ঝাপসা! তবে যেহেতু আমাকে এখন চলতে হচ্ছে না, শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে সেহেতু আপাতত তেমন কোন সমস্যা হলো না। দেখে দেখে এবং না দেখে দেখে একসময় পৌঁছে গেলাম প্রথম জামারার কাছে। সামনের স্তম্ভটি দেখতে পেলাম অস্পষ্ট। তবু রামী করতে অসুবিধা হলো না। পরের দু'টি রামীও সম্পন্ন হলো নির্বিঘ্নে।

হযরতের ইচ্ছাকে 'অমান্য' আমি এখন উপযুক্ত মাশুল আদায় করছি, কিন্তু শিক্ষা কি আমার হবে?! হয়ত এ ভুল আবার হবে। একই ভুল আমাদের বারবার হয়; ঠিক সময়ে বুদ্ধি-বিবেচনা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। শুধু আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন সে-ই রক্ষা পায়, আর আল্লাহ তাকেই রক্ষা করেন যে প্রার্থনা করে। কিন্তু আমরা যে প্রার্থনা করতে জানি না! প্রার্থনায় বিশ্বাসই বা করি ক'জন!

সেদিন বড় অসহায় অবস্থায় প্রার্থনা করেছিলাম, 'হে আল্লাহ! আমি দেখি না, তুমি তো দেখো! তুমি তোমার খাছ কুদরত দ্বারা আমাকে আমার মানযিলে পৌঁছে দাও।'

কঠিন সংকটের সময় তোমার ভিতরে যে 'তুমি' আছে, সে তোমাকে আওয়ায দেয় এবং পথ বলে দেয়, কিন্তু তুমি, আমি– আমরা আমাদের ভিতরের 'আমি'কে গুরুত্ব দেই না। অথচ ভিতরের সেই আমিই প্রকৃত আমি, ভিতরের সেই তুমিই প্রকৃত তুমি। বাইরের যে আমি এবং তুমি সেটা শুধু ভিতরের আমি এবং তুমি-এর খাঁচা। সেদিন মিনার ময়দানে জামরার সামনে একান্ত নাচার অবস্থায় যখন কী করবো কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না তখন আমার ভিতরের 'আমি' যেন আমাকে এই বলে সান্ত্বনা দিলো, 'ভয় কি! তুমি তো আল্লাহর মেহমান! আল্লাহ তোমাকে পথ দেখাবেন।'

আমি তখন এই ভেবে আশ্বস্ত হলাম, যা ঘটেছে নিশ্চয় আমার ভালোর জন্য ঘটেছে। হয়ত বান্দাকে আল্লাহ প্রতিকূলতা দ্বারা তারবিয়াত করছেন। যথাসময়ে বান্দাকে নিশ্চয় তিনি সাহায্য করবেন।

যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে আসছে সেহেতু তাঁবুতে ফিরে যাওয়াই সহজ ও নিরাপদ মনে হলো। জনতরঙ্গের তখন শেষ প্রবাহটা চলছে।

পথ সম্পর্কে আমি শুধু জানি যে, এখান থেকে সোজা বেশ কিছু দূর গেলে যে 'ওভার ব্রিজ' সেটা ছাড়িয়ে সামান্য আগে বেড়ে হাতের ডান দিকে যেতে হবে। তারপর একটি 'তাঁবুমহল্লা' পার হলেই আফগান হাজীদের মহল্লা। তারপর বাংলাদেশী হাজীদের মুআল্লিম সেলিম মুনশির তাঁবুমহল্লা। তাঁবুর নাম্বারও মনে ছিলো।

আল্লাহর উপর ভরসা করে রওয়ানা হলাম। আল্লাহ যে বান্দার সহায় সেটা প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করা যায় যখন বান্দা একেবারে একা হয়ে যায়। মানুষের ঢল তখন জামরা অভিমুখে, আমি এবং আরও দু'একজন মাত্র চলছি বিপরীত দিকে। পিপাসায় আমার তখন লবেজান অবস্থা। সামান্য এককাতরা পানি যদি পাওয়া যেতো! এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে শুনতে পেলাম একটি আপ্যায়নের কণ্ঠ, 'তাফায্যাল'।

মেহেরবান আল্লাহর এই 'মেহেরবান' বান্দাকে আমি কখনো দেখিনি, সম্ভবত আর কোনদিন দেখবো না। বড় কঠিন পিপাসার সময় তিনি আমার দিকে ঠাণ্ডা পানির বোতল এগিয়ে দিয়েছিলেন, আমি তার শোকর আদায় করলাম এবং অশ্রুসিক্ত চোখে আসমানের দিকে তাকালাম। এভাবেই আল্লাহ সাহায্য করেন বান্দাকে। প্রতিকূল অবস্থা দ্বারা বান্দার তারবিয়াত করেন, আবার প্রয়োজনের সময় গায়ব থেকে সাহায্য করেন। অবশ্য পুরোটাই হলো অনুভবের বিষয়। হৃদয়ে যদি অনুভব না থাকে তাহলে সবই 'ঘটনাচক্র', পক্ষান্তরে হৃদয় যদি অনুভব করতে পারে তাহলে সেই ঘটনাচক্রই হলো গায়বি নেযাম, গায়বি তারবিয়াত এবং গায়বি মদদ। যত গোনাহগার বান্দাই হও তুমি, আল্লাহর গায়বি মদদ সবসময় আছে তোমাকে ছায়াদানের জন্য।

সূর্য ডুবে গেছে। অল্প ক'জন রাস্তার উপরই মাগরিবের জামাত করছেন, কারণ রাস্তা এখন জনশূন্য। আমিও সেই জামাতে শরীক হলাম।

আবার পথ চলা এবং একা একা। ওভার ব্রিজ দেখতে পেলাম। অর্থাৎ আমি পথ হারাইনি। আরো কিছু দূর গিয়ে ডানে মোড় নিলাম এবং আফগান-তাঁবু পেয়ে গেলাম, তবে আফগানী ভাইয়েরা নেই। এরপর সহজেই পৌঁছে গেলাম নিজেদের তাঁবুতে। আল্লাহর শোকর, আল্লাহ আমাকে পৌঁছে দিলেন।

জীবনের বড় অদ্ভুত একটি রাত অতিবাহিত হলো মিনার ময়দানে। বিশাল তাঁবুতে আমি একা। অন্যান্য তাঁবুতে একজন দু'জনের আওয়ায শোনা যায়, আর শোনা যায় মু'আল্লিমের কর্মীদের তাঁবু গুটানোর আওয়ায।

মু'আল্লিমের প্রধান তাঁবুতে দশবারো জনের জামাতে এশার নামায আদায় করলাম। তারা বললো সেখানেই রাত যাপন করতে, কারণ অন্যান্য তাঁবু ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। বেঁচে যাওয়া খাবার ছিলো, সেগুলো খেতে বলা হলো বেশ অনুরোধ করে, না খেলে নষ্ট হবে। আল্লাহর নেয়ামত মনে করে সবাই সে খাবার খেলাম। এমন সময় এমন খাবার যেমন স্বাদের হয় তেমন স্বাদ অন্য সময় অন্য খাবারে হয় না। এটা সেই শুধু বুঝতে পারে যার জীবনে কখনো এমন মুহূর্ত এসেছে।

এই তিনদিন মিনা প্রান্তর ছিলো যেন লক্ষ লক্ষ মানুষের জাঁকজমকপূর্ণ এক শহর; দেখতে দেখতে এখন তা জনমানবশূন্য এক বিরান ভূমি। অসংখ্য তাঁবু এখনো আছে,

কিন্তু নেই তাঁবুর বাসিন্দারা। তাঁবুগুলোও থাকবে না আগামীকাল। পড়ে থাকবে খোলা প্রান্তর। পাহাড় থাকবে, প্রান্তর থাকবে, থাকবে না শুধু মানুষ! চোখের সামনে এভাবে জনপদ আবাদ হওয়া এবং বিরান হওয়ার এমন শিক্ষণীয় দৃশ্য আর কোথাও পাবে না তুমি। এ যেন জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের জ্বলন্ত উদাহরণ! দুনিয়ার জীবন যে মাত্র দু'দিনের তা নিজের চোখে দেখা যায় যদি মিনায় আজকের রাতটি যাপন করা যায়। যদি আজ হারিয়ে না যেতাম তাহলে আমার জীবন থেকে হারিয়ে যেতো এমন একটি মূল্যবান শিক্ষার রাত। এ শিক্ষার প্রয়োজন ছিলো। শিক্ষা তো তিনিই দেবেন যিনি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষা কে দিতে পারে! জনশূন্য মিনা প্রান্তরের আজকের এ নিঃসঙ্গ রাত যেন আমার রবের পক্ষ হতে আমার জন্য সর্বোত্তম এক শিক্ষক। আমি চেয়েছিলাম পর্বতের গভীর নির্জনতায় একটি রাত যাপন করতে; সেই রাত, সেই নির্জনতা মিনা প্রান্তরেই আল্লাহ আমাকে দান করলেন তের তারিখে।

কালকের জাঁকজমকপূর্ণ রাত এবং আজকের এই সুনসান রাতের পার্থক্য যেন আমার সামনে তুলে ধরলো জীবনের ভিন্ন দুই রূপ। একই প্রান্তরে ভিন্ন দুই রাতে আমি দেখতে পেলাম জীবনের জোয়ার ও ভাটা।

রাত যত গভীর হলো নির্জনতা তত নিবিড় হলো এবং নিঃসঙ্গতা তত গাঢ় হলো, আর হৃদয়ের প্রশান্তি তত যেন প্রগাঢ় হলো! বিশাল প্রান্তরে কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই; যেন আমি ছাড়া কেউ নেই। না, তিনি আছেন আমার সঙ্গে। যখন কেউ থাকে না তখন তিনি থাকেন বান্দার সঙ্গে, বান্দার অতি নিকটে।

আজকের নির্জন রাতের পরিপূর্ণ চাঁদকে যত কাছের, যত আপন মনে হলো তেমনটি আগে কখনো মনে হয়নি। স্রষ্টা তো বান্দার কাছে আসেন সৃষ্টিকে আড়ালরূপে গ্রহণ করে। এই যে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো, সে তো তাঁরই জামাল ও সৌন্দর্যের পর্দা। এই পর্দার আড়ালে আমি তো আসলে তাঁর সৌন্দর্যকেই অবলোকন করছি! এ পরম সত্য কি হৃদয় আমার এমন করে উপলব্ধি করতো যদি আজকের এই নির্জন রাত না হতো! হাঁ, জান্নাতে যখন বান্দাকে আল্লাহ আপন তাজাল্লি দান করবেন, যখন আল্লাহ তাঁর পূর্ণ জালাল ও জামালসহ আত্মপ্রকাশ করবেন তখন বান্দার সামনে কোন আড়াল থাকবে না।

তখন এ নির্জনতারও প্রয়োজন হবে না; কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। তখন এই চাঁদকে যেমন দেখা যায় তেমনি দেখতে পাবে বান্দা আল্লাহকে; দেখতে পাবে তাঁর জালাল ও জামাল এবং তাঁর মহিমা ও সৌন্দর্য। এই চাঁদ যেমন আমার উপর বর্ষণ করছে স্নিগ্ধ জোসনার শিশির, তেমনি তখন বর্ষিত হবে বান্দার উপর আল্লাহর জালাল ও জামাল এবং মহিমা ও সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ শিশির। তাতে জান্নাতি বান্দা হতে থাকবে সুন্দর থেকে সুন্দর, হতেই থাকবে!

আশ্চর্য! আজকের এ রাতের আগে, এই গভীর নির্জনতার পূর্বে কোথায় কিসের আড়ালে লুকিয়ে ছিলো হৃদয়ের এ অনুভব-অনুভূতি! যদি হারিয়ে না যেতাম তাহলে তো মিনাপ্রান্তরের এ নির্জন রাত হারিয়ে যেতো আমার জীবন থেকে এবং হারিয়ে

যেতো হৃদয়ের এই পবিত্র অনুভব-অনুভূতিও! সুতরাং নিজেকে হারিয়ে আমি যেন নিজেকেই খুঁজে পেলাম আজ।

চাঁদ অস্ত গেলো, ফজর উদিত হলো। ছোট্ট এক জামাতে বিরাট উপলব্ধির অপূর্ব এক নামায আদায় হলো। নির্জন রাতের বিনিদ্র মুহূর্তগুলোর পর আমার দু'চোখ ভরে নেমে এলো প্রশান্তির ঘুম। এ ঘুম চোখের ও দেহের; এ ঘুম নয় হৃদয়ের এবং আত্মার! যখন জেগে উঠলাম, আমি যেন অন্য এক মানুষ! নবজন্মের নবজাগ্রত এক মানুষ! আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নিজেকে, আমার চারপাশের সবকিছুকে। শোকর আলহামদু লিল্লাহ!

***

তখন আলোকিত দুপুর। সূর্য প্রখর উত্তাপ বর্ষণ করছে এবং মরুভূমি উত্তপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু হৃদয়ের শীতলতা ও প্রশান্তি সবকিছুকে এমন ছাপিয়ে উঠলো যে, বাইরের সবকিছুকে মনে হলো শান্ত-শীতল। তাই সতেজ দেহে, সজীব হৃদয়ে এবং সবল পদক্ষেপে আমি রওয়ানা হলাম জামরার উদ্দেশ্যে। আজকের জামরামুখী এ পথের পূর্ণ প্রশস্ততা ও দৈর্ঘ্য, মনে হলো আমার একার। এ পথ যেন সোজা চলে গিয়েছে জান্নাতের দুয়ার পর্যন্ত! শয়তানকে যদি তুমি পরাস্ত করতে পারো তাহলে জান্নাতে প্রবেশের পথে তোমার আর বাধা কোথায়! আজ এ পথের শেষ মাথায় আমাকে নামতে হবে সেই চেষ্টায়! কংকরের আঘাতে শয়তানকে পরাস্ত করার শেষ চেষ্টায়!

এমন কিছু অনুভব অনুভূতিতে আচ্ছন্ন ছিলাম জামরা-অভিমুখী নির্জন পথে চলতে গিয়ে। কালকের জামরায় তো ছিলো না এ অনুভূতি! নির্জনতা ছাড়া এমন অনুভূতি সম্ভবত আসে না অন্তরে। 'খালওয়াত দর আন্‌জুমান' (জনতার মাঝে নির্জনতা)-এর স্বাদ যারা অনুভব করতে পারেন তাদের কথা অবশ্য ভিন্ন।

অন্যদিনের চেয়ে অনেক কম সময়ে আজ পৌঁছে গেলাম জামারায়। সুবহানাল্লাহ! জামরার দৃশ্য দেখে সত্যি অভিভূত হলাম! মন খুশিতে বাগবাগ হয়ে গেলো! এমন কেন হচ্ছে আজ! কেমন অনুভূতি এ! যেদিকে তাকাই মনে হয়, সবকিছু আমার জন্য! মাওলার পক্ষ হতে বান্দার ইকরামের জন্য! তোমার শোকর হে আল্লাহ! তুমি বড় মেহেরবান হে আল্লাহ!

তোমার বান্দারা দেখো হে আল্লাহ, যে যার পাত্র পূর্ণ করে খুশি-খুশি বিদায় নিয়ে গেছে মিনাপ্রান্তর থেকে; আমি রয়ে গেছি নির্জনতার মাঝে তোমার নৈকট্য লাভের আশায়! তোমার এককত্বের কাছে হে আল্লাহ, আমার একাকিত্বের শুধু এই মিনতি. আমাকে তুমি কবুল করো হে আল্লাহ!

জামরায় তখন খুব বেশী হলে পঞ্চাশ ষাটজন। বলা যায়, প্রায় নির্জন। তাই প্রথম জামরার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় হৃদয় অন্যরকম এ আবেগে উদ্বেলিত হলো। আমার চারপাশে আজ কোন জনতরঙ্গ নেই; আছে শুধু আমার হৃদয়ে আবেগের তরঙ্গ। আমি এগিয়ে গেলাম ধীর শান্তভাবে, হৃদয়ের গভীরে সেই তরঙ্গদোলা অনুভব

করে করে; আমি এগিয়ে গেলাম সুদৃঢ় পদক্ষেপে আমার চিরশত্রুর দিকে। এখন সময় শত্রুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করার নয়; এখন সময় অবিচল প্রতিজ্ঞা অর্জন করার। শয়তান জানে, ক্রোধের উন্মত্ততা হলো ক্ষণিকের। তাই ছুঁড়ে দেয়া জুতা-ছাতায় শয়তান শুধু কৌতুক বোধ করে। তার ভয় শুধু মানুষের দৃঢ় পদক্ষেপ এবং তার অবিচল প্রতিজ্ঞাকে।

বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে প্রথম কংকরটি নিক্ষেপ করলাম। আজ নয় কোন তাড়াহুড়া ও বিচলতা। শয়তানকে প্রথম কংকরের যন্ত্রণা ভোগের সময় দিয়ে ধীরে সুস্থে আমি প্রস্তুত হলাম দ্বিতীয় কংকরটি নিক্ষেপ করার জন্য এবং নিক্ষেপ করলাম। অপূর্ব এক পুলক ও আনন্দশিহরণ সর্বসত্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। আমার দুশমন নিশ্চয় ঘায়েল হয়েছে দ্বিতীয় কংকরের আঘাতে! হে আল্লাহ, বাকি জীবনে শয়তান যেন কোমর সোজা করে দাঁড়াতে না পারে আমার সামনে।

এভাবে তৃপ্তি ও পরিতৃপ্তির সাথে প্রথম জামরার রামী সম্পন্ন হলো। এবার যতক্ষণ ইচ্ছা দু'আ করো দ্বিতীয় জামরার আগে। ভিক্ষাপাত্র হাতে প্রাণভরে ভিক্ষা চাও তোমার মাওলার দরবারে। কেউ বাধা দেবে না তোমাকে। কারণ তুমি ছাড়া কেউ নেই সেখানে। একই রকম শান্তি ও প্রশান্তির সাথে, একই রকম দৃঢ়তা ও দৃপ্ততার সাথে দ্বিতীয় জামরা সমাপ্ত করলাম। হৃদয় তখন উন্মুক্ত ছিলো এবং আশা ও প্রত্যাশার সীমাহীন উচ্ছ্বাস ছিলো। তাই হৃদয়ের সবটুকু আকুতি ও মিনতি নিবেদন করে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করলাম-

হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, তুমি ছাড়া কারো আমার প্রয়োজনও নেই।

হে আল্লাহ, জীবনের সর্বক্ষেত্রে শয়তানকে পরাস্ত করার এবং নফসকে দমন করার তাওফীক দান করো।

হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ভালোবাসো এবং তোমাকে ভালোবাসার তাওফীক দান করো।

হে আল্লাহ, মৃত্যুর সময় তুমি আমাকে সঙ্গ দান করো এবং তোমার সঙ্গ গ্রহণ করার তাওফীক দান করো।

হে আল্লাহ, তুমি সন্তুষ্ট থাকো এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দান করো।

হে আল্লাহ, দুই জামরার মধ্যবর্তী স্থানে তোমার পেয়ারা হাবীব যা যা দু'আ করেছেন তার কিছু বরকত এই অধম উম্মতিকেও দান করো। আমীন।

আমার মৃত্যুর পর কে ভাই তুমি এ সফরনামা পড়ছো! কালের ঘড়িতে এখন কত সময় পার হয়েছে! একশ বছর! দু'শ, তিনশ বছর!

তুমি আমাকে দেখোনি, আমিও তোমাকে দেখিনি! কিন্তু এ লেখা যখন লিখছি, তোমাকে আমি অনুভব করছি। তুমিও যেন আমাকে অনুভব করো এবং আমার দু'আর সঙ্গে আমীন বলো, আর দয়া করে আমার জন্য একটু দু'আ করো।

মুনাজাত থেকে ফারিগ হয়ে তৃতীয় ও শেষ জামরার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং একটি, দু'টি করে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে শেষ কংকরটিও নিক্ষেপ

করলাম। এভাবে জীবনের প্রথম হজ্বের সর্বশেষ আমলটিও সমাপ্ত হয়ে গেলো। শোকর আলহামদু লিল্লাহ!

কী শান্তি ও প্রশান্তি! কী তৃপ্তি ও পরিতৃপ্তি!!

দশ তারিখে যখন ইহরাম থেকে মুক্ত হলাম তখন হৃদয়ের যে অনুভূতি ছিলো তা কোন ভাষায়, কোন উপমায় প্রকাশ করা যায়! মরুভূমির যাত্রী যেন ছায়াঘেরা মরুদ্যানে প্রবেশ করলো! কিংবা আরো সুন্দর কোন উপমা, যা আমার জানা নেই!

তারপর যখন তাওয়াফে যিয়ারাত শেষ হলো তখনকার অনুভূতি! পিপাসার্ত মুসাফির যেন মরুদ্যানের ছায়ায় বসে সুশীতল পানি পান করলো! কিংবা আরো সুন্দর কোন উপমা, যা কারো জানা নেই!

আর এখন শেষ জামারার শেষ কংকরটি নিক্ষেপ করার পর! বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে মুসাফির যেন পৌঁছে গেলো তার মানযিলে মাকছূদে পরম প্রিয়তমের সান্নিধ্যে! স্বপ্ন যিনি দান করেছিলেন, স্বপ্ন তিনি পূর্ণ করেছেন; সুতরাং আশা করি, সমস্ত ত্রুটি ও বিচ্যুতি এবং দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তিনি তা কবুল করে নিয়েছেন। আমি তো আমার আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণাই পোষণ করবো! আমি তো আমার আল্লাহর কাছে কল্যাণই আশা করবো! অন্যায়-অপরাধ যত গুরুতরই হোক, আল্লাহর রহমতের চেয়ে তো বেশী নয়! আল্লাহর মাগফিরাতের উপর তো তা ভারী নয়!

***

যোহরের আযানের সময় প্রায় হয়ে গেছে। এখান থেকে মসজিদুল খায়ফ খুব নিকটে; ঐ তো দেখা যায়! অনিবার্য অপারগতার কারণে এ ক'দিন এক ওয়াক্ত নামাযও আদায় করা সম্ভব হয়নি মসজিদুল খায়ফে। না, একটি ওয়াক্ত অবশ্য পড়া হয়েছিলো মসজিদের বাইরে অনেক দূরের কাতারে দাঁড়িয়ে।

মিনার তাঁবুতে বসে হযরত হাফেজ্জী হুযূর বলেছিলেন মসজিদুল খায়ফে তাঁর জীবনের প্রথম প্রবেশের অনুভূতির কথা। এখন থেকে অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে, তখন মসজিদের বাহ্যিক অবস্থা ছিলো 'জীর্ণ-শীর্ণ'। হযরত বলেছিলেন, 'আব তো সবকুছ খাবো খায়াল মা'লুম হোতা হায়' (এখন তো সবকিছু মনে হয় স্বপ্ন, আর কল্পনা)।

মুখে মৃদু হাসির স্নিগ্ধতা মেখে কত সুন্দর করে তিনি বলেছিলেন, 'মিয়াঁ, তখন তো জোয়ান ছিলাম, তোমাদের চেয়ে বেশী জোয়ান। তখন প্রায় সব ওয়াক্ত মসজিদুল খায়ফে আদায় করেছিলাম এবং একটি রাত মসজিদেই ছিলাম। মসজিদে বিজলী বাতি ছিলো না। তবে দিলে বড় শান্তি এবং রূহানী সুকূন হাছিল করেছিলাম। এমন সুকূন যার 'ঠাণ্ডক' এখনো অনুভব করি!'

যুগে যুগে আল্লাহর বহু বান্দা তাঁদের সফরনামায় মসজিদুল খায়ফে দাখেল হওয়ার পর আত্মিক প্রশান্তি ও রূহানী সকূন হাছিল হওয়ার কথা লিখেছেন, যা খুবই স্বাভাবিক। এখানে যে রয়েছে বহু নবীর কবর! বিদায় হজ্বে এখানে যে কিয়াম করেছেন আল্লাহর পেয়ারা হাবীব! সুতরাং এখানের সবকিছুতেই তো নূর ও নূরানিয়াত!

যোহরের আযানের সময় আমিও জীবনে প্রথম প্রবেশ করলাম মসজিদুল খায়ফে! হযরতের কথাগুলো তখন বারবার মনে পড়ছিলো।

এ ক'দিন তো মানুষের ভিড়ে মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তের তারিখের এমনই বরকত যে, চারদিক থেকে যেন শুধু শোনা যায়, এসো হে আল্লাহর মেহমান! সবকিছু এখন তোমার জন্য!

আগুনঝরা রোদ থেকে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মসজিদে প্রবেশ করে দেহ যেমন জুড়িয়ে গেলো শীতল বাতাসের স্পর্শে, হৃদয় ও আত্মাও তেমনি শীতলতা লাভ করলো এক অদৃশ্য স্পর্শ থেকে, যা শুধু অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না।

বিশাল মসজিদ, জামাত হলো মাত্র একদু'কাতারের। কিন্তু আমার মনে হলো, মসজিদ যেন জমজমাট। চারদিকে যেন শুধু শুভ্রতা, শুধু নূরানিয়াত! অদৃশ্যে কাদের যেন আনাগোনা! কাদের যেন ইবাদতের, তিলাওয়াত-মুনাজাতের মৃদুমধুর গুঞ্জন! জানি না, এ গুঞ্জন কি যারা এখানে আছে তাদের, না সুদূর অতীতে যারা ছিলেন তাদের! জানি না, আমি কিছু জানি না; আমি শুধু মিষ্টিমধুর অনুভবের জগতে তন্ময় হয়ে থাকতে চাই।

আযান হলো। আরবের আযান তুমি যেখানেই শোনবে, মনে হবে সুমধুর; কিন্তু এত যুগ এবং এত শতাব্দীর ব্যবধানেও মসজিদে খায়ফের আযানে তুমি শুনতে পাবে, বেলালী আযানের সুর! বিদায় হজ্বে এখানে আল্লাহর পেয়ারা নবীর অবস্থানকালে হযরত বেলাল (রা) যে আযান দিতেন, সময়ের প্রাচীর অতিক্রম করে যদি তা এখনো প্রতিধ্বনিত হয় তাহলে অবাক হওয়ার কী আছে বন্ধু! তুমিও কান পেতে শোনো আজকের আযান, তুমিও শুনতে পাবে দূরের সেই আযানের সুমধুর সুর!

নামাযের পর মসজিদ থেকে বের হতে কিছুতেই মন সরে না। দাখেল হয়েছি ই'তিকাফের নিয়তে, কিছুক্ষণ না হয় ঘুমিয়ে থাকি! আল্লাহ তো তাঁর মেহমানদের ঘুমকেও কবুল করবেন ইবাদতরূপে! সুবহানাল্লাহ, কত মেহেরবান আমাদের আল্লাহ!

আবার ভাবলাম, হযরত হয়ত পেরেশান হচ্ছেন। গতকাল রামী করার পর তাঁর সঙ্গে ফিরে যাওয়ার কথা ছিলো মক্কায়, কিন্তু জনস্রোতের তোড়ে সেই যে হারিয়ে গেলাম, সে হারিয়ে যাওয়া এখনো চলছে। হারিয়ে গেলে মানুষ পেরেশান হয়, জানতাম; কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার শান্তি ও তৃপ্তি যে এতো তা আমার জানা ছিলো না।

মন যেন চাচ্ছে, আরো দীর্ঘ হোক এ হারিয়ে যাওয়া, কিন্তু তিনি যে পেরেশান হবেন! সুতরাং আর দেরী করা চলে না!

বের হলাম মসজিদে খায়ফ থেকে মেহরাব, ছাদ, দেয়াল সবকিছুর উপর বিদায়ের করুণ দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে। আর কি আসা হবে এখানে, সত্তরজন নবীর মাযারধন্য মসজিদে খায়ফে? পেয়ারা হাবীবের অবস্থানে সুরভিত মসজিদুল খায়ফে? হে আল্লাহ, তোমার যদি কৃপা ও করুণা হয় তাহলে তো অসম্ভব কিছুই নয়!

***

মিনা থেকে বের হয়ে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাছ্ছাব'-এ অবস্থান করেছিলেন। এটা অবশ্য হজ্বের অংশ নয়, কিন্তু ছাহাবা কেরামের নবীপ্রেম ছিলো এমনই অতুলনীয় যে, মুহাছ্ছাবের অবস্থানকেও তাঁরা বিস্মৃত হননি। পরবর্তী যুগে আল্লাহর পেয়ারা বান্দারাও তা অনুসরণ করেছেন। এমনকি নিকট অতীতের বুযুর্গানে দ্বীন ও আশিকানে রাসূল স্পর্কেও জানা যায়, তারা যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন মুহাছ্ছাবে অবস্থান করে তারপর মক্কায় প্রবেশ করতে। কিন্তু সউদী সরকারের অব্যাহত অবহেলায় এখন তো স্থানটি চেনারও সুযোগ নেই। আফসোস, যদি চিনতে পারতাম, পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতি স্মরণ করে অবশ্যই মুহাছ্ছাবে কিছুক্ষণ অবস্থান করতাম।

শেষ জামরা থেকে কিছু দূর আগে বাড়লে মক্কা-অভিমুখী দু'টি সুড়ংপথ। একটি যানবাহনের জন্য, অন্যটি পথচারীদের জন্য। আধুনিক প্রযুক্তি এ অসম্ভবকেও সম্ভব করেছে। পাহাড় এখন আর পথরোধ করে দাঁড়ায় না। মানুষ পাহাড় ছিদ্র করে তার চলার পথ করে নিয়েছে। মিনা ও মক্কার পথ এখন অনেক সহজ ও সংক্ষিপ্ত!

আলহামদু লিল্লাহ, হজ্বের সফরকে আরামদায়ক করার জন্য আধুনিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা দোষের কিছু নয়। শরীর ও স্বাস্থ্যে এবং সাহস ও মনোবলে মানুষ দিন দিন যেভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে তাতে তো এটা সুনিশ্চয় যে, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এযুগের মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার বিরাট নেয়ামত। এ যুগের সুযোগ-সুবিধা না হলে এবং সে যুগের বিপদ-কষ্ট বহাল থাকলে খুব কম মানুষই এখন হজ্বের সফরের সাহস করতে পারতো।

কিন্তু আফসোস! আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ যত আয়ত্তে আসছে ততই যেন আমরা অতীত থেকে দূরে সরে যাচ্ছি; হৃদয়ে এবং অনুভব-অনুভূতিতে ততই যেন দরিদ্র ও নিঃস্ব হয়ে পড়ছি। আমাদের হজ্ব ও ইবাদত যেন নিছক আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। হজ্বের মূল প্রাণ যে প্রেম ও ভালোবাসা এবং ইশক ও মুহাব্বাত, তার প্রকাশ কোথায় এখন আমাদের মাঝে!

কিছু দূর হাঁটার পর সুড়ংপথের প্রবেশমুখে পৌঁছলাম এবং বিসমিল্লাহ বলে প্রবেশ করলাম। বিরাট সুড়ং, কম করে একশ হাত প্রশস্ত। উঁচু হবে পাঁচ মানুষের সমান। আলোর ব্যবস্থা প্রচুর। জেটবিমানের আওয়াযে বিরাট বিরাট পাখা চলছে। বাতাস যেন প্রয়োজনের চেয়ে বেশী। প্রবল জনস্রোতে এখানে নাকি দুর্ঘটনাও ঘটে। সেই সুড়ংপথ আজ প্রায় নির্জন! খুব বেশী হলে বিশ-পঁচিশজন। বড় আনন্দ হলো একা একা পথ চলতে।

এখন আমি চলছি মিনা থেকে মক্কার পথে। আবার আমি দেখবো হারাম! আবার আমার চোখ জুড়োবে, মন জুড়োবে আল্লাহর ঘরের যিয়ারাতে, বাইতুল্লাহর তাওয়াফে! আবার আমার প্রাণ শীতল হবে 'চাহে যামযামের' মিঠা পানিতে! সামনে যখন হাতছানি থাকে নতুন আনন্দের, নতুন তৃপ্তির এবং নতুন প্রাপ্তির তখন পিছনের বিচ্ছেদবেদনা মনকে বিষণ্ন করলেও হৃদয়কে কাতর করে না। তাই তো মদীনাকে

বিদায় জানিয়ে মক্কার পথে চলতে গিয়ে হৃদয়ে সেদিন বিচ্ছেদের বেদনা যেমন ছিলো তেমনি ছিলো আনন্দের উচ্ছ্বাস। হৃদয়রাজ্যে আনন্দ-বেদনার সে এক অপূর্ব লুকোচুরি, যার তুলনা তুমি খুঁজে পাবে না জগতের আর কোন আনন্দ-বেদনার অনুভূতিতে। একদিকে মনের জ্বালা-পোড়া, হায়, মদীনার মিনার দেখা যায় না! হায়, মসজিদে নববীর আযান আর শোনা যায় না!

অন্যদিকে মনের ভিতর জাগে অপূর্ব এক পুলক-দোলা, ঐ যে দূরে দেখা যায় মক্কার জনবসতির আলোর ইশারা! আমি তো এখন দেখতে পাবো হারামের আলো এবং কালো গিলাফের সৌন্দর্য!

মদীনা থেকে মক্কার পথে সেদিন যেমন আমি অবগাহন করেছি আনন্দ-বেদনার মিলনমোহনায়, তেমনি মসজিদে খায়ফ থেকে মসজিদুল হারামের অভিমুখে চলতে গিয়ে একই সঙ্গে অনুভব করলাম কিছু রেখে আসা ব্যথা এবং ফিরে পাওয়া অনেক আনন্দ।

হজ্বের পরে কয়েক দিন

ধারণার চেয়ে অনেক কম সময়ে পৌঁছে গেলাম হারাম শরীফে। তখনো আছরের আযান হয়নি। নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে হারাম শরীফে প্রবেশ করলাম। বুকটা দুরু দুরু করলো; এই দেখবো, এই দেখবো! এবং দেখতে পেলাম আমার আল্লাহর ঘর! এ ঘরকে বলা হয় 'আলবাইতুল আতীক' (প্রাচীন গৃহ), কিন্তু এ যে চিরনতুন! চিরসুন্দর! যখন দেখি যতক্ষণ দেখি, আলো যেন ততই উদ্ভাসিত হয়! সৌন্দর্য যেন ততই উন্মোচিত হয়! হৃদয়ের আনন্দ যেন ততই পল্লবিত হয়! আত্মার প্রশান্তি যেন ততই গভীর হয়! এ তো শুধু গিলাফের সৌন্দর্য! গিলাফের আড়ালে! কবিহৃদয়ের আকুতি এখন আমি বুঝতে পারি নিজের হৃদয় দিয়ে-

রোখসার সে বোরকা' কা যেরা পারদা হাটা দো/ লিল্লাহ মুঝে হুসনে খোদা-দাদ দেখা দো!

(মুখমণ্ডল থেকে বোরকার পরদা সরাও না একটু! আল্লাহর দেয়া সৌন্দর্য আমাকে দেখাও না একটু!)

আল্লাহর ঘরের প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতকালে যে দু'আ পড়তে হয় তা পড়লাম। তারপর উম্মেহানিতে উপস্থিত হলাম। আশা ছিলো, এখানেই হযরতকে পাবো এবং পেলাম, তবে দূর থেকে শুধু দেখলাম। নামাযের আগে কাছে যাওয়া সম্ভব হবে না।

হযরত সম্পর্কে একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলতে ইচ্ছে হয়। আমার অনুভূতির সময় থেকে তাঁকে দেখছি। আব্বাকে আল্লাহ জান্নাত নছীব করুন; শৈশব থেকে আমাদেরকে তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযূরের ছায়ায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তখন থেকে বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন ঘটনায়, দুর্ঘটনায়, বিভিন্ন যোগে-দুর্যোগে ও আনন্দ-বেদনায় তাঁকে দেখেছি, কাছ থেকে এবং দূর থেকে। আমি বলবো না, সবসময় একজন ফিরেশতাকে দেখেছি! মানুষ ফিরেশতা হবে কেন! মানুষের সৌন্দর্য তো বাইরে-ভিতরে শুধু মানুষ হওয়ার মাঝেই! তবে একথা অবশ্যই বলবো, তাঁকে শুধু অবলোকন করে এবং তাঁর বিভিন্ন অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করে আমি অনেক কিছু শিখেছি; অন্তত শেখার অনেক সুযোগ পেয়েছি। বিশেষ করে হজ্বের সফরে তাঁর ছোহবত ও সংস্পর্শ থেকে, বিভিন্ন অবস্থায় তাঁকে অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার এত খোরাক পেয়েছি যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শিক্ষা পেয়েছি কথা

বলার এবং কথা শোনার, শিক্ষা পেয়েছি চিন্তা করার এবং অনুভব করার, শিক্ষা পেয়েছি মুহাব্বাত করার এবং মুহাব্বাতের আদব রক্ষা করার, শিক্ষা পেয়েছি অনেক কিছুর। তবে পাহাড় থেকে নদীতে পানি তো গড়িয়ে নামে বিপুল পরিমাণে, কিন্তু নদী তার কতটা ধরে রাখতে পারে! সব পানি তো গিয়ে মিশে যায় সাগরের নোনা পানিতে! তবু নদীর কিছু না কিছু প্রাপ্তি তো অবশ্যই আছে।

ফিরে আসি আগের কথায়। হযরতকে দূর থেকে দেখছি। তিনি দেখছেন আল্লাহর ঘরকে, আমি দেখছি আল্লাহর বান্দাকে!

একদিন একজন আমাকে বলেছিলেন, তুমি 'হুযূরের' দিকে এভাবে তাকিয়ে আছো কেন! বাইতুল্লাহর দিকে তাকাও!

জানতাম, তার কথা যুক্তিসঙ্গত, তবু বিনয়ের সাথে বললাম, কীভাবে বাইতুল্লাহর দিকে তাকাতে হয়? কীভাবে বাইতুল্লাহর জামাল ও সৌন্দর্য অনুভব করতে হয়? কীভাবে বাইতুল্লাহর আনওয়ার ও বারকাত এবং ফায়য ও ফায়যান হাছিল করতে হয়? এসব আমি জানবো কিভাবে এবং শিখবো কিভাবে যদি এমন কাউকে না দেখি যিনি বাইতুল্লাহকে দেখতে জানেন, বাইতুল্লাহর সৌন্দর্য অনুভব করতে পারেন, সর্বোপরি যিনি বাইতুল্লাহর ফায়য ও ফায়যানে অবগাহন করতে পারেন?! তাঁকে দেখা তো প্রকৃতপক্ষে বাইতুল্লাহকে দেখার এবং বাইতুল্লাহর সৌন্দর্য অনুভবের যোগ্যতা অর্জন করারই জন্য!

তো বাইতুল্লাহর অবলোকনে আত্মসমাহিত হযরতকে দূর থেকে দেখে আমার সামনে যেন আজ এক নতুন সত্য উদ্ভাসিত হলো। আমার মনে হলো, তিনি বাইতুল্লাহকে অবলোকন করছেন এটা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে, তাঁর অবলোকন আরো অনেক গভীরে, হয়ত একেবারে তলদেশে গিয়ে উপনীত হয়েছে। হয়ত তিনি সৌন্দর্যের পর্দায় 'সৌন্দর্য' অবলোকন করছেন।

নামাযের পর হযরতের কাছে গেলাম এবং সে সময়টি আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকলো। ভেবেছিলাম, তিনি গতকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং হয়ত সস্নেহ তিরস্কার করবেন। কিন্তু না, তিনি বরং এমনভাবে কথা বললেন যেন গতকাল বলতে কিছুই ছিলো না এবং সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গেই রয়েছি আমি!

হযরত যা বললেন তাতে আমি অনাস্বাদিতপূর্ব এক পুলক অনুভব করলাম। কারণ আমার বিশ্বাস হলো, দূর থেকে তাঁর বাইতুল্লাহ অবলোকন, অবলোকন করে আমি তার অন্তর্লোকের কাছাকাছি যেতে পেরেছিলাম। ভাব নেই, আবেগ নেই, তরঙ্গ নেই, এমনি সহজ স্বাভাবিক স্বরে তিনি বললেন, 'মিয়াঁ আবু তাহের! বাইতুল্লাহর দিকে শুধু নযর করা একটি ইবাদত। তবে এই নযরের বিভিন্ন মারহালা (ও স্তর) রয়েছে। মযা তো তখনই আসে যখন জামালে বাইতের মাঝে জামালে হক নযরে আসে।'

***

লেখকের লেখায় একজন পাঠক কী পেতে চায়? সবকিছুর আগে নিজেকে খুঁজে পেতে চায়। লেখার আয়নায় পাঠক সবার আগে নিজের ছবি দেখতে চায়। যে লেখায় শুধু

লেখকের ছবি থাকে সে লেখায় পাঠকের আগ্রহ থাকে না। বিশেষ করে ভ্রমণকাহিনীর ক্ষেত্রে একথা খুবই সত্য, আর হজ্বের সফরনামায় তা আরো সত্য। কিন্তু যত সংযমই অবলম্বন করা হোক, লেখায় লেখকের ছবি ও ছাপ তো এসেই যায়! এটা তো স্বভাব ও প্রকৃতির অনিবার্য এক দুর্বলতা! শুধু দেখতে হয়, দুর্বলতা যেন দোষের পর্যায়ে না চলে যায়। অবশ্য দোষ ও দুর্বলতার মাঝে ব্যবধান রক্ষা করাও কঠিন।

তো এখন আমি যা বলতে চাই তা যদি শুধু আমার নিজের কথা হয়ে যায়; হে পাঠক, তাতে তুমি যদি নিজেকে কিছুমাত্র খুঁজে না পাও তাহলে হয় আমাকে ক্ষমা করো, না হয় এ অংশটায় চোখ না বুলিয়ে চলে যেয়ো; আমি কিছু মনে করবো না।

চৌদ্দ তারিখে দুপুরের পর অনেক কষ্ট করে উম্মেহানিতে বসে আছি। চেষ্টা করছি বাইতুল্লাহকে দেখতে; দেখে সান্ত্বনা লাভ করতে। সকাল থেকে যামযাম পান করেছি কয়েকবার এবং পেট ভরে ভরে। কিন্তু হায়, এ পাকস্থলী তো ঐ রকম নয় যা শুধু নূরানিয়াত থেকে 'গিযা' লাভ করতে পারে! অস্থিরতা ক্রমেই বাড়ছে। বাইতুল্লাহর কালো গিলাফের দিকে তাকিয়ে আছি, আর চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এ অশ্রুজল কতটা হৃদয়ের, কতটা উদরের, বলা কঠিন।

আল্লাহর নেক বান্দাদের কত শত মুজাহাদার ঘটনা পড়েছি কিতাবে এবং শুনেছি হযরত হাফেজ্জী হুযূরের মুখে। তিনি দূর অতীতের ঘটনা বেশী বলতেন না, বলতেন নিকট অতীতের ঘটনা। হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহ), হযরত গাঙ্গোহী (রহ), হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ), সৈয়দ হোসায়ন আহমদ মাদানী (রহ) ও অন্যান্যের ঘটনা। শুনতাম, আর নিজের অবস্থা চিন্তা করে লজ্জিত হতাম; হায়, কত দুর্বল আমরা! মুহাব্বাতের জাযবা, ভালোবাসার অনুভূতি এবং হৃদয়ের মিনতি সবই লোপ পেয়ে যায় দেহের স্থূল চাহিদা যখন মুখ হা করে গিলে খেতে চায়।

তবু সান্ত্বনা এই যে, চোখের পানি আল্লাহর ঘরকেই নিবেদন করেছি এবং দীনতা ও মিনতি আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করেছি–

আর তো পারি না হে আল্লাহ! হে মেহেরবান! হে দয়াল মেযবান! কাকে বলবো তুমি ছাড়া! কার কাছে যাবো তুমি ছাড়া! কে শোনবে আমার ডাক তুমি ছাড়া! কেউ না, শুধু তুমি!

আর আল্লাহ ডাক শুনলেন এবং আশ্চর্যভাবে শুনলেন। আল্লাহ অবশ্যই শোনেন, যদি আমরা ডাকি ভরসা ও নির্ভরতার সঙ্গে এবং অপেক্ষা করি একটু ছবরের সঙ্গে।

তখন যদি মানুষের বেশে কোন ফিরেশতাকে আমার সামনে দেখতে পেতাম, হয়ত এতটা চমৎকৃত হতাম না, যতটা হয়েছিলাম আমার ভাই সাঈদ মিছবাহকে দেখে। সে তো এখন রিয়াদে তার কর্মস্থলে! তার তো রয়েছে চাকুরির বাধ্যবাধকতা! এসময় তাকে এখানে আশা করবো কী, কল্পনাও করিনি। বান্দা যা কল্পনা করতে পারে না, আল্লাহ তা বাস্তব করে দেন যখন ইচ্ছা করেন। তাঁর ইচ্ছায় তো অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়!

ইহরামের শুভ্র লেবাসে ফিরেশতার মতই মাতাফের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম আমার ভাইকে, আমার পাশ দিয়ে। আমাকে সে দেখতে পায়নি; পাবে কিভাবে?! তার প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টি তো তখন সামনে কালো গিলাফের দিকে! এসময় তো পরিপার্শ্ব মুছে যায় দৃষ্টি থেকে এবং চিন্তা থেকে! এসময় তো মানুষ ভাবের তরঙ্গদোলায় দুলতে থাকে এবং আন্দোলিত হতে থাকে!

ডাক দেয়া আমার উচিত হয়নি বাইতুল্লাহর দিকে এগিয়ে যাওয়া, আমার ভাইটিকে; কিন্তু আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম আবেগে, আনন্দে এবং অভিন্ন রক্তের গন্ধে!

সাঈদ! সাঈদ!!

আমি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালাম ডাকতে ডাকতে এবং কাঁপতে কাঁপতে।

শুভ্র লেবাসে সে তো ফিরেশতা ছিলো না, মানুষ ছিলো এবং আমার ভাই ছিলো! তাই সে চমকে উঠলো এবং তার গতি থেমে গেলো। এ অনুশোচনা এখনো আমাকে বিঁধে যে, আমার ডাকে বাইতুল্লাহর দিকে তার চলার গতি থেমে গিয়েছিলো। সে ফিরে তাকালো; তাকিয়েই থাকলো কয়েক মুহূর্ত।

চোখ দু'টি তার শৈশব থেকেই সুন্দর। কিছু মানুষ আছে, যাদের চোখের চাহনি থেকে কখনো কখনো শিশির ঝরে। আমার ভাইয়ের চাহনি থেকে তখন শিশির ঝরতে দেখেছিলাম এবং সেই শিশিরে আমি সিক্ত হয়েছিলাম।

চলমান চিত্রকে ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে শুনতে পাই। সেই পবিত্র সময়ের শুভ্র-সুন্দর চিত্রটি যদি আমরা দু'ভাই ধরে রাখতে পারতাম আমাদের জীবনে তাহলে খুব ভালো হতো! তাহলে অনেক কিছু হতো এবং অনেক কিছু হতো না।

আমার ভাই আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভাইয়ের বুকে ভাইয়ের ঝাঁপিয়ে পড়া– এটি পৃথিবীর তৃতীয় সুন্দরতম দৃশ্য। এর চেয়ে সুন্দর হতে পারে শুধু মায়ের আঁচল দিয়ে সন্তানের মুখ মুছে দেয়া এবং সন্তানের মাথায় বাবার স্নেহের হাত বুলিয়ে দেয়া। সময় যত গতি লাভ করছে এবং জীবন যত এগিয়ে চলেছে, জীবনের এ দৃশ্য ততই দুর্লভ হয়ে পড়ছে। সংসারে এখন ভাই আছে, কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ভাইয়ের বুক নেই। তুমি হে পাঠক, যদি পারো তোমার বুকটিকে উন্মুক্ত রেখো তোমার ভাইয়ের ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

আমার ভাই আমার দিকে তাকালো এবং তাকিয়েই চমকে উঠলো। এমনই হয়! নাড়ির টানে এবং রক্তের বন্ধনে এমনই হয়! যাকে যত আপন তুমি ভাবতে চাও ভাবতে পারো, কিন্তু তোমার ভাইয়ের চোখের তারায় তোমার মুখের যে ছবি দেখা যাবে, অন্য কারো চোখে তা দেখা যাবে না। আমি অবশ্য সেই চোখের কথা বলছি না যা স্বার্থের ঘোলায় কখনো কখনো ঘোলাটে হয়ে যায়। আমার বাবার চোখের তারায় তাঁর ভাইয়ের এমনই ছবি দেখেছি আমি সারা জীবন!

সাঈদ অস্থির হয়ে আমার হাত ধরে বললো, চলুন আগে কিছু.. আমি বাধা দিয়ে বললাম, আগে তাওয়াফ সাঈ শেষ করো।

সে কিছুতেই শোনবে না; তখন একটু শাসনের সুরে বললাম, আমার কথা তো শোনো! আগে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করো।

অগত্যা আমাকে সেখানে বসিয়ে রেখে সে মাতাফে নেমে গেলো। আমি আবার তাকালাম কালো গিলাফে ঢাকা আল্লাহর ঘরের দিকে। আবার আমার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়লো। তবে মনে হয়, এবার তা ছিলো শুধু শোকর ও কৃতজ্ঞতার জন্য।

আমার ভাই সেদিন আমার ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করেছিলো। আর কেউ বুঝতে পারেনি, আমার ভাই বুঝতে পেরেছিলো, আমি কত ক্ষুধার্ত ছিলাম!

কেউ যদি বলে, আমাকে সে ভালোবাসে, আমি বিশ্বাস করবো; যদি বলে, আমাকে সে আমার ভাইয়ের মত ভালোবাসে, আমি নীরব থাকবো; আর যদি বলে, আমাকে সে আমার ভাইয়ের চেয়ে বেশী ভালোবাসে, আমি বিরক্ত হবো। কারণ ভাইয়ের চেয়ে ভাইকে কেউ বেশী ভালোবাসতে পারে না; স্বার্থের কালো ছায়া উপরে এসে পড়ে তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

সাঈদ ওমরার অনুমতি নিয়ে এসেছিলো এবং দু'দিন ছিলো। এ দু'দিন আল্লাহর ঘরের ছায়ায় আমরা দুই ভাই যে সময়গুলো যাপন করেছিলাম, তা ছিলো আমাদের দু'জনেরই জীবনের অন্যতম মধুর সময়। দু'দিন পর আমার ভাই আপন কর্মস্থলে চলে গেলো তার অনেক কিছু আমার কাছে রেখে এবং আমার অনেক কিছু নিজের সঙ্গে নিয়ে। সে আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগের কথা।

অতীতকে সবসময় আমার শুভ্র-সুন্দর মনে হয় এবং অতীতের হাতছানি সবসময় আমাকে ব্যাকুল করে। ইচ্ছে হয় চিরকাল অতীতের কোলেই বাস করি। জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যতের চেয়ে জীবনের অতীতকে অনেক বেশী আপন মনে হয়। ভিতর থেকে কে যেন বারবার আকুল হয়ে ডাকে, হে সুন্দর অতীত! ফিরে এসো এবং তোমার কোলে আমাকে আশ্রয় দাও।

অধৈর্য হয়ে পড়েছো হে পাঠক! থাক তাহলে, চলো ফিরে যাই আমাদের আগ্রহের বিষয়ে।

***

হজ্ব শেষ হলো, আর আমাদের 'জোয়ান' হযরত হঠাৎ করেই যেন বার্ধক্যের কবলে পড়ে গেলেন; অর্থাৎ তিনি এমন গুরুতর অসুস্থ হলেন যে, আমরা সবাই শংকিত হয়ে পড়লাম। হাসপাতালে নেয়ার চিন্তা করা হলো, কিন্তু তিনি রাযি নন। সুতরাং ব্যক্তিগত চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এবং অচিন্তনীয়ভাবেই তার সুব্যবস্থা হয়ে গেলো। মক্কা শরীফে বাস করতেন মধ্যবয়সের এক বাঙ্গালী ডাক্তার, সম্ভবত জনাব আখতার ফারূক ছাহেবের পরিচিত। নামটা ভুলে গেছি, তবে তিনি তার পেশাগত ভীষণ ব্যস্ততার মাঝেও যে মুহাব্বাতের পরিচয় দিয়েছেন তা ভোলার মত নয়। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটে এলেন এবং হযরতের রুচি, ইচ্ছা ও তবিয়তের পূর্ণ খেয়াল

রেখে চিকিৎসা করলেন। চিকিৎসা ও আন্তরিকতা দু'টোয় মিলে দু'দিনেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন, তবে দুর্বলতা ছিলো এরপর পুরো সফরেই।

শেষ পর্যন্ত হযরতের জন্য হুইলচেয়ার কেনা হলো। 'যুক্তির' পথ ত্যাগ করে হাজী সিরাজুদ্দৌলা ভক্তির পথ গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ 'অমুকের দায়িত্ব'-এর পরিবর্তে 'আমার সৌভাগ্য'-এ চিন্তা গ্রহণ করলেন, তবে অনেক বিলম্বে। আরো আগে হলে অনেক ভালো হতো!

মক্কা শরীফের অবশিষ্ট দিনগুলো হযরত হুইলচেয়ারে হারাম শরীফে আসা-যাওয়া করেছেন, তাহাজ্জুদে এবং অন্যান্য নামাযে। মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেব এবং আমি আনা-নেয়ার খেদমত আঞ্জাম দিতাম। এ সৌভাগ্যের জন্য সবসময় আল্লাহর শোকর আদায় করি। আমার খুবই আনন্দ হতো যখন তাহাজ্জুদের সময় হযরত হুইলচেয়ারে বসে আমাকে ডাক দিতেন, আর আমি দৌড়ে এসে হুইলচেয়ারের হাতল ধরতাম। তিনি প্রথমে আমাকে ডাকতেন, না পেলে মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেবকে। রাতে আমি হারাম শরীফে থাকতাম এবং তাঁকে আনার জন্য তাহাজ্জুদের কিছু আগে বাসায় যেতাম। একদিন পৌঁছতে বিলম্ব হলো। পথে দেখি, হযরত আসছেন। মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেব কোন প্রয়োজনে হযরতকে আমার 'হাওয়ালা' করে বাসায় ফিরে গেলেন।

সেদিনটির কথা বিশেষভাবে মনে আছে এজন্য যে, সেদিন হারামে যাওয়ার পথে হযরত বলেছিলেন, 'তোমরা এখন জোয়ান। এখনই তোমাদের ইবাদত করার আসল সময়। এই দেখো না, আমাদের মত বুড়োদেরকে তো ঠেলে ঠেলে নিতে হয়। এখন তো দিলে অনেক শওক পয়দা হয়, কিন্তু মাযুরির জন্য পারি না। জোয়ানির সময় তো ত্রিশ চল্লিশটি পর্যন্ত তাওয়াফ করেছি। এখন তোমরা বেশী বেশী তাওয়াফ করবা। হযরত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আজ কয়টি তাওয়াফ করেছি। উত্তর শুনে তিনি উপরের কথাগুলো বলেছিলেন।

হাজী মীযানের বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর কিছু দূর যেতেই একটি বড় 'বাক্কালা' ছিলো। বাক্কালা মানে তরিতরকারি বিক্রেতা। এ দোকানগুলোতে কোমল পানীয় এবং প্রয়োজনীয় সবকিছু পাওয়া যায়। বাক্কালার কাছে আসার পর হযরত বলতেন, 'মুশাক্কাল আছেনি?'

আমি দৌড়ে গিয়ে মুশাক্কাল আনতাম। তিনি খেয়ে কিছু অংশ আমাকে দিতেন। এটা তাঁর এত প্রিয় ছিলো যে, চেহারায় তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠতো।

একদিন বাসায় যাওয়ার পথে মুশাক্কাল নিয়ে গিয়েছিলাম। নির্দিষ্ট স্থানে আসার পর হযরত কিছু বলার আগেই মুশাক্কাল সামনে বাড়িয়ে দিলাম। তিনি খুব খুশী হলেন এবং অনেক দু'আ দিলেন।

তিনি পছন্দ করতেন, মুশাক্কাল আমারও খুব প্রিয় হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তী সফরগুলোতে দোকানে দোকানে অনেক তালাশ করেছি, কত রকমের পানীয় ছিলো,

হযরতের প্রিয় সেই মুশাক্কাল আর ছিলো না। কীভাবে যে এটা বাজার থেকে এমন উধাও হলো, আল্লাহ জানেন!

***

মক্কা শরীফের বালাদিয়ার প্রধান শায়খ আব্দুল আজীজ অত্যন্ত শরীফ ও মেহমান নেওয়ায ব্যক্তি। মক্কায় তার বেশ সুনাম শুনেছি। হযরতকে তিনি তার বাড়ীতে আড়ম্বরপূর্ণ এক নৈশভোজে আপ্যায়িত করলেন। মক্কার উপকণ্ঠে বিরাট এলাকা জুড়ে তার ছিমছাম দোতালা বাড়ী। যে পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো তার দু'পাশে এবং 'আইল্যান্ড'-এ সবুজ গাছের সারিগুলো ছিলো দেখার মত। বাড়ীটা ছিলো বাগানঘেরা। ছোট বড় বিভিন্ন গাছ সুন্দর করে ছেঁটে রাখা, যেন শিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়া পেয়ে আকর্ষণীয় বিভিন্ন নকশা ফুটে উঠেছে। যমিন সবুজ ঘাসের চাদরে আচ্ছাদিত। এই সবুজায়নের জন্য যে কী পরিমাণ অর্থ ও যত্ন ব্যয় করতে হয়েছে, না দেখলে বোঝা যাবে না। তবে একথা সত্য যে, মরুপরিবেশে এমন সবুজবেষ্টিত বাড়ী আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। মক্কার উপকণ্ঠে নিজের জন্য এমন একটি মনোরম বাড়ীর, বলতে সংকোচ নেই, মনে আকাঙ্ক্ষা জেগেছিলো।

খাবারের আয়োজন ছিলো বিপুল এবং পরিবেশন ছিলো আন্তরিক। অবশ্য কোন আরব-দস্তরখানেই এ জিনিসটির অভাব হয় না; যদিও মাত্রায় তারতম্য হয়। অপচয় এখানেও ছিলো। খাবারের অপচয় এখন আরবসমাজে সর্বত্র। এমনকি বাংলাদেশী (এবং পাকিস্তানী ও ভারতীয়) প্রবাসীরাও অপচয়ব্যাধিতে কমবেশী আক্রান্ত। সবাই নিজ নিজ সচ্ছলতা অনুপাতে অপচয় করে। পুরো সফরে এ অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য, বিশেষত হযরতের জন্য ছিলো অত্যন্ত মর্মপীড়ার কারণ। কোন কোন বাঙ্গালী ও পাকিস্তানী মেযবানকে তিনি এ বিষয়ে সতর্কও করেছেন।

এখানে সত্যের খাতিরে বলতে হয়, হযরত ও তার সফরসঙ্গীদের কাছে ইরানের অভিজ্ঞতা শুনেছি অন্যরকম। সেখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও নাকি কোন প্রকার অপচয় দেখা যায়নি। প্রেসিডেন্ট খামেনিকে তারা দেখেছেন, দস্তরখানে পড়ে থাকা অন্যের খাওয়া রুটি তিনি স্বচ্ছন্দে খেয়ে যাচ্ছেন।

এখানেও দস্তরখানের পরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এবং হযরতের কথিত ইরান-ইরাক সন্ধিপ্রচেষ্টার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, শায়খ আব্দুল আযীয যেমন কঠোর শিয়াবিরোধী, তার পরিবারের তরুণ প্রজন্ম ঠিক তার বিপরীত। মুখে তারা কিছু বলেনি, কিন্তু অভিব্যক্তি থেকে পরিষ্কার ছিলো, শিয়াদের আধ্যাত্মিক নেতা খোমেইনীর ব্যক্তিত্বের জাদু তাদের মাঝে যথেষ্ট কাজ করছে। সউদী রাজতন্ত্রের প্রতি তারা সন্তুষ্ট নয়। আমার মনে হয়েছে, এ প্রবণতা শুধু শেখ আব্দুল আযীযের পরিবারে সীমাবদ্ধ নয়। একটা সময় হয়ত আসবে যখন রাজতন্ত্রের ভিত্তিমূলে নাড়া পড়বে। ভিতরে ভিতরে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে এবং বিক্ষোভের উপাদান সঞ্চিত হচ্ছে। আজ হোক, কাল হোক সউদী রাজতন্ত্রের অবসান অনিবার্য। পতন শব্দটি এখানে আমি সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেলাম।

***

বাইতুশ্-শরফের পীর মাওলানা আবদুল জাব্বার এবং জামাতে ইসলামীর (তখন ইত্তেহাদুল উম্মাহর আড়াল ব্যবহার করা হতো) দেলোয়ার হোসায়ন সাঈদী হযরতের আস্তানায় হাযির হলেন। তারা আবেদন করলেন যে, আপনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশে আমরা ইসলামী আন্দোলন করতে চাই।

অন্যরা যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেও হযরত ছিলেন নিস্পৃহ। কারণ এসব 'ঐক্যের ডাক'-এর প্রকৃতি তাঁর অজানা ছিলো না। অতীতের ওলামায়ে কেরামের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তিনি খুব জানতেন। এবিষয়ে তিনি একটি মৌলিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন; অর্থাৎ আকীদা ও বিশ্বাসের প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখে শুধু আন্দোলনের ঐক্য অর্থহীন। তাই তিনি মৃদু হেসে এই বলে আলোচনার ইতি টেনে দিলেন–

'ইসলামী আন্দোলন তো অনেক করেছেন। আমি তাওবার ডাক দিয়েছি, এখন আসেন অতীতের সকল ভুলভ্রান্তির জন্য তাওবা করে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন-নবুয়ত (নবুয়তের তরীকায় খিলাফাত) প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করি।

সেদিন একটি মজার ঘটনা হলো। বাইতুশ্-শরফের পীর সাহেব বললেন, 'হুযূরের জন্য আমি ডিনারের ব্যবস্থা করতে চাই।'

হযরত তাজ্জব হয়ে জানতে চাইলেন, 'ডিনার কেয়া চীজ হায়?!'

আমি বললাম, হযরত এটি ইংরেজি শব্দ। ইংরেজরা রাতের খাবারকে ডিনার বলে। পীর সাহেব আপনাকে রাতের খাবারের দাওয়াত দিচ্ছেন। শব্দটা যে হযরতের পছন্দ হয়নি, চেহারার অভিব্যক্তি থেকেই বোঝা গেলো। পরে তিনি বলেছিলেন, 'এ সমস্ত লোকেরাও ইংরেজি আলফাযের বিমারিতে মোবতালা হয়ে পড়েছে।'

পীর সাহেবের 'ডিনার' অবশ্য হযরত কবুল করলেন। আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় দিক থেকেই সেটা ছিলো সত্যিকারের 'ডিনার'। শুধু চেয়ার-টেবিল ছিলো না। নচেৎ কাঁটা চামচও সগৌরবে বিরাজমান ছিলো।

ইসলামী আন্দোলনওয়ালা দস্তরখানেরও একই দশা। এখানেও খাদ্যের অপচয় হলো। সব খাবার একসাথে জড়ো করে পলিথিনে ভরে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য সত্যি মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিলো। আসলে মেহমানের সংখ্যা অনুপাতে খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করা হলেই আর অপচয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় না। কেন যে এটা খেয়াল রাখা হয় না কে বলবে!

***

হজ্বের তিন চার দিন পর শায়খ বিন বাযের পক্ষ হতে পুনরায় যোগাযোগ করা হলো। বিন বায তাঁর মিনাস্থ বাড়ীতে হযরতকে দাওয়াত করলেন। হজ্ব উপলক্ষে আগত বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিশিষ্ট আলিমদেরও দাওয়াত করা হয়েছিলো। পৃথিবীর প্রায় সবদেশের আলিম-ওলামার এই সম্মানিত মজলিসটি অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ও মর্যাদামণ্ডিত ছিলো। শায়খ বিন বায হযরতকে তাঁর পাশে বসিয়ে আলাদা সম্মান জানালেন। পুরো মজলিসে তাঁকে মনেও হচ্ছিলো স্বমহিমায় ভাস্বর ও জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

একে একে সকলে খুব তা'যীমের সাথে তাঁর সঙ্গে মুছাফাহ করলেন। পূর্বপরিচয় ছাড়া প্রথম দর্শনেই তাঁর নূরানী চেহারা ও জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্ব সবার অন্তরে শ্রদ্ধার আসন তৈরী করে নিয়েছিলো এবং তাঁরা তাঁর আধ্যাত্মিক মাকাম ও মর্তবা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

পাকিস্তানের মেহমান ছিলেন দু'জন, মাওলানা সালীমুল্লাহ খান ছাহেব এবং (সম্ভবত) মাওলানা সামীয়ুল হক ছাহেব। তারা হযরতের সঙ্গে এমন বিনীত আচরণ করলেন যে, আমি সত্যি অভিভূত হলাম। মাওলানা সালীমুল্লাহ খান ছাহেব তো পাকিস্তানের মুরুব্বী আলিম। তাঁর আখলাক ও শারাফাতের পরিচয় তো রামাযানেই পেয়েছি। এখন পাকিস্তানের তরুণ আলিম সামীয়ুল হক ছাহেবের আখলাক ও শারাফাত দেখার সুযোগ হলো এবং আমার মনে আবার সেই প্রশ্নটি কাঁটার মত বিঁধতে লাগলো; মাটি ও রক্তের প্রশ্ন, পূর্ব-পশ্চিমের স্বভাব ও চরিত্র এবং চিন্তা ও চেতনার আশ্চর্য পার্থক্যের প্রশ্ন। একবার দেখেছিলাম মাওলানা তাকী ওছমানী ছাহেবকে নূরিয়ার মসজিদে। হযরতের 'অনুরোধে' তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে তিনি বয়ান করলেন, কিন্তু হযরতের সামনে চেয়ারে বসতে কিছুতেই রাজি নন, বললেন, হযরতের হুকুম পালন করার জন্য কিছু কথা অবশ্যই আরয করবো, কিন্তু এই গোস্তাখি তো আমি করতে পারবো না।' শেষে হযরত একপ্রকার আদেশ করেই তাঁকে চেয়ারে বসালেন।

কেন এমন হয়? তারা পারে, আমরা পারি না?! কেন?! কেন?!

সেদিন শায়খ বিন বাযের দস্তরখানে পাকিস্তানের তরুণ মাওলানাকে হযরতের প্রতি যে পরম ভক্তিপূর্ণ আচরণ করতে দেখেছি তা তাঁর স্নেহধন্য অনেক ছাত্রকেও কমই করতে দেখেছি। আর শেষ জীবনে তো ...।

অনেক কষ্টের তাড়নায় লিখে ফেলা কথাগুলো আর মুছলাম না। হয়ত ভালোই হলো, কিংবা হয়ত মুছে ফেলাই ভালো ছিলো। কিন্তু হযরতের বেদনাদগ্ধ বুক থেকে বারবার যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হতো সেগুলো মোছবো কী দিয়ে!

আচ্ছা, চেষ্টা করেও কি আমরা আমাদের মাটি থেকে কিছু উপরে এবং আমাদের রক্ত থেকে কিছু ঊর্ধ্বে উঠতে পারি না!

যাক, ফিরে আসি মজলিস-প্রসঙ্গে। শায়খ বিন বায সমবেত মেহমানদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। তাতে তিনি উম্মাহকে সঠিক পথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে আলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করালেন। অবশেষে সকলের জন্য হজ্বে মাবরূর কামনা করে বক্তব্য সমাপ্ত করলেন।

'উদ'-এর সুগন্ধি আরবদের খুব প্রিয়, শুনেছি; এই প্রথম তার ব্যবহার দেখলাম। মজলিসের শুরুতে উদের সুগন্ধি দ্বারা মেহমানদের সুবাসিত করা হলো। আমাদের দেশে যেভাবে ধুপ জ্বালানো হয় উদের ব্যবহার মোটামুটি সেরকম। একজন সেবক মেহমানের সামনে গিয়ে উদজ্বালানো পাত্রটি ধরেন আর মেহমান মাথার রুমালের দুই প্রান্ত নাড়া দিয়ে উদের ধোঁয়া নিজের দিকে গ্রহণ করেন। প্রায় সকলেই দেখলাম বেশ অভ্যস্ত। সেবক যখন শায়খ বিন বাযের সামনে পাত্রটা ধরলো ঠিক তখনই তিনি

রুমালের দুই প্রান্ত দ্বারা ধোঁয়া গ্রহণ করলেন। তাঁর নৈপুণ্য ও সময়বোধ সত্যি বিস্ময়কর। উদের ধোঁয়া গ্রহণের দৃশ্যটা হয়ত নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না, তবে আমার কাছে তা বেশ চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে।

আরেকটা জিনিস দেখলাম, শায়খ বিন বাযের আহার গ্রহণ ছিলো অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। একটি খাদ্যকণাও এদিক-ওদিক পড়েনি।

আরবদের গাহওয়া আরো দু'এক মজলিসে খেয়েছি, কিন্তু শায়খ বিন বাযের দাওয়াতে পরিবেশিত গাহওয়া ছিলো সত্যি অতুলনীয় এবং সেই অতুলনীয় গাহওয়াই ছিলো মজলিসের সমাপ্তিপর্ব। তারপর মেহমানগণ বিদায় গ্রহণ করলেন। আমাদের বলা হলো, শায়খ হযরতের সঙ্গে কিছুক্ষণ একান্তে কথা বলতে চান।

শায়খ নিজেই জানতে চাইলেন, হজ্ব সম্পর্কে সউদী কর্তৃপক্ষের প্রতি তাঁর কোন পরামর্শ বা উপদেশ আছে কি না।

তিনি বললেন, আমি তো অন্য কাউকে চিনি না, আপনার সাথেও এ সফরেই প্রথম পরিচয়। আপনি পরামর্শ জানতে চেয়েছেন, এজন্য আমি খুশী হয়েছি। আপনার কাছেই আমি কিছু কথা রেখে যাচ্ছি; যদি গ্রহণযোগ্য মনে হয়, এগুলো কার্যকর করার চেষ্টা করবেন, আশা করি।

হযরতের পরামর্শগুলো ছিলো এরকম –

(ক) বিভিন্ন দেশ থেকে যারা আসে, অধিকাংশই হজ্বের হাকীকত ও রূহানিয়াত এবং আহকাম ও মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে হজ্ব আদায় করতে পারে না; অনেকের তো হজ্ব ফাসিদ হয়ে যায়; খবরও থাকে না, আর অনেকে হজ্ব করলেও হজ্বের মাকছাদ থেকে মাহরূম থেকে যায়।

সালাফিয়াতের যে সমস্ত কিতাব তাকসীম করা হয় তাতে বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের মাঝে আরো ইনতিশার (ও বিশৃঙ্খলা) পয়দা হয়। ফলে আলিমদের দ্বীনী কাজ করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। চার মাযহাবই যেহেতু হক সেহেতু প্রত্যেক দেশের হাজীদের মাঝে তাদের মাযহাব অনুযায়ী কিতাব তাকসীম করা উচিত, যাতে ইনতিশার না হয়। আর প্রতিবছর প্রত্যেক দেশ থেকে আহলেহক আলিমদের একটি জামাতকে সরকারী খরচে হজ্বে আনার ব্যবস্থা করা দরকার, যারা নিজ নিজ দেশের হাজীদের উপর মেহনত করবে, যাতে সকলের হজ্ব ছহীহ হয় এবং হজ্বের আসল মাকছূদ হাছিল হয়।

(খ) হারাম শরীফের এলাকায় গানবাজনার আওয়ায কানে আসে। এমনকি মসজিদে নববীর খুব কাছে গানের দোকান দেখা যায়। এ সমস্ত 'মুনকারাত' থেকে হারামাইন শরীফাইনকে পাক ছাফ রাখা লাযিম। পাঁচসাত বছর আগেও এরূপ অবস্থা আমার নযরে পড়েনি। খুবই আফসোসের কথা যে, এখানকার দ্বীনী হালাত দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে।

এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান হারামাইনের বাসিন্দাদের অন্য নযরে দেখে থাকে। এখানকার সবকিছু তারা জায়েয এবং অনুসরণযোগ্য মনে

করে। হারামাইন শরীফাইনে ক্যামেরা দ্বারা ছবি তোলার বিদ'আতও চালু হয়ে গেছে। খুব কঠিনভাবে এর 'রোকথাম' হওয়া দরকার।

(গ) হজ্বের যাবতীয় বিষয় সুষ্ঠুভাবে এবং শরী'আতের ছহীহ নাহ্জ (ও তারীকার) উপর আঞ্জাম দেয়ার জন্য মুসলিম জাহানের নির্বাচিত আলিম এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দ্বীনদার লোকদের একটি মজলিস গঠন করা খুব দরকার।

এ পর্যায়ে হযরত মৃদু হেসে বললেন, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, এটা আমার বিলকুল মুখলিছানা মশওয়ারা। সিয়াসাতের সাথে এর কোন তা'আল্লুক নাই, বরং 'আদ্দীনু আন-নাছীহাহ্'-এই হাদীছে নববীর উপর আমলের জাযবা থেকেই আমি আমার পরামর্শ দিয়েছি।

শায়খ বিন বায পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বললেন, 'আপনার ইখলাছ ও হিতাকাঙ্ক্ষার উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে এবং আপনার পরামর্শগুলো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত। তবে আপনি নিশ্চয় বর্তমান মুসলিম জাহানের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন, আর শেষ পর্যন্ত সউদী আরবও মুসলিম জাহানেরই অংশ। এখানেও আলিমদের বহু প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। তারপরো আপনার পরামর্শগুলো আমি গভীরভাবে চিন্তা করবো এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবো।

গান-বাজনা ও ছবি তোলার বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। এ বিষয়ে ইনশাআল্লাহ আমি ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।'

মিনা-আরাফায় হাজীদের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কেও হযরত কিছু পরামর্শ দিলেন। অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে প্রায় ত্রিশমিনিটের এই একান্ত আলোচনা সমাপ্ত হলো।

খুব আশ্চর্য হলাম যে, এত ব্যস্ততা ও দায়-দায়িত্বের মাঝেও শায়খ বিন বায প্রথম মজলিসের কথা মনে রেখেছেন। মাদরাসার পক্ষ হতে যে দরখাস্ত পেশ করার কথা ছিলো তা তিনি নিজেই স্মরণ করিয়ে দিলেন।

শায়খ তাঁর নামের একটি বিশেষ কার্ড দিয়ে বললেন, রাবেতার দফতরে এই কার্ড দেখিয়ে যোগাযোগ করা আপনাদের জন্য সহজ হবে।

হযরতের নায়েব হিসাবে মাওলানা আতাউল্লাহ হলেন মাদরাসার যিম্মাদার তিনি খুব জোর দিলেন যেন রাতের মধ্যেই দরখাস্ত তৈরী করে ফেলি। আমি বললাম, হযরতের ইজাযত ছাড়া তা সম্ভব নয়! আপনি ইজাযত হাছিল করুন, তারপর আমার কাজ। এবং সেখানেই দেখা দিলো জটিলতা। সউদী সরকারের কাছে হযরতের পক্ষ হতে, হোক তা মাদরাসার নামে, কোন দরখাস্ত পেশ করা ঠিক হবে কি না, এ প্রশ্ন তুললেন সফরসঙ্গীদের কেউ কেউ। প্রশ্নটা তুললেন বটে, অসুবিধাটা কী তা আর খোলাসা করে বললেন না। মাওলানা আতাউল্লাহ ছাহেব একাই মাদরাসার পক্ষে কথা বললেন এবং আমার নীরবতায় কিছুটা ক্ষুণ্ন হলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি অনুমতি আদায় করে নিলেন এবং ঐ রাত্রেই দরখাস্ত তৈরী করে ফারূক ভাইয়ের হাতে দেয়া হলো।

রামাযান থেকে হজ্ব পর্যন্ত ফারূক ভাই একা একা যদ্দুর পেরেছেন মাদরাসার কাজ করেছেন, আর দীর্ঘ দিন হারামাইনের প্রতিবেশী হয়ে যত পেরেছেন সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এজন্য তার প্রতি ঈর্ষা হয়। সৌভাগ্যের পথ তো খোলা ছিলো আমারও জন্য! কিন্তু কী করা যাবে- ঈঁ সা'আদাত বাযোরে বাযূ নিস্ত... এ সৌভাগ্য তো বাহুবলে অর্জন করা যায় না, যদি না দান করেন স্বয়ং ভাণ্ডারের মালিক। হারামাইন শরীফাইনের দীর্ঘ দিনের প্রতিবেশীরূপে আল্লাহ যে তাকেই কবুল করেছিলেন!

এর মধ্যে দেখা দিলো আরেকটি বিষয়। রাবেতার বাঙ্গালী কর্মকর্তা, যিনি হযরতের দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত ছিলেন এবং মিনা-আরাফায় হযরতের সঙ্গে ছিলেন, তিনি জানালেন, শায়খ বিন বায আমার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চান।

আমি তো অবাক এবং সত্যি অবাক! বললাম, হযরতের অনুমতি ছাড়া তো আমি যেতে পারি না। সুতরাং আগে বিষয়টি তাঁকে জানাই।

জানালাম, তিনি এই বলে অনুমতি দিলেন- মাদরাসার বিষয় হলে, প্রথম মজলিসে যে আলোচনা হয়েছে, সেই আন্দাযে কথা বলবা। আর সিয়াসী মুআমালা হলে বলবা, আমি তো এই ময়দানের মানুষ না। সুতরাং এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না। আর যদি রাবেতায় চাকুরির কথা বলেন (মৃদু হেসে) তাহলে সেটা তোমার এখতিয়ার।

আমি কিছুটা অভিমান করে বললাম, হযরত তো জানেন আমার জবাব কী হবে, তারপর এভাবে বলছেন কেন!

হযরত তাঁর মধুর হাসিটুকু অটুট রেখে বললেন, তোমার উপর হুকুমত চালানের তো দরকার নাই।

হযরত আরেকটা কথা বললেন, কোন মেহমানদারি বা হাদিয়ার মুআমালা আসলে মুনাসিব ওযর পেশ করে দিবা'।

এই হলেন আমাদের হাফেজ্জী হুযূর! এমনই ছিলো তাঁর বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টি! তিনি যখন নিজের থেকে বলতেন, তখন জটিল থেকে জটিল প্রশ্নের জবাব শুনে সবাই হয়রান হতো! পরিষ্কার বোঝা যেতো, তিনি বলছেন না, তাঁর ভিতর থেকে কেউ বলছে। আর যখন 'মশওয়ারা' শামিল হতো তখনো বোঝা যেতো, তিনি বলছেন না, বাহির থেকে অন্য কেউ বলছে। হযরতের দুর্বলতা ছিলো শুধু এই যে, একান্ত আপন যারা তাদের কথা তিনি খুব কমই এড়াতে পারতেন। শরী'আতের সীমার ভিতরে হলে তিনি তা রক্ষা করতে চাইতেন, এমনকি নিজের ইচ্ছা ও মতের বিপরীত হলেও। এটা তাঁকে অনেক ভুগিয়েছে। বিশেষ করে জীবনসায়াহ্নে, যখন তিনি জাতীয় দায় ও দায়িত্বের এক জটিল অধ্যায় অতিক্রম করছিলেন। আপনজনেরা যদি হস্তক্ষেপহীন থাকতেন এবং শুধু আনুগত্য করে যেতেন তাহলে এদেশে ইসলামী রাজনীতির ইতিহাস আজ অন্যরকম হতো। কিন্তু সারা জীবন হযরত আর যাই পেয়েছেন, আপনজনদের পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মনিবেদন পাননি। সবাই তাঁকে ভালোবেসেছেন, সত্য এবং তার অনুগত থেকেছেন, এটাও সত্য, তবে তা ছিলো নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির

উপর। সম্মানজনক ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিলো, কিন্তু পরিস্থিতির সামনে তারাও ছিলেন অসহায়।

কোত্থেকে কোথায় চলে এলাম! যাক, ঐ ভদ্রলোক আমাকে শায়খ বিন বাযের দফতরে নিয়ে গেলেন। দাওয়া ওয়াল ইরশাদ-এর দফতর আলিশান এক ইমারতে। এটা আঞ্চলিক দফতর, সদর দফতর হলো রিয়াদে। আঞ্চলিক দফতরের শানশওকত দেখেই আমি অবাক। করিডোরেও মূল্যবান গালিচা। আমার খুব ভালো লাগলো এটা দেখে যে, শায়খের নিজস্ব কক্ষটির সাজসজ্জা ছিলো যথেষ্ট স্বাভাবিক। নাস্তা ও গাহওয়া পেশ করা হলো। আমি বিনয়ের সাথে অপারগতা প্রকাশ করলাম।

আমাকে চমকে দিয়ে শায়খ বিন বায প্রথম যে প্রশ্নটি করলেন তা হলো, শায়খের সঙ্গে তুমি শুধু ইরাকে যাচ্ছো যে? ইরান সফরে যাওনি কেন?

বললাম, আমি আসলে মাদরাসার তালিবে ইলম; আরবী ভাষার খেদমতই হচ্ছে আমার মূল মাশগালা। ইরান বা ইরাক কোন সফরেই আমার থাকার কথা নয়। আমাদের মাদরাসা থেকে আমার সম্পাদনায় ছোটদের আরবী শিক্ষার জন্য 'ইকরা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেই সুবাদে বাংলাদেশস্থ ইরাকী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি আমার বাগদাদ সফরের ব্যবস্থা করেছেন।

শায়খ বললেন, আমি যদ্দুর জেনেছি এবং বুঝেছি, তোমাদের শায়খ তাকওয়া ও ইখলাছের অতি উচ্চ স্তরের মানুষ। বাংলাদেশের মুসলমানদের দিলে তাঁর বিরাট মাকাম রয়েছে। আমি চাই শায়খকে তাঁর দ্বীনী কাজে সহযোগিতা করতে। কিন্তু আমার আশংকা, শায়খ দেশে ফিরে যাওয়ার পর এমন কোন পরিস্থিতি না সৃষ্টি হয়, যাতে তাঁর উপর শিয়াদের প্রতি সমর্থনের 'ধাব্বা' এসে যায়। তখন অনেক সদিচ্ছা সত্ত্বেও কোন সহযোগিতা করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

তোমাকে বিচক্ষণ যুবক মনে হয়; আমি চাই, এ বিষয়ে শায়খকে তুমি 'আদ্দীনু আন-নাছীহাহ' হিসাবে সঠিক পরামর্শ দেবে।

আমি বললাম, আমাদের শায়খ তাঁর দ্বীনী দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। আমি আপনার কথা মনে রাখার চেষ্টা করবো।

বিদায় মুছাফাহার সময় আমি বললাম, যদি কিছু মনে না করেন, আমি নিজের ব্যবস্থায় হারামে ফিরে যেতে পারবো, গাড়ীর বা পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হবে না।

তিনি যথেষ্ট অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমি নিজের ব্যবস্থায় অর্থাৎ পায়ে হেঁটে হারাম শরীফে ফিরে এসেছিলাম। সময় লেগেছিলো, তবে অনেক ভালো লেগেছিলো।

হযরত তাঁর অন্তর্দৃষ্টি থেকে হাদিয়ার যে কথাটা বলেছিলেন সেটারও সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছিলো। অর্থাৎ দাওয়া বিভাগ থেকে বিভিন্ন দেশে অযিফাভুক্ত দাঈ নিযুক্ত করার একটি নিয়ম আছে। তো আমার সামনে কাগজপত্র পেশ করা হয়েছিলো দাঈর দায়িত্ব গ্রহণ করে স্বাক্ষর করার জন্য। আমি হযরতের আদেশ অনুযায়ী বিনয়ের সাথে অপারগতা প্রকাশ করেছিলাম। এতে ওখানকার কর্মকর্তারা বেশ অবাক হয়েছিলেন। সম্ভবত এটাই ছিলো তাদের এধরনের প্রথম অভিজ্ঞতা।

ফিরে আসার পর হযরত আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। আমি নিজে থেকে যখন বলতে চাইলাম তখন তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, থাক এ বিষয়ে জানার প্রয়োজন নেই।

আমি কিছু বুঝতে না পেরে কিছুটা পেরেশান হলাম। হযরতকে আর কিছু বলা হলো না।

***

হজ্বের দু'তিন দিন পর হযরতের ইরাক সফরের প্রস্তুতি শুরু হলো। দায়িত্ব ছিলো মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ছাহেবের উপর। তিনি আমার প্রতি যথেষ্ট স্নেহশীল ছিলেন। জেদ্দাস্থ ইরাকী দূতাবাসে যাওয়ার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেখানে অত্যন্ত কর্মব্যস্ততা ছিলো। অভ্যর্থনায় গিয়ে ঢাকাস্থ ইরাকী রাষ্ট্রদূতের পত্র হস্তান্তর করার পর আমাদের উপস্থিতি বেশ গুরুত্ব লাভ করলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা মাননীয় রাষ্ট্রদূতের কক্ষে প্রবেশ করলাম। তিনি আন্তরিক উষ্ণতার সঙ্গে 'করমর্দন' করলেন এবং কোমল পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। আমরা ইরান সফর করেছি কি না জানতে চাইলেন। উত্তর শুনে মনে হলো, কিছুটা বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি যে একজন পেশাদার কূটনীতিক সেটা প্রকাশ পেলো তার বিস্ময়পরবর্তী সংযম থেকে। তিনি শুধু বললেন, আপনাদের ইরাকসফর সুখময় হোক। বাগদাদের 'পানি ও বাতাস' আপনাদের ভালো লাগুক। 'বারুদের গন্ধ' যেন আপনাদের কষ্টের কারণ না হয়।

মাননীয় রাষ্ট্রদূতের কথা আমার খুব ভালো লাগলো। মানুষের হাসিমুখ এবং মুখের কোমল-সুন্দর কথা সারা জীবন মনে থাকে। মানুষের কথায় মানুষ যখন খুশি হয় নিজের অজান্তেই তার প্রতি অন্তর থেকে শুভ কামনা উৎসারিত হয়। একটি হাসি এবং একটি কোমল কথার জন্য কিন্তু কোন কিছু ব্যয় করতে হয় না! অনেক মানুষের মুখের স্নিগ্ধহাসি এবং মিষ্টি কথা আমার মনে দাগ কেটে আছে। তাদের সাথে হয়ত জীবনে আর দেখা হবে না, কিন্তু হৃদয়ে তাদের স্মৃতি জাগরূক থাকবে। অন্যরকম কিছু মানুষের কথাও মনে আছে। তাদের কোন ক্ষতি হতো না, যদি একটি হাসির ফুল তারা আমাকে উপহার দিতো, দেয়নি, বরং তাদের মুখের অপ্রসন্নতা অন্তরে কাঁটা হয়ে বিঁধেছে। সেই সব স্মৃতি এখনো ভুলতে পারি না।

ঢাকায় সউদী রাষ্ট্রদূত যথেষ্ট সৌজন্যমূলক আচরণ করেছিলেন এবং সময়সংকটের মুখে খুব দ্রুত আমার ভিসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তবে স্নিগ্ধ হাসিটি উপহার পেয়েছিলাম জেদ্দায় ইরাকী রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে। সেটি এখনো আমার বুকে স্নিগ্ধতার পরশ বুলিয়ে দেয়।

প্রিয় পাঠক, হজ্বের সফরনামা হয়ত হাসির ফযিলত বয়ান করার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। কিন্তু তোমার সঙ্গে অন্যত্র আর দেখা হবে কি না তা তো জানি না। তাই এখানেই তোমাকে বলে রাখলাম, মানুষের প্রয়োজন পুরা করতে পারো বা না পারো, তার সাথে হাসি মুখে কথা বলার চেষ্টা করো। যদ্দুর মনে পড়ে, হাদীছ শরীফে এটাকে ছাদাকা বলা হয়েছে।

আচ্ছা, মূল প্রসঙ্গে আসি, কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিসাসংক্রান্ত যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ে গেলো। এ সময়টুকু আমরা সেখানেই অপেক্ষা করলাম।

আমার সামনে টেবিলের অপর প্রান্তে যে মানুষটি বসা তিনি একটি সম্পদশালী ও সমৃদ্ধ আরব দেশের প্রতিনিধি। তার পোশাকে আরবপরিচয়ের কোন ছাপ নেই, কিন্তু ভাষা বিশুদ্ধ, যাকে বলে একেবারে কোরআনের আরবী! আচরণেও রয়েছে আরবীয় আভিজাত্যের স্ফূরণ। ঢাকায় ইরাকী রাষ্ট্রদূতকে যেমন দেখেছি, এখানেও দেখলাম, সাবলীল ওঠা-বসা, গতিশীল চলা-ফেরা এবং সৈনিকসুলভ উদ্যম। পক্ষান্তরে সৌদী দূতাবাসে দেখেছি রাজকীয় হালচাল। সবকিছু যেন চলে হেলে দুলে, আয়েশী আন্দাযে। এ পার্থক্যটা আমার চোখে স্পষ্টই ধরা পড়েছে। কোন আয়েশী জাতি কখনো কোন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকবেলা করতে পারে না। আবুধাবিতে দু'একজন আরব শায়খ দেখেছি, সউদী আরবেও দেখেছি এবং হতাশ হয়েছি। উদ্যম -উদ্দীপনা নেই, সতেজ-সবল অভিব্যক্তি নেই। মেদবহুল শরীরে কেমন যেন জমাট বাঁধা আলস্য। বাংলাদেশে লোকেরা বলে, ভাতের একটা দানা টিপলেই পুরো হাঁড়ির খবর জানা যায়। এটা সত্য হলে বলতে পারি, আরব শায়খদের অবস্থা আমার জানা হয়ে গেছে এবং জানা হয়ে গেছে ইরাকী আরবদের অবস্থাও। আরব শায়খরা হয়ত ধার্মিক, তবে ভীষণ অলস। অলস ধার্মিক, কিংবা ধার্মিক অলস। ইরাকীরা –সরকারী পর্যায়ে– ধর্ম থেকে হয়ত অনেক দূরে, তবে সতেজ-সবল, উদ্যমী ও কর্মতৎপর।

ঢাকায় ইরানী রাষ্ট্রদূত, আয়াতুল্লাহ জান্নাতী ও অন্যান্যদের দেখে যদ্দুর বুঝেছি, জাতি হিসাবে ওরা দক্ষ ও পরিশ্রমী এবং নিজেদের ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে যথেষ্ট ধার্মিক। তাই ইরাক-ইরান যুদ্ধ চলছে সেয়ানে সেয়ানে, আর শায়খশাসিত আববদেশগুলো, মতের ও পথের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও, শুধু ইরানের ভয়ে ভীত হয়ে ইরাককে সাহায্য করে চলেছে অকাতরে। ইরাকের যুদ্ধব্যয়ের সিংহভাগই বহন করছে কুয়েত, সউদী আরব এবং আরব আমিরাত। কিন্তু এরা সম্মিলিতভাবে সম্ভবত তিন দিনও টিকে থাকতে পারবে না ইরানের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে।

আফসোস, তুলনাটা আমাকে করতে হলো মুসলিম দেশগুলোর মাঝে। কারণ অভিশপ্ত ইহুদিরাষ্ট্র ইসরাইল মনে হয় এখন আমাদের কারো শত্রু নয়। এখন আমরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু। আরো আশ্চর্য, আমেরিকা এখন ইরাক ও অন্যান্য আরবদেশের খুব কাছের বন্ধু; অর্থ ও অস্ত্রের যোগান যদিও যায় তেল আবিবে!

ইরাক এবং ইরান, দু'টি মুসলিম দেশই যখন নিজেদের মাঝে হানাহানি ও রক্তক্ষয় করে দুর্বল ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে তখন! তখন হয়ত শুরু হবে আসল খেলা! তারপরো যদি হুঁশ ফিরে আলখেল্লাওয়ালাদের!

এসব কথা ভাবছিলাম মাননীয় রাষ্ট্রদূতের কক্ষে ভিসার কাগজপত্র তৈরী হওয়ার অপেক্ষায় বসে থেকে। চিন্তার জগতে অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম, খান ছাহেব আমাকে জাগালেন, 'চলুন মেছবাহ, আমাদের কাজ হয়ে গেছে।'

মাননীয় রাষ্ট্রদূত উঠে দাঁড়িয়ে উষ্ণ করমর্দন করে বললেন, আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা, শায়খ ও তাঁর সফরসঙ্গীদের আমার বাসায় দাওয়াত করি এবং সবার সঙ্গে পরিচিত হই।

খান ছাহেব বললেন, আপনার আকাঙ্ক্ষার কথা শায়খকে জানাবো। আশা করি, তিনি আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে খুশী হবেন।'

শেষ কথাটুকু খান ছাহেব না বললেই ভালো করতেন। কারণ হযরতের সফরসঙ্গীদের, দ্বিমতের কারণে ইরাকী রাষ্ট্রদূতের দাওয়াত শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি ছিলো যথেষ্ট পীড়াদায়ক। আমরা যে দেশ সফর করতে যাচ্ছি সে দেশের মাননীয় রাষ্ট্রদূত হযরতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় দাওয়াত দিয়েছেন, সে দাওয়াত গ্রহণ করা মনে হয় সৌজন্যের ন্যূনতম দাবী ছিলো। সেটা আমরা কেন করলাম না, করলে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথে সেটা কিসের বাঁধা হতো তা আমার বুঝে আসেনি। তবে এ বিষয়ে আগে বেড়ে কিছু বলা সমীচীন মনে হয়নি, তাই কিছু বলিনি। শুধু ভেবেছি, আমাদের বড় হওয়ার এখনো অনেক দেরি; এখনো আমাদের শেখার অনেক বাকি।

***

আমার ইরাকসফর নিয়ে অপ্রত্যাশিত এক বিপত্তি দেখা দিলো। হযরত একান্তে ডেকে বললেন, তুমি ইরাকে না গেলে ভালো হয়। আমি তো হতভম্ব! বুঝলাম না, কীভাবে কী হলো! কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্য। আমি পূর্ণ ইতমিনানের সাথে আরয করলাম, হযরত! আমি তো বাংলাদেশে ইরাকী ছাফীরকে বলেই এসেছি যে, আমার হযরত অনুমতি দিলে যাবো, নইলে নয়। আজও তো আপনার অনুমতিতে জেদ্দা গিয়েছি। আমার যা কিছু আগ্রহ তা হলো আপনার ছোহবত। নচেৎ আমি তো এই সফরের চেয়ে আল্লাহর ঘরে আরো কিছুদিন থাকতে পারাকে অনেক বেশী কিসমতের মনে করি।

হযরত খুশী হলেন এবং জাযাকাল্লাহু বললেন। বলতে বাধা নেই, মনে মনে আমি উৎফুল্লই হলাম যে, আরো কিছু দিন আল্লাহর ঘরে থাকার সৌভাগ্য হবে। কিন্তু খান ছাহেব জানতে পেরে বেশ ক্ষুব্ধ হলেন। সম্ভবত বিষয়টিকে তিনি অন্যভাবে নিয়েছিলেন। তিনি কাকে কীভাবে কী বললেন, জানি না; শুধু ফলাফলটা জানলাম। অর্থাৎ আমার ইরাকসফর যাদের পছন্দ ছিলো না, এখন সেটা তাদের পছন্দ হলো এবং পরের দিন হযরত বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। আমি বললাম, জ্বি আচ্ছা, আপনি যা বলবেন তাই করবো।

বলতে ভুলে গেছি। ইরাকী দূতাবাস থেকে বের হওয়ার পর একটি কুতুবখানায় গিয়েছিলাম। আমার অনুরোধে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ছাহেব নিয়ে গিয়েছিলেন। জিদ্দার প্রাণকেন্দ্রে দোতালা বাণিজ্যিক কুতুবখানা। এত বিশাল হতে পারে কোন কুতুবখানা এবং সেখানে এতো মানুষের সমাগম হতে পারে কল্পনায়ও ছিলো না।

আমার ধারণা ছিলো, সউদীরা এখন কিছুই পড়ে না, না ভালো না মন্দ। এখানে এসে সেই ধারণায় কিছু পরিবর্তন করতে হলো।

শিশুসাহিত্য যেহেতু আমার প্রধান আগ্রহের বিষয় সেহেতু প্রথমেই 'রোকনু আদাবিল আতফাল'– (শিশুসাহিত্যকর্নার)-এ গেলাম। সেখানে আবার শিশু-কিশোর পত্রিকার আলাদা শাখা। ঘুরে ঘুরে দেখছি আশ্চর্য এক জগৎ। আগে শুধু 'মাজিদ' পত্রিকাটির সাথে পরিচয় ছিলো। এটি শিশু-কিশোরদের সাপ্তাহিক পত্রিকা। এখানে দেখি বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত অসংখ্য আরবী পত্রিকা এবং সবই শিশু-কিশোরদের জন্য। একটি মাসিক পত্রিকার নাম 'বাসিম'। একটি ইরাকী পত্রিকার নাম আল-মিযমার। সিরিয়া থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকা হলো 'আত্তিফলুল আরাবী' (আরবশিশু)। সবক'টি পত্রিকার ভাষা আরবী, কিন্তু বিষয়বস্তু! না আরবী, না ইসলামী! আগাগোড়া পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্ধঅনুকরণ। মাত্র বিশ পঁচিশ গজের সংক্ষিপ্ত একটি কোণায় দাঁড়িয়েই আমি যেন দিব্য চোখে দেখতে পেলাম, আজকের আরবশিশু কোন পরিবেশে, কোন সংস্কৃতিতে এবং কী মনমানসিকতায় গড়ে উঠছে! সুতরাং আরব-জাহানের আগামী নেতৃত্ব কাদের হাতে যাবে!

একটি পত্রিকায় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে। বিজয়ী দশজনকে আমেরিকার 'ডিজনি ওয়ার্ল্ড' ঘুরিয়ে আনা হবে, এবং পত্রিকাটি সউদী আরব থেকে প্রকাশিত। তবেই বুঝুন! দুঃখের বিষয়, পত্রিকাটির নাম এখন মনে নেই।

একটি পত্রিকা শুধু পেলাম কুয়েত থেকে প্রকাশিত নাম 'আত্তিফলুল মুসলিম'। 'আরবশিশু' ও 'মুসলিম শিশু'-এর মাঝে কী বিরাট পার্থক্য! চাকচিক্যে ও জৌলুসে, প্রাচুর্যে ও সৌকর্যে এবং প্রচারে ও প্রসারে। 'আরবশিশু' যেন পর্বতচূড়ায়, আর 'মুসলিম শিশু' পাদদেশে!

এখানেই আমি প্রথম দেখতে পাই লেডিবার্ডের শিশু-কিশোর আরবী গ্রন্থ সিরিজ। প্রধানত ইংরেজি থেকে আরবী অনুবাদ এবং আদর্শ অনুবাদ। সকল বিচারেই বইগুলো শিশুদের জন্য। শিশুদের রুচি ও মনমানস অনুযায়ী শিশুদের ভাষায় লেখা। পক্ষান্তরে ইসলামী শিশুসাহিত্যের নমুনাও দেখলাম। লেখা হয়েছে ছোটদের জন্য, তবে বড়দের ভাষায় এবং সবকিছুতেই দৈন্যের ছাপ বড় প্রকট।

একটা বিষয় বাংলাদেশে যা দেখে আসছি এখানেও তাই দেখলাম। যারা ধর্মবিরোধী, কিংবা নিদেনপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ, কলম তাদেরই হাতে এবং সাহিত্য তাদেরই দখলে। পক্ষান্তরে ইসলামপ্রিয় যারা কলম তাদের দুর্বল এবং সাহিত্যে তারা বে-দখল।

উদাহরণস্বরূপ, রুশসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অনুবাদ রয়েছে বাংলায়, তার মধ্যে শিশুসাহিত্যও রয়েছে। ভাষা ঝরঝরে, ছাপা ঝকঝকে! চোখ যেমন জুড়িয়ে দেবে, তেমনি মন-মগজ কেড়ে নেবে।

অনুবাদ ছাড়া মৌলিক শিশুসাহিত্যও তাদের হাতে রচিত হয়েছে প্রচুর। সেগুলোর ভাষা যেমন উন্নত তেমনি বাংলাদেশের বৈষয়িক সামর্থ্যের বিচারে ছাপাও সুন্দর।

পক্ষান্তরে ইসলামী শিশুসাহিত্য সামান্য যা আছে সেগুলোর তুলনায় কোন সাহিত্যই নয়।

এখানে আরবদেশেও একই অবস্থা। উদাহরণস্বরূপ, পাশ্চাত্যের প্রকাশনা সংস্থা শুধু এক লেডিবার্ড আরবী ভাষায় যে শিশু-কিশোর সাহিত্যসম্ভার তৈরী করেছে তার তুলনায় ইসলামী শিশুসাহিত্য কোন হিসাবেই আসতে পারে না। আসলে ওরা জানে শিশু-কিশোরদের মনমানস ও চিন্তা-চেতনা কিভাবে দখল করতে হয়। ওরা জানে, আমরা জানি না। তাই নিরন্তর ওরা এগিয়ে চলেছে, আমরা অলস বসে আছি। ওদের কাছে সাহিত্য হলো সাধনার বিষয়, আমাদের কাছে নিছক লেখার বিষয়।

আমরা ভাবি, কিছু একটা লিখলেই সাহিত্য হয়ে যায়, বাতিল সাহিত্যের মোকাবেলায় অতটুকুই যথেষ্ট। আসলেই কি তাই! বিষয়টি কি এত সহজ, এত সরল!

আমার হাতে যদি পঁয়সা থাকতো, এখান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বই সংগ্রহ করতাম, কিন্তু সাধ ও সাধ্যের সেই চিরকালীন পার্থক্য এখানেও বাধা হয়ে দাঁড়ালো। অনেক ভেবেচিন্তে খান ছাহেবকে বললাম, তিনি সানন্দে লেডিবার্ডের তিনচারটি বই 'কিনে' দিলেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানালাম। এখন (এই সফরনামা লেখার সময়) আমার কাছে আরবী শিশুসাহিত্যের উপর লেডিবার্ডের শতাধিক বই আছে। কিন্তু এর প্রথম সংগ্রহে ছিলো খান ছাহেবের অবদান, যা আমি ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারবো না।

(আরেকটি কথা এখানেই বলে রাখি, আরবী শেখার নামে এসকল ধর্মহীন সাহিত্য তালিবে ইলমদের হাতে সরাসরি তুলে দেয়া আমি খতরনাক মনে করি, আমার মতে এগুলো শুধু গবেষকদের ব্যবহারযোগ্য, যারা এ দেশে শিশুকিশোর আরবী সাহিত্যের ময়দানে কাজ করবে।)

পুরো কুতুবখানা দেখার জন্য প্রয়োজন ছিলো পূর্ণ একটি দিন, কিংবা আরো বেশী, কিন্তু কোথায় সে সময়! সুতরাং অতৃপ্ত মনেই বেরিয়ে আসতে হলো; তবু খান ছাহেবের অনুগ্রহে যা দেখলাম এবং যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম তা আমার 'কার্যক্ষেত্র'-এর জন্য ছিলো অনেক মূল্যবান।

একটি মুবারক সফরে খান ছাহেবের সঙ্গে গড়ে ওঠা এ সম্পর্ক দেশে আসার পর আমারই ব্যর্থতায় রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তিনি অবশ্য তাঁর এক ছেলের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব আমার যিম্মায় সোপর্দ করেছিলেন। নূরিয়া মাদরাসায় কিছু দিন সে আমার কাছে ছিলো, কিন্তু আমার দ্বারা তার তেমন উপকার হয়নি। তবু এই সফরে যে স্নেহ ও অনুগ্রহ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি সে জন্য সবসময় আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। কামনা করি, তাঁর জীবনের সায়াহ্নকাল সুখের হোক।

কৃতজ্ঞতার প্রসঙ্গে এখানে আরেকটি কথা বলতে চাই। মিনার দুর্ঘটনায় চশমা হারিয়ে খুব কষ্টে পড়ে গিয়েছিলাম। তখন হযরতের সফরসঙ্গী মাওলানা ফযলুল হক আমীনী ছাহেব বড় উপকার করেছিলেন। তাঁর কাছে অতিরিক্ত চশমা ছিলো এবং সেটির 'কাঁচশক্তি' মোটামুটি আমার উপযোগী। তিনি সেটি আমাকে দিয়েছিলেন ব্যবহার

করার জন্য। যদিও ফ্রেমটি ছিলো তাঁর মত, আমার মত নয়, তবু বিপদের সময় কাজে এসেছে; জেদ্দা ও মক্কার কুতুবখানায় যেমন তেমনি ইরাকের সফরে। সবচে' বড় কথা, শেষ ক'টি দিন এ চশমার সাহায্যেই আল্লাহর ঘর দেখতে পেয়েছিলাম। প্রথম দু'দিন চশমা ছাড়া হারাম শরীফে বসে থাকতাম; আল্লাহর ঘর শুধু ঝাপসা দেখা যেতো, আর শুধু কান্না পেতো, অসহায় মানুষের কান্না। তবে ঐ সামান্য কান্নাও আল্লাহর কাছে পৌঁছেছিলো। বান্দার কোন কষ্টই আল্লাহর অগোচরে থাকে না এবং কোন প্রার্থনাই আল্লাহর সমীপে বৃথা যায় না। বান্দার সব প্রার্থনাই আল্লাহ শোনেন। বান্দার ছোট-বড় সমস্ত চাহিদাই আল্লাহ পূর্ণ করেন। তাই তো বলা হয়েছে, তোমার সব প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাও, এমনকি জুতার ফিতা হারিয়ে গেলে, সেটাও আল্লাহর কাছে চাও।

আমি আমার চশমার কষ্ট আল্লাহর কাছে বলেছিলাম। এ সমস্যার সমাধানের দৃশ্যত কোন উপায় ছিলো না। কিন্তু তিনি যখন সাহায্য করতে চান, উপায়ের অভাব হয় না। আমাদের দোষ ঐ একটাই। আল্লাহর কাছে চাই না, যদিও বা চাই, বড় তাড়াহুড়া করি এবং অল্পতেই বে-ছবর হয়ে পড়ি। আল্লাহর কাছে সবকিছুর জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময় এবং সে জন্য অপেক্ষা করতে হয় ছবরের সাথে। সেই ছবর ও ধৈর্যের জন্যও রয়েছে আলাদা আজর, আলাদা পুরস্কার! সুবহানাল্লাহ, মাওলা আমাদের কত মেহেরবান!

আমীনী ছাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার চশমা? বললাম, প্রথম দু'দিন কংকর মেরেছি হযরতের সঙ্গে। বার তারিখে ছিলাম একা, তো শয়তান একা পেয়ে চশমাটা রেখে দিয়েছে।

তিনি কিছু না বলে মৃদু হাসলেন। পরের ওয়াক্তে অতিরিক্ত চশমাটি দিয়ে বললেন, দেখো তো কাজ হয় কি না? আমি তখন উম্মেহানিতে বসে তাকিয়ে আছি আল্লাহর ঘরের দিকে; কিছুই দেখতে পাই না কালো গিলাফের ছায়া ছাড়া। চশমাটি পরে ধীরে ধীরে তাকালাম আল্লাহর ঘরের দিকে এবং দেখতে পেলাম আমার আল্লাহর ঘরকে স্পষ্টভাবে, যেমন দেখেছি এত দিন ।

প্রিয় পাঠক! আমার হৃদয়ের সেই মুহূর্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাস না তুমি কল্পনা করতে পারবে, না আমি শব্দ দিয়ে বোঝাতে পারবো! শুধু শোনো, সাতরাজার গুপ্তধন পাওয়ার আনন্দ এর সামনে তুচ্ছ! মনে হলো হারানো জীবন ফিরে পেলাম। আল্লাহর ঘরকে আবার যেন প্রথম দেখলাম। যদি চশমা না হারাতো তাহলে কি হতো এত কিছু! হতো আমার হৃদয়-আকাশে এত মেঘ-রোদের খেলা! এই হাসি-কান্না! আল্লাহ যা কিছু করেন বান্দার ভালোর জন্যই করেন। নির্বোধ বান্দা কখনো ভুলে যায় শোকর, কখনো ভুলে যায় ছবর, ফলে যা ছিলো ভালো তা হয়ে যায় মন্দ!

আমীনী ছাহেবকে জাযাকাল্লাহ্ বলে অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা জানালাম!

***

মিনায় অবস্থানকালের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এখন মনে পড়লো। তাই এখানেই তা উল্লেখ করছি। হযরত খবর পেলেন, হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ)-এর খাছ খলীফা মাওলানা মছীহুল্লাহ খানছাহেব (যিনি জালালাবাদী হযরত নামে পরিচিত) হজ্বে তাশরীফ এনেছেন এবং মিনায় কাছাকাছি এক তাঁবুতে অবস্থান করছেন। হযরত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন দেখা করার জন্য। বারবার বলতে লাগলেন, 'আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো।'

শুধু একটি ঘটনা যে হতে পারে কত বড় শিক্ষক, নিকট থেকে শুধু একটি ঘটনার অবলোকন যে হতে পারে জীবনের জন্য কত বড় শিক্ষা তা সেই রাত্রে মিনার আলোঝলমল এক তাঁবুতে নতুন করে উপলব্ধি করলাম। আমাদের হযরতের উছিলায় সামান্য সময়ের জন্য সৌভাগ্য হয়েছিলো সেই জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বকে একঝলক দেখার! সেটাই জীবনের প্রথম দেখা এবং জীবনের শেষ দেখা। দ্বিতীয়বার দেখার সৌভাগ্য আর হয়নি।

পরবর্তীতে হযরত আমাদেরকে বারংবার তাকীদ করেছিলেন জালালাবাদে তাঁর ছোহবতে যাওয়ার জন্য। যারা গিয়েছেন, ফিরে এসে অনেক প্রাপ্তির অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। হযরতের ইনতিকালের পর বারবার মনে পড়েছে তাঁর আদেশের কথা এবং ইচ্ছেও জেগেছে, ভিতর থেকে তাগিদও এসেছে, কিন্তু হয়ে উঠেনি। জীবনটা আমার এভাবেই পার হয়ে চলেছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কিছু না কিছু অর্জন করার আমাকে সুযোগ দান করা হয়েছে। অনেক সময় বুঝতে পারিনি, অনেক সময় বুঝেও গ্রহণ করতে পারিনি, আবার গ্রহণ করেও ধরে রাখতে পারিনি। কবির ভাষায় –

বাগানে ফুল তো ফুটেছিলো অজস্র/ বকুলতলায় অনেক ঝরেছে বকুল/ তোমার আঁচল ছিলো অনেক ছোট/ কপাল ছিলো মন্দ তাই করোনি কবুল!

হযরত আমাদেরকে নিয়ে সেই তাঁবুতে গেলেন জালালাবাদী হযরতের সঙ্গে দেখা করতে এবং আমাদেরকে দেখা করাতে। সেখানে হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ)-এর সর্বকনিষ্ঠ খলিফা মাওলানা আবরারুল হক ছাহেবও ছিলেন। তাঁকে অবশ্য দেশে হযরতের দরবারে আগেও দেখেছি। হযরতই মূলত তাঁকে বাংলাদেশে পরিচিত করেছেন। করাচীর হাকীম আখতার ছাহেবও সেখানে ছিলেন।

উভয় হযরতের মাঝে এমন মুহাব্বাতপূর্ণ এবং উষ্ণতাপূর্ণ মুছাফাহা-মু'আনাকা হলো যে, সে পবিত্র দৃশ্য আমি সারা জীবনের জন্য অন্তরে গেঁথে রাখার চেষ্টা করলাম।

আমাদের হযরতকে তিনি অন্তরঙ্গভাবে কাছে বসালেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত একে একে আমাদের সবাইকে মুছাফাহার সুযোগ করে দিলেন। এতটুকু সৌভাগ্যকেই আজ মনে হচ্ছে অনেক বড়। কারণ এমন দুটো কোমল পবিত্র হাত, এখন আর কোথায় পাবো?!

নাহ! কথাটা ঠিক নয়। সময় কখনো শূন্য হয় না আলো থেকে! সমাজ কখনো বঞ্চিত হয় না আলোকিত মানুষ থেকে!

মানুষ শুধু পড়ে থাকে নফসের ধোকায়। আর নফসের ধোকাও বড় অদ্ভুত! যা হারিয়ে গেছে তা নিয়ে তো আফসোস করায়, কিন্তু যা এখনো আছে দৃষ্টির সীমায় এবং স্পর্শের সীমানায় সে সম্পর্কে করে রাখে গাফেল-উদাসীন।

এ মজলিসেও আলোচনা উঠলো ইরান সফরের। মাওলানা আযীযুল হক ছাহেব দীর্ঘ সময় ধরে যা বললেন তার সিংহভাগ জুড়ে ছিলো, রাষ্ট্রীয় আপ্যায়ন এবং উষ্ণ আতিথেয়তার কথা। শেষে মাওলানা মছীহুল্লাহ খান ছাহেব কিছুটা বিরক্তির স্বরে বললেন–

'এতে কি আসে যায়, আসল কথা হলো, তাদের আকীদা সম্পর্কে কী জেনেছেন?

আমাদের হযরত এখানেও একই কথা বললেন, 'আমার উদ্দেশ্য ছিলো যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে চেষ্টা চালানো। সুতরাং আমি সেদিকেই মনোযোগী ছিলাম। বাকি শিয়া ফেরকা সম্পর্কে আমার চিন্তা আহলে সুন্নাত ওয়ালজামাতের ফায়ছালা থেকে ভিন্ন নয়।'

আমি ভাবলাম, এখনই এ প্রশ্নটির এত বাড়ন্ত অবস্থা, তাহলে দেশে ফেরার পর?! এমন না হয় যে, মূল কাজ ছেড়ে এটা নিয়েই হযরতকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো! কিন্তু হযরতের সফরসঙ্গীদের একথাটা কে বোঝাবে? না কি যা বলার বুঝে শুনেই বলা হচ্ছে!

এরপর আলোচনা শুরু হলো রাজনৈতিক অঙ্গনে হযরতের পদার্পণ এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে। এ বিষয়ে হযরত অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের পদক্ষেপের যৌক্তিকতা এবং তাওবার রাজনীতির তাৎপর্য তুলে ধরলেন এবং জালাবাদী হযরত পূর্ণ মনোযোগসহকারে শ্রবণ করলেন, আর মাওলানা আবরারুল হক ছাহেব এবং হাকীম আখতার ছাহেব ... থাক, হজ্বের সফরনামায় অপ্রিয় প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম।

হযরতের বক্তব্যের পর জালালাবাদী হযরত যা বললেন তার খোলাছা হলো–

আমলী সিয়াসাতে (সক্রিয় রাজনীতিতে) হিস্সা নেয়া হাকীমুল উম্মতের পছন্দ ছিলো না। তাছাড়া আপনি এখন বয়স ও স্বাস্থ্যের যে হালাতে আছেন তাতে এ গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া কীভাবে সম্ভব হবে?!

মনে হলো, আমাদের হযরত ভাবলেন, যেহেতু এ বিষয়ে তাঁর 'শারহে ছদর' রয়েছে সেহেতু তিনি তো আপন অবস্থানে অবিচল থাকবেন। সুতরাং আদবের সাথে এ আলোচনা থেকে সরে আসাই উত্তম। তাই তিনি বললেন, জিহাদের ময়দানে এখন তো নেমে পড়েছি, এখন তো পিছিয়ে আসার সুযোগ নেই।

এরপর যা ঘটলো তা আজকের পৃথিবীতে শুধু আমাদের হযরতের পক্ষেই সম্ভব ছিলো। হযরত তাঁর মুরীদান সকলের সামনে এই বলে বাই'আতের আবেদন পেশ করলেন, 'আপনার হাতে আমি হযরত হাকীমুল উম্মতের বাই'আতের তাজদীদ (নবায়ন) করতে চাই।

আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম, আর শিক্ষা গ্রহণ করলাম, কীভাবে 'আনাকে ফানা' করতে হয়! এ বাই'আতের কী রহস্য, জানি না, তবে আত্মবিলোপের এমন

মহীয়ান দৃশ্য অবলোকন করার আমাদের প্রয়োজন ছিলো, খুব বেশী প্রয়োজন ছিলো। মনস্তত্ত্বের গবেষক যারা তারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন, এঘটনার মূল্য কত এবং এর শিক্ষা কত সদূরপ্রসারী?!

***

আমার অন্তরে সুপ্ত একটি আকাঙ্ক্ষা ছিলো তায়েফে যাওয়ার। কারণ তায়েফে বনু সা'দের বস্তিতে বিবি হালিমার ঘরে কেটেছে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শৈশব। এই তায়েফের মাটিতেই জড়িয়ে আছে তাঁর নবুয়তি জীবনের অনেক বেদনাদায়ক স্মৃতি। তায়েফের পথে পথে দুস্কৃতিকারীদের পাথরের আঘাতে ঝরেছে তাঁর পবিত্র রক্ত। শৈশবে ছোটদের সীরাতগ্রন্থে যখন পড়েছিলাম নবীজী তায়েফ গমনের ঘটনা তখন আমার শিশুহৃদয়েও অনেক বেদনা জেগেছিলো এবং আমার অবুঝ চোখদু'টি থেকে অনেক অশ্রু ঝরেছিলো।

মক্কার লোকেরা যখন আল্লাহর নবীর ডাকে সাড়া দিলো না তখন অনেক আশা নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন তায়েফে, দুধমা বিবি হালিমার দেশে। এ আশায় যে, হয়ত তায়েফ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবে, হয়ত তায়েফীরা তাঁর দাওয়াত খুশিমনে কবুল করবে। কিন্তু তায়েফ ও তায়েফীদের নিষ্ঠুরতা মক্কার কোরায়শকেও ছাড়িয়ে গেলো। নবীর দাওয়াত কবুল করা দূরের কথা, আরবদের মেহমানদারির যে সাধারণ ঐতিহ্য সেটাও তারা ভুলে গেলো, এমনকি ন্যূনতম মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দিতেও ব্যর্থ হলো। নবীজীর পিছনে তারা দুস্কৃতিকারিদের লেলিয়ে দিলো। আর ঐ হতভাগারা পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে নবীজীর দেহ রক্তাক্ত করে ফেললো।

বড় বেদনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে তায়েফে আমার নবীজীর, আবার তাঁর শৈশবেরও দীর্ঘ চারবছরের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে তায়েফের পল্লীতে বনু সা'দ গোত্রের মরুনিবাসে। বিভিন্ন যুগে হজ্বের সফরে যারা তায়েফ গিয়েছেন এবং তাদের সফরনামায় তায়েফের বিবরণ লিখেছেন সেগুলো পড়ে আমার হৃদয় বড় আপ্লুত হতো। কল্পনায় আমিও তাঁদের সঙ্গী হতাম; আমি যেন দেখতে পেতাম তায়েফের সেই সব অলিগলি যেখানে আমাদের প্রিয় নবী তাঁর বিশ্বস্ত খাদেম হযরত যায়দ বিন ছাবিত (রা)কে নিয়ে অসহায়ভাবে হেঁটেছেন, দুষ্টরা পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। হযরত যায়দ প্রাণপ্রিয় নবীকে বুক পেতে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, তবু নবীজী আহত হয়েছেন, মাটিতে পড়ে গিয়েছেন। রক্তে ভেসে গেছে তাঁর শরীর।

আমি যেন দেখতে পেতাম সেই আঙ্গুর বাগান যেখানে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে আশ্রয় নিয়েছিলেন পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর এক দয়াবতী নারী তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন এবং আঙ্গুর দিয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করেছিলেন।

আমি যেন দেখতে পেতাম তায়েফের সেই মরুপল্লী যেখানে মা হালিমার আদরস্নেহে এবং তাঁর কিশোরীকন্যা শায়মার মমতার কোলে আমার পেয়ারা নবী বড় সুখের শৈশব যাপন করেছেন।

কিন্তু তায়েফ যিয়ারাতের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায় কী? আল্লাহর ইচ্ছায় উপায় হলো এবং অপ্রত্যাশিতভাবে হলো। আমার শৈশবের প্রিয় বন্ধু আবুল-কালাম কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলো সময়ের টানে। লালবাগের হেফযখানায় আমরা একসঙ্গে পড়েছি। এমন পবিত্র একটি অন্তরঙ্গতা ছিলো যে, আমরা তখন নিজেদের আলাদা কোন জীবন কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু শৈশবে যা পারিনি, পরবর্তীকালে খুব সহজেই তা পেরেছি। অন্যজনকে ছাড়া আমাদের উভয়ের জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে গেছে। অন্তত আমার তো মনেই পড়েনি, শৈশবে আবুল-কালাম নামে আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য একটি অঙ্গ ছিলো।

হযরত হাফেজ্জী হুযূরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন এক ভদ্রলোক। তায়েফে চাকুরি করেন। সেখানেই আছেন দশবছর ধরে সপরিবারে। নাম, প্রিয় পাঠক, তুমি ধরতে পেরেছো নিশ্চয়, ভদ্রলোকের নাম আবুল কালাম!

চমকে উঠলাম! হঠাৎ যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেলো আমার দেহে! কত রহস্যময় আমাদের মনোজগত! আবুল কালাম নামটি তাহলে যেমন ভেবেছিলাম, হারিয়ে যায়নি আমার জীবন থেকে! শুধু লুকিয়ে ছিলো মনের অজ্ঞাত কোন অংশে! একটি নাম উচ্চারিত হলো, আর দু'টি 'মৃত শৈশব' যেন একসঙ্গে আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠলো! জীবন্ত হলো, কিন্তু শৈশবের মত আপন যেন হলো না। তবু এগিয়ে মুছাফাহা করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি লালবাগের হিফযখানায় পড়েছেন? আমার আন্দাযের তীর লক্ষ্য ভেদ করলো। তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন! কিছু হয়ত খুঁজলেন আমার মুখাবয়বে, সুদূর শৈশবের কোন কিছু। মনে হলো, অতীতের গহ্বরে নেমে যাওয়ার একটি সিঁড়ি যেন পেয়ে গেলেন এবং ঠিক ঠিক পৌঁছে গেলেন হারিয়ে যাওয়া শৈশবে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি.. তুমি আবু তাহের!? আমি ছিলাম 'আপনি'-এর স্তরে, তিনি নেমে গেলেন আরো গভীরে, 'তুমি'-এর তলদেশে! এর পর আলিঙ্গন, দুই যুবকের শৈশবের আলিঙ্গন!

বলবো বলবো করছি, কিন্তু কুণ্ঠা কাটিয়ে উঠতে পারছি না। এখানেও তিনি এগিয়ে থেকে বললেন, আল্লাহর শোকর, তোমার সঙ্গে দেখা হলো। চলো তায়েফে; পুরো তায়েফ শহর তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাবো।

বান্দার পক্ষ হতে সর্বোত্তম শোকর এই যে, বান্দা অন্তর থেকে স্বীকার করে নেবে, হে আল্লাহ! তোমার ছোট-বড় কোন নেয়ামতের শোকর আদায় করতে আমি অক্ষম। কীভাবে শোকর আদায় করবে বান্দা! কোন্ কোন্ নেয়ামতের শোকর আদায় করবে! অন্তরে একটি সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, যা মুখে উচ্চারণ করিনি, তাও তিনি পূর্ণ করলেন এবং এমন মনোরমভাবে!

হযরতের অনুমতি পাওয়া গেলো সহজেই। তিনি অতীতের তায়েফসফরের স্মৃতিচারণ করে বললেন, মসজিদে ইবনে আব্বাসে নামায পড়তে বড় 'সুকূন ও সাকীনাহ' হাছিল হয়েছিলো এবং প্রথমবার তায়েফ গিয়েছিলাম উটের পিঠে সওয়ার হয়ে।

আমার শৈশবের আবুল-কালাম আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলো তার 'পঙ্খিরাজে' সওয়ার হয়ে। গাড়ীচালনায় তার দক্ষতায় মুগ্ধ হলাম। নিজে তো সাইকেল চালাতেও জানি না, তাই খানিকটা ঈর্ষা হলো। আমি তো এখন হুযূর। আর আমাদের দেশে কোন হুযূর গাড়ী 'ড্রাইভ' করবে, এমন 'খতরনাক' বিদআত কল্পনাও করা যায় না। একজন হুযূর বড় জোর নদীতে নেমে গোসল করতে পারে, কিন্তু সাঁতার কাটা! তওবা! আমরা নাকি মুজাহিদ নবীর ওয়ারিছ! অথচ মেদভুঁড়ি এখন আমাদের প্রধান সমস্যা!

গাড়ী চলছে ঝড়ের বেগে। আমরা ব্যক্তিগত জীবনের খবর বিনিময় করলাম। আবুল-কালাম এখানেও এগিয়ে। বিয়ে করেছে বেশ ক'বছর হলো। বরিশালের মেয়ে, শ্বশুর বরিশালের কোন এক আলিয়া 'মাদরাসার' শিক্ষক। সে নিজেও নাকি আলিয়া পাশ। চেহারা-সুরতে অবশ্য তা বোঝা যায় না। দুই ছেলে এক মেয়ে।

তার জিজ্ঞাসার জবাবে বললাম, 'আমার ভাই গরিবানা হালত। বিয়ে করেছি দু'বছর হয় কি হয় না! একটি মেয়ে আল্লাহ দান করেছেন রামাযানের আগে। আর আমার মনে হয়, এ 'লক্ষী মেয়ের' বরকতেই আমি আজ আল্লাহর ঘরে।

আবুল-কালাম বললো, 'আসলেই মা-বাবার জীবনে মেয়েরা লক্ষী হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনে। তারপরো কেন যে সব মা-বাবা ছেলে, ছেলে করে মাথা খোঁড়ে! আমাকেই দেখো, চাঁদের টুকরো মেয়ে আমার যেদিন মায়ের কোল আলো করলো সেদিন থেকে আমার সৌভাগ্যের শুরু। খুব কষ্টে ছিলাম। মেয়েটির জন্মের কয়েকদিন পরেই বর্তমান চাকুরিটা পেলাম একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে কোন রকম তদবীর ছাড়া। আগের তুলনায় বেতনও কয়েকগুণ বেশী।

কথা বলছিলাম, কিন্তু আমার দৃষ্টি ছিলো বাইরে মরুভূমিতে। সেই একই দৃশ্য; বালুর সাগর এবং কালো পাথরের পাহাড়, পাহাড়ের অনিঃশেষ শ্রেণী। কিন্তু যতই দেখি, মনে হয়, নতুন করে দেখছি! ক্লান্তিহীন দৃষ্টি যেন অন্তহীন পিপাসা নিয়ে শুধু দেখেই যেতে চায় হিজাযের দৃশ্য। হিজাযের সঙ্গে যে আমাদের প্রাণের সম্পর্ক এবং আত্মার বন্ধন! জন্ম আমার সবুজ বাংলাদেশে, কিন্তু মন আমার বিভোর হিজাযের স্বপ্নে! আমি ভালোবাসি জলবৃক্ষহীন বালুর মরুভূমি! আমি ভালোবাসি উটের কাফেলা এবং হুদির সুর! আমি ভালোবাসি দিগন্ত আড়াল করে রাখা পর্বতশ্রেণী, আর ভালোবাসি পর্বতশিখরে সূর্যের উদিত হওয়া এবং অস্ত যাওয়া!

একসময় চেকপয়েন্ট এসে গেলো। আবুল-কালাম আমার পাসপোর্ট নিয়ে নেমে গেলেন এবং ফিরে এলেন। কোন সমস্যা হয়নি। আমরা নির্বিঘ্নে সামনে অগ্রসর হলাম। মক্কা-তায়েফ পুরোনো যে রাস্তা সেটা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পথ। বর্তমানে তা পরিত্যক্ত। এটি মক্কা-তায়েফ নতুন সড়ক। দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম এবং বেশ ঝকঝকে মসৃণ ও আরামদায়ক। সউদী আরবের সড়ক যেন স্বচ্ছ আয়না; রোদে চলন্ত গাড়ীর ছবি দেখা যায় সড়কের আয়নায়।

গাড়ী চলছে তীব্র গতিতে। কিছুক্ষণ পরই সবুজের দেখা পেতে শুরু করলাম। দু'পাশে বিভিন্ন সবজীর বিস্তীর্ণ বাগান। বাংলাদেশী এবং ভারতীয়রাই এখানে বেশীর ভাগ

কাজ করে। আরো কিছু দূর গিয়ে দেখলাম আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলের বাগান। সে এক মনোরম দৃশ্য! মক্কা-মদীনার সবজী ও ফলফলাদির বেশীর ভাগ চাহিদার যোগান যায় এখান থেকে। সম্প্রতি অন্যান্য স্থানেও নাকি ব্যাপক কৃষি-চাষের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রচুর গম উৎপন্ন হচ্ছে। খুব দ্রুত দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার দৃঢ় ইচ্ছা সউদী সরকারের। শুভ ইচ্ছা। খাদ্যে পরনির্ভরশীল দেশকে জিম্মী থাকতে হয় 'আন্তর্জাতিক মর্জির' কাছে। বাঁচতে হলে গম চাই; তেলকে বলা হয় তরল সোনা, ঠিক আছে, কিন্তু তেল খেয়ে তো বাঁচা সম্ভব নয়। আসলে আগামী পৃথিবীতে যে যুদ্ধটা হবে সেটা হবে পানি ও খাদ্যের। সুতরাং গোটা মুসলিমবিশ্বকেই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যথাসম্ভব দ্রুত খাদ্যে ও পানিসম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। আরেকটা কথা বলে তো আর লাভ নেই; এ যুগে কেনা অস্ত্রে যারা যুদ্ধ জয় করতে চায় তারা আসলেই বোকার স্বর্গে বাস করে।

***

তায়েফকে বলা হয় শৈলশহর। পুরো শহরটা ছড়িয়ে আছে পাহাড়ের উপর উঁচুতে ঢালুতে, চড়াইয়ে উৎরাইয়ে অপূর্ব এক তরঙ্গ সৃষ্টি করে। সে তরঙ্গ যেন দৃষ্টির-পথে প্রবাহিত হয়ে হৃদয়ের সবুজ ভূমিতেও তরঙ্গ আনে।

যদি বলি, তায়েফ হলো শিল্পীর নিপুণ তুলিতে আঁকা একটি শহর, তাহলে তায়েফের সৌন্দর্যকে অসম্মান করা হবে। তায়েফ আসলে শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির চেয়েও সুন্দর এক শহর।

পথের দু'পাশের সবুজ-সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম তায়েফের প্রবেশদ্বারে।

আমাদের নবীজী এসেছিলেন এই তায়েফ শহরে। তখন নিশ্চয় এত সম্প্রসারিত ছিলো না শহর; অনেক ছোট ছিলো এবং খুব সাধারণ ছিলো। কিন্তু এখন?! তায়েফ এখন চৌদ্দশ বছর আগের 'পল্লীশহর' নয়; আধুনিক স্থাপত্যের স্বাক্ষর বহনকারী উঁচু উঁচু ইমারতবেষ্টিত সম্পূর্ণ নতুন এক শহর।

তায়েফ নামটুকু ছাড়া অতীতের আর কিছু কি আছে এখানে? হয়ত নেই। সবকিছু হারিয়ে গেছে আধুনিকতার স্রোতে; সবকিছু চাপা পড়ে গেছে বড় বড় দালানকোঠার নীচে।

কিংবা হয়ত আছে কিছু কিছু, এমনকি অনেক কিছু, তাদের জন্য যারা সামনের চোখ বন্ধ করে দেখতে পায় পিছনে; দূরে, বহু দূরে! নইলে কেন আসতে চায় মানুষ তায়েফে! কিসের টানে! কোন আকর্ষণে! আধুনিকতার জৌলুসের জন্য নয়; সুদূর অতীতের 'ঐটুকু' স্মৃতির প্রতি ভালোবাসার কারণে! কী ক্ষতি ছিলো এদেশের সরকারের, যদি তায়েফের দুয়ার খোলা রাখতো সবার জন্য! যদি অতীতের কিছু স্মৃতি অক্ষত রেখে দিতো আমাদের জন্য!

প্রবেশপথ থেকেই অবাক হওয়ার পালা। আমি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিনি, তবে ভ্রমণকাহিনী পড়েছি প্রচুর। পথের এমন অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা আমি পাইনি

কোথাও। শহরের প্রবেশপথ থেকেই যেন রোমাঞ্চের শুরু। এঁকে বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে পথ উঠে গেছে উপরে, অনেক উঁচুতে। ইঞ্জিন যেন গাড়ীকে টেনে তুলতে হাঁপিয়ে ওঠে। কোথাও কোথাও পথ এত সরু যে, রীতিমত বিপজ্জনক। একটু অসতর্ক হলেই গড়াতে গড়াতে গাড়ী গিয়ে পড়বে কয়েকশ ফুট নীচে। ভয়ে যে কারো বুক দুরু দুরু করবে, তবু সৌন্দর্যের আকর্ষণ তাকে প্রলুব্ধ করবে উপরে উঠে যেতে। আমার চেহারায় ভয়ের ছাপ পড়েছিলো কি না জানি না, আবুল কালাম আমার দিকে তাকিয়ে অভয় দিয়ে বললো, এপর্যন্ত তেমন কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি এখানে।

একসময় এত উপরে উঠলাম যেন মেঘেরা আমাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে আলতোভাবে আদর করে যায়!

গাড়ী থামিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ালাম। অপূর্ব! সত্যি অপূর্ব! মনে হলো, তন্ময় হয়ে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকা যাবে এই সৌন্দর্যকে সামনে রেখে। পাহাড়ের ঢেউয়ে ঢেউয়ে পুরো শহর যেন সবুজের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত। শুধু সবুজ আর সবুজ, যেন সবুজের ছায়ায় পুরো শহর বিশ্রামরত।

জানি না কেন, হয়ত সবুজের ছোঁয়া লেগে হঠাৎ মনে পড়ে গেলো সবুজ বাংলাদেশের কথা! মনে পড়েই ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো এক অব্যক্ত বেদনায়। কারণ দুই সবুজের মাঝেই রয়েছে ছোপ ছোপ লাল।

এই তো সেদিন বাংলাদেশের মাটিতে শহীদ হলেন আওলাদে রাসূল সৈয়দ মোস্তফা হোসায়নী আলমাদানী। বাংলাদেশকে তিনি ভালোবেসেছিলেন হৃদয়ের গভীর থেকে। সেখানেই কেটেছে তাঁর জীবন। ইসলামের খিদমত এবং কোরআন-সুন্নাহর প্রচার-প্রসারই ছিলো তাঁর জীবনের লক্ষ্য। এজন্য তিনি জীবনের সব সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়েছিলেন।

ফিরেশতা-ছুরত ও ফিরেশতা-সীরত এই মানুষটিকে একবার যে দেখেছে সেই তাঁকে ভালোবেসেছে এবং শ্রদ্ধা করেছে। মানুষ তো নিষ্পাপ হতে পারে না; তবে তাঁকে দেখে সবাই একবাক্যে বলতো, জেনেশুনে ইনি কোন পাপ করতে পারেন না। সবসময় এমন স্নিগ্ধ হাসি ফুটে থাকতো যেন ঠোঁটদু'টো তার সাদা গোলাবের পাপড়ি। আওলাদে রাসূলের বুক লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হয়নি, গুলি ছোঁড়া হয়েছিলো এবং তিনি শহীদ হয়েছিলেন। সবুজ মাটিতে তাঁর বুক থেকে ঝরেছিলো লাল রক্ত। আমি নিজের চোখে দেখেছি তাঁর রক্তাক্ত জানাযা। বিনা গোসলে, বিনা কাফনে, শহীদী লেবাসে তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো। সেদিনই প্রথম জেনেছিলাম, শহীদকে কীভাবে দাফন করতে হয়!

আমি তাঁর জানাযা পড়েছি। হাজার হাজার মানুষ ছিলো। এমন কান্নার রোল কখনো শুনিনি; এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্যও আর দেখিনি। তিনি শুয়ে আছেন লালবাগ শাহী মসজিদের ছোট্ট নিরিবিলি কবরস্তানে।

সেবছর আল্লাহর এক প্রিয় বান্দা মদীনা শরীফে আল্লাহর নবীকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। যিন্দা কলব যারা এ স্বপ্ন তাদেরকে খুব বিচলিত করেছিলো। থাক এখানে সেই স্বপ্নের কথা।

আমার চোখদু'টো বোধহয় ঝাপসা হয়ে উঠেছিলো। আবুল-কালাম অবাক হয়ে জানতে চাইলো, কী হয়েছে! আমি ম্লান হেসে বললাম, কত কিছু হয়! চলুন, যাওয়া যাক।

গাড়ী আবার চলতে শুরু করলো। এবার পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে নীচে নামার পালা। নীচে নামার অনুভূতিটাও কম উপভোগ্য নয়। তবে উপভোগ করার মত মনের অবস্থা তখন ছিলো না।

***

আমার বন্ধু আবুল-কালামের বাড়ীতে মনে হলো খুব শান্তির পরিবেশ। সুখ-শান্তির এমনই এক স্বর্গীয় স্নিগ্ধতা রয়েছে যে, মানুষ কোন সুখী গৃহে প্রবেশ করে সহজেই তার পরশ অনুভব করতে পারে, হোক না তা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আসবাববর্জিত।

আবুলকালামের, স্ত্রী ও দুই সন্তানের ছোট্ট পরিবার। পনের দিন অন্তর একবার স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে মক্কা শরীফ যায় ওমরা করার জন্য। একদিন হারাম শরীফে অবস্থান করে ফিরে আসে তায়েফে। ছেলেটির বয়স সাত আট। মেয়েটির পাঁচমাস।

আবুল-কালাম মেয়েটিকে আমার কোলে দিলো, আর আমার মন কেমন করে উঠলো। পৃথিবীর সব শিশুই কি জাদু জানে, বিশেষ করে কোলের শিশু! এমন অবাক চাহনি, এমন সুন্দর হাসি, এমন মধুর কান্না কে দেয় তাদের চোখে, ঠোঁটে, গলায়! তাদের হাসি-কান্না কীভাবে এমন মধু বর্ষণ করে আমাদের কানে! তাদের অবাক চাহনি কীভাবে এমন মুগ্ধ করে আমাদের হৃদয়কে! কী আছে তাদের অবোধ হাসিতে, অবুঝ কান্নায় এবং অবাক চাহনিতে!

আমার কোলে তো ছিলো আবুল-কালামের মেয়েটি, কিন্তু তার হাসিতে, কান্নায় এবং চোখের অবাক চাহনিতে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম অন্যকিছু!

আশ্চর্য! একটি শিশুর চোখে-মুখে কীভাবে ফুটে ওঠে অন্য শিশুর মুখাবয়ব! একটি শিশুর হাসিতে কান্নায় এবং চোখের চাহনিতে কীভাবে মানুষ শুনতে পায় নিজের শিশুর হাসি-কান্না! দেখতে পায় নিজেরই শিশুর চোখের চাহনি!

আদর করে মেয়েটির গালে কপালে চুমু খেলাম, কিন্তু স্বাদ পেলাম সুদূর বাংলাদেশে রেখে আসা নিজের মেয়েকে আদর করার এবং চুমু খাওয়ার। আসলে পৃথিবীর সকল শিশু অভিন্ন একটি সত্তার অধিকারী; অভিন্ন তাদের পরিচয়। আমার শিশু, তোমার শিশু, অন্য কারো শিশু; সবাই তারা মানবশিশু। তাই সবশিশুর চোখে তুমি দেখতে পাবে তোমার শিশুর চোখের চাহনি। সবশিশুর মুখে তুমি শুনতে পাবে তোমার শিশুর মুখের হাসি ও কান্না।

শিশুরা কারো নয়, সবার। শিশুরা মানবজাতির। পৃথিবীর সবশিশুর অভিন্ন পরিচয়: তারা মানবশিশু। এজন্যই যে কোন শিশুকে কোলে নিয়ে মনে হবে যেন তোমারই

শিশু তোমার কোলে দোল খায়। আরবশিশুকে হাতছানি দাও; কেন তোমার কোলে ঝাঁপ দেয়?! ইংরেজ শিশুকে আদর করো; কেন তোমার আদর গ্রহণ করে?! কারণ সে মানবশিশু। পৃথিবীর যে কোন মানবশিশুকে শুঁকে দেখো, তার মাঝে তুমি পাবে তোমারই ফুলশিশুর ঘ্রাণ! তাই কখনো কোন মানবশিশুকে অসম্মান করো না; তোমার শত্রুর শিশুকেও কোলে নিতে ভুল করো না।

কোলে নিয়ে দোল তো দিচ্ছিলাম একটি অবোধ শিশুকে, কিন্তু এটা ছিলো বাইরের দৃশ্য; অন্তর্জগতে আসলে আমি নিজেই দোল খাচ্ছিলাম ভাবের এবং আবেগের আশ্চর্য এক তরঙ্গে! আমার কোলে দোল খাওয়া আবুল-কালামের শিশুটি, সুদূর বাংলাদেশে মায়ের কোলে রেখে আসা আমার নিজের শিশুটি এবং পৃথিবীর সকল মানবশিশু আমার চোখে তখন একাকার হয়ে গিয়েছিলো। সব যেন বেহেশ্‌তি বাগানের ফুল! সবার মুখে যেন বেহেশ্‌তি ফুলের হাসি! সবার দেহে যেন বেহেশ্‌তি ফুলের ঘ্রাণ! সবার কান্নায় যেন বেহেশ্‌তি পাখীর গান!

ছাব্বিশ বছর আগে তায়েফে আমার কোলে দোল খাওয়া সেই শিশুটি কি এখনো সেই শিশুটিই আছে! অন্তত মুখের হাসিতে, চোখের চাহনিতে! আমার মেয়ের কোল যেমন আলো করেছে জান্নাত থেকে নেমে আসা একটি আলোকশিশু তেমনি তার কোলেও কি ফুটে আছে কোন বেহেশ্‌তি ফুল!

যেখানেই তুমি থাকো মা, আমার হৃদয়ের শিশিরসিক্ত কল্যাণকামনা থাকবে তোমার সঙ্গে। কারণ আমার কোলে দোল খেয়ে সেদিন তুমি আমার অন্তরে ভাবের অপূর্ব এক তরঙ্গদোলা সৃষ্টি করেছিলে। তোমাকে কোলে নিয়েই আমি শিখেছিলাম প্রতিটি মানবশিশুকে বেহেশ্‌তি ফুলের মত ভালোবাসতে। সে শিক্ষা এখনো জীবন্ত রয়েছে আমার আত্মার গভীরে। তুমি সুখী হও মা, সুখী হও!

প্রিয় পাঠক! তোমার কি মনে হয় আমি দূরে সরে পড়েছি হজ্বের পরিবেশ থেকে? বাইতুল্লাহর ছায়া থেকে? সবুজ গম্বুজের স্নিগ্ধতা থেকে? আমার কিন্তু মনে হয় না। কারণ বিবি হাজেরার কোলের শিশুটি তো হজ্বেরই অংশ! এবং যামযামের ফল্গুধারা তো তারই দান! জাহেলিয়াতের বর্বরতা থেকে শিশুকন্যাদের মুক্তি পাওয়া, সে তো সবুজ গম্বুজেরই অবদান! সুতরাং কোন শিশুকে এবং শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে ইচ্ছে করলে তুমি পেতে পারো যামযামের শীতলতা এবং সবুজ গম্বুজের স্নিগ্ধতা!

তায়েফে আমার শৈশবের বন্ধু আবুল কালামের গৃহে প্রবেশ করেছিলাম শূন্য হাতে, কিন্তু বের হলাম একটি অবোধ শিশুর কাছ থেকে হৃদয় ও আত্মার অনেক সম্পদ অর্জন করে।

***

আবুল-কালাম আমাকে নিয়ে বের হলো তায়েফ শহর দেখাতে। রাস্তায় সবুজ গাছের ছায়া, উপরে আকাশে কালো মেঘের ছায়া, আর আমার হৃদয়াকাশে ছিলো বেদনা ও বিষণ্নতার অন্যরকম এক ছায়া। ধীরে ধীরে আমি যেন ফিরে গেলাম সেই সুদূর অতীতে। এখানে এই তায়েফে এসেছিলেন আমেনার দুলাল। মক্কা তার হৃদয় থেকে

রক্ত ঝরিয়েছিলো; তিনি আশা করেছিলেন তায়েফ তাঁর হৃদয়ের ক্ষতে সান্ত্বনার শীতল প্রলেপ বুলিয়ে দেবে। কিন্তু! মক্কা তাঁর হৃদয় থেকে রক্ত ঝরিয়েছিলো, আর তায়েফ তাঁর দেহ থেকেও রক্ত ঝরালো। যে মেহমানকে ভালোবাসার ফুল দিয়ে বরণ করা উচিত ছিলো, তায়েফের পথে পথে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করা হলো! সেই নূরানি রক্তের ঘ্রাণ এখনো যেন পাওয়া যায় তায়েফের পথে পথে।

সমতল এলাকায় একটি মসজিদের সামনে এসে আবুল-কালাম বললো, লোখমুখে প্রচলিত আছে, এখানেই ছিলো সেই আঙ্গুর বাগান, যালিমদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহর নবী যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম বেদনায় বিগলিত হৃদয় নিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুর নাযরানা পেশ করে। নবীর উম্মত কেন আসে না তায়েফে সেই নূরানি রক্তের ঘ্রাণ পেতে এবং দু'ফোঁটা অশ্রুর নাযরানা পেশ করতে! কেন আসে না দ্বীনের জন্য পাথরের আঘাত বরণ করার এবং রক্ত ঝরানোর শিক্ষা গ্রহণ করতে! কেন আসে না? কেন আসতে দেয়া হয় না?

মসজিদটি খুব বড় যেমন নয়, তেমনি খুব ছোটও নয়। দেয়ালে এবং ছাদে সেগুন কাঠের ভাবগম্ভীর সাজসজ্জা। পুরো সফরে আর কোন মসজিদে এমন কাঠের কারুকাজ দেখিনি। মনের ভিতরে অন্যরকম একটি ভালো লাগার অনুভূতি সৃষ্টি হলো। কী যেন এখানে আছে, যা অন্যখানে নেই! খুব ইচ্ছে হলো একথা ভাবতে যে, লোকমুখে যা প্রচলিত সেটাই সত্য। নাহলে আমার মনের এমন কেন অবস্থা হবে? আমার যে ইচ্ছে করছে এখানে সবুজ কার্পেটের উপর লুটিয়ে পড়তে! চিরকালের জন্য পড়ে থাকতে!

দু'রাকাত নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বের হলাম। মনে হলো, সত্যি সত্যি আমি অন্য মানুষ হয়ে বের হলাম! আমি প্রতিজ্ঞা করলাম তায়েফের শিক্ষা নিজের মাঝে সারা জীবন ধারণ করার, অন্তত চেষ্টা করে যাওয়ার।

গাড়ী কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ আমি আবুল-কালামকে অনুনয়ের স্বরে বললাম, আমাকে নিয়ে যেতে পারেন ঐখানে, আল্লাহর নবী যেখানে মুনাজাত করেছিলেন, অশ্রুমাখা ও রক্তভেজা মুনাজাত যা কম্পন সৃষ্টি করেছিলো আল্লাহর আরশে! আমি দেখতে চাই সেই পবিত্র স্থানটি যেখানে আল্লাহর হুকুমে আমার পেয়ারা নবীর খেদমতে হাযির হয়েছিলেন পাহাড় হেফাযতের ফিরেশতা এবং অনুমতি চেয়েছিলেন দুই পাহাড় একত্র করে তায়েফীদের হালাক করার, কিন্তু দয়া ও রহমতের নবী অস্থির হয়ে বলেছিলেন, 'না, না; আমি তো আশা করি, ওরা না হলেও ওদের সন্তানসন্ততি আমার দাওয়াত কবুল করবে।'

আমি দেখতে চাই সেই পবিত্র স্থান যেখান থেকে আমার হৃদয় শিক্ষা গ্রহণ করবে পাথরের আঘাত খেয়েও বিভ্রান্ত মানুষকে ভালোবাসার এবং ক্ষমা করার। এ শিক্ষার আজ বড় প্রয়োজন উম্মতের। এই ক্ষমাসুন্দর চরিত্র তো নবীজীবনেরই আদর্শ! এটা তো নববী জিহাদেরই অংশ!

আবুল-কালাম বুঝতে পেরেছিলেন আমার হৃদয়ের ব্যথা এবং আবেগের গভীরতা। তিনি আফসোসের স্বরে বললেন, কিন্তু এই হতভাগারা হিজাযের পবিত্র ভূমিতে তাদের নবীর কোন চিহ্নই যে বাকি রাখেনি! একে একে সব মুছে ফেলেছে!

আমি বললাম, থাক, মুছে ফেলেছে তো কী হয়েছে! হৃদয়ের অনুভব থেকে তো আর মুছে ফেলতে পারে না! হৃদয়ের গভীরেও তো অনুভব করা যায় সুদূর অতীতকে! আমাদের শিক্ষা তো এই মাটি থেকে নয়, আমাদের শিক্ষা তো সেই পবিত্র জীবন থেকে! আর সেই জীবন তো আমাদের সামনে চিরজীবন্ত!

মসজিদে ইবনে আব্বাস (রা)-এর কথা শুনেছি হযরত হাফেজ্জী হুযূরের কাছে এবং পড়েছি শায়খুল হিন্দ (রহ)-এর সফরনামা 'আসীরে মাল্টায়'। সেই মসজিদে ইবনে আব্বাসে দাখেল হওয়ার খোশকিসমত হলো আজ।

ইসলামী খেলাফাতের আখেরি 'পাসবান' তুর্কীদের সঙ্গে যখন বেদুঈন আরব বিদ্রোহীদের ঘোরতর যুদ্ধ চলছে তখন রামাযানে এই তায়েফে অবস্থান করছিলেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহ) এবং তাঁর 'জানেছার' খাদেম শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসায়ন আহমদ মাদানী (রহ)। দিন-রাত প্রচণ্ড গুলিবৃষ্টি হতো উভয় পক্ষের মাঝে। সেই গুলিবৃষ্টি উপেক্ষা করে শায়খুল হিন্দ (রহ) এবং তাঁর সফরসঙ্গীরা মসজিদে ইবনে আব্বাসে হাযির হতেন। অথচ তাঁদের অবস্থানক্ষেত্রের নিকটেই ছিলো মহল্লার মসজিদ। এটা শরীয়াতের মাসআলা নয়, এটা হলো ইশক ও মুহব্বতের তাকাযা।

আগের যুগের বিভিন্ন সফরনামায়, এমনকি শায়খুল হিন্দ (রহ)-এর 'আসীরে মাল্টা'য় যেমন পড়েছি, সেই মসজিদে ইবনে আব্বাসের চিহ্নমাত্র এখন নেই। মসজিদে ইবনে আব্বাস এখন অতি শানদার ও কারুকার্যময় বিরাট মসজিদ। কিন্তু এটা তো শুধু চোখের বিভ্রম! মানুষ যদি ইচ্ছে করে, খুব সহজেই ফিরে যেতে পারে অতীতের কোলে, যেখানে সবকিছু সহজ-সরল এবং সবকিছু হৃদয়ের খুব নিকটবর্তী; যেখানে বিজলী বাতির ঝলমলতা নেই, আছে নূর ও নূরানিয়াত। আমি চেষ্টা করলাম একটু একটু করে সময়ের সিঁড়ি বেয়ে সুন্দর অতীতের ছায়ায় ফিরে যেতে। আমি যেন দেখতে পেলাম মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যবিপর্যয়কারী সেই যুদ্ধের বিভীষিকা। অল্পসংখ্যক জানবায তুর্কী সিপাহী এবং ইংরেজের ক্রীড়নক শরীফের বেদুঈন বাহিনীর মাঝে চলছে ঘোরতর যুদ্ধ। প্রচণ্ড গোলাগুলিতে রাতের অন্ধকারে তায়েফের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। মসজিদের মিনার ভেঙ্গে পড়েছে। ভেতরেও এসে পড়ছে একটা দু'টো গোলা। মসজিদে কোন মানুষ নেই। এশার নামাযেও কোন মানুষ আসেনি। ঘর থেকে বের হওয়াই তো সম্ভব নয়। সেই সুনসান মসজিদে পড়ে আছেন তিনচারজন হিন্দুস্তানী মুসাফির। ঐ তো শায়খুল হিন্দ (রহ)! প্রচণ্ড গোলাগুলি এবং মৃত্যুর বিভীষিকা, কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে আছেন জায়নামাযে, পূর্ণ আত্মসমাহিত! নামায শেষে ঐ যে তিনি হাত তুলেছেন আল্লাহর দরবারে মুনাজাতে! জারজার হয়ে কাঁদছেন আর ফরিয়াদ করছেন, আল্লাহ যেন রক্ষা করেন মুমূর্ষু ইসলামী খেলাফতকে ইংরেজ হায়েনাদের

হামলা থেকে। কারণ শত দুর্বলতা সত্ত্বেও এই তুর্কী খেলাফতটুকুই এখন ইসলামী উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক এবং গৌরবময় অতীতে ফিরে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন। তিনি জানতেন এটা, আর জানতো মুসলিম উম্মাহর জানি দুশমন সুচতুর ইংরেজ; জানতো না শুধু আরবনামের কলঙ্ক ইংরেজের হাতের পুতুল শরীফ।

ঐ যে শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ)! প্রাণপ্রিয় শায়খকে যেন আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন। অজ্ঞাত কোন গুলি যদি আসে, শায়খের গায়ে নয় তা যেন লাগে নিজের বুকে!

সময়ের অনেক সিঁড়ি পার হয়ে, বহু নূরানি মানুষ অবলোকন করে করে আমি যেন প্রবেশ করলাম নূর ঝলমল সেই ছোট্ট মসজিদটিতে যেখানে নামায পড়ছেন নবীজীর প্রিয় ছাহাবী হযরত আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস (রা)। আবুল-কালামের কথায় চমকে উঠলাম এবং অতীত থেকে ফিরে এলাম বর্তমানে। আমার সামনে শানদার মসাজিদে ইবনে আব্বাস। দু'রাকাত নফল পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, যার আত্মিক প্রশান্তি ও রূহানি সুকূন এখনো যেন অনুভব করা যায়।

সেদিনই সন্ধ্যায় তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে এলাম। আবুল কালাম তার গাড়ীতে করে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। সেই যে গেলেন, আর না হলো দেখা, না থাকলো কোন যোগাযোগ। যেমন হারিয়ে ছিলেন তখন পর্যন্ত তেমনি হারিয়ে আছেন এখন পর্যন্ত। মাঝখানে যেন শুধু আসমানের ইশারায় একদিনের জন্য উদিত হয়েছিলেন তায়েফের আলোতে আমাকে আলোকিত ও প্লাবিত করার জন্য! তিনি হারিয়ে গেছেন আমার দিন-রাতের জীবন থেকে, তবে হৃদয়ের স্পন্দন থেকে নয়। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এখনো আমি স্মরণ করি তাকে। কে জানে, হয়ত হঠাৎ করে কোন একদিন ..!

কোন কিছুই তো অসম্ভব নয়! কত বিস্ময়, কত আনন্দ এবং বেদনা লুকিয়ে থাকে আমাদের জীবনে আগামী দিনের পর্দায়, আগে থেকে আমরা তো তার কিছুই জানি না! অজানার এই ঝুলন্ত পর্দাটুকুর জন্যই হয়ত জীবনের প্রতি এত ভালোবাসা, এত অনুরাগ!

***

একদিন তাহাজ্জুদের সময় হুইলচেয়ারে হযরতকে হারাম শরীফে নিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ তিনি বললেন, মিয়াঁ আবু তাহের! আমি তোমাকে জান্নাতুল মু'আল্লার যিয়ারাতে নিয়ে যাবো, তবে একটি শর্ত!

এমন অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য, আমি তো অভিভূত এবং আনন্দে আত্মহারা! হযরত বলছেন 'শর্ত', আশ্চর্য! মেঘ বলছে তৃষ্ণার্ত ভূমিকে, তোমার বুকে বারিবর্ষণ করবো. তবে একটি শর্ত; তোমাকে সবুজ ফসল দান করতে হবে পৃথিবীর মানুষকে! মেঘ যদি মাটির কাছে দাবী করে এমন মধুর শর্ত তাহলে কেমন হয়! আমার অবস্থাও হলো সেই শুকনো ভূমির মত; কারণ তেমনি একটি মধুর শর্তের কথা বললেন হযরত আমাকে! বললেন... থাক সে কথা।

ফজরের পর হযরতের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে এবং কিছুটা পথ হুইলচেয়ারে করে হযরত পৌঁছলেন জান্নাতুল মুআল্লায়।

জান্নাতুল মুআল্লা মক্কা শরীফের প্রাচীনতম কবরস্তান। হারাম থেকে এক মাইলের দূরত্বে মক্কার উর্ধ্বভূমিতে তার অবস্থান।

জান্নাতুল মুআল্লার পরিচয়ের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এখানে শায়িত আছেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী, আমাদের আম্মা হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রা); বিবাহ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুখে-দুঃখে, বিপদে-দুর্যোগে যিনি নবীজীর পাশে ছিলেন। জীবন ও সম্পদ, সর্বস্ব যিনি আল্লাহর নবীর কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহর নবী যাঁর সম্পর্কে বলেছেন, যখন মানুষ আমাকে অবিশ্বাস করেছে তখন খাদীজা আমাকে বিশ্বাস করেছেন। 'যখন লোকেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন খাদীজা আমাকে গ্রহণ করেছেন। যখন লোকেরা আমাকে কষ্ট দিয়েছে তখন তিনি আমাকে সমবেদনা জানিয়েছেন।'

আল্লাহর নবীর পবিত্র যবানে যখন তিনি নবুয়তপ্রাপ্তির কথা শুনলেন তখন নির্দ্বিধায় এবং পরম নির্ভরতায় তিনি তা বিশ্বাস করলেন এবং কৃতার্থ কণ্ঠে মধুর মমতায় এই বলে আল্লাহর নবীকে সান্ত্বনা দিলেন, 'আপনার ভয় কি! আপনি তো দুর্বলকে সাহায্য করেন, নিঃস্ব অসহায়কে আশ্রয় দেন। বিপদে-দুর্যোগে সবার পাশে দাঁড়ান; সুতরাং আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন এবং আশ্রয় দান করবেন। কিছুতেই আল্লাহ আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না।'

প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীর মুখে এই যে সুমধুর সান্ত্বনা, তা কেমন প্রশান্তি দান করেছিলো আমাদের পেয়ারা নবীকে!

আবির্ভাবের চরম দুর্যোগকালে ইসলাম একজন নারীর কাছেই পেয়েছিলো এমন মমতা! এমন সান্ত্বনা! সেই নারীর প্রতি কি ইসলাম কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে! ইসলামের চেয়ে আর বেশী কে চাইতে পারে নারীর কল্যাণ?!

আজ কার ভুলে, কাদের মূর্খতায় ইসলামের প্রতি নারীসমাজের এমন ভীতি-ভয় ও দ্বিধা-সংশয়?!

জান্নাতুল মুআল্লার প্রবেশদ্বার খোলাই ছিলো এবং যিয়ারতকারীদের আসা-যাওয়া অব্যাহত ছিলো। হযরত হুইলচেয়ার থেকে নেমে ধীর পদক্ষেপে জান্নাতুল মুআল্লায় প্রবেশ করলেন।

কিছুক্ষণ সাধারণভাবে সকল কবরবাসীর জন্য দু'আ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে একটি কবরের সামনে হাজির হলেন এবং আমাকে সতর্ক করে বললেন, খুব আদবের সাথে দাঁড়াও। এটা আম্মাজান হযরত খাদীজা (রা)-এর কবর, স্বয়ং আল্লাহ যাঁকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং সালাম পাঠিয়েছেন হযরত জিবরীল আলাইহিস-সালাম!

হযরতের তখন এমন 'বে-খোদ' অবস্থা যে, তিনি জারজার হয়ে কাঁদলেন। সে কান্নায় কোন শব্দ ছিলো না, ছিলো শুধু অশ্রুর বর্ষণ।

হযরতের কান্না দেখে আমারও কান্না পেলো এবং আমারও চোখ দু'টো কিছু না কিছু সিক্ত হলো।

এর পর একে একে হযরত বিভিন্ন কবরের সামনে দাঁড়ালেন এবং যিয়ারাতের হক আদায় করলেন। আমি অভিভূত চিত্তে তাঁর অনুগমন করলাম। তিনি যখন যে কবরের সামনে দাঁড়ান, আমিও পিছনে দাঁড়াই এবং যিয়ারত করি। সব এখন মনে নেই, তবে এইটুকু মনে আছে যে, ইমামুল আকাবির হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ)-এর কবরের সামনে তিনি মোরাকাবার অবস্থায় দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই মোরাকাবার কী হাকীকত এবং কী তাঁর প্রাপ্তি? আমার মত 'নির্বোধ' কীভাবে তা জানবে বা বোঝবে! আমার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমি তখন ছিলাম সেখানে আমার হযরতের পিছনে।

যিয়ারাত থেকে ফারিগ হয়ে জান্নাতুল মুআল্লা থেকে বের হওয়ার সময় হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, মিয়াঁ আবু তাহের, কিছু হালাত পয়দা হইছে নি?'

অকপটে আরয করলাম, হযরত! আমি কিছু বুঝতে পারিনি। তবে চোখ দু'টো একটু ভিজেছে এবং কয়েক কাতরা আঁসু এখানে রেখে যেতে পেরেছি।

ফেরার পথে পুরোটা সময় হযরত হুইলচেয়ারে ছিলেন, আর আমি পরম আনন্দে সেটা চালিয়ে এনেছি। সারা পথে হযরত কোন কথা বলেননি, একেবারে নীরব ছিলেন এবং সেই আধ্যাত্মিক ভাবেই আত্মনিমগ্ন ছিলেন যা তিনি জান্নাতুল মুআল্লার যিয়ারত থেকে অর্জন করেছেন।

***

হারাম শরীফ থেকে বাবে উম্মেহানি দিয়ে বের হয়ে মিসফালায় যাওয়ার মুখে বাম দিকে যে ছোট পাহাড়টি, তার উপর রয়েছে তুর্কী আমলের দুর্গ। প্রতিদিন আসা-যাওয়ার পথে দুর্গটি নযরে পড়ে। কখনো কখনো দুর্গের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। হৃদয় অবর্ণনীয় এক বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তুর্কীদের উছমানী খেলাফাতই ছিলো মুসলিম বিশ্বে ইসলামী খিলাফাতের সর্বশেষ প্রতিনিধি। হারামাইন, হিজায ও আরববিশ্ব ছিলো বিশাল উছমানী খিলাফাতের অন্তর্ভুক্ত। বলাবাহুল্য যে, এটা খিলাফাতে রাশেদা ছিলো না, কিন্তু ছিলো ইসলামী খিলাফাতের অবশিষ্ট এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও শক্তির প্রতীক। তাই ইহুদি-খৃস্টান চক্র শুরু থেকেই তৎপর ছিলো উছমানি খিলাফত ধ্বংসের কূট চক্রান্তে।

শেষ দিকে উছমানী খিলাফত যখন বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত তখন আন্তর্জাতিক ইহুদি সংস্থার প্রতিনিধিদল তুর্কী খলীফা সুলতান আব্দুল হামীদ খানের কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসে যে, সকল বৈদেশিক ঋণ তারা পরিশোধ করবে, তদুপরি জঙ্গি নৌবহরের আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করবে; বিনিময়ে বেশী কিছু নয়, ফিলিস্তীনে একখণ্ড বাসভূমি তাদেরকে 'দান' করতে হবে।

সুলতান আবদুল হামীদের অনেক দোষ-দুর্বলতা ছিলো, কিন্তু এ প্রশ্নে তিনি মর্দে মুমিনের পরিচয় দিয়েছিলেন। ইহুদিদের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তিনি

বলেছিলেন ..। যা বলেছিলেন ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। বলেছিলেন, 'আমার দুর্বলতা তোমরা বুঝতে পেরেছো, তাই অর্থের প্রলোভন দেয়ার দুঃসাহস করেছো, কিন্তু আমি তো এর বিনিময়ে ফিলিস্তীনের একমুঠ বালুও তোমাদের দেবো না!'

প্রলোভনে যখন কাজ হলো না তখন ইহুদিচক্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো, যে কোন মূল্যে উছমানি খিলাফত ধ্বংস করেই তারা ক্ষান্ত হবে। শেষ পর্যন্ত তাদের চক্রান্ত সফল হলো আরব শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক পর্যায়ে হিজায, শাম, ফিলিস্তীন, মিশর, জর্দানসহ সমগ্র আরববিশ্ব তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। ইংরেজ-ইহুদিচক্র আরবদের মাঝে আরব জাতীয়তাবাদের অভিশপ্ত বীজ ছড়িয়ে দেয় এবং তাদেরকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উছমানী খিলাফত অনেক চিন্তাভাবনার পর একান্ত অনন্যোপায় হয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করলো। মক্কা-মদীনা ও জিদ্দা-তায়েফে তখন মাত্র পাঁচহাজার প্রশিক্ষিত সৈন্য ছিলো। আরব-বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তারা মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছিলো, কিন্তু বৃটিশ গোলান্দায বাহিনী যখন আরবদের সাহায্যে এগিয়ে এলো তখন তুর্কীদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লো এবং শৌর্যবীর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেও তুর্কী বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। এভাবে মক্কা-মদীনাসহ সমগ্র হিজায তুর্কীদের হাতছাড়া হয়ে গেলো।

তুর্কীদের শোচনীয় পরাজয় হলেও আরবদের দিবাস্বপ্ন আর পূর্ণ হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো আরববিশ্বকে টুকরো টুকরো করে গ্রাস করে নেয়। ফিলিস্তীনও আরবদের হাতছাড়া হয়ে যায়। শত প্রলোভনের মুখেও সুলতান আবদুল হামীদ যে ফিলিস্তীনের একমুঠ বালু বিক্রি করতে রাজী হননি, আরবরা তা একরকম উপহাররূপেই দুশমনের হাতে তুলে দেয়, আর সেখানে জন্ম নেয় সাম্রাজ্যবাদের বিষফোঁড়া অভিশপ্ত ইহুদিরাষ্ট্র ইসরাইল। আরবরাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা বলতে আজ কিছুই নেই। সউদি রাজবংশও জন্মলগ্ন থেকেই টিকে আছে ইঙ্গমার্কিন শক্তির দয়ায়। মার্কিন প্রভুর মর্জির বাইরে একটি কদমও রাখার ক্ষমতা নেই তাদের। কয়েক লাখ ইহুদির হাতে কয়েক কোটি আরব আজ যে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে তা কিন্তু আরবদেরই কর্মফল। তুর্কীদের দোষত্রুটি ছিলো সীমাহীন সন্দেহ নেই, কিন্তু মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও শক্তির শেষ ভরসাস্থল উছমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহ ছিলো এমন অপরাধ যা ইতিহাস কখনো ক্ষমা করবে না। আল্লাহ যদি ক্ষমা করেন তাহলেই শুধু আরবদের মুক্তি হতে পারে ইতিহাসের শাস্তি থেকে।

যখনই আমি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত তুর্কী আমলের জরাজীর্ণ দুর্গটির দিকে তাকাই এসব চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং আমি বেদনাভারাক্রান্ত হয়ে পড়ি। পর্বতচূড়ার জীর্ণদশার এ দুর্গটি একদিকে যেমন মুসলিম উম্মাহর হারানো শক্তি ও গৌরবের নীরব সাক্ষী, অন্যদিকে আরব শাসকদের কলঙ্কজনক অধ্যায়ের বেদনাদায়ক নিদর্শন।

হায় আরব! তোমরা ছিলে ইসলামী খিলাফতের রক্ষক। গোটা বিশ্ব ছিলো তোমাদের ভয়ে কম্পমান। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস! তোমাদেরই বিশ্বাসঘাতকতায় তৈরী হলো মুসলিম খিলাফাতের কবর, আর এখন তোমরা লাঞ্ছনা ভোগ করছো অভিশপ্ত ইহুদিদের হাতে।

শোনা যাচ্ছে, সউদি সরকার দুর্গটি ভেঙ্গে ফেলার চিন্তাভাবনা করছে। করারই কথা। কলঙ্কের সাক্ষ্য কেই বা রাখতে চায়!

***

সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। সময় সবসময় দ্রুতই ফুরিয়ে যায়। আর সৌভাগ্যের সময় তো শেষবিকেলের ছায়া। তাই দিন-রাতের যতটা সময় সম্ভব হারাম শরীফেই থাকার চেষ্টা করছি। হযরত যখন উম্মে হানিতে বসেন, তাঁর ছোহবতে থাকি। তাঁর কথা ও উপদেশ শুনি। যখন নীরব থাকেন, তাঁকে অবলোকন করি। যখন তাওয়াফ করেন, সেই তাওয়াফে শরীক হই। যামযামের পানি প্রাণভরে পান করি। তাতে প্রাণ সুসিক্ত ও সুশীতল হয়। কিন্তু যখন মনে পড়ে, এ সৌভাগ্য মাত্র দু'দিনের, বিষাদের কালো মেঘ তখন হৃদয়ের আকাশ ছেয়ে যায়। আল্লাহর ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি, আমার মত না-পাক, গান্দা ইনসানকেও ডেকে আনা হয়েছিলো আল্লাহর ঘরের মেহমানরূপে। কোন যোগ্যতা ছিলো না, শুধু আল্লাহর রহমত ছিলো। কিন্তু আমি পারিনি আল্লাহর ঘরের কোন আদব রক্ষা করতে। যেমন এসেছিলাম গাফেল তেমনি ফিরে যাচ্ছি গাফেল। কী উপায় হবে আমার? মাহরূমি ও বঞ্চনাই কি আমার ভাগ্য?

আবার ভাবি, না না, আমার মাওলা তো বড় মেহেরবান। মরুভূমির বালুকণার শেষ আছে, মহাসাগরের জলরাশির সীমা আছে, আমার মাওলার দয়া ও রহমতের, করুণা ও করমের কোন শেষ নেই। এ ঘর তাঁর এবং তিনিই এ ঘরের দয়ালু মেযবান, আর আমি তাঁর দাওয়াতি মেহমান! তাঁর দান তো যোগ্যতার বিচারে নয়, দয়া ও রহমতের ভিত্তিতে হয়। ভাব ও আবেগের এইসব তরঙ্গদোলায় হৃদয় যখন উদ্বেলিত হয় তখন ঘরের গিলাফ ধরে ঘরের মালিকের কাছে অন্তরের সবটুকু আকুতি ঢেলে দিয়ে মিনতি জানাই হযরত আমাতুল্লাহ তাসনীমের সেই কবিতায়–

আয় বান্দা নাওয়ায! মেরী মিন্নাত কি লাজ রাখলে/ মেরী নেহী তো আপনি রাহমাত কি লাজ রাখলে।

(ওগো দয়াময়, রক্ষা করো বান্দার মিনতির লাজ/ বান্দার না হয়, রক্ষা করো তোমার রহমতের লাজ।)

হে আল্লাহ! তুমি তো বলেছো, 'বান্দা যদি গোনাহ দিয়ে আসমান-যমিন ভরে ফেলে, আমি মাগফিরাত দিয়ে আসমান-যমিন ভরে ফেলবো। বান্দা যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি বান্দার দিকে দৌড়ে আসবো।' হে আল্লাহ! তোমার রহমতের আশায় তোমার দিকে আমি হেঁটে হেঁটে এসেছি; বার বার হোঁচট খেয়েছি, তবু এসেছি। গোনাহগার বান্দার দিকে তুমি হে আল্লাহ দৌড়ে আসো এবং তোমার রহমতের ছায়ায় তাকে আশ্রয় দান করো।

বিরাট আমার গোনাহর বোঝা, অসংখ্য আমার পাপের কলঙ্ক, কিন্তু তোমার রহমত থেকে আমি নিরাশ নই হে আল্লাহ! কারণ তোমার হাবীব বলেছেন, তোমার রহমত আমাদের গোনাহ থেকে প্রশস্ত। হে আল্লাহ! আমলের উপর আমার কোন ভরসা নেই, ভরসা শুধু তোমার রহমতের উপর।

মেহমানদারি হয়ে গেছে। আল্লাহর মেহমানগণ এখন যার যার দেশে ফিরে যাচ্ছেন। হারাম ও মাতাফ হালকা হয়ে এসেছে। এখন মানুষ আছে, জনস্রোত নেই। এখন সহজেই মুলতাযামে বুক লাগানো যায় এবং ঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা যায়; একদিন তো হাজারে আসওয়াদ চুম্বনের খোশকিসমতও হয়ে গেলো। নিজে তো চুমু খেলামই, এক বুড়ো হাজীকেও দু'হাতে আগলে রেখে চুমু খেতে সাহায্য করলাম। বুড়ো মিয়াঁ কী খুশী! যাকে বলে আনন্দে আত্মহারা! আমার হাতে কপালে চুমু খেলেন, আর অজানা-অচেনা এক ভাষায় মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। মুখের ভাষা তো বুঝলাম না, তবে মুখমণ্ডলের ভাষা বুঝলাম, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। বুড়ো মিয়াঁর চুমো খাওয়া ভালো লাগলো একথা ভেবে যে, ঠোঁট দু'টো এই মাত্র হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেছে।

আল্লাহর বান্দাদের সামান্য একটু খেদমতে দিলের কত দু'আ যে পাওয়া যায়! এসব দু'আই হলো জীবনপথের পাথেয়। কিন্তু আমরা খুব কমই চিন্তা করি এসব বিষয়। আল্লাহকে পাওয়ার জন্যই এত কষ্ট করে আল্লাহর ঘরে আসা, অথচ কেয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, তুমি যদি ঐ ক্ষুধার্তকে একলোকমা খাবার দিতে, কিংবা ঐ পিপাসার্তকে একঢোক পানি দিতে, অথবা ঐ অসুস্থ লোকটিকে একটু সেবা করতে, সেখানে তুমি আমাকে পেতে! হজ্বের সফরে বহু সুযোগ আসে আল্লাহকে কাছে পাওয়ার, কিন্তু আমরা আল্লাহকে তালাশ করি শুধু তাওয়াফের ভিড়ে এবং হাজারে আসওয়াদের হুজুমে মানুষকে কষ্ট দেয়ার মাঝে।

মুমিন ভাইয়ের সামান্য সেবা-সাহায্য তো দূরের কথা, মক্কায়, মিনায়, আরাফায় সর্বত্র আত্মকেন্দ্রিকতার এমন সব দৃশ্যের অবতারণা হয় যে, হজ্বের মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হওয়ার উপক্রম। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন এবং তাওফীক দান করুন, আমীন।

একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো। মদীনা শরীফে অহুদের ময়দানে। গরম ছিলো প্রচণ্ড। এক হাজী, কোথায় তার দেশ, কী তার ভাষা জানি না; দূর থেকে দেখলাম, বোতল থেকে ঠাণ্ডা পানি পান করছেন। কাছেই এক বৃদ্ধা মহিলা সেদিকে তাকিয়ে আছেন তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে। হাজী ছাহেব হঠাৎ দেখতে পেলেন এবং বোতলটি বৃদ্ধার দিকে এগিয়ে দিলেন। কয়েক ঢোক পান করে তার বার্ধক্যপীড়িত চেহারায়ও সজীবতা ফিরে এলো। দৃশ্যটি দেখে আপ্লুত হলাম। মন সাক্ষ্য দিলো, অচিন দেশের অচিন হাজী আল্লাহকে পেয়ে গেলেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ যখন বলবেন, হে বান্দা! আমি পিপাসার্ত হয়ে তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, তুমি .. অচিন হাজী তখন বলে ওঠবে, আমি তোমাকে পানি দিয়েছিলাম হে আল্লাহ! ঐ যে অহুদের ময়দানে! তখন

কি আল্লাহ হেসে দেবেন না; তখন কি আল্লাহ বলে ওঠবেন না, আচ্ছা, যাও বান্দা, জান্নাতে যাও!

এমন প্রিয় দৃশ্য দেখেছি কিছু; অপ্রিয় দৃশ্যও চোখে পড়েছে বেশ কিছু। কিন্তু মন্দের উদাহরণ তুলে ধরে কী লাভ! কবির ভাষায়–

বুলবুলির মত গেয়ে যাও শুভ ও কল্যাণের গান/ অশুভ অসুন্দর যা, মুছে যাক তোমার গানের সুরে।

শুধু কামনা করি, আমি, তুমি– আমরা সকলে যেন চলতে পারি কল্যাণের পথে, আল্লাহকে পাওয়ার পথে।

***

তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত আদায় করে যামযামের পারে গেলাম এবং প্রাণভরে যামযাম পান করলাম। পবিত্র যামযামের স্রোতধারা যেমন কখনো শেষ হবে না তেমনি যামযামের প্রশস্তিও শেষ হবে না। যত বলবে, মনে হবে, শেষ কথাটি বলা হয়নি; যত লিখবে মনে হবে, রয়ে গেছে আরো কিছু লেখার। যামযাম পান করে পিপাসায় শুকিয়ে যাওয়া কলজে যেমন ভিজে শীতল হয় তেমনি হৃদয় ও আত্মাও যেন অপার্থিব এক প্রাপ্তিতে পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। যখনই যামযামের পূর্ণ পাত্র ঠোঁট স্পর্শ করে তখনই কল্পনায় ভেসে ওঠে সেই পবিত্র দৃশ্য! যামযামের পারে দাঁড়িয়ে আছেন আল্লাহর পেয়ারা নবী। তিনি যামযাম পান করছেন, করেই চলেছেন। যামযাম মুখে নিয়ে তিনি কুলি করছেন এবং তা যামযামের কূপে নিক্ষেপ করছেন, যাতে ছাহাবা কেরাম যেমন পেয়ারা নবীর পবিত্র থুথু থেকে বরকত লাভ করতেন, আনেওয়ালা উম্মতও যেন তা লাভ করতে পারে এই যামযাম থেকে।

আহা, কত দয়ার নবী! কেমন রহমতের নবী! যখনই যামযাম পান করি, আমার সামনে সেই পবিত্র দৃশ্য ভেসে ওঠে এবং আমি অনুভব করি যামযামের এবং পেয়ারা নবীর পবিত্র থুথুর মিশ্র স্বাদ! যামযামের পানিতে আমি যেন পাই সেই থুথুর আলাদা ঘ্রাণ!

যামযাম থেকে ফেরার পথে সিঁড়ির মাথায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো মক্কা বালাদিয়ার প্রধান শায়খ আব্দুল আযীযের সঙ্গে। কয়েকদিন আগে হযরতের অনুগামীরূপে তার বাড়ীতে দাওয়াত খেয়েছিলাম। তিনি চিনতে পেরে এগিয়ে এলেন এবং উষ্ণ আন্তরিকতার সাথে মুছাফাহা করলেন। হযরতের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, ভালো আছেন। তিনি আপনাকে স্মরণ করেন, আপনার খুলুছ ও আন্তরিকতার কথা বলেন এবং আপনার জন্য দু'আ করেন।

শায়খ বললেন, তোমার কোন প্রয়োজন থাকলে নিঃসংকোচে বলো, সৌভাগ্য মনে করে আমি তোমার খেদমত করবো।

আরবের শরীফ মেযবান মেহমানকে এধরনের কথা বলে থাকেন। সবসময় বলে এসেছেন, এখনো বলেন এবং আন্তরিকভাবেই বলেন। এটা তাদের আরবীয় মেহমানদারির অংশ।

সত্যি বলতে কি! একটি প্রয়োজন ছিলো। গতকাল কুতুবখানায় কাশফুযযুনূন কিতাবটি এবং আরো কিছু কিতাব দেখেছি, আফসোসের দেখা। একবার মনে হলো, কিতাবের কথা বলি, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। কারণ বাইতুল্লাহ ছিলো আমার সামনে। লজ্জিত হলাম এবং নিজেকে তিরস্কার করলাম। শায়খকে বললাম, জাযাকাল্লাহ। কিন্তু জনাব, আপনি নিজেই তো এ ঘর তাওয়াফ করেছেন ঘরের মালিকের কাছে নিজের প্রয়োজন চাওয়ার জন্য! আমি কেন আপনার কাছে চাইবো! ঘরের মালিকই আমার প্রয়োজন পুরা করবেন।

আবেগের সাথে দিল থেকে এসেছিলো কথাগুলো এবং মনে হলো শায়খের অন্তরকেও স্পর্শ করেছে। তিনি ছাদাকতা, ছাদাকতা বলে নেমে গেলেন যামযামের উদ্দেশ্যে। আমার অন্তর পূর্ণ হলো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায়। কালো গিলাফের দিকে তাকালাম সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে; তোমার শোকর হে আল্লাহ! বান্দাকে তুমি রক্ষা করেছো তোমার ঘরের সামনে বান্দার কাছে হাত পাতার লজ্জা থেকে।

ঐ সফরে ঐ কিতাবগুলো আসেনি সত্য, তবে বিশ্বাস ছিলো, কিতাবের যা উদ্দেশ্য তা অবশ্যই আল্লাহ দান করবেন।

মনে পড়লো অনেকবার কিতাবে পড়া সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি। মুসলিম জাহানের প্রতাপশালী খলিফা হারুন রশীদ হজ্বের সফরে আসছেন। বিভিন্ন এলাকার মুহতাজ লোকেরাও মক্কায় জমা হতে লাগলো; এই সুযোগে খলিফার কাছে নিজেদের প্রয়োজন তুলে ধরবে। অভাবগ্রস্ত এক বেদুঈনও বালকপুত্রকে সঙ্গে করে মক্কায় হাজির হলো। তাওয়াফ করার সময় সে দেখে অভাবিতপূর্ব একদৃশ্য; বাইতুল্লাহর গিলাফ ধরে জারজার হয়ে কাঁদছেন বাদশাহ হারুন রশীদ! আরব বেদুঈনের অন্তরে যেন আলো ঝিলিক দিলো! চোখ থেকে যেন পর্দা সরে গেলো এবং হাকীকতের নূর দৃষ্টিকে আলোকিত করলো। অভাবগ্রস্ত বেদুঈন মুহূর্তের মাঝে যেন হয়ে গেলো বাদশাহর চেয়ে ধনবান।

আসলে অভাব কাকে বলে? অভাব তো বলে হৃদয়ে ভাবের অনুপস্থিতিকে! হৃদয় যখন ভাবে পূর্ণ হয় তখন কোন অভাব থাকে না। সব অভাব মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। ভাবের অভাবই আসল অভাব। বাইতুল্লাহর গিলাফ ধরে বাদশাহর কান্না দেখে আরব বেদুঈনের হৃদয়রাজ্যে ভাবের এমন তরঙ্গ সৃষ্টি হলো যে, তার সব অভাব দূর হয়ে গেলো। পুত্রকে সম্বোধন করে আবেগ-উদ্দীপ্ত কণ্ঠে সে বলে উঠলো–

انظر يا بني ! كيف يتضرع جبار الأرض إلى جبار السماء

(দেখো হে প্রিয় পুত্র! যমিনের বাদশাহ কীভাবে আসমানের বাদশাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে!)

আরব বেদুঈন ভাবলো, তবে আমি কেন এসেছি দুনিয়ার বাদশাহর কাছে আসমানের বাদশাহকে ভুলে! যে দরবারের ভিখারী স্বয়ং হারুন রশীদ, সেই দরবার ছেড়ে আমি কেন হাত বিছাবো কাঙ্গালের দরবারে!

আরববেদুঈন এভাবে নিজেই শুধু শিক্ষা লাভ করলো না, নিজের আগামী প্রজন্মের সামনেও তুলে ধরলো এক পরম শিক্ষা। পুত্রকে সঙ্গে করে সেও জড়িয়ে ধরলো বাইতুল্লাহর গিলাফ। একাকার হয়ে গেলো রাজা ও প্রজা রাজাধিরাজের ঘরের গিলাফ ধরে। হে আল্লাহ! আমার প্রয়োজন তোমার কাছে, শুধু তোমার কাছে; কোন বান্দার কাছে নয়, নয় বাদশাহ নামের কোন ফকীরের কাছে।

হজ্ব শেষে আরববেদুঈন দিলের ধনে ধনী হয়ে ফিরে গেলো বাদশাহ হারুন রশীদের সঙ্গে দেখা না করে। নিজেই শুধু ধনী হলো না, ইতিহাসের পাতায় আমাদেরও জন্য রেখে গেলো অমূল্য এক সম্পদ। আল্লাহর নবী সত্যই বলেছেন-

لَيْسَ الْغِنِي غِنَى الْمَالِ إِنَّمَا الْغِنِيَ غِنَى النَّفْسِ

(সম্পদের প্রাচুর্য প্রাচুর্য নয়, আসল প্রাচুর্য হলো হৃদয়ের প্রাচুর্য)

কত শত বছর আগের আরববেদুঈন আমারও হৃদয়ে ভাবের এক তরঙ্গ সৃষ্টি করলো। আমিও এগিয়ে গেলাম বাইতুল্লাহর দিকে নতুন ভাবে, নতুন অনুভূতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে এবং জড়িয়ে ধরলাম বাইতুল্লাহর গিলাফ। হে আল্লাহ! আমার প্রয়োজন যেন হয় শুধু তোমার দরবারে। আমার চাওয়া যেন হয় শুধু তোমার দুয়ারে ।

হে আল্লাহ! তুমি যা পূর্ণ করবে সেটাই হলো আমার প্রয়োজন; তুমি যা পূর্ণ করবে না সেটা আমার প্রয়োজন হতে পারে না, সেটা হবে প্রয়োজনের ভ্রান্তি। হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রয়োজন পূর্ণ করো এবং প্রয়োজনের ভ্রান্তি থেকে আমাকে রক্ষা করো।

হে আল্লাহ! আমার প্রয়োজন তো কিতাবের নয়, ইলমের। তুমি আমাকে ইলমের নূর দান করো কিতাবের পাতা থেকে, কিংবা তোমার কোন বান্দার সিনা থেকে, অথবা সরাসরি তোমার ইলমের খাযানা থেকে।

বাইতুল্লাহর গিলাফ ধরে মুনাজাত আরো অনেক করেছি, কিন্তু সেই মুনাজাতের শান্তি ও প্রশান্তি ছিলো অন্যরকম। তাতে শুধু প্রার্থনার আকুতি ছিলো না, ছিলো দাতার পক্ষ হতে দানের আশ্বাস। এই প্রার্থনা-সৌভাগ্যের উপলক্ষ ছিলেন শায়খ আব্দুল আযীয, যিনি দিতে চেয়েছিলেন কিছু অর্থসম্পদ, কিন্তু তার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে দান করলেন প্রাপ্তি ও পরিতৃপ্তির এমন অমূল্য সম্পদ যার জন্য আমি হাসিমুখে উৎসর্গ করতে পারি পৃথিবীর সব সম্পদ। সেই উপকারী বন্ধুকেও আল্লাহ সম্পদশালী করুন, আমীন।

***

ঘড়ির কাঁটা এবং সময়ের চাকা থেমে নেই। আরেকটি সূর্য অস্ত গেলো। জীবনের সৌভাগ্য থেকে আরেকটি দিন কমে গেলো। আর আছে মাত্র দু'টি দিন। মদীনা থেকে বিদায়ের সময় সান্ত্বনা ছিলো যে, মন্‌যিল আমাদের মক্কা। সবুজ গম্বুজ হয়ত দেখবো না, কিন্তু আমার চক্ষু শীতল করবে বাইতুল্লাহর কালো গিলাফ। তখন বিদায়ের বেদনায় ছিলো আরো বড় মিলনের আনন্দ-হিল্লোল। কিন্তু এবার! এবার কিসের মাঝে পাবো সান্ত্বনার স্নিগ্ধ পরশ!

হঠাৎ মনে হলো, কোন একটি শীতল পরশ যেন হৃদয়ের সবটুকু দহন শুষে নিলো। এই তো আমার সান্ত্বনা! ঘর এখানে, কিন্তু ঘরের মালিক তো সময় ও সীমানার উর্ধ্বে! তিনি তো বান্দার স্কন্ধশিরারও নিকটে। হয়ত ঘরের সান্নিধ্যের ইতি হবে, কিন্তু ঘরের মালিকের সান্নিধ্য তো থাকবে চিরকাল। মৃত্যুর এপারে এবং মৃত্যুর ওপারে। ঘরের দীদার শুরু হয়, আবার শেষ হয়, কিন্তু জান্নাতে ঘরের মালিকের দীদার যখন শুরু হবে, শেষ হবে না কোন দিন। সেই মহাদীদারের অস্থির প্রতীক্ষার মধুর বেদনা আমি বহন করবো চিরকাল।

এখানে এসেছিলাম কী জন্য?! আমি তো এসেছিলাম ঘরের দীদারের মাধ্যমে ঘরের মালিকের মহাদীদারকে স্মরণ করার জন্য। এই দীদারের আনন্দ-বেদনা দ্বারা সেই দীদারের ব্যাকুলতাকে আরো সজীব করার জন্য, যা এগিয়ে আসছে একটু একটু করে, একদিন একদিন করে! হজ্বের সফর তো ছিলো সেই মহাসফরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য, যার পরিণতি হবে ইনশাআল্লাহ ঘরের মালিকের মিলন ও দীদার! সেই মিলনের স্বাদ ও শান্তি, সেই দীদারের লয্যত ও প্রশান্তি এখন তুমি বোঝবে না হে বান্দা! এখন তুমি বোঝবে না! এখন শুধু অনুভব করতে চেষ্টা করো অস্থির প্রতীক্ষার মধুর বেদনার স্বাদ। ঘর থেকে তোমার বিদায় হবে, ঘরের মালিকের সান্নিধ্য থেকে তো বিদায় হবে না, যদি নিজে তুমি বিদায় না হও। তিনি তো আছেন তোমার সঙ্গে, তুমি যখন জাগ্রত তখনো, তুমি যখন ঘুমন্ত তখনো! তুমি যখন তাঁকে স্মরণ করো তখনো, তুমি যখন তাঁকে ভুলে যাও তখনো!

***

আমার পরিচিত এক ব্যক্তি, অনেক দিন মক্কায় আছেন, তাকে বললাম, নবীজীর জন্মস্থান কোথায়, আমাকে কি নিয়ে যেতে পারেন? তিনি নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলেন, তা তো জানি না! আমি এখানে বাড়ীর ব্যবসা করি, আর এবার আমার মাথায় পড়েছে বাড়ি! লাভ দূরের কথা, লোকসান সামাল দেয়াই মুশকিল।

অবাক হলাম, লজ্জিত হলাম এবং ব্যথিত হলাম। সমবেদনা প্রকাশ করে বললাম, আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করুন সবরকমের লোকসান থেকে।

অনেকবারের মত আমার সামনে আবারও উদ্ভাসিত হলো দূর ও নিকটের দর্শন। অনেকে দূরে আছে কিন্তু দূরে থাকে না; অনেকে কাছে আছে, কিন্তু কাছে থাকে না।

অন্য একজন খুব আগ্রহের সঙ্গে আমাকে নিয়ে গেলেন। ছাফা পাহাড়ের দিক থেকে বেশ কিছু ঘর পার হয়ে একটি দোতালা বাড়ীর সামনে এসে বললেন, এখানে ছিলো মা আমেনার ঘর।

কল্পনার চোখে আমি দেখতে চেষ্টা করলাম, কেমন ছিলো মা আমেনার ঘরখানি! পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী এবং সবচেয়ে দুঃখিনী ছিলেন মা আমেনা। এখানে একটি ঘরে, জানি না কেমন ছিলো সে ঘরখানি, জগতের শ্রেষ্ঠ মানব একটুকরো চাঁদ হয়ে এসেছিলেন মা আমেনার কোল আলো করে। সুতরাং তাঁর চেয়ে সৌভাগ্যবতী মা আর কে হবেন, কে হতে পারেন! কিন্তু সেই চাঁদের টুকরোকে কোলে নিয়ে দোল

দেয়ার এবং আদর করে চুমু খাওয়ার সুযোগ হলো না তাঁর। কোলের সন্তানকে তুলে দিতে হলো তায়েফের বিবি হালিমার কোলে। মাতৃহৃদয় ও মাতৃমমতার জন্য এর চেয়ে দুঃখের, এর চেয়ে বেদনার আর কী হতে পারে!

তার পর যখন কোলের চাঁদকে কোলে ফিরে পেলেন তখন তিনি নিজেই চলে গেলেন মৃত্যুর কোলে! মদীনা থেকে মক্কায় ফিরে আসার পথে নির্জন মরুভূমিতে মৃত্যুর কালো পর্দা যখন নেমে এসেছিলো তাঁর চোখে তখন কি এই জনমদুঃখিনী মায়ের শোকে মরুভূমির বালু কাঁদেনি! আকাশের চোখে তখন কি অশ্রু ঝরেনি! কিংবা মৃত্যুর ফিরেশতার কি বুক কাঁপেনি!

মৃত্যুর ফিরেশতার কি বুক আছে; সে বুকে কি হৃদয় আছে; যদি থাকে, বলতেই হবে, মা আমেনার রূহ ধরে টান দিতে ফিরেশতার বুকেও কষ্ট হয়েছিলো, তারও হৃদয়ে বেদনা জেগেছিলো। নির্জন মরুভূমিতে কলিজার টুকরোকে একা ফেলে বিদায় নেয়া; তার চেয়ে দুঃখিনী মা আর কে হতে পারেন!

নবীজীর জন্মস্থান যে ঘর তা তো আর নেই। যুগে যুগে অনেক পরিবর্তনের পর এখন তা হয়েছে একটি আধুনিক ভবন। তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার। আমরা পরম ভক্তি মুহব্বতের সাথে ভবনটিতে প্রবেশ করলাম। হৃদয়ে ভাবের সাগরে তখন অদ্ভুত এক তরঙ্গদোলা অনুভব করলাম। কল্পনার চোখে আমি যেন দেখতে পেলাম সামান্য উপকরণের সেই অসামান্য ঘরটি যেখানে ছিলো মা আমেনার সুখের সংসার; স্বামীর মৃত্যুর পর যেখানে কেটেছে তাঁর দুঃখের দিনরাত; যে ঘরে মা আমেনার কোলে পূর্ণিমার আলো এসেছিলো দুনিয়া উজালা করে; চাঁদশিশুকে কোলে নিয়ে যে ঘরে কেটেছে মা আমেনার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখের অল্প ক'টি দিন। কলিজার টুকরোকে বিবি হালিমার কোলে তুলে দিয়ে এখানেই কেটেছিলো মা আমেনার অস্থির প্রতীক্ষার কয়েকটি বছর। কোন্ পাষাণ হৃদয় এখানে এসে ভক্তিরসে সিক্ত হবে না! মা আমেনার প্রতি এবং তাঁর আদরের দুলালের প্রতি ভালোবাসায় আপ্লুত হবে না! কিন্তু যাদের হাতে এই সব পবিত্র স্থান হেফাযতের দায়িত্ব তারা তাদের বুদ্ধি বিবেচনা মত যা ভালো মনে করেছেন করেছেন। সেটা ভালো হয়েছে কি না তা আল্লাহ জানেন।

যিনি পাঠাগারের দায়িত্বে ছিলেন তার কাছে বিনয়ের সাথে নিবেদন করলাম, ভাই, আমি একজন আলিমে দ্বীন। শিরক ও বিদ'আত এবং ইশক ও মুহাব্বাতের পার্থক্য আমি বুঝতে পারি। আপনি কি দয়া করে আমাকে ঠিক সেই স্থানটি দেখাবেন যেখানে আল্লাহর নবী জন্মগ্রহণ করেছেন?!

ভদ্র লোকের দয়া হলো; কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আসুন। তিনি আমাকে একটি বন্ধ কামরার সামনে নিয়ে গেলেন এবং দরজা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য রকম একটি সুবাস পেলাম। যেন বর্তমানের কোন সুবাস নয়, অতীতের কোন খোশবু।

পাঠাগারের তত্ত্বাবধায়ক বললেন, এই হলো সেই পবিত্র স্থান। এখানেই আল্লাহর নবী পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম সেই পবিত্র ভূমির দিকে, বিশ্বজাহান উজালাকারী আলোর প্রথম স্পর্শধন্য ভূমির দিকে। অন্তরে তখন ভাব ও আবেগের অপূর্ব এক আলোড়ন এবং হৃদয়ের গভীরে অপার আনন্দের আশ্চর্য এক শিহরণ! দু'জাহানের সরদার সাইয়েদুল মুরসালীন, ফাখরুল আওয়ালীন ওয়াল আখেরীন, আল্লাহর পেয়ারা হাবীব মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ ঘর একদিন আলোকিত হয়েছিলো আমার পেয়ারা হাবীবের নূর নূরানিয়াতের প্রথম স্পর্শে।

চারদিকে এত যে খোশবু তা কিসের! গোলাব-আতরের! জাফরান-মিশকাম্বরের! হতে পারে, কারণ আতর ও মিশকাম্বর ছিলো সেই পবিত্র কক্ষে, কিন্তু বন্ধু! আমাকে বিশ্বাস করো, আতরের ঘ্রাণ এবং মিশকের সুবাস আমি চিনি। আমার চিরদিনের পরিচিত সেই আতর ও মিশকাম্বরের ঘ্রাণকে ছাড়িয়ে সেখানে সেই পবিত্র কক্ষে সত্যি সত্যি আমি পেয়েছিলাম অন্য এক সুবাস, যার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না পৃথিবীর কোন সুবাসে; হয়ত পাওয়া যাবে জান্নাতের বাগিচায় ফুলের পাপড়িতে।

আমার পেয়ারা নবীর শুভাগমনের স্মরণে বাংলাদেশের কবি কী অপূর্ব সুরে প্রকাশ করেছেন তার হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস—!

'আয়রে সাগর, আকাশ-বাতাস, দেখবি যদি আয়। ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মাদ এলো রে দুনিয়ায়।'

পেয়ারা নবীর শুভাগমনের আনন্দ প্রকাশে এর চেয়ে সুন্দর সুর পৃথিবীর আর কোন ভাষায় রচিত হয়েছে কি না আমার জানা নেই। সাগরের তলদেশে সত্যি সেদিন মহা-আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো, আকাশে-বাতাসে আশ্চর্য এক আন্দোলন শুরু হয়েছিলো এবং পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়েছিলো প্রবল কম্পন। তাই তো নিভে গিয়েছিলো অগ্নিপূজকদের হাজার বছরের অগ্নিকুণ্ড এবং ভেঙ্গে পড়েছিলো পারস্যের রাজপ্রাসাদের মজবুত গম্বুজ!

পাঠাগারের তত্ত্বাবধায়ক ভদ্রলোক উৎসাহ দিয়ে বললেন, ইচ্ছে করলে তুমি ভিতরে যেতে পারো। কিন্তু সাহস হলো না। আমার ভিতর থেকে কে যেন সাবধান করে দিলো, এ পবিত্র কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছো, অনেক করেছো; আর আগে বেড়ো না। তোমার 'কাদামাখা' পায়ের কালো দাগে এ কক্ষের পবিত্রতা কলঙ্কিত করো না। এ কক্ষ তোমার নবীর মায়ের কক্ষ! তুমি যার শাফা'আতের তামান্না করো এ কক্ষ তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্মৃতিবিজড়িত কক্ষ! কিছুটা অন্তত হায়া শরম করো! নিজের অপবিত্রতা থেকে এ ঘরের পবিত্রা রক্ষা করো!

ভিতরের সাবধানবাণীতে শঙ্কিত হয়ে আমি দু'কদম পিছিয়ে এলাম। আজ উম্মত কোথায়, আর উম্মতের নবী কোথায়! আজ উম্মতের জীবন কোথায়, আর নবীর সুন্নত কোথায়! আজ উম্মতের দিল আর নবীর মুহাব্বাত কোথায়! জীবন থেকে নবীর সুন্নত

হারিয়ে গেছে এবং হৃদয় থেকে মুছে গেছে নবী-প্রেম। এখন শুধু আছে রাজপথের জশনেজুলূস, আছে মিলাদুন্নবী নামের জন্মোৎসব, আর সীরাতুন্নবী নামের প্রাণহীন আলোচনা। হায়রে উম্মত, তোমার নবী কি এজন্য এসেছিলেন দুনিয়ায়? তুমি কি এজন্যই আসো প্রতিবছর এই পবিত্র ভূমিতে?

হঠাৎ যেন ভিতরের আমি আমাকে প্রশ্ন করে বসলো তিরস্কারের সুরে, তুমি! তুমি কেন এসেছো এ পবিত্র ভূমিতে, এখানে এই পবিত্র ঘরের দুয়ারে?

আমি নির্বাক!

ভিতরের আমি যেন আমাকে বললো, এখানে এই পবিত্র ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আজ শপথ নাও, যত দিন বেঁচে থাকবে নবীর সুন্নতের উপর অবিচল থাকবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবীর সুন্নতকে যিন্দা করার মেহনতে নিবেদিত থাকবে। নবীর শাফা'আত লাভের এবং আবে কাউছারের পেয়ালা হাছিলের এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

পবিত্র কক্ষের দ্বারপ্রান্তে এসেছিলাম অভূতপূর্ব এক ভাবতন্ময়তা নিয়ে, এখান থেকে বিদায় নিলাম নতুন এক ভাবনা ও চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে।

***

হযরত হাফেজ্জি হুযূরের সান্নিধ্যের পর এই সফরে আমার আরেকটি সৌভাগ্য ছিলো বাংলাদেশের তাবলীগ জামাতের বড় হুযূর হযরত মাওলানা আব্দুল আযীয ছাহেবের হজ্বের আমল দেখতে পাওয়া। হজ্বের আগে ও পরে কয়েকবার তিনি হযরতের সঙ্গে দেখা করেছেন। এমন আদব ও বিনয়ের সঙ্গে তিনি তাঁর সামনে বসতেন যে, উপস্থিত সবাই অবাক হতো। ঐ সফরেই হযরতকে আমি বলতে শুনেছি, এই মিয়াঁ আমার খুব পেয়ারা শাগিরদ। আমি এবং ছদর ছাহেব এই মিয়াঁকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে শামিল হওয়ার হুকুম করেছিলাম। এই মিয়াঁ বড়ই নেক ইনসান ও সাদা দিল।

সফরে বিভিন্ন উপলক্ষে যখনই ছদর ছাহেবের প্রসঙ্গ এসেছে, দেখেছি হযরতের চোখ ছলছল করে উঠেছে। তাতে সামান্য হলেও অনুভব করতে পেরেছি, কী গভীর মুহাব্বাত ছিলো তাঁদের মাঝে এবং হযরতের অন্তরে তিনি কতটা জাগরূক ছিলেন। ছদর ছাহেবের সঙ্গে হযরতের হজ্বসফরের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেছিলেন, 'সেই হজ্বের লয্যত ও রূহানিয়াত এখন আর কোথায় পাওয়া যাবে!'

হযরত আরো বলেছিলেন, 'ছদর ছাহেবের সারা যিন্দেগি ছিলো মেহনত-মোজাহাদার যিন্দেগি, তবে হজ্বের সফরে তিনি যে মোজাহাদা করতেন তার নমুনা শুধু সালাফে ছালেহীনের মাঝেই পাওয়া যায়। আসলে সব বিষয়েই তিনি ছিলেন সালাফের নমুনা। ছদর ছাহেবের কাওম ছদর ছাহেবকে চিনতে পারে নাই। খুব কাছের মানুষেরাও চিনতে পারে নাই।

এমন এমন চিন্তা তিনি পেশ করতেন যা আমরা বুঝতে পারতাম না। যেমন উঁচা দেমাগ, উঁচা চিন্তা তেমনই বে-ইনতেহা দরদ-ব্যথা।'

হযরত আরো বলেছিলেন, 'সিয়াসাত সম্পর্কে ছদর ছাহেবের চিন্তাই ছিলো সঠিক। আমি যা অনেক পরে 'বুঝতে পারছি' উনি তা অনেক আগেই 'বুঝছিলেন'। এখন আমার যেমন সঙ্গী-সাথী নাই তখন তাঁরও সঙ্গী-সাথী ছিলো না।'

আরো অনেক কথা হযরত বলেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, তা'লীমের ময়দানে তুমি ছদর ছাহেবের চিন্তা-ফিকির অনুসরণের চেষ্টা করবা।

বলছিলাম কাকরাইলের বড় হুযূরের কথা। হজ্বের সফরে তাঁকে 'বিস্তারিতভাবে' দেখার সুযোগ হয়েছিলো। হারাম শরীফে দেখেছি, কখনো তিলাওয়াত করছেন, কখনো বাইতুল্লাহর দীদার করছেন, কখনো উপস্থিত লোকদের দাওয়াত বা উপদেশ দিচ্ছেন। তাওয়াফের হালাতে যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছি মুলতাযামে বুক লাগিয়ে আহাযারি করতে।

একদিন মুলতাযামের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। অপেক্ষা করছি, আমার সামনে আল্লাহর যে বান্দা তিনি পিছিয়ে এলে আমি সুযোগ গ্রহণ করবো। আল্লাহর সেই বান্দা এমন জারজার হয়ে কাঁদছিলেন যে, তার কান্না আমারও অন্তর ভিজিয়ে দিলো। আমি সিক্ত হৃদয়ে তার রোনাযারি শুনছিলাম। তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া উম্মতে মারহূমার দেখভাল করার কেউ নাই। হে আল্লাহ! তুমি ইয়াতিম নবীর ইয়াতিম উম্মতকে রহম করো। ....

আল্লাহর বান্দার সমস্ত কাকুতি মিনতি ছিলো উম্মতের জন্য, নিজের জন্য নয়। তিনি যখন মুলতাযাম থেকে সরে এলেন, দেখি, আমাদের কাকরাইলের বড় হুযূর! অশ্রুবিধৌত তার নূরানি চেহারাকে তখন মনে হচ্ছিলো ফিরেশতার চেহারা!

আরেকদিন দেখি, মাকামে ইবরাহীমের বেশ পিছনে দু'হাত তুলে মুনাজাত করছেন। দূর থেকে ঐ নূরানি দৃশ্য আমার অন্তরে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিলো যে, মনে হয় এখনো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

আমরাও মুনাজাত করি, আল্লাহর পেয়ারা বান্দারাও মুনাজাত করেন। উভয় মুনাজাতের দৃশ্য হয়ত এক, কিন্তু অদৃশ্যে অনেক পার্থক্য। সে পার্থক্য ভাবের, অভিব্যক্তির, বিশ্বাসের এবং আত্মনিবেদনের। মুনাজাতের মাঝে তারা মাওলার সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা ও আপনত্ব বোধ করেন আমাদের কি তা নছীব হয়? তারা যেভাবে নিমগ্ন ও আত্মসমাহিত হন আমরা কি তেমন হতে পারি? পার্থক্য আরো আছে, তবে তা শব্দের অলঙ্কারে সাজিয়ে পরিবেশন করার বিষয় নয়, তা হৃদয় ও আত্মায় অনুভব করার বিষয়।

বড় হুযূরকে সেদিন মুনাজাতের অবস্থায় দেখে মনে হলো, তাঁর দেহসত্তা থেকে যেন আলোর বিচ্ছুরণ ঘটছে। সে আলোর উদ্ভাসে চারপাশের মানুষও যেন উদ্ভাসিত। কিংবা আকাশ থেকে যেন তাঁর উপর আলোর শিশির বর্ষিত হচ্ছে।

মুনাজাতের এই নূরানি রূপ সময়ের ব্যবধান যত বাড়ছে, তত কমে আসছে। হয়ত এক সময় এমন মুনাজাতের একটিও যিন্দা নমুনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সেদিন পর্যন্ত দেখতে পেতাম আমার আব্বার মুনাজাত। নিজেকে বড় ভাগ্যবান মনে হতো।

বড় শক্তি ও সান্ত্বনা লাভ করতাম একথা ভেবে যে, এ মুনাজাত আমাদের ঘরের সম্পদ! এ মুনাজাতের কাকুতি-মিনতির আমাদেরই জন্য!

এখন আব্বা১ নেই, আব্বার মুনাজাতও নেই!

একদিন দেখি, যামযামের পারে দাঁড়িয়ে বড় হুযূর গ্লাস ভরে ভরে হাজীদের যামযাম পান করাচ্ছেন। নল চেপে ধরা বেশ কষ্টকর, কিন্তু তিনি ক্লান্তিহীনভাবে গ্লাসের পর গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছেন, আর হাতের পর হাত তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তাঁর চোখেমুখে ছিলো আত্মিকতৃপ্তির অপূর্ব এক উদ্ভাস। তাঁর মাঝে তখন যুবকের উদ্যম। আমি চেষ্টা করলাম তাঁকে অনুকরণ করার, কিন্তু অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠলাম।

মিনায় হযরতের তাঁবুতে তিনি কয়েকবার এসেছেন। হযরতের জন্য কিছু না কিছু ফল অবশ্যই আনতেন। হযরতও যখন যা থাকতো তাই দিয়ে সস্নেহে তাঁকে আপ্যায়ন করতেন।

মনে হতে পারে, এগুলো তো সচরাচর দৃশ্য এবং খুব সাদামাটা বিষয়, কিন্তু যদি অনুভবের দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে এই সব সাধারণ দৃশ্যের মাঝেই লুকিয়ে থাকে অসাধারণ কিছু 'অ-দৃশ্য'। এখানে তুমি যেমন পাবে বেতাকাল্লুফ এবং অনাড়ম্বর মেহমানদারির শিক্ষা তেমনি পাবে বিনয় ও কৃতার্থতা প্রকাশ করার শিক্ষা; আরো পাবে আল্লাহর ওয়াস্তে একে অন্যকে মুহব্বত করার শিক্ষা। দ্বীনদার মহলেও এগুলো এখন দুর্লভ থেকে দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

মোটকথা, এই সফরে বড় হুযূরকে বিভিন্ন হালাতে দেখে দেখে জীবনের মূল্যবান কিছু শিক্ষা আমি অর্জন করেছিলাম। আমি হয়ত তেমন হতে পারবো না, কিন্তু হজ্বের সফরে কেমন হতে হয় তা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছিলাম।

***

আরেকটি সূর্যের অস্ত হলো, আর আছে মাত্র একটি দিন। সম্ভবত আর মাত্র দু'টি সূর্যোদয় এবং একটি সূর্যাস্ত আমি দেখতে পাবো মক্কার দিগন্তে। তারপর আমাকে বিদায় নিতে হবে আল্লাহর ঘর থেকে, মাকামে ইবরাহীম থেকে, বীরে যামযাম থেকে এবং পবিত্র হারাম ও মক্কা থেকে।

শেষ দিন হিসাবে যত বেশী সম্ভব তাওয়াফ করলাম। যত বেশী মানে আমাদের হযরতের অর্ধেক বা আরো কম। আমি আরয করলাম, হযরত, এর রহস্য কী? আপনি পারেন, আমরা কেন পারি না? তিনি মৃদু হেসে বললেন, এ প্রশ্ন সব যামানায় ছিলো। আমারও মনে হতো, হযরত হাকীমুল উম্মত পারেন, আমরা কেন পারি না? মিয়াঁ, মেহনত করতে থাকো; দু'আ করি, আল্লাহ যেন তাওফীক দান করেন।

শেষ সূর্যোদয়ও হয়ে গেলো। মক্কার দিগন্তে আমি আর সূর্যের উদয় বা অস্ত দেখতে পাবো না। যোহরের পর হযরত বিদায় তাওয়াফ করবেন। তাঁকে হুইলচেয়ারে করে আনতে গেলাম। পথের সেই পরিচিত দোকান থেকে শেষবারের মত মুশাক্কাল নিলাম। দোকানদারের সাথে মোটামুটি পরিচয় হয়ে গিয়েছিলো, বললাম, আমাদের

তো আজ বিদায়। দো'আ করবেন, আল্লাহ যেন পবিত্র ভূমির এই দিনগুলো কবুল করেন।

দোকানদার দু'আ তো করলেন, কিন্তু মুশাক্কালের পয়সা না নিয়ে আমাকে অপ্রস্তুত করলেন; তদুপরি জোর করে আরো কয়েকটি দিয়ে দিলেন। আমি জাযাকাল্লাহ বলে এর বিনিময় আল্লাহর হাওয়ালা করলাম। আফসোস, এই সব আচরণ পবিত্র ভূমিতেও ধীরে ধীরে কমে আসছে। হাজীরা যেমন বদলে যাচ্ছে তেমনি বদলে যাচ্ছে অনেক কিছু।

যোহরের পর হযরতের সঙ্গে তাওয়াফুল ওয়াদা করলাম। এতদিনের তাওয়াফে ছিলো মিলনের আনন্দ, আজকের তাওয়াফে বিচ্ছেদের বেদনা। বিদায়ের তাওয়াফ যে এত কষ্টের তা আগে এমনভাবে বুঝিনি। বুকের প্রতিটি পাঁজর যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়। হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়। আল্লাহর ঘর থেকে সত্যি কি আজ আমার বিদায়! এ ঘর তাহলে আর দেখা হবে না আগামীকাল! আমি কি তাহলে হারিয়ে যাবো তাওয়াফের জনস্রোত থেকে জীবনের ঘুর্ণীস্রোতে! এই মুলতাযাম আমি আর পাবো না বুক লাগাতে! এই দুয়ারে আমি আর দাঁড়াবো না অশ্রু ঝরাতে! এটা কি আমার দুর্ভাগ্য, না এটাই আল্লাহর ঘরের আদব!

হে আল্লাহ, বিদায় যদি হয় তোমার ঘরের আদব তাহলে বেদনায় হৃদয় যতই বিক্ষত হোক, হাসিমুখে বিদায় গ্রহণ করবো। শুধু এইটুকু মিনতি হে আল্লাহ, যা কিছু ভুল ও বিচ্যুতি সব তুমি মাফ করে দাও।

হে আল্লাহ, এ বিদায় যেন হয় শুধু তোমার ঘর থেকে, তোমার সঙ্গ থেকে নয়। হে আল্লাহ, আমাকে তোমার সঙ্গ দান করো চিরকাল, জীবনে এবং মরণে, বিচারের ময়দানে এবং জান্নাতের বাজারে, আমীন।

হে আল্লাহ, আমি তোমাকে চাই, শুধু তোমাকে। আমার সব প্রয়োজনে কাছে যেন পাই তোমাকে।

হে আল্লাহ, তোমার পেয়ারা হাবীব তো বলেছেন, কখনো কখনো তুমি হেসে দাও। তুমি তো নিরাকার! দেহ ও দেহাকৃতির সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে তুমি! তোমার যাত ও ছিফাতের হাকীকত শুধু তুমি জানো, আমরা জানি না। তোমার হাসি কেমন তুমিই জানো, আমরা জানি না। হে আল্লাহ, আমার মিনতি রক্ষা করো, তোমার অবুঝ বান্দাকে তোমার একটি পবিত্র হাসি উপহার দাও। মেহমানের বিদায়কালের মিনতি রক্ষা করো হে দয়াল মেযবান! তোমার হাসি আজ দেখতে পাবো না, কিন্তু অনুভব যেন করতে পারি হে চিরসুন্দর! হে চিরমহান!

মুলতাযাম থেকেও বিদায় গ্রহণ করলাম। মাকামে ইবরাহীমে নামাযের পর হযরতের সঙ্গে মুনাজাত করলাম। কিছু অশ্রু তো ঝরেছে প্রতিদিন, চোখ দু'টো আজ যেন সঞ্চিত সব অশ্রু ঢেলে দিলো মাকামে ইবরাহীমের শেষ মুনাজাতে। দয়াময় দাতা বিদায়কালেও দানের ভাণ্ডার বন্ধ করেন না। এখানেও তিনি সৌভাগ্য দান করলেন

তাঁর পেয়ারা বান্দার কৃতজ্ঞতার অশ্রুর সঙ্গে অধম বান্দার অনুতাপের অশ্রুকে মিশ্রিত করার।

মুনাজাত শেষে হযরত বললেন, মিয়াঁ আবু তাহের, আল্লাহ তা'আলা আমার একটি আরযু পুরা করেছেন, তোমাকে আমার সঙ্গে হজ্ব করানোর আরযু। এখন আমি দু'আ করছি, আল্লাহ যেন তোমাকে খানাকা'বায় আরো হাযির হওয়ার তাওফীক দান করেন। তখন যদি আমি না থাকি, আমার নামে কিছু না কিছু তাওয়াফ অবশ্যই করবা। এটা তোমার কাছে আমার দরখাস্ত।

এমন 'দরখাস্ত'-এর উত্তরে কিছু বলা যায় না, শুধু পায়ের ধুলো নেয়া যায়। তাঁর পায়ে ধুলো ছিলো না, তাই শুধু পায়ের স্পর্শ গ্রহণ করলাম।

এবার এই সফরের শেষ যামযাম। প্রাণভরে পান করলাম। আর সবকিছুতে গাফলত তো ছিলোই, যামযামের মত এমন মযাদার ইবাদতেও গাফলাত ছিলো। কত সুযোগ ছিলো পান করার, অলসতার কারণে করিনি। আর তো সুযোগ নেই, তাই এবার একেবারে আকণ্ঠ পান করলাম। যখন মনে হলো আর সম্ভব নয়, তখন একটু বিরতি দিয়ে আরো এক গ্লাস পান করলাম।

যামযাম থেকে এসে হযরত বসলেন তাঁর প্রিয় স্থান উম্মে হানিতে। আছর পর্যন্ত শুধু তাকিয়ে থাকলেন বাইতুল্লাহর দিকে। আমি কখনো বাইতুল্লাহর দিকে, কখনো আশিকে বাইতুল্লাহর দিকে। হযরতের দৃষ্টি কখনো ছলছল, কখনো জ্বলজ্বল, কখনো ঝলমল। বোঝা যায়, তাঁর অন্তর্জগতে এখন কতরকম ভাবের তরঙ্গ খেলা করছে! হয়ত কখনো বিদায়ের বেদনা, কখনো কবুলিয়াতের সান্ত্বনা, আর কখনো আগামী মিলনের সুরমূর্ছনা।

বিদায়ী মুসাফিরের চোখের দৃষ্টিতে হৃদয়ের ভাবতরঙ্গের এই যে অপূর্ব ছায়াপাত, খুব নিকট থেকে তা অবলোকন করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো সেদিন বাইতুল্লাহ থেকে বিদায়ের বিষণ্ণ মুহূর্তে। প্রেমিক হতে না পারার দুর্ভাগ্য যদি বা হয়, প্রেমিক-দৃষ্টির সৌন্দর্য ও মাধুর্য অবলোকন করার সৌভাগ্য থেকে যেন কেউ বঞ্চিত না হয়।

আছরের পর হারাম শরীফের সর্বত্র বিদায়ের বিষণ্ণ দৃষ্টি শেষবারের মত একবার বুলিয়ে নিলাম। সব কিছু যেন এখন অন্যরকম। মিলনের প্রথম দৃষ্টির সময় হৃদয়ের স্পন্দন ছিলো তীব্র, এখন বিদায়ের শেষ দৃষ্টির সময় হৃদয়ের স্পন্দন যেন থেমে যায় যায়।

এবার আমি তাকাবো বাইতুল্লাহর দিকে, কালো গিলাফের পর্দায় লুকিয়ে থাকা সেই পবিত্র ঘরের দিকে যে ঘরের দিদার ছিলো আমার সারা জীবনের স্বপ্ন, হৃদয়ের গভীরে যে স্বপ্ন লালন করে বেঁচে ছিলাম এত দিন, যে স্বপ্নপূরণের আনন্দদোলায় কেটে গেলো মহাসৌভাগ্যের এই অল্পক'টি দিন, যে স্বপ্নের স্মৃতিচারণের সুখানুভূতিই হবে আমার বিরহদগ্ধ আগামী জীবনের অবলম্বন।

প্রিয় বাইতুল্লাহর প্রতি এখনই হবে আমার বিদায়দৃষ্টি, কিন্তু তার আগে হে ঘরের মালিক, হে আল্লাহ, তোমার কাছে আমার মিনতি. এ দেখা যেন না হয় শেষ দেখা, এ বিদায় যেন না হয় শেষ বিদায়। আবার যেন আসা হয়, বারবার যেন আসা হয়!

আবার যেন দেখা হয়, বারাবার যেন দেখা হয়!

বিদায় মুহূর্তে আমি চাইনি চোখে অশ্রু আসুক, অশ্রুজলে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হোক, কিন্তু চোখদু'টো ছলছল করে উঠলোই। চোখের কী দোষ! হৃদয় যদি বিগলিত হয় চোখ থেকে অশ্রু তো ঝরবেই। আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরলো। বাইতুল্লাহকে তার অক্ষম এক মুসাফিরের শেষ অশ্রুনিবেদন। আমি তাকালাম ঝাপসা দৃষ্টিতে আমার প্রিয় বাইতুল্লাহর দিকে, 'শেষ বিদায়ের' আগে আবার দেখার স্বপ্ন নিয়ে। যেন একটি স্বপ্নের ইতি হলো আরেকটি স্বপ্নের কলি ফুটিয়ে। স্বপ্নই তো মানুষের জীবন! স্বপ্নই তো জীবনে বেঁচে থাকার অবলম্বন!

***

ইরাকের দূতাবাস থেকে এক পদস্থ কর্মকর্তা এসেছেন হযরতকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেয়ার জন্য। রাষ্ট্রদূত ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন অনিবার্য অপারগতার কারণে বিমানবন্দরে নিজে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে।

গাড়ী রওয়ানা হলো জেদ্দার পথে। মক্কা শহরের ঝলমল আলো তখনো দেখা যাচ্ছে। সেদিকেই তাকিয়ে ছিলাম জানালাপথে নির্নিমেষ নয়নে। একসময় তাও মুছে গেলো দৃষ্টিপথ থেকে।

প্রশস্ত মসৃণ পথে গাড়ী চলছে তীব্র গতিতে। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর ঘর চলে যাচ্ছে দূরে আরো দূরে, কিন্তু তা শুধু চোখের দৃষ্টি থেকে, হৃদয়ের দৃষ্টি থেকে নয়। আমার দেশের কবি বলেছেন, 'বক্ষে আমার কাবার ছবি, নয়নে মুহম্মদ রাসূল'।

আমি যেখানেই থাকি, যে ভূমিতেই বাস করি, আমার হৃদয় তো বিচরণ করবে মক্কায়, মদীনায়; আমার চোখের তারায় তো স্বপ্ন থাকবে কালো গিলাফের এবং সবুজ গম্বুজের। সুতরাং এ দূরত্ব তো দূরত্ব নয়। বিরহের কালো মেঘই তো বয়ে আনবে মিলনের বৃষ্টিজল!

অল্পক্ষণেই জেদ্দা বিমানবন্দর এসে গেলো। হিজাযভূমির প্রবেশদ্বার জেদ্দা। কিন্তু লোহিত সাগরের কন্যা আলোঝলমল জেদ্দা আমাদের জন্য প্রবেশদ্বার ছিলো না, ছিলো নির্গমনদ্বার। একদিন এ পথ দিয়েই হয়েছিলো পবিত্র ভূমিতে আমাদের আনন্দ -আগমন, আজ এ পথেই হবে পবিত্র ভূমি থেকে আমাদের বিষণ্ন নির্গমন।

আল্লাহর কত আশিক বান্দা পৃথিবীর কত দূর দেশ থেকে বারে বারে হাযির হবে পবিত্র ভূমিতে এই পথ দিয়ে; আর কখনো আমি কি শামিল হতে পারবো সেই নূরানি কাফেলায়! আবারও কি ধ্বনিত হবে আমার কণ্ঠে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইকের সুমধুর ধ্বনি!

মনকে প্রবোধ দেয়ার জন্য মানুষ কত রকম ছল ও ছলনার আশ্রয় নেয়, আমিও নিলাম। অবুঝ মনকে এই বলে প্রবোধ দিলাম, যদিও আজ হিজাযের পবিত্র ভূমি

থেকে বিদায়, তবু গন্তব্য তো আমার আরবেরই একটি দেশে! হেজাযের ঘ্রাণ কিছু কি পাবো না সেখানে! ইরাক তো শুনেছি খেজুরের দেশ, মদীনার খেজুরের কিছু কি স্বাদ পাবো না সেই খেজুরে! দজলা-ফোরাতের পানিতে কিছু কি শীতল হবে না এ মন, এ প্রাণ!

এশার নামায আদায় করে প্রস্তুত হলাম। বাস অনেক দূর পথ অতিক্রম করে পৌঁছে দিলো ইরাকি এয়ার লাইনসের বিশাল বিমানের সামনে। যাত্রীরা আরোহণ করছে। হযরত বললেন, বিমানে আরোহণের আগে সম্ভব হলে দু'রাকাত ছালাতুল হাজাত পড়ে নাও এবং খাছ করে দু'আ চাও, আমাদের এ সফর যেন আল্লাহ কবুল করেন; সফরের মাকছাদ যেন আল্লাহ কামিয়াব করেন।

বলেই হযরত জায়নামায বিছিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমাদের সঙ্গে তো আর জায়নামায থাকে না, আমরা খালি যমিনেই দাঁড়ালাম। রাতের ঝিরঝির বাতাসে হিজাযের পাক যমিনে সেটাই ছিলো আমাদের শেষ নামায।

ইরাকি বিমান সংস্থার এই বিমানটি ইরাকি হাজীদের বাগদাদ নিয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত আমাদের কারণে কয়েকজন ইরাকি হাজীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হলো। কথাটা ভেবে একটু খারাপ লাগলো।

বিমানে আরোহণ করলাম। রাত তখন এগারটা হবে। বিমান আকাশে উড্ডীন হলো। আমাদের গন্তব্য ইরাকের বাগদাদ, হযরত আলীর কুফা এবং ইমাম হোসাইনের কারবালা।

আসলে ইরাকসফরের কথা আলাদা করে কখনো ভাবিনি। যদিও বোগদাদি কায়দা পড়েছি এবং কারবালার মর্মন্তুদ কাহিনী শুনেছি সেই সুদূর শৈশবে। তখন পুঁথিপাঠের প্রচলন ছিলো। কারবালার পুঁথি শুনে আমাদের শিশুহৃদয়েও কান্নার ঢেউ উঠতো, আমাদেরও চোখ থেকে অশ্রু ঝরতো।

দজলা-ফোরাত নামদু'টির একত্র উচ্চারণ আমার কাছে মেঘনা-যমুনার চেয়ে কম প্রিয় ছিলো না, বরং একটি যুক্তিহীন বিশ্বাস ছিলো, ইরাকের দজলা-ফোরাত বাংলাদেশের মেঘনা-যমুনার চেয়ে অনেক সুন্দর, উদ্দাম, উচ্ছল, তবে অনেক শান্ত। মেঘনা-যমুনার মত দজলা-ফোরাত কুল ভাঙ্গে না এবং মানুষের সর্বনাশ করে না। দজলা-ফোরাত কারো সুখের সংসার ভাসিয়ে নেয় না। তাই দজলা-ফোরাতের প্রতি আমার আলাদা একটি পক্ষপাতিত্ব ছিলো, যেমন ছিলো মিশরের নিলনদের প্রতি।

আমার অন্তরে বাগদাদ ছিলো, কারবালা ছিলো, কুফা-বছরা ছিলো, দজলা-ফোরাত ছিলো, সবই ছিলো; তবু ইরাকের স্বপ্ন ছিলো না। যাকে বলে স্বপ্ন সেটা ছিলো শুধু হিজাযের, যা আল্লাহ মেহেরবান পূর্ণ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি ইরাকসফরের এবং কারবালা যেয়ারতের সুযোগ দান করছেন, এটা অবশ্যই বড় নেয়ামত। সুতরাং সেজন্য আল্লাহর শোকর।

গভীর রাত্রে বিমান বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করলো।

যদিও ইরাক-ইরান যুদ্ধ চলছে তবু বাগদাদ বিমানবন্দরের জৌলুস বজায় রয়েছে। যুদ্ধপরিস্থিতির কারণে স্বাভাবিক আলোকসজ্জা অবশ্য ছিলো না, কিন্তু বিশাল ব্যাপ্তি ও

আভিজাত্য অনুভব করতে অসুবিধা হলো না। বিমানবন্দর দেখেই বুঝতে পারলাম, আমরা এক আধুনিক ও সমৃদ্ধ আরবদেশে উপস্থিত হয়েছি।

প্রিয় পাঠক এটা হলো সেই সময়ের কথা যখন আমরা ইরাক সফর করেছিলাম, কিন্তু আজ সাতাশ বছর পর যখন এ সফরনামা লিখছি তখন বাগদাদ বিমানবন্দর এক বিরানভূমি এবং ইরাক এক মৃত্যুপুরি ছাড়া আর কিছু নয়।

সাদ্দাম তখনো আমার প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন না, এখনো আমার পছন্দের মানুষ নন। কিন্তু বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের মত আমারও অন্তরে তার প্রতি রয়েছে গভীর সমবেদনা।

অনেক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছেন অন্যান্য দেশের একনায়কদের মত ইরাকের এই একনায়ক। ইসলামের প্রতিও খুব একটা বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারেননি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ যেমন তিনি শুরু করেছেন তেমনি নির্বোধের মত একই ফাঁদে পা দিয়ে কুয়েত দখল করেছেন, যার অনিবার্য ফল হলো উপসাগরীয় যুদ্ধের বিভীষিকা এবং ইরাক ও ইরাকি জনগণের সর্বনাশ। এমনকি নিজের মর্মন্তুদ পরিণতির জন্যও তিনিই দায়ী, অন্য কেউ নয়। সন্দেহ নেই তার অপরাধের পাল্লা অনেক ভারী। কিন্তু সাদ্দামের চরম শত্রুও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, নির্বোধ হলেও তিনি ছিলেন সাহসী। স্বদেশভূমি ইরাককে তিনি ভালোবাসতেন। ক্ষমতার বিনিময়ে, এমনকি জীবনেরও বিনিময়ে দেশের তেলসম্পদ সভ্যযুগের লুটেরাদের হাতে তুলে দিতে রাজি হননি। শত্রুর হাতে বন্দী অবস্থায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি তাই করেছেন যা একজন মুমিনের শান-উপযোগী। ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেও তিনি ভীরুতার পরিচয় দেননি। বীরের মত মৃত্যু বরণ করেছেন এবং মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনব্যাপী সকল ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন।

অন্তত আরব ও মুসলিম উম্মাহর সাহস ও বীরত্বের যে গৌরবময় ইতিহাস, শত্রুর সামনে তিনি তা কলঙ্কিত করেননি। আরব শায়খদের মত মসনদ রক্ষার জন্য মার্কিন হায়েনাদের পদসেবায় লিপ্ত হননি, বরং ঘৃণাভরে তাতে পদাঘাত করেছেন। শহীদের মর্যাদায় আল্লাহ তাকে জান্নাত নছীব করুন, আমীন।

প্রিয় পাঠক, হঠাৎ করে ভিতরের তাজা জখম থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়লো, কিন্তু কী লাভ তাতে! তার চেয়ে চলো আমরা ফিরে যাই পঁচিশ বছর আগে আমাদের ইরাকসফরে।

***

ইতিহাসের পাতায় একটি সত্যকে সংরক্ষিত করার জন্য এখানে কিছু কথা বলে নিতে চাই। ইরান-ইরাক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ শুরু থেকেই আমাদের হযরতের অন্তরে বিরাট ক্ষত সৃষ্টি করেছিলো। সমৃদ্ধশালী এবং সামরিক শক্তিতে বলীয়ান দু'টি মুসলিম দেশ চরম ধ্বংসের পথে ধেয়ে চলেছে, এচিন্তায় তিনি অস্থির ছিলেন। এ অবস্থায় যখন তাঁকে জানানো হলো, ইরান ও ইরাক উভয় দেশ যুদ্ধ বন্ধের আলোচনার জন্য তাঁকে দাওয়াত দিয়েছে এবং তাঁর মধ্যস্থতা মেনে নিতে সম্মত হয়েছে তখন মুসলিম উম্মাহর

এক বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেয়ার সুযোগ হাতছাড়া করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। এত দীর্ঘ ও জটিল সফরের জন্য বয়স, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিস্থিতি মোটেই উপযোগী ছিলো না, কিন্তু তিনি ভেবেছেন, যুদ্ধরত 'দুই ভাই' ডাকার পরও যদি তিনি সন্ধিপ্রচেষ্টায় উদ্যোগী না হন তাহলে আখেরাতে আল্লাহর কাছে তাঁকে জবাবদেহি করতে হবে। এ মহাদায়িত্ববোধে অনুপ্রাণিত হয়েই যুদ্ধ বন্ধের কথিত সফরে তিনি রাজী হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর জন্য ছিলো বিরাট জিহাদ এবং তাতে ঝাঁপিয়ে পড়া তাঁর পক্ষেই শুধু সম্ভব ছিলো।

কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, ইরান বা ইরাক কোন সরকারই এ উদ্দেশ্যে তাঁকে দাওয়াত দেয়নি। ইরানের দাওয়াত ছিলো আগাগোড়া প্রচারণাকেন্দ্রিক। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো কথিত ইসলামী বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশে অনুকূল জনমত তৈরী করা। তিনি যখন ইরান সফরে তখন বাংলাদেশস্থ ইরানি দূতাবাসের বাংলা বুলেটিনের শিরোনাম ছিলো, 'মাওলানা মোহাম্মদুলাহ হাফেজ্জি হুযূরের নেতৃত্বে একদল দর্শনার্থীর ইমাম খোমেনির সঙ্গে সাক্ষাৎ' পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য এই একটি উদাহরণই যথেষ্ট।

পক্ষান্তরে ইরাকী দূতাবাস এগিয়ে এসেছিলো শুধু ইরানি দূতাবাসের পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে। সবচে' বড় কথা, উভয় দেশের দাওয়াতনামাতেই শুধু সফরের আমন্ত্রণ ছিলো, যুদ্ধ বন্ধের কোন প্রসঙ্গই ছিলো না।

তাছাড়া হযরতের কোন কোন সফরসঙ্গীর আচরণ ও বক্তব্য ছিলো কথিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এবং প্রকাশ্য সভায় তারা ইরান সরকার ও তার ইসলামী বিপ্লবের এমন একতরফা প্রশংসা করে চলেছিলেন যা মধ্যস্থতাকারীর অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো না কিছুতেই।

বস্তুত ইরান-ইরাক সফরই শেষ পর্যন্ত এদেশে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনপূর্ণ আন্দোলনের জন্য কাল হয়েছিলো। যারা এটা করেছেন, কেন করেছেন তা ভেবে তখনো আমি অবাক হয়েছি, এখনো অবাক হই।

আরেকটি বিষয়, জিদ্দা বিমানবন্দরে এসে আমরা জানলাম, একই বিমানে আরেকটি বাংলাদেশী দল ইরাক সরকারের দাওয়াতে বাগদাদ যাচ্ছে। দলের নেতা হলেন জমিয়াতুল মুদাররিসীনের সভাপতি (মরহুম) 'মাওলানা' আব্দুল মান্নান। শর্ষিণার পীর সাহেবও দলের রয়েছেন।

সুনির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই বিষয়টি অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। পরবর্তীতে অবশ্য বোঝা গিয়েছিলো যে, আমাদের অস্বস্তি অমূলক ছিলো না।

যাই হোক আমরা উভয় 'দল' একসাথে বিমানে আরোহণ করলাম এবং বাগদাদ বিমানবন্দরে একই সাথে অবতরণ করলাম। হযরতের মেযবান ছিলো ইরাকের তথ্য ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়। দ্বিতীয় দলটির মেযবান ছিলো ওয়াকফ ও ধর্মমন্ত্রণালয়। একারণেই হযরতকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রণালয়ের

সচিব, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দলটির জন্য উপস্থিত ছিলেন ধর্মমন্ত্রণালয়ের কতিপয় কর্মকর্তা।

উভয় দল একই বাসে আরোহণ করে বিমানবন্দরভবনের ভি আই পি লাউঞ্জে এলো। বাসে আমরা উভয়দল এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলাম যেন ভিন্ন দুই দেশের বাসিন্দা, কেউ কাউকে চিনি না, জানি না। আমার মনে হলো, উভয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অবস্থাটা আঁচ করতে পেরেছেন। নিজেকে আমার তখন খুবই ক্ষুদ্র মনে হলো। কী ক্ষতি হতো যদি বিদেশী মেযবানদের সামনে অন্তত ন্যূনতম সৌজন্যটুকু আমরা রক্ষা করতাম!

জিদ্দা বিমানবন্দরেও একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো। সেখানে অবশ্য মাওলানা মুহিউদ্দীন খান আগে বেড়ে কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু অপর পক্ষ হতে কেউ এ সৌজন্যটুকুও রক্ষা করেননি। অথচ আমরা উভয় দল হজ্জ করে এসেছি। একই বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছি, একই যামযামের শীতল পানি পান করেছি, একই আরাফার ময়দানে অকূফ করেছি, একই মুযদালিফায় খোলা আকাশের নীচে রাত যাপন করেছি, একই মিনার প্রান্তরে রামী ও নহর করেছি, কিন্তু এক হতে পারিনি।

যদি মনে করি, আমাদের মাঝে আদর্শের ভিন্নতা রয়েছে তো থাক না, কিন্তু পরস্পর সৌজন্যবোধ! কুশলবিনিময়! ইসলামি ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে না হলে অন্তত সাধারণ ভদ্রতার দাবীতে, যা কাফির মুশরিকরাও করে থাকে! এতটুকু যদি না পারলাম তাহলে হজ্ব থেকে আমরা কী নিয়ে ফিরলাম?

আমাদের হযরত তো ছিলেন অন্য জগতে বিভোর। তিনি বিমান থেকে নামার সময় একবার শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কি ইরাকে পৌঁছে গেছি? তারপর থেকেই তাঁর চক্ষু ছিলো নিমিলিত এবং তাসবীহ ছিলো সচল। আমাদের মাঝে থেকেও যেন আমাদের মাঝে তিনি অনুপস্থিত!

এবার শুনুন হযরত আমাদের উভয় দলকে কী শিক্ষা দিলেন? যখন তাঁকে বলা হলো, একই বিমানে বাংলাদেশের আরেকটি দল এসেছে এবং তাতে শর্ষিণার পীর সাহেব রয়েছেন, তখন হযরত আচ্ছা! আচ্ছা! বলে উঠে দাঁড়ালেন এবং অনেক দূর হেঁটে গিয়ে পীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় করলেন। পীর সাহেব এবং তার সফরসঙ্গীরা অপ্রস্তুত অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে মোছাফাহা করলেন। আমরাও সকলের সঙ্গে মোছাফাহা করলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, উভয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ আবার দৃষ্টিবিনিময় করলেন। তথ্যমন্ত্রণালয়ের সচিব পরে গাড়ীতে আমাকে বলেছিলেন, شَيخكم أعظمُ مشائخةً و إنسـانًا (তোমাদের শায়খ শায়খ হিসাবে এবং মানুষ হিসাবে অনেক বড়।)

তথ্যমন্ত্রণালয়ের সচিব আধুনিক বেশভূষার সম্পূর্ণ কেতাদুরস্ত এবং নিপাট এক ভদ্র-লোক। বাইরে থেকে ধর্ম ও ধার্মিকতার কোন ছাপ নেই, কিন্তু হযরতের সঙ্গে তিনি ভক্তি-তাযীমের আচরণ করলেন। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সারতে কিছু সময়

লাগবে। তাই তিনি সে দায়িত্ব অন্যদের হাতে দিয়ে হযরতকে নিয়ে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। হযরত আমাকে সঙ্গে নিলেন।

বিমানবন্দর থেকে বাগদাদ বেশ দূরে। গভীর রাত বলে রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা। সচিব ভদ্রলোক নিজেই গাড়ী চালাচ্ছেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, ইঞ্জিন চালু করার সময় তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণে দু'আ পড়লেন, ... سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هذَا

পুরো পথ তিনি হযরত সম্পর্কে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করলেন। এক পর্যায়ে বললেন, আমার দাদা এখনো জীবিত এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক, দেখতে অনেকটা তোমাদের শায়খের মত।

অল্পক্ষণেই ভদ্রলোক বেশ আন্তরিক হয়ে উঠলেন। এই মানুষটির বাইরের রূপকে তো আমি গ্রহণ করতে পারি না, কিন্তু তার ভিতরের যে রূপটি দেখলাম সেটাকে কীভাবে অস্বীকার করি?

হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবী (রহ) সত্যই বলেছেন, 'কলব ও কালিব'-এর মাঝে যখন বৈপরীত্য দেখা দেয় তখন কলবকে কালিবের উপর অগ্রাধিকার দিতে হয়, কারণ যে কোন সময় কলব থেকে কালিবের মাঝে পরিবর্তন আসতে পারে।'

উম্মতের বর্তমান বদহাল অবস্থায় হযরত নদবীর এ উপদেশ অত্যন্ত মূল্যবান।

আমি তাকে নামায-রোযার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি মৃদু হেসে বললেন, রোযায় আমার কোন ত্রুটি নেই, আর নামায পড়তে চেষ্টা করি।

তারপর যেন কিছুটা লজ্জা ঢাকার মত করে বললেন, আমার 'ওয়ালিদায়ন' কিন্তু নিয়মিত নামায পড়েন এবং কোরআন তিলাওয়াত করেন।

বললাম, আল্লাহ তোমাকে তোমার মা-বাবার মত করে দিন।

ভদ্রলোক খুব আন্তরিকভাবে বললেন, আমীন।

হোটেল মেরিডিয়ান রাজধানী বাগদাদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং সবচে' অভিজাত হোটেল। সফরের নয়দিন এখানেই আমরা ছিলাম। শুরু থেকে শেষ, হোটেলের সবকিছুতে এমনই সীমাহীন প্রাচুর্য ছিলো যে, হযরত তো বটেই, আমরাও কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছি।

হোটেলে অভ্যর্থনাকক্ষের কর্মকর্তার সঙ্গে সচিব ভদ্রলোক ফরাসিতে কথা বললেন। এ হোটেলে আরবী ও ইংরেজী দুটোই চলে ভাঙ্গ ভাঙ্গা, ফরাসি বেশ সাবলীল।

হযরতকে তাঁর কক্ষে পৌঁছে দেয়া হলো। তিনি ফারিগ হয়ে শুয়ে পড়লেন এবং সবসময় যেমন দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। সফরসঙ্গীরাও কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছলেন। সচিব ভদ্রলোক সকালে আসার কথা বলে উষ্ণ আন্তরিকতার সাথে করমর্দন করে বিদায় নিলেন।

হযরতের জন্য ছিলো আলাদা কক্ষ। আমাদের প্রত্যেক দু'জনের জন্য একটি করে কক্ষ। মাওলানা হামীদুলাহ ছাহেব এবং আমি একটি কক্ষে। কিন্তু হযরতের আরামের

কথা চিন্তা করে ঠিক হলো, তিনি হযরতের সঙ্গে থাকবেন। ফলে আমি একা ছিলাম এবং আমার জন্য তা স্বস্তিদায়ক হয়েছিলো।

***

সফরের প্রথম দিবসে প্রবেশ করার পূর্বে আমি চাই, নয়দিনের সংক্ষিপ্ত সময়ে আমার দেখা ইরাক সম্পর্কে এখানে সামান্য কিছু আলোকপাত করতে।

একজন মানুষকে যেমন, একটি পরিবারকে যেমন, কোন দল ও গোষ্ঠীকে যেমন তেমনি একটি দেশকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য শুধু বাইরে থেকে দেখা যথেষ্ট নয় ভিতর থেকেও দেখতে হয়, কিন্তু স্বভাবতই সে সুযোগ ছিলো কম, তবু চেষ্টা করেছি যদ্দুর সম্ভব আমার দেখা যেন অন্তর্মুখী হয়। এজন্য কর্মসূচীর বাইরেও আমি বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেছি। এক্ষেত্রে মাওলানা মহিউদ্দীন খান ছাহেব যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। নচেৎ বাগদাদ যাদুঘর ও বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করা আমার পক্ষে হয়ত সম্ভব হতো না।

গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করার জন্য গ্রামেও গিয়েছি এবং গ্রাম ও গ্রামের মানুষকে কাছে থেকে দেখেছি। এছাড়া রাজধানী বাগদাদে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারেও খুব অন্তরঙ্গ পরিবেশে কিছু সময় যাপন করেছি। একারণে বলা যায়, নয়দিনের সফরে ইরাককে আমি শুধু বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেও দেখার সুযোগ পেয়েছি। ফলে দেশটির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রায় বাস্তবানুগ ধারণা অর্জন করতে পেরেছি বলে আশা করা যায়। যদিও ইরাকের আসমান থেকে যমিন সবকিছু এখন বদলে গেছে, সবকিছু সারখার হয়ে গেছে এবং তখনকার সমৃদ্ধ এই মুসলিম দেশটি এখন শাব্দিক অর্থেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তবু মনে হয় আমাদের আলোচনা একেবারে নিরর্থক হবে না। 'ফানা হবে সবকিছু, থাকবে তো শুধু আল্লাহর নাম।'

ইরাকে প্রথমেই যা আমার নযরে পড়েছে তা হলো পর্দা, অর্থাৎ পর্দার অনুপস্থিতি। পর্দাহীনতা এখন অবশ্য সব মুসলিম দেশেরই সাধারণ ব্যাধি। ইরাকও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে অবনতিটা এখানে আমাদের চেয়ে কিছু বেশী এদিক থেকে যে, ইরাকী মেয়েরা মিনিস্কার্টে অভ্যস্ত এবং মস্তকাবরণের সাথে অপরিচিত; অথচ ইউরোপের নগ্ন পরিবেশেও মুসলিম নারীরা স্কার্ফের দাবীতে সোচ্চার। বোরকার পর্দা ইরাকে নেই বললে ভুল হবে; আছে, শুধু মাযারে বয়স্কা ও বৃদ্ধাদের মাঝে। বাগদাদে, এমনকি আধুনিক বোরকা, যাকে আমরা এরাবিয়ান বোরকা বলি, নযরে পড়েনি, তবে আবরুহীনতা বা লজ্জাহীনতাও দেখিনি। নির্দিষ্ট মাত্রায় আরবীয় শালীনতা এখনো রয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অফিস-দফতর যেখানেই গিয়েছি, মহিলা কর্মকর্তাদের মুখেও 'ইনশাআল্লাহ' 'মাশাআল্লাহ' 'সুবহানাল্লাহ' প্রচুর শুনতে পেয়েছি। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে এক মহিলা কমকর্তার ডেস্কে কোরআন শরীফ এবং হাদীছের কিতাব রিয়াযুছ্-ছালিহীন দেখে ভালো লেগেছে। বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছি। শিক্ষকদের সঙ্গে এবং বিভিন্ন ছাত্রাবাসে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কথা

বলেছি। সামগ্রিক বিচারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খারাপ কিছু দেখিনি। অতিরিক্ত যা পেয়েছি তা হলো শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও পাঠমনস্কতা। সেখানে 'যুগলসংস্কৃতি' একেবারেই নযরে পড়েনি।

ইরাকের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে দুঃখকজন বিষয় এই যে, তাতে ধর্মীয় শিক্ষার কোন স্থান নেই। ফলে তরুণ প্রজন্ম স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ধর্মনিস্পৃহরূপে গড়ে ওঠছে, তবে পারিবারিক পর্যায়ে কিছুটা হলেও ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশাসন এখনো বহাল রয়েছে, যার ছাপ এমনকি বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের মাঝেও প্রত্যক্ষ করেছি। ধর্মাচরণে 'নিজস্ব ত্রুটি' ঢাকা দেয়ার জন্য সলজ্জ হাসি হেসে অনেকেই বলেছে, 'আমার মা-বাবা/দাদা-দাদী খুব ধার্মিক'।

হক্কানী আলেম যাদের বলা হয় তারা বেশ কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছেন। সরকারী বিধিবন্ধনের বাইরে হক কথা বলার কোন সুযোগ নেই। বরং অপ্রিয় হক কথার পরিণতি হয় খুব কঠিন। তাই তারা উপায়হীন নীরবতার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তবে কয়েকজন সাহসী ও প্রাজ্ঞ আলিমের নযিরবিহীন কোরবানির ফলে দ্বীনী শিক্ষার অপ্রাতিষ্ঠানিক একটা ক্ষীণ ধারা এখনো প্রবাহিত রয়েছে। আমাদের উপমহাদেশের মত দ্বীনী শিক্ষাব্যবস্থা এখানেও যদি বহাল রাখা যেতো তাহলে অবশ্যই পরিস্থিতি ভিন্ন হতো। এক্ষেত্রে ওলামায়ে হিন্দ-এর ইহসান ও অবদান যে কী বিরাট তা ইরাকে এসে আমি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। মিসর, তিউনেশিয়া, আলজিরিয়া এবং (পরবর্তীতে) সোভিয়েট রাশিয়া থেকে মুক্ত দেশগুলো যারা সফর করেছেন তারাও একই কথা বলেন।

ইরাক শিয়াপ্রধান দেশ। জনসংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শিয়া। তাই মাযারপ্রীতি অসম্ভব বেশী এবং যথারীতি তা শিরক ও বিদ'আতে জর্জরিত। মাযারে প্রবেশের আগে মেয়েরা মিনিস্কার্টের উপর বোরকা বা চাদর চড়িয়ে নেয়, মাযার থেকে বের হয়ে আবার খুলে ফেলে। সন্তান লাভের জন্য মাজারে সুতা বাঁধার বিদ'আত এবং কবরে সিজদা করার শিরক সেখানেও আছে।

ইরাক বেশ আগে থেকেই পূর্ণ একনায়কতন্ত্রের দেশ। এর শুরু সাদ্দাম থেকে নয়, তিনি ধারাবাহিকতা মাত্র। তবে দেশ পরিচালনায় পূর্বসূরীদের তুলনায় তিনি যথেষ্ট গতিময়তা আনতে পেরেছেন এবং আমার ধারণা, অন্যান্য একনায়কদের মত সাদ্দামের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নয়। এর কারণ সম্ভবত তার ব্যক্তিগত সততা, দেশপ্রেম এবং সুশৃঙ্খল জীবনাচার।

ইরাকের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তিনি শুধু কঠোর হস্তে নয়, বরং নিষ্ঠুর হস্তেই দেশ শাসন করছেন। হিযবুল বা'ছ (বাথপার্টি) হলো ইরাকে একক রাজনৈতিক দল। মাইকেল আফলাক নামে এক ইহুদি কমিউনিস্ট ছিলেন বাথপার্টির প্রতিষ্ঠাতা। আরব ওলামাদের যথাসাধ্য প্রতিরোধ সত্ত্বেও মাইকেল আফলাক ও তার বাথপার্টি শিক্ষিত আরব তরুণদের মাঝে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং একসময় সিরিয়া ও ইরাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেয়। বস্তুত মাইকেল আফলাক এবং তার প্রতিষ্ঠিত বাথপার্টি

ছিলো আরববিশ্বের জন্য মূর্তিমান অভিশাপ, যেমন তুরস্কে মুস্তফা কামাল এবং তার প্রতিষ্ঠিত নাহদা পার্টি। পার্থক্য শুধু এই যে, দ্বিতীয়জন পৈত্রিক সূত্রে মুসলিম নাম ধারণ করতো। ফলে ইসলামী খেলাফতের বুকে খঞ্জর চালানো তার জন্য খুব সহজ হয়েছিলো। অবশ্য 'আতাতুর্ক' নামের এই বিষকাঁটা তৈরী করার পিছনেও যথারীতি ইহুদি মগজই সক্রিয় ছিলো।

বাকস্বাধীনতা বা মতপ্রকাশের অধিকার সাদ্দামের ইরাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। বাথপার্টিই সেখানে রাজনীতির শুরু এবং শেষ এবং সাদ্দাম হোসায়নই বাথপার্টির 'আওয়াল-আখের'। তবে এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, শিয়া, সুন্নী, কুর্দী- এই তিন জনগোষ্ঠীর দেশ ইরাকের অখণ্ডতা এখনো টিকে আছে সাদ্দামের কঠোর শাসনের ফলেই। আমাদের দেশের মত গণতন্ত্রের চাষ যদি ইরাকের মাটিতে করা হতো তাহলে অখণ্ড ইরাক হতো এতদিনে ইতিহাসের বিষয়। অবশ্য একটি প্রশ্ন যে কেউ করতে পারে, ইরাকের মুসলিম জনসাধারণের হৃদয়ের ভাষা যদি সাদ্দাম বুঝতেন, ইরাকের পুণ্যভূমিতে যদি ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো এবং জাতিগত সমস্যার ইনসাফভিত্তিক সমাধানের চেষ্টা যদি করা হতো তাহলে ফলাফল কী হতো?

আধুনিক ও সমৃদ্ধশালী ইরাক গড়ে তোলার পিছনে সাদ্দামের অবদান অনস্বীকার্য। সামরিক শক্তিতে তিনি দেশকে যেমন এগিয়ে নিয়েছেন তেমনি দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও মযবূত করেছেন। শেখশাসিত উপসাগরীয় আরবদেশগুলোর বিপরীতে ইরাকী জনগণকে তিনি এবং তার পূর্বসূরীরা কর্মঠ ও উদ্যমীরূপে গড়ে তুলেছেন। ইসলাম ও আরববিশ্বের শত্রুদের চক্রান্তজালে পা দিয়ে ইরানের সঙ্গে এক ভয়াবহ যুদ্ধের আবর্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার পরও সাদ্দাম ইরাকের অর্থনীতি সচল রাখতে পেরেছেন। এটা শুধু তেলের জোরে নয়, এর পিছনে রয়েছে হাতেরও জোর। এটা অবশ্যই বিস্ময়কর যে, এত বড় যুদ্ধের মাঝেও ইরাকী জনগণের কর্মচাঞ্চল্যে ভাটা পড়েনি।

সারা ইরাক জুড়ে 'সাদ্দাম জিন্দাবাদ'-এর একটা আবহ তৈরী করে রাখা হয়েছে এবং সাধারণ চোখে এটা যথেষ্ট দৃশ্যমানও। তবে একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সাদ্দামপ্রীতির চেয়ে সাদ্দামভীতিই এখানে প্রবল। আর ভীতি কখনই প্রীতির মত স্থায়ী ফলদায়ক ঔষধ নয়, তবে তাতে সাময়িক উপশম অবশ্যই হয়। ইরাকের অখণ্ডতার ক্ষেত্রে সাদ্দামভীতি সাময়িক উপশমেরই কাজ করছে। সাদ্দাম যদি তার বিদেশী 'বন্ধুদের' থেকে নযর হটাতে পারতেন এবং ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করতেন, যেমন করেছেন শাহাদাতের আগে তাহলে আল্লাহ তাকে ব্যক্তিত্বের যে কারিশমা দান করেছিলেন তাতে খুব সহজেই তিনি আপন জনগণের অন্তরের মাঝে ভীতির পরিবর্তে প্রীতির স্থান লাভ করতে পারতেন।

***

বাগদাদের পুণ্যভূমিতে আমাদের প্রথম রাত ভোর হলো। বরাবরের মত বুড়ো মানুষটিই আমাদের ঘুম থেকে জাগালেন। তাঁর আদেশে আমি কামরায় কামরায় গিয়ে

সবাইকে জাগালাম। একটি দৃশ্য আমাকে চমৎকৃত করেছিলো। হযরতের পাশের কামরায় আওয়ায দিতেই মাওলানা হাবীবুলাহ মেছবাহ দরজা খুললেন। মাওলানা আযীযুল হক ছাহেব মুনাজাত করছেন। তাঁর কান্নার মৃদু আওয়ায কানে আসছে। মাওলানা মেছবাহর মুখমণ্ডলও 'অশ্রুধোয়া'। জিজ্ঞাসা করলাম, ঘুমাননি? তিনি কিছু বললেন না, শুধু মৃদু হাসলেন।

হযরতের কামরায় নামায হলো। নামাযবাদ তিনি আমাদের যে নছীহত করেছিলেন, আজ এত বছর পরও অন্তরে তা তরতাজা রয়েছে! তিনি বলেছিলেন, 'গতকাল পর্যন্ত আমরা এক পরিবেশে ছিলাম, এখন এসে পড়েছি অন্য পরিবেশে, হারামের পরিবেশ থেকে হোটেলের পরিবেশে। সুতরাং গাফলাত যেন আমাদের জন্য হারামের বরকত থেকে মাহরূমির কারণ না হয়, বরং চেষ্টা করতে হবে যেন হোটেলের পরিবেশ হারামের পরিবেশে পরিবর্তিত হয়ে যায়।'

হযরত আরো বলেছিলেন, 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে 'আযমাইশ' যে, আমরা হজ্ব থেকে কী পরিমাণ তারবিয়াত ও নূরানিয়াত হাছিল করেছি। মুখে দায়েমি যিকির এবং ইস্তিগফার জারি রাখেন, আর চলতে ফিরতে নযর নীচে রাখেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ হেফাযতে থাকবেন।'

এই নছীহতের উপর আমল করা ছাড়া উপায়ও ছিলো না। কারণ শোরেশ কাশ্মীরের ভাষায়, চারদিকে ছিলো 'হূরানে দুনিয়ার' এমন চাহাল-পাহাল যে, নযর নীচু রাখলেই শুধু ঈমান রক্ষা পায়, হজ্ব নিরাপদ থাকে, নচেৎ সব বরবাদ হওয়ার জোগাড়!

***

সফরের দ্বিতীয় রাতটি আমার জন্য ছিলো স্মরণীয়; না, কোন ঘটনার জন্য নয়, একটি স্বপ্নের জন্য। সে রাতটি ভোর হয়েছিলো মধুর এত স্বপ্নের জগতে বিচরণ করে। দেখি, আমি আল্লাহর ঘরে। মাতাফে মানুষজন নেই, শুধু আলো আর আলো! সেই আলোর বন্যায় ডুবন্ত হয়ে এবং অপার্থিব এক আনন্দে বিভোর হয়ে আমি হযরতের সঙ্গে তাওয়াফ করছি। আমার চারপাশে আলোর ফোয়ারা, আর সর্বাঙ্গে ইহরামের শুভ্র লেবাস। বাইরের আলো ও শুভ্রতায় হৃদয়ও যেন শুভ্র ও আলোকিত। আমার ইহরাম বারবার অবিন্যস্ত হয়ে যায়, আর হযরত ঠিক করে দেন। আমার দু'হাত যেন দু'টি ডানা। মাঝে মাঝে উড়ে উড়ে তাওয়াফ করছি। মুলতাযামে কেউ নেই। আমি একা বুক লাগিয়ে কাঁদছি, আর মুনাজাত করছি।

আবার দেখি, যামযামের পারে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে যামযাম পান করছি। বহু মানুষ! আমি আনন্দিত চিত্তে পেয়ালা ভরে ভরে যমযম বিতরণ করছি!

ঘুম থেকে জেগে স্বপ্নের আবেশেই কেটে গেলো অনেক্ষণ। স্বপ্নের ঘোর যখন কাটলো তখন বুঝলাম, মক্কা শরীফে নই, আমি এখন সুদূর ইরাকে বাগদাদের অভিজাত হোটেলে সুসজ্জিত কক্ষের কোমল শয্যায়। বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ছিলো শুধু স্বপ্ন, মধুর এক স্বপ্ন! অনির্বচনীয় এক আনন্দে, পুলকে, শিহরণে হৃদয়-মন আপ্লুত হলো। মনে হলো স্বপ্নের চেয়ে বড় নেয়ামত জীবনে আর কিছু নেই। বিরহের যে বেদনা

ভিতরে ভিতরে হৃদয়কে দগ্ধ করে, একটি মধুর স্বপ্নের শীতল পরশ মুহূর্তের মাঝে সেই দহনজ্বালা জুড়িয়ে দেয়।

এমন মধুর স্বপ্ন আরো কয়েকবার দেখেছি ইরাকের সফরে। কখনো উটের কাফেলা, কখনো বিমানের যাত্রা; কখনো মিনা-আরাফার সমাবেশ, কখনো আল্লাহর ঘরের কালো গিলাফ, কখনো মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ! এই সব মধুর স্বপ্ন ইরাকের পুরো সফরে আমার বিরহী হৃদয়কে অনাস্বাদিতপূর্ব এক প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ করে রেখেছিলো। আল্লাহ যদি বান্দাকে আনন্দ দিতে চান, আল্লাহ যদি বান্দার হৃদয় ও আত্মায় প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দিতে চান, কতভাবেই তিনি তা পারেন! কখনো কাছে নিয়ে, কখনো দূর থেকে মধুর স্বপ্ন দেখিয়ে!

হযরতকে স্বপ্নের কথা জানাতাম, তিনি শুধু বলতেন, মোবারক খাব। একটি স্বপ্নের তা'বীর তিনি বলেছিলেন ..... এবং যা বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর বড় কষ্টকরভাবে তা বাস্তব হয়েছিলো; কষ্টকর, তবে কল্যাণপ্রসূ।

***

হযরতের সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিলো ইরাক-ইরান ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা।। শুরু থেকেই তিনি তাঁর ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে আসছিলেন এবং যত দ্রুত সম্ভব সরাসরি প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছিলেন। খান ছাহেব সাধ্যমত যোগাযোগ করছেন, সন্তোষজনক ফল আসছে না। ইরাকী তথ্যমন্ত্রণালয় থেকে শুধু জানানো হচ্ছে, যুদ্ধপরিস্থিতির কারণে প্রেসিডেন্ট ভীষণ ব্যস্ত। সীমান্ত এলাকায় আবার ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আশ্বাস দিয়েছেন, প্রথম সুযোগেই তিনি হযরতকে সাক্ষাৎ দান করবেন।

হজ্বের কারণে সাময়িক বিরতির পর এবার কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়েছে ইরানের পক্ষ হতে। কারণ কোনভাবেই ইরাক যুদ্ধ করার অবস্থানে ছিলো না, বরং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো; এমনকি নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতিতেও ইরাকের আপত্তি ছিলো না, কিন্তু ইরান তার একতরফা শর্তগুলোর বিষয়ে ছিলো অনড়।

এখানে আমার মনে বিরাট প্রশ্ন দেখা দিলো; সফরসঙ্গীদের কথামতে, ইরান নাকি হযরতকে একজন রাষ্ট্রপতির মর্যাদায় বরণ করেছে। ইরানের ধর্মীয় নেতা যেখানে উপসাগরীয় শান্তি-প্রচেষ্টায় নিয়োজিত মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে আছরের পর শুধু মোছাফাহার অনুমতি দিয়েছিলেন সেখানে হযরতের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ একঘণ্টা অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর সন্ধি-প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন। আমার প্রশ্ন হলো, ইরান সরকার এবং ইরানের ধর্মীয় নেতা তো জানেন, হযরত এখন যুদ্ধ বন্ধের ইরানী প্রস্তাব নিয়ে ইরাকে রয়েছেন। তো ইরান কি এই শান্তিমিশনের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ হজ্ব-মৌসুমের যুদ্ধবিরতিকে আরো কয়েক দিন বহাল রাখতে পারতো না!? অন্তত হযরতের ইরাকে অবস্থানকালীন সময় পর্যন্ত!? যুদ্ধ শুরু হওয়ার খবরে হযরতও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, কিন্তু তাঁর সফরসঙ্গীদের কাছে এ

প্রশ্নের কোন জবাব ছিলো না। না মাওলানা আযীযুল হক ছাহেবের কাছে, না জনাব আখতার ফারূক সাহেবের কাছে। দ্বিতীয়জন বরং আমাকে অবাক করে দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কী প্রমাণ আছে যে, এ হামলা ইরান শুরু করেছে? ঠিকই তো, কোন প্রমাণ নেই! কারণ আমরা তো যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষদর্শী নই। তবে জানতে ইচ্ছা করে, সাদ্দাম যে শুরু থেকেই যুদ্ধের জন্য খোমেনিকে দায়ী করে আসছেন তার বিপক্ষেই বা কী চাক্ষুষ প্রমাণ আছে?

যাক, হোটেলের কামরায় নিশ্চেষ্ট সময় কাটানো ছাড়া করারও ছিলো না। হযরতের কামরায় জামাতের সাথে নামায হয়। নছীহত ও হেদায়াতের বয়ান হয়। আর সফরের উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তা নিয়ে হযরত অস্থিরতা প্রকাশ করেন। আমরা মোটামুটি খেয়ে-দেয়ে আরামেই ছিলাম।

হোটেল কত প্রকার ও কী কী, তা তখনো আমার জানা ছিলো না, এখনো নেই, তবে হোটেল মেরিডিয়ানের হাম্মাম বা বাথরুমটি ছিলো চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। আগের যুগে রাজা-বাদশাহদেরও সম্ভবত এত আরামের গোসলখানা ছিলো না। মেরিডিয়ানের বাথরুমেই শ্যাম্পু নামের পদার্থটির সাথে আমার পরিচয়। বাথটবটি ছিলো এত বিরাট যে, দিব্বি ডুব দিয়ে থাকা যায়। হজ্বের সফরনামা না হলে এখানে বাথরুমের যথেষ্ট উপভোগ্য বর্ণনা দেয়া যেতো। কিন্তু ঐসব বেহুদা কথায় কী লাভ! তবে হোটেলের নয়দশতালার বেলকনিতে দাঁড়িয়ে রাতের বাগদাদ দেখার কথা আমি কখনো ভোলবো না। সত্যি বড় অপূর্ব ছিলো অত উঁচু থেকে রাতের দেখা বাগদাদ! সে যুগের আলফে লায়লার রহস্যময়ী নগরী এ যুগেও যেন স্বগৌরবে বিরাজমান। যুদ্ধ চলছে; তার মাঝেও পুরো বাগদাদ যেন আলোকসজ্জায় সজ্জিত এক স্বপ্নপুরী! রাতের তারাখচিত একটুকরো আকাশ যেন এখানে নেমে এসেছে! উপরে আকাশের দিকে তাকাও, তারকার আলোকসজ্জা তোমাকে অভিভূত করবে; নীচে মাটির দিকে তাকাও, মনে হবে, কোন শিল্পী রাতের আকাশ দেখে মনোরম এক ছবি এঁকে রেখেছে!

দজলা-ফোরাতের দেশ ইরাককে বলা হয় বিলাদুর-রাফেদাইন বা দুই নদীর দেশ। ইরাকের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের নাম মাছরিফুর-রাফেদাইন। এ থেকেই ইরাকের জন্য দজলা-ফোরাতের গুরুত্ব বোঝা যায়।

বাগদাদ এখন দজলা নদীর উভয় তীরে বিস্তার লাভ করেছে। এখন মানে, সেই আব্বাসী আমল! তখনই বাগদাদের দুই অংশকে যুক্ত করার জন্য দজলা নদীর উপর সেতু স্থাপন করা হয়েছিলো। প্রাচীন সেতুর নমুনা এখনো রয়েছে পরিত্যক্ত অবস্থায়। তার পরিবর্তে বেশ ক'টি আধুনিক সেতু নির্মিত হয়েছে, যা দেখলে সত্যি অবাক হতে হয়! সেতু তো নয় যেন রংধনু! দজলা নদীর সেতুর উপর দিয়ে যখন গাড়ী ছুটে যায়, মনে অদ্ভুত এক ভাবের উদয় হয়। পোলের নীচে পানির স্রোত যেন অতীত বাগদাদের প্রতিবিম্ব, আর পোলের উপর গাড়ীর স্রোত যেন আধুনিক বাগদাদের গতিময়তার গর্বিত প্রতীক!

রাজধানীর কেন্দ্রস্থলের অভিজাততম হোটেল মেরিডিয়ানের উঁচু বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আমি যে আলোকিত বাগদাদ দেখছি, তার আড়ালে লুকিয়ে আছে অন্য এক বাগদাদ; সেটি ইতিহাসের বাগদাদ, কখনো আলোকিত, কখনো কলঙ্কিত; ইসলামী উম্মাহর অসংখ্য জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের আলোকে যেমন আলোকিত তেমনি দুনিয়ার কুকুরদের লোভ-লালসা, হিংসা-প্রতিহিংসা, হানাহানি-ছিনাছিনি, ভোগবিলাস ও পাপাচারের কলঙ্কে কলঙ্কিত। বাগদাদ কখনো ছিলো মাদীনাতুস্-সালাম– শান্তির শহর, কখনো হয়েছে হালাকু খার ধ্বংসযজ্ঞের অসহায় শিকার।

ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে এলো আধুনিক আলোকসজ্জার বাগদাদ এবং ইতিহাসের পাতা থেকে জেগে উঠলো সুদূর অতীতের বাগদাদ। খলীফা আলমানছূর, হারুন রশীদ ও আলমু'তাছিমের বাগদাদ যেমন আমি দেখতে পেলাম, যার অখণ্ড প্রতাপে কম্পমান সমকালীন বিশ্বমানচিত্র, তেমনি দেখতে পেলাম দুর্বলচিত্ত, দুর্বলচরিত্র, সুর ও সুরায় মত্ত খলীফাদের বাগদাদ, যা ভোগের সাগরে মদের স্রোতে ভেসে চলেছে চরম ধ্বংসের দিকে। দেখতে পেলাম আল্লাহর গযবরূপে ধেয়ে আসা তাতার-বাহিনীর ধূলিঝড়; দেখতে পেলাম রক্তের নদীতে ভেসে যাওয়া লাশের পর লাশ; শুনতে পেলাম কেয়ামতের শোরগোল এবং লুণ্ঠিতা নারীদের বুকফাটা চিৎকার!

একদিকে যেমন দেখতে পেলাম ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের দরসে ফিকাহ ও দরসে হাদীছ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের বিচার-মজলিস, তেমনি দেখতে পেলাম গ্রীক দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের সর্বপ্লাবী জোয়ার ও জয়জয়কার, দেখতে পেলাম খলীফাদের দরবারে ভূলুণ্ঠিত ন্যায় ও ইনছাফের গর্দানে জল্লাদের তলোয়ার। একদিকে যেমন দেখছি শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী ও জোনায়দ বোগদাদীর নূরানী মাহফিল, যেখান থেকে উৎসারিত হচ্ছে আত্মশুদ্ধির অনিঃশেষ আলোকধারা এবং মা'রিফাতের অন্তহীন স্রোতধারা, তেমনি দেখতে পাচ্ছি কবি আবু নাওয়াস ও আবুল আতাহিয়ার কাব্যসভা, তেমনি শুনতে পাচ্ছি ইসহাক ও ইবরাহীম মুছেলীর সুর ও সঙ্গীতের ঝংকার।

ইতিহাসের বাগদাদ সত্যি যুগপৎ কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায় এবং শুভ-অশুভের আশ্চর্য এক উদাহরণ। একদিকে যেমন আবাদ ছিলো ইলম ও জ্ঞানচর্চার এবং মারিফাত ও আধ্যাত্মিকতার বহু মজলিস, অন্যদিকে তেমনি জমজমাট ছিলো সুর ও সঙ্গীতের, সুরা ও কাবাবের এবং নৃত্য ও নুপুরঝংকারের অসংখ্য 'মায়ফিল'। এখানে যেমন ছিলো তাকওয়া ও খোদাভীতি এবং মুজাহাদা ও আধ্যাত্মসাধনার সুউচ্চ আলোকমিনার, যেমন ছিলো ন্যায় ও ইনছাফ এবং সততা ও সুবিচারের প্রজ্বলিত মশাল, তেমনি ছিলো ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তিপূজা এবং আনন্দ-উল্লাস ও ইন্দ্রিয় উন্মত্ততার নিশান-বরদার, তেমনি ছিলো অনাচার ও পাপাচার এবং শয়তানিয়াত ও জাহেলিয়াতের কালো কালো পাহাড়। এখানে রাতের অন্ধকারে জায়নামাযে অসংখ্য চোখ থেকে যেমন অশ্রু ঝরতো তেমনি শরাবের মজলিসে অসংখ্য পেয়ালা থেকে

রঙ্গীন মদ উপচে পড়তো। বাগদাদ ছিলো এমনই আশ্চর্য এক শহর যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ) তাঁর প্রিয় শাগরিদকে বলেছিলেন, 'তুমি বাগদাদ দেখোনি! তাহলে তো পৃথিবীর কিছুই দেখোনি!'

পারস্যযুগে বাগদাদ ছিলো দজলা নদীর পশ্চিম তীরে ছোট্ট এক বস্তি। কথিত আছে, পারস্য-সম্রাট খসরু তার এক মূর্তিপূজক ক্রীতদাসের প্রতি খুশী হয়ে এ অঞ্চলটি তাকে দান করেছিলেন। আর সে তার উপাস্য মূর্তি 'বাগ'-এর দাদ বা দানরূপে এর নাম রেখেছিলো বাগদাদ (বাগদেবতার দান)।

এমনও কথিত আছে যে, পারস্য-সম্রাট নওশেরাওয়াঁ এখানে বসে ন্যায় ও ইনছাফের বিচার করতেন বলে এর নাম হয়েছে বাগদাদ। বাগ মানে বাগান বা উদ্যান, আর দাদ মানে সুবিচার, সুতরাং বাগদাদ মানে সুবিচারের বাগান বা ন্যায়-উদ্যান।

দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা আলমানছুর ১৪০ হিজরীতে বাগদাদে রাজধানী স্থাপন করেন। কারণ এর একদিকে ছিলো দজলা নদী। এ নৌপথে সুদূর চীনদেশের সাথেও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিলো, অন্যদিকে ছিলো ফোরাত নদী। ঐ পথে সিরিয়া ও রাক্কার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ ছিলো।

খলীফা আলমানছুর বাগদাদের নতুন নাম রাখেন মাদীনাতুস্-সালাম বা শান্তির শহর। এই শান্তি-শহরের চমকপ্রদ 'কাকতালীয়তা' এই যে, বহু শতাব্দী যাবৎ একটি মুসলিম খেলাফতের রাজধানী হলেও কোন খলীফার মৃত্যু এখানে হয়নি। সবারই মৃত্যু হয়েছে কোন না কোনভাবে বাগদাদের বাইরে।

সেই অতীতকাল থেকে এখন পর্যন্ত দজলা নদীর পশ্চিম তীরের বাগদাদ রাছাফা নামে এবং পূর্বতীরের বাগদাদ কারখ নামে পরিচিত। এভাবেই ইতিহাসের অসংখ্য স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তি কারখী ও রাছাফী নামে পরিচিত হয়েছেন।

***

তথ্যমন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে ঐতিহাসিক স্থান ও মাযার যিয়ারাতের একটি কর্মসূচী দেয়া হলো। মন্ত্রণালয়ের যে সিনিয়র কর্মকর্তা গাইডরূপে নিযুক্ত হলেন তার নাম মুহসিন বিন মুকাররাম, অত্যন্ত সপ্রতিভ, চৌকস ও মার্জিত রুচির নিপাট ভদ্রলোক। উদ্ভাসিত মুখমণ্ডলের এই ভদ্রলোকের ঠোঁটে একটি অমায়িক হাসি সবসময় লেগে থাকতো। দেখলে যে কারো বিশ্বাস হবে সরলতা ও আন্তরিকতা তার স্বভাবজাত। পুরো সফরে আমাদের তিনি খুব আনন্দদায়ক সঙ্গ দান করেছেন; বিশেষ করে হযরত হাফেজ্জী হুযূরের যাবতীয় সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন এবং তাতে যতটা না ছিলো দায়িত্বপালন তার চেয়ে বেশী ছিলো অন্তরের আকর্ষণ।

আমার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সখ্যও গড়ে উঠেছিলো। সেই সুবাদে তিনি আমাকে বাগদাদ থেকে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার দূরে তার গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ইরাকের গ্রামীণ জীবনের অন্তত একটি খণ্ড চিত্র দেখার আমার সুযোগ হয়েছিল। সে সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করার ইচ্ছে আছে।

আমাদের কর্মসূচীর প্রথম পর্বে ছিলো সে যুগের- এবং হয়ত সর্বকালের- আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী (রহ)-এর মাযার যিয়ারাত, পাকভারত 'সারযামিনে' যিনি 'বড় পীর' নামে সুপরিচিত।

শুক্রবার। নাস্তার পর হযরতের সঙ্গে হোটেল থেকে রওয়ানা হলাম। বাগদাদ তখন একটি কর্মচঞ্চল রাজধানীরূপে জেগে ওঠেছে। পথে অবশ্য পথচারী নেই। প্রশস্ত সড়কে শুধু গাড়ী আর গাড়ী! তবে সুশৃঙ্খল এবং গতি সুনিয়ন্ত্রিত। সবকিছু ছবির মত ঝকঝকে তকতকে!

দেশের বাইরে আমি জীবনে এই প্রথম এবং আমার সফর ছিলো আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে, দেশভ্রমণের জন্য নয়; যদিও তাতে রয়েছে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের অবারিত সুযোগ। তাই মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আদেশ হলো, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, আর দেখো, কেমন ছিলো অপরাধীদের পরিণাম!

আমার জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে সফর ও দেশভ্রমণের তেমন কোন সুযোগ আসেনি। আমি ইউরোপ-আমেরিকার কোন শহর দেখিনি। প্যারিস ও ভেনিস আমার অজানা, রোম ও নিউইয়র্ক আমার অচেনা, এমনকি বৈরুত ও দামেস্কও আমার অদেখা। সুতরাং পৃথিবীর উন্নত সব নগর-শহরের সৌন্দর্য বিচার করা এবং রূপজৌলুস তুলনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভ্রমণকাহিনী পড়ে পৃথিবীর সুন্দরতম শহরগুলোর সৌন্দর্যের একটি কল্পরূপ আমি অর্জন করেছি এবং বলতে দ্বিধা নেই, বাগদাদের সৌন্দর্য আমার কল্পনাকে অতিক্রম করেছে। বাগদাদ শুধু আধুনিক স্থাপত্যের দৃষ্টিনন্দন সুউচ্চ ইমারত ও ভবনের শহর নয়, বাগদাদ সবুজ বৃক্ষেরও শহর। সবুজ বিভিন্ন শহরে আছে, তবে সবুজের এমন শান্তশীতল ছায়া শুধু গ্রামেই কল্পনা করা যায়, শহরে নয়। পথের দু'পাশে যেমন খেজুরবৃক্ষের সারি, তেমনি সড়কদ্বীপগুলোতে আশ্চর্য সুন্দর ফুলের কেয়ারি। আবার শহরের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে ছোট বড় অনেক বৃক্ষ-উদ্যান। সবুজের নির্জনতা যেন শহরের সকল শব্দ ও কোলাহল শোষণ করে নেয়। তাই বাগদাদ এত কর্মমুখর, অথচ এমন শান্ত-নীরব! বাগদাদের একমাত্র অসৌন্দর্য যা আমার নযরে এসেছে তা হলো বিভিন্ন সড়ক-মোড়ে স্থাপিত প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের মূর্তি। বড় পীরের শহরে আর যাই হোক, মূর্তি বড় বেমানান। সাদ্দাম কী চান, জনপ্রিয়তা? মানুষের ভক্তি-ভালোবাসা? সে জন্য রাস্তার মোড়ে মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কি খুব বেশী বুদ্ধির পরিচয়!

রাজধানীর আধুনিক এলাকা অতিক্রম করে অবশেষে আমাদের গাড়ী পুরোনো শহরে প্রবেশ করলো। এতক্ষণ দেখেছি আধুনিকতার চোখ ধাঁধানো রূপ, এখন দেখছি প্রাচীনতার বিমর্ষ মলিন চেহারা। আধুনিক বাগদাদ যেন যৌবনের বসন্তকাল, আর প্রাচীন বাগদাদ যেন যৌবনের পড়ন্ত বিকাল। তবে এই জীর্ণতা ও প্রাচীনতার মাঝে রয়েছে অন্যরকম এক মাদকতা, যার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে শুধু অতীতমুখী মানুষের ইতিহাস-কাতর হৃদয়। শহরের অপ্রশস্ত পথ, প্রাচীন ভবন এবং আরবী জুব্বা যেন নীরব ভাষায় বলছে, আমি তোমার হারানো বাগদাদ! আমি তোমার অতীত ইতিহাস!

আমি তোমার লুণ্ঠিত গৌরবের মলিন চিহ্ন! আমাকে চোখ মেলে দেখো এবং হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করো। তুমি তো তালিবে ইলম! তুমি তো নিযামিয়ার উত্তরাধিকারী! আধুনিক বাগদাদে কিছু নেই তোমার জন্য; তোমার যা কিছু তা এখানে এই সব প্রাচীন ভবনের ইট-গাঁথুনিতে!

একটি পুরোনো সড়কের মাথায় এসে গাড়ী থামলো। হযরত অবতরণ করলেন, আমরা নামলাম। এখানে মুহসিন আমাকে মুগ্ধ করলেন এবং লজ্জিত করলেন। আমরা কেউ অবতরণকালে হযরতের হাত ধরার কথা ভাবিনি। এটা প্রয়োজন নয়, এটা সম্মান প্রদর্শন। মুহসিন দ্রুত এগিয়ে হযরতকে হাত ধরে সহায়তা দিলেন, আর তিনি মৃদু হেসে জাযাকাল্লাহ বললেন। ঘটনাটি ছোট্ট, কিন্তু এখনো মনে আছে, কারণ একজন পরদেশীর সামনে নিজেকে সেদিন খুব ছোট মনে হয়েছিলো। এ ঘটনাটি হতে পারে হযরতের প্রতি দূর ও কাছের লোকদের আচরণ ও অভিব্যক্তির একটি সুন্দর প্রতীক! আর 'কাছ' থেকে নিজেকে আমি বাদ দেবো কেন!

একটি অপ্রশস্ত গলি পার হয়ে আমরা মসজিদের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হলাম। বিরাট মসজিদ, পাশে মাদরাসা এবং বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহ)-এর মাযার। শায়খ তাঁর জন্মভূমি উত্তর ইরানের জিলান প্রদেশ থেকে মাত্র আঠারো বছর বয়সে বাগদাদে এসেছিলেন। তাঁর ইলমচর্চা ও আধ্যাত্মিক সাধনার গৌরবময় জীবন এই মসজিদ-মাদরাসাকে কেন্দ্র করেই অতিবাহিত হয়েছে। এখনও তিনি এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত।

মাযারের খুব কাছেই ছিলো প্রাচীন বাগদাদের নগরপ্রাচীর। মসজিদ, মাদরাসা ও মাযার তো এখনো আছে, কিন্তু মাটির সাথে মিশে গেছে নগরপ্রাচীরের সবচিহ্ন। ইট-পাথরের চিহ্ন মুছে যায়, থেকে যায় শুধু আলোর নিশান। এটাই আল্লাহর চিরন্তন বিধান। বাগদাদের নগরপ্রাচীর যেমন আজ নেই তেমনি নেই সে যুগের খলিফার রাজপ্রাসাদ, কিন্তু রূহানি জগতের বাদশাহ শায়খ জীলানী এখনো জীবন্ত, তাঁর মসজিদ এখনো আবাদ। জীবনকালে যেমন হেদায়াতের আলো ছড়িয়েছেন মানুষের হৃদয়রাজ্যে, তেমনি মৃত্যুর পর যুগ যুগ ধরে সারা মুসলিম জাহানে প্রবাহিত রয়েছে তাঁর রূহানি ফয়য ও ফায়যানের কল্যাণধারা এবং ইনশাআল্লাহ তা অব্যাহত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। দুনিয়ার বাদশাহ মৃত্যুর পর মরে যায়, আর রূহানিয়াতের বাদশাহ মৃত্যুর পর হন অমর। তবু মানুষ পেতে চায় দুনিয়ার বাদশাহি, সোনার সিংহাসন এবং মণিমুক্তার মুকুট! তবু মানুষ গ্রহণ করে না রূহানিয়াতের তাজ এবং হতে চায় না 'জাহানে কলবের সারতাজ'!

হযরত হাফেজ্জী হুযূর শায়খ জীলানী (রহ)-এর মাযারে উপস্থিত হলেন, যিয়ারাত করলেন, কিবলামুখী হয়ে এবং দীর্ঘ সময় মোরাকাবায় আত্মনিমগ্ন থাকলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এই সঙ্গটুকুই এখন জীবনের বড় সম্পদ।

এই মহান সাধকের পবিত্র জীবনের টুকরো যে সব ঘটনা জানা ছিলো সেগুলো তখন আমার স্মৃতির আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘের মত ভেসে বেড়াতে লাগলো। বালকবয়সেও

তাঁর সত্যবাদিতা ও নির্ভীকতা ডাকাত-সরদারের কঠিন হৃদয় বিগলিত করেছিলো! আর যুবক বয়সেই তাঁর ওয়াযের মাহফিলে মুরদা দিল যিন্দা হতো এবং কান্নার রোল উঠতো। পাপাচারী ও যালিম দুষ্কর্ম থেকে তাওবা করতো, আর শরাবী নেশার শরাব ছেড়ে মা'রেফাতের শরাব পান করে ধন্য হতো।

শায়খের একটি ঘটনা খুব প্রসিদ্ধ। তিনি যখন ইবাদত ও রিয়াযাত-মুজাহাদার উচ্চতম সোপানে উপনীত তখন একবার তাঁর সামনে একটি আলো উদ্ভাসিত হলো। সেই আলোর মাঝে একটি আলোকিত আকৃতি আত্মপ্রকাশ করলো। শায়খ জীলানী (রহ) আলো ও আলোকিত আকৃতি দেখতে পেলেন; দেখে চমকিত হলেন। এমন তো কখনো হয়নি! এ কিসের আলো! কে এই আলোকিত আকৃতি! শায়খকে আল্লাহ নূরানি কলব দান করেছিলেন। আল্লাহর সঙ্গে তা'আল্লুক দ্বারা কলবে নূরানিয়াত পয়দা হয়। তা'আলুক যত গভীর হয়, নূরানিয়াত তত উজালা হয়। হতে হতে একসময় বান্দা আল্লাহর ইশক ও মুহাব্বাতে সম্পূর্ণ ফানা হয়ে যায়, তখন বান্দার কলব শুধু গোশতের পিণ্ড থাকে না, পূর্ণ নূর হয়ে যায়। 'নাস্তি ও হাস্তির' হাকিকত ও রহস্য তার সামনে তখন উদ্ভাসিত হয়ে যায়। ঐ বান্দা তখন কোন কিছুতেই বিভ্রান্ত হয় না। শয়তান তখন যুলমানি ও নূরানি কোন অস্ত্রেই তাকে ঘায়েল করতে পারে না। সে তখন ঐ বান্দার কাছে আসা দূরের কথা, তাকে বরং সভয়ে এড়িয়ে চলে।

শায়খ জীলানী (রহ)-কে আল্লাহ তা'আলা ফানা ফিল্লাহর সেই মাকাম দান করেছিলেন; তাই তৎক্ষণাৎ ঐ আলো ও আলোকিত আকৃতির হাকীকত তাঁর সামনে খুলে গেলো। আর যখন আওয়ায এলো, হে আব্দুল কাদির, আমি তোমার রব্ব, খোশখবর কবুল করো, তোমার ইবাদত-মুজাহাদায় এবং বন্দেগি-মুরাকাবায় আমি খুশী। যাও, আজ থেকে তুমি ইবাদতের এবং হালাল-হারামের কয়েদ থেকে আযাদ। সুতরাং খুশী হও এবং শোকর করো হে আমার প্রিয় বান্দা!

'গায়বি' আওয়ায এলো, শায়খও বুঝলেন। তিনি খুশী হলেন এবং শোকর করলেন, আল্লাহর। তিনি গযবের স্বরে বললেন, বাবা আদমের দুশমন! দূর হ! দূর হ!

মুহূর্তে দূর হয়ে গেলো সেই আলো এবং আলোর মাঝে প্রকাশিত 'আলোকিত' সত্তা। সবকিছু ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেলো।

ঘটনার সেখানেই শেষ নয়। শয়তানের হামলা কখনো একবারে শেষ হয় না। বারবার হামলা হয় এবং হামলার রূপবদল হয়। শয়তান একভাবে ব্যর্থ হয়ে অন্যভাবে হাযির হয়। ক্রমে তার হামলা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম হয়। তাই কোরআনে মানুষকে আল্লাহ শয়তানের হামলা সম্পর্কে বারবার হুঁশিয়ার করেছেন, আর বলেছেন, 'তুমি অভিশপ্ত শয়তানের (ধোকা) হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো।'

আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করলেই শুধু তুমি নিরাপদ। শয়তানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হামলা থেকে তোমার জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি তোমাকে রক্ষা করতে পারে না, তোমার সাধনা ও মুজাহাদা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তোমাকে রক্ষা করতে পারে না; পারে শুধু আল্লাহর হেফাযত।

এখানেও তাই হলো, 'ইবলীস কা বাচ্চা' পাঁয়তারা বদল করে আরো সূক্ষ্ম হামলা চালালো, 'গায়ব' থেকে সে আওয়ায দিলো, আফসোস, আমার হামলা থেকে তোমার ইলম তোমাকে বাঁচিয়ে দিলো। আমি তো কম সে কম সত্তরজন সাধকের সাধনা নস্যাৎ করেছি এ অস্ত্র দ্বারা।

শয়তানের দুর্ভাগ্য, এবার তার পালা পড়েছিলো জীলানের আব্দুল কাদিরের সঙ্গে! তিনি চিৎকার করে উঠলেন, দূর হ, মরদূদ, খবীছ! ইলম নয়, আমাকে তো রক্ষা করেছেন আল্লাহ।

আধ্যাত্মিকতার পথে যারা অনভিজ্ঞ পথিক, এখানে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শিক্ষা। তাদের বুঝতে হবে, তরীকাত বা মা'রেফাত শরীয়ত থেকে আলাদা হতে পারে না এবং বান্দা মা'রিফাতের উচ্চতম স্তরেই গিয়েও শরীয়তের ইবাদত ও হালাল-হারামের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। আগুনের আলো এবং নূরের আলোর মাঝে যারা পার্থক্য করতে পারে না তারাই বিভ্রান্ত হয় এবং ভ্রষ্ট হয়।

হযরত হাফেজ্জী হুযূর তখনো তাঁর মোরাকাবায়। কী রহস্যের লীলাখেলা চলছে তখন তাঁর কলবের জগতে, তা বোঝার সাধ্য আমাদের কোথায়! হঠাৎ মনে হলো, আমি একটি সতর্কবাণী শুনলাম– 'সাবধান, সাবধান! এ অকূল দরিয়ায় নৌকা ডুবেছে কত সাধকের, কত সওদাগরের! নিরাপদে দিতে হলে পাড়ি, মা'রেফাতের নৌকায় পাল তোলো শরীয়তের।'

আমি তখন আল্লাহর কাছে অন্তরের আকুতি নিবেদন করলাম এভাবে– হে আল্লাহ, তোমার অনুগ্রহে তোমার বান্দা তোমার ঘর তাওয়াফ করে এসেছে, তোমার হাবীবের রাওযা যিয়ারাত করে এসেছে। হে আল্লাহ, তোমার ঘরের ওছীলায়, তোমার হাবীবের ওছীলায় এবং তোমার রহমতের ওছীলায় আমাকে হেফাযত করো শয়তানের সব রকম ধোকা হতে।

হযরতের মোরাকাবা শেষ হলো, তিনি চোখ মেলে তাকালেন। মনে হলো, বহু দূরের সফর থেকে ফিরে এলেন। আসলে এ জগতের সফর তো চলতে থাকে জীবনভর; এ সফরের শেষ মানযিল তো মওতের আখেরি লামহা। মসজিদের কিবলার দিকে একটি প্রাচীরের আড়ালে ছিলো শায়খ জীলানী (রহ)-এর মাযার। সেখান থেকে বের হয়ে আমরা মাদরাসার অঙ্গনে চলে এলাম।

এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হলেন জীলানী (রহ)-এর শিক্ষক শায়খ কাযি আবু সা'আদ মাখরামি (রহ)। তাঁর মৃত্যুর পর জিলানী (রহ) এ মাদরাসাকেই তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ও তা'লীম-তারবিয়াত এবং জ্ঞান-গবেষণা ও আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করেন। তাঁর মাওয়াইয ও ওয়াযসংকলনকে উচ্চতর আরবী সাহিত্যের আদর্শ নমুনা মনে করা হয়। তাতে দেখা যায়, তাঁর শিক্ষার মূল কথা হলো, মা'রিফাতের সাধককে অবশ্যই শরীয়তের অনুগত এবং সুন্নাতের অনুসারী হতে হবে।

শায়খ জীলানী (রহ)-এর শিক্ষাকেন্দ্র এ মহান মাদরাসা যুগের শত দুর্যোগ মুকাবেলা করে আজো টিকে আছে। কালের এই নীরব সাক্ষীর সামনে দাঁড়িয়ে আমি অভিভূত

হলাম। হৃদয় ও আত্মা ইলমের সাধনার পথে অপূর্ব এক উদ্দীপনা লাভ করলো। কল্পনার জগতে আমি দেখতে চেষ্টা করলাম মাদরাসার সেই নূরানি হুজরাটি যেখানে এই মহান সাধকের কলম নূরের হরফে লিখতো ইলমের বাণী। আমি যেন দেখতে পেলাম ধ্যানমগ্ন সাধকের একটি উজ্জ্বল ছবি, যার ডান হাতের কলম দ্রুত সঞ্চালিত হচ্ছে ডান থেকে; একবার দোয়াতে ডুব দেয়, আবার কাগজের পাতায় সাঁতার কাটে। সেই ছবিটি কখনো দেখলাম দিনের আলোতে, কখনো রাতের আঁধারে, আবার কখনো মোমের বাতিতে। তখন আমি সমগ্র অন্তর দিয়ে আল্লাহর কাছে কামনা করলাম, সেই নূরানী কলমের ফায়য ও ফায়যান আমার দুর্বল কলমও যেন কিছুটা অর্জন করতে পারে।

জীলানী-মাদরাসার এখন যিনি প্রধান তাঁর নাম শায়খ আব্দুল কারীম আলমুদাররিস। নূরানি চেহারার সহজ-সরল এই বুযুর্গ আমাদের হযরতকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন। তথ্যমন্ত্রণালয় থেকে তাঁর আগমন-সংবাদ আগেই জানানো হয়েছিলো এবং সাক্ষাতের অনুমতি নেয়া হয়েছিলো। আমাদের গাইড মুহসিন জানালেন, ইনি সাধারণত সরকারী মেহমানদের সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। কিন্তু তোমাদের শায়খের কথা শুনে সানন্দ-সম্মতি প্রকাশ করেছেন।

শায়খে ইরাক ও শায়খে বাঙ্গাল, উভয়ের মাঝে দীর্ঘক্ষণ আন্তরিক আলোচনা হলো। আমি তরজমার দায়িত্ব পালন করলাম। প্রাচীন যুগের স্রোতধারার অনুসারী এই নূরানি মানুষটিকে আমাদের হযরত খুব পছন্দ করলেন। তাঁর কাছে আধুনিক কোন বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেই, কিন্তু সাদ্দামের মত কঠিন একনায়কও তাঁকে সমীহ করেন। মুহসিনের কাছেই জানা গেলো, শায়খ কখনো প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে যাননি, প্রয়োজনে প্রেসিডেন্ট নিজে সময় চেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। এমনই হয়, যুগে যুগে এমনই হয়েছে এবং এমনই হবে। এ ধারা যত ক্ষীণ প্রবাহেই হোক, এখনো আছে, আগামীতেও থাকবে।

আজ দীর্ঘ সাতাশ বছর পর যখন এই সফরনামা লিখছি তখন ঐ মহান আলিম ও শায়খে কামিল হয়ত দুনিয়ায় নেই; সেই বাগদাদও তো এখন নেই! নেই বাগদাদের 'লৌহমানব' সাদ্দাম হোসায়ন! কিন্তু শায়খের নিবেদিতপ্রাণ ছাত্ররা?! সেদিন জিলানী-মাদরাসায় তাঁর যে অল্পক'জন তরুণ ছাত্রকে দেখেছিলাম তারা এখন কোথায়?! আশা করবো, তারা এখন জিহাদের ময়দানে যামানার হালাকু খার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এবং দুশমনের বুক ছিদ্র করে, আর দুশমনের গুলিতে ছিদ্রবুক নিয়ে শাহাদাত বরণ করছেন।

শায়খ নিজে ঘুরে ঘুরে মাদরাসার কুতুবখানা দেখালেন। তিনি বললেন, 'হযরত জিলানীর মাযারের বয়স যত, এ কুতুবখানার বয়স তার চেয়ে বেশী।'

অবাক হওয়ার মত বিশাল সংগ্রহ! আধুনিক যুগের মুদ্রিত কিতাব যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রাচীন যুগের হাতে লেখা বহু কিতাব। সেই কিতাবের ঘ্রাণ সহজেই

অনুভব করা যায়, তখন মনের অবস্থা কেমন হয় তা নিষ্প্রাণ কিছু শব্দ দিয়ে কীভাবে বোঝাবো!

এরপর আমাদের সামনে এলো তাতারীদের হাতে বাগদাদের ধ্বংসযজ্ঞের মর্মন্তুদ ইতিহাসের এক নীরব সাক্ষী! শায়খ আমাদের হযরতের হাতে একটি হস্তলিখিত জীর্ণদশাগ্রস্ত কিতাব তুলে দিয়ে বললেন, 'তাতারীদের হাতে বাগদাদের বরবাদির পর এ কিতাবটি দজলা নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছিলো।'

আমি চমকে উঠে কিতাবটির দিকে তাকালাম। আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগলো। চোখের সামনে গোটা কুতুবখানা যেন দুলে উঠলো। কম্পিত হাতে হযরতের কাছ থেকে কিতাবটি নিলাম। কিছু লেখা মুছে গেছে। শেষ পৃষ্ঠায় নীচের দিকে দেখলাম অন্য একটি হাতের লেখা। লেখাটি পড়লাম আমার দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া বুকের উপর হাত রেখে–

'৫৫৬ হিজরীতে এই কিতাব আমি দজলা নদীর পানি থেকে উদ্ধার করেছি। আমাদের সব কিতাব তাতারীরা দজলায় ফেলে দিয়েছিলো।'

লেখাটির নীচে উদ্ধারকারীর স্বাক্ষর ছিলো। আফসোস, কিতাব এবং তার উদ্ধারকারীর নাম এখন মনে নেই।

বাগদাদের বরবাদির ইতিহাস আমি পড়েছি। লক্ষ লক্ষ মানুষের গণহত্যার পর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিলো যে, বাগদাদে কোন জীবিত মানুষ আর চোখে পড়ে না। কিন্তু হালাকু খান অত সহজে ছাড়ার পাত্র ছিলো না; সে তো এসেছিলো বাগদাদে আল্লাহর গযব হয়ে। তার হুকুমে সব মসজিদে আযান দেয়া হলো। সেই আযানের ধোকায় যে হতভাগারা রাস্তায় বের হলো তাদেরও কতল করা হলো। প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, 'বাগদাদ তখন রক্তের বন্যায় ভাসছিলো।'

তারপরো হালাকু খার সন্দেহ হলো, হয়ত কিছু মানুষ রয়ে গেছে মাটির নীচে গোপন কুঠুরিতে। হুকুম জারি হলো, 'দজলা নদীর বাঁধ কেটে দাও।' বাগদাদ শহর তলিয়ে গেলো দজলানদীর পানিতে। এরপর একজন মানুষও বাগদাদে জীবিত ছিলো না। ঐতিহাসিকদের মতে বাগদাদে তাতারীদের হাতে বিশলাখ মানুষ নিহত হয়েছিলো। সেদিন দজলার পানি যেভাবে ছুটে এসেছিলো, বিশলাখ বাগদাদী যদি খালি হাতেই সেভাবে ছুটে যেতো তাতারীদের দিকে, মুসলমানদের বদলে তাতারীদেরই লাশের স্তূপ তৈরী হতো বাগদাদের বাইরে। কিন্তু হায়, স্বয়ং খলীফাতুল মুসলিমীন তখন ডুবে ছিলেন শরাবের পেয়ালায়! তাতারীদের রক্তের নেশা যখন পূর্ণ হলো তখন তারা মেতে উঠলো কুতুবখানা ধ্বংসের পৈশাচিকতায়। গোবি মরুভূমির এই যাযাবর পশুদের বুঝে আসেনি, 'কাগজের বাণ্ডিল' কেন এভাবে আলমিরাতে তুলে রাখা হয়! তাদের প্রতিহিংসা এমনই ভয়ংকর ছিলো যে, যেখানে যত 'কাগজের বাণ্ডিল' ছিলো, সব তারা দজলার পানিতে ফেলে দিয়েছিলো। স্পেনে 'সভ্য' খৃস্টানদের হাতে জ্বলেছিলো 'কুরতুবা'র কুতুবখানা, আর বাগদাদে বর্বর তাতারীদের হাতে দজলার পানিতে ডুবেছিলো 'কাগজের বাণ্ডিল'!

লক্ষ্য করলাম, কিতাবের শেষ পৃষ্ঠার সেই লেখাটিরও একদু'টি হরফ পানির দাগে ঝাপসা। আমি নিশ্চিত, এটা দজলার পানির দাগ নয়; কিতাবটি উদ্ধার করে এই লেখাটি যিনি লিখেছেন এটা তার চোখের পানির দাগ। হাজার বছর পর আরো দু'ফোঁটা চোখের পানি সেই কিতাবের আরো কিছু লেখা ভিজিয়ে দিলো। আমি জামার কাপড় দিয়ে চোখের পানিটা মুছে কিতাব ফিরিয়ে দিলাম শায়খের হাতে।

পরে বাগদাদ জাদুঘরেও দজলার পানি থেকে উদ্ধার করা আরো কিছু কিতাব আমি দেখেছি। সেসব কিতাবের লেখা আর পড়ে দেখিনি, তবে যা লেখা ছিলো না তা আমি পড়েছিলাম; পড়তে পেরেছিলাম। তাতে যা লেখা ছিলো না তা হলো–

'ইলমের খাযানা এবং কিতাবের ভাণ্ডার উম্মাহকে রক্ষা করতে পারে না, যদি ইলমের নূর থেকে কলবের জাহান মাহরূম হয়ে যায়, যদি 'সীনা ও সাফীনার' রিশতা ছিন্ন হয়ে যায়। কলম ও তলোয়ার যখন আলাদা হয়ে যায় এবং চোখের পানি থেকে যখন বুকের লাল রক্তের গন্ধ হারিয়ে যায় তখন উম্মাহর ভাগ্যবিপর্যয় অনিবার্য হয়ে যায়।

আজ সাতাশ বছর পর যখন এ সফরনামা লিখছি তখন হাজার বছর আগের বাগদাদ আবার জ্বলছে নয়া যামানার হালাকু খার হাতে। জানি না, হাজার বছর পর আবার কোন মুসাফির বাগদাদের জাদুঘরে হাযির হবে কি না এবং আগুনে পোড়া কোন কিতাবে এমন লেখা দেখতে পাবে কি না–

'১৪২৭ হিজরিতে এই কিতাব আমি বাগদাদের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করেছি। মার্কিন হায়েনাদের জ্বালানো আগুনে আমাদের সবকিছু সারখার হয়ে গেছে। এই কিতাবের পোড়া দাগে হে পাঠক, তুমি পাবে আমার পোড়া কলজের গন্ধ!'

জানি না, হাজার বছর পরের কোন পাঠক চোখের পানিতে সেই কিতাবের লেখা ভিজিয়ে দেবে কি না! জানি না! তবে আমি জানি, বাগদাদ আবার জেগে ওঠবে। আগুনে জ্বলে পুড়ে সারখার বাগদাদ আবার সবুজ হবে। হারুন রশীদের বাগদাদ ধ্বংস হয়েছিলো, সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে শায়খ আব্দুল কাদির জিলানীর বাগদাদ জেগে উঠেছিলো। আজ সাদ্দামের বাগদাদ জ্বলে সারখার হতে পারে, কিন্তু 'শায়খ আব্দুল কারীম আলমুদাররিস'-এর বাগদাদ আবার জেগে ওঠবে, আবার সবুজ সজীব হবে। দুই বাগদাদের আবাদি ও বরবাদির এ মর্মন্তুদ লীলাখেলা হয়ত তত দিন চলবে যত দিন মুসলিম উম্মাহর কলবের জাহানে আবাদি ও বরবাদির 'আফসানা' বন্ধ না হবে।

জুমু'আর সময় হয়ে এলো। শায়খ বাগদাদের তাজা খেজুর দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। আমরা শায়খের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মসজিদে হাজির হলাম। আমি বুঝতে পারিনি, কুতুবখানার সেই কিতাব হযরতের কলবকে এতটা যখমি করেছে! কিছুটা বুঝলাম যখন মসজিদে বসে তিনি বললেন, 'মিয়াঁ আবু তাহের, আমাদের সালাফের কত কিতাব তাতারীদের হাতে বরবাদ হয়েছে! কারণ তো আর কিছু না: কিতাব ছিলো, কিতাবের খরিদ্দার ছিলো, কিন্তু কিতাবের 'নযরদার' ছিলো না। এজন্যই বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, 'ইলম দর সীনা, না দর সফীনা।'

মিয়াঁ আবু তাহের! আমার তামান্না, তুমি সাফীনার ইলমের বদলে সীনার ইলমের দিকে বেশী আগে বাড়ো।'

এখনো চোখের সামনে ভাসে, কথাগুলো তিনি বলছেন, তাঁর চোখ দু'টো ছলছল করছে। শেষে তিনি বড় দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন এবং আমি তার উত্তাপ অনুভব করেছিলাম। অনুভবের এই পাথেয়টুকুর কল্যাণেই আমার জীবনের সফর এখনো পশ্চিমমুখী। ব্যথিত হৃদয়ের গভীর থেকে বের হয়ে আসা সেই দীর্ঘনিঃশ্বাস এখনো আমি যেন শুনতে পাই যখন তাঁর কবরের পাশে দাঁড়াই!

হযরত জায়নামাযে তিলাওয়াতে মশগুল ছিলেন, আমরা মশগুল ছিলাম আমাদের 'তিলাওয়াতে'। এখানে জমিয়াতুল মুদাররিসীনের জনাব আব্দুল মান্নান সাহেবের নেতৃত্বাধীন দলটির সাথে দেখা হয়ে গেলো। তিনি বিখ্যাত মানুষ, তবে এই সফরের আগে তাকে দেখার সুযোগ হয়নি। তিনি পিছনের কাতারে ছিলেন। আমি পিছনে ফিরে মুছাফাহা করলাম এবং একটু সরে সামনের কাতারে জায়গা করে দিলাম। তিনি সামনে এসে আমার পাশে বসলেন এবং একটি কথা জানতে চাইলেন। তাতে আমি যেমন অবাক হলাম তেমনি ব্যথিত হলাম; সত্যি সত্যি খুব ব্যথিত হলাম।

অনেক ভেবেছি, হজ্বের সফরনামায় লিখবো কি লিখবো না; শেষ পর্যন্ত লিখলাম, এ আশায় যে, হয়ত শিক্ষার খোরাক হবে। তিনি জানতে চাইলেন, 'খাওয়া-দাওয়া কেমন চলছে!'

অবাক হলাম এবং ব্যথিত হলাম, কারণ তিনি তো বড় ব্যক্তি, সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও তো এমন স্থানে এমন কথা আশা করা যায় না। বয়সে ও যোগ্যতায় আমি ছোট; তাই ভিতরের কষ্টটুকু চেপে যেতেই হলো, কটাক্ষের তিক্ততাটুকুও হযম করে নিতে হলো। শুধু সরলভাবে বললাম, একটু আগে জিলানীর কুতুবখানায় বড় বিস্বাদ খাবার গ্রহণ করেছি।

কিছু বুঝতে না পেরে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, এমন এক কিতারেব যিয়ারাত করেছি যা তাতারীদের হাতে বাগদাদের বরবাদির পর দজলা নদীর পানি থেকে উদ্ধার করা হয়েছিলো।

আর কোন কথা হলো না, তবে সেই ঘটনা অন্তরে স্থায়ী ব্যথা হয়ে থেকে গেলো। এ দুঃখ আমার মনে সবসময় বাজে, অনেক বড় হয়েও আমরা অনেক ছোট থেকে যাই কেন?!

জুমু'আর নামায হলো। হিজায-ভূমি থেকে বিদায়ের পর প্রথম জুমা, তবু হিজাযের ঘ্রাণ অনুভূত হলো। শায়খ আলমুদার্‌রিস খোতবা দিলেন। অপূর্ব এক তন্ময়তার মাঝে খোতবা শেষ হলো। বলা যায়, এ খোতবা ছিলো ইরাকসফরের অন্যতম প্রাপ্তি। জিহ্বার ঝর্ন থেকে শব্দরা যেন কল্লোল তুলে নেমে আসছিলো এবং হৃদয়ের ভূমিতে আছড়ে পড়ছিলো। শ্রোতাকে বলে দিতে হয় না যে, তপ্ত হৃদয়ের উত্তাপ রয়েছে খোতবার প্রতিটি শব্দে। আমাদের গাইড মুহসিন যদি নাও বলতেন তবু তাঁর খোতবা থেকেই বুঝতে পারতাম, তিনি কতটা নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী। তাতারীদের হাতে

বাগদাদের বরবাদির কথা বলে তিনি যখন আহলে বাগদাদকে সতর্ক করলেন তখন মনে হলো দজলার পানিতে ভেজা কিতাবটির ইয়াদ তার দিলে আবার তাজা হয়েছে। আশ্চর্য এই যে, খোতবার মাঝে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন, দুই মুসলিম দেশের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কেউ লাভবান হবে না, না ইরান, না ইরাক। লাভ হবে শুধু আরব ও মুসলিম উম্মাহর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হিংস্র শকুনদের। হায় কোন দরদী বন্ধু যদি ধুয়ে দিতে পারতো রক্তমাখা হাতগুলো যাতে একহাত অন্য হাতকে আবার ধরতে পারে ভালোবেসে!

খতীব আলমুদার্‌রিস যখন শেষ শব্দগুলো বলছিলেন চোখের পানি তখন আর ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

সাদ্দামের 'বাদশাহীর সীমানায়' হকের আওয়ায বুলন্দ করার জন্য কত বড় দিলগুর্দা ও ঈমানী হিম্মতের প্রয়োজন তা শুধু তারাই বোঝবে যারা জানে, ক্ষমতার মসনদে সাদ্দাম কতটা নির্মম হতে পারেন।

জুমু'আর পর হযরত গাড়ীতে উঠতে যাবেন, তখন অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হলো। ইরাকে প্রচুর বাংলাদেশী কাজ করে। রাজধানী বাগদাদেও তাদের সংখ্যা কম নয়। অধিকাংশই শ্রমিক। চিকিৎসা, প্রকৌশল, হোটেলব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য পেশায় আছেন অল্প কিছু। শায়খ জীলানী এবং ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মাযার ও মাযারসংলগ্ন মসজিদ হলো শুক্রবারে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাধারণ মিলনকেন্দ্র। সপ্তাহের একটি দিন এ মিলনক্ষেত্রে এসে তাদের প্রবাসজীবনের দুঃখভার কিছুটা হলেও লাঘব হয়। দেশের খোঁজ-খবরেরও আদান-প্রদান হয়।

হঠাৎ আওয়ায উঠলো, হাফেজ্জী হুযূর! হাফেজ্জী হুযূর! দেখতে দেখতে বহু প্রবাসী হযরতের চারপাশে জমা হয়ে গেলো, আর শুরু হলো মুছাফাহার সুমধুর অত্যাচার! দেশের পরিবেশে এ দৃশ্য দেখেছি, কিন্তু বিদেশে সুদূর ইরাকেও দেখবো, ভাবিনি! বাংলাদেশের সহজ-সরল, ধর্মপ্রাণ মানুষের অন্তরে হযরতের প্রতি যে গভীর ভালোবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা, তা আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করলাম তেমনি করলো ইরাকের মুসলিম ভাইয়েরাও। আমাদের গাইড মুহসিন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, একজন সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে মাঝে মধ্যে ভাবি, আমাদের শায়খ, তোমাদের শায়খ এবং আরো যারা আছেন, কোন্ শক্তিবলে মানুষের হৃদয়রাজ্য এমনভাবে শাসন করেন! শাসকদের আনুগত্য হলো ভয়-ভীতির, এঁদের প্রতি আনুগত্য হলো আত্মনিবেদনের। শাসকদের অস্ত্র তো আমরা দেখতে পাই, এঁদের অস্ত্রটা কী!

আমি বললাম, 'তাসবীহ'! মুহসিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

আমি বললাম, যদি ব্যাখ্যা চাও তাহলে বলবো, দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে তাঁরা আল্লাহকে গ্রহণ করেছেন, মাখলূকের সন্তুষ্টিকে তুচ্ছ করে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিবেদিত হয়েছেন, আর আল্লাহ তাঁদেরকে হৃদয়জগতের রাজত্ব দান করেছেন। সবযুগে এটা হয়েছে, কেয়ামত পর্যন্ত এটাই হবে।

আরো বললাম, হাদীছে আছে, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মুহাব্বাত করেন তখন আসমানে ঘোষণা করেন, আসমান থেকে যমীনে ঘোষণা আসে, তখন আহলে যমীন তাকে মুহাব্বাত করতে থাকে।

মুহসিন খুব মনোযোগের সাথে শুনছিলেন; আমি বললাম, তোমাদের বাগদাদেরই ঘটনা! খলীফা হারুন রশীদ রাজপ্রাসাদের খাছ মহলে বিশ্রাম করছেন। এমন সময় শোরগোলের মত আওয়ায হলো। তিনি জানতে চাইলেন, শহরে গোলযোগ দেখা দেয়নি তো!

জানা গেলো, ঘটনা অন্য কিছু নয়, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক বাগদাদে প্রবেশ করেছেন। তিনি হাঁচি দিয়ে 'তাহমীদ' করেছেন, আর মানুষ ইয়ারহামুকাল্লাহ'র সিলসিলা শুরু করেছে। তারই শোরগোল ছিলো এটা। খলীফার দাসী তখন অবাক কণ্ঠে বলে উঠলো, বাগদাদের বাদশাহ তাহলে তো হারুন রশীদ নন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক!

***

অনেক কষ্টে জনতরঙ্গ পার হয়ে হযরত গাড়ীতে উঠলেন এবং গাড়ী হোটেল মেরিডিয়ানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো।

দেশের মাটিতে যা বারবার মনে হতো, আজ আবার মনে হলো, আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এমন বিশাল ব্যক্তিত্বের ছায়ায় থেকেও আমরা কিছু করতে পারছি না। এখন জীবন-সায়াহ্নে রাজনীতির অঙ্গনে তিনি তাওবার ডাক দিয়েছেন। সে ডাকের অভূতপূর্ব সাড়ায় তাদেরও চোখ খুলে গেছে যারা ক্ষমতার মোহে অন্ধ। এমনকি 'মুরুব্বী মহল'ও চমকে উঠেছে বাংলাদেশে আধ্যাত্মিক রাজনীতির উত্থান দেখে। কিন্তু আমি জানি, আমাদের ভিত্তি কত দুর্বল এবং যোগ্যতা কত ভঙ্গুর! তাই ঢেউ জেগেছে, ঢেউ মিলিয়ে যাবে, আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম, ঘুমিয়ে থাকবো। হে দুশমন, তোমাদের পেরেশান হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

আলিমসমাজকে ছদর ছাহেব (রহ) খিদমতে খালকের ডাক দিয়েছিলেন; আমরা কিছুই করিনি, করার চিন্তাও করিনি। ফলে 'জনসেবার মাঠ' এখন শত্রুর দখলে। আর জনসেবাই হলো জনতার হৃদয়রাজ্যের প্রবেশদ্বার। আসলে ছদর ছাহেবের মর্মবেদনা কেউ বুঝতে পারেনি।

এখন এই 'বটবৃক্ষে'র ছায়ায় এ অঙ্গনে কিছু করার সুযোগ ছিলো, যদি আমাদের কিছুমাত্র যোগ্যতা থাকতো! কিংবা থাকতো সামান্য অনুপ্রেরণা! ত্রিশবছর আগে ছদর ছাহেব লিখে গেছেন–

'ইসলামের প্রচার হয়েছে খিদমতে খালক ও মানবসেবা এবং আখলাক ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে। আজ আমরা খিদমত ছেড়ে দিয়েছি, উত্তম চরিত্র হারিয়ে ফেলেছি এবং পূর্বপুরুষদের ইতিহাস ভুলে গিয়েছি। মানুষ এখন খৃস্টানদের মতলবি মানবসেবা দেখে মুগ্ধ হয়। আমি খাছভাবে ওলামা ভাইদের বলছি, আপনারা খিদমত শিখেন, মানবসেবার অভ্যাস গড়েন এবং আখলাক ও চরিত্র উন্নত করেন। সেবা

এমনই জিনিস যে, বিধর্মীরাও তা দ্বারা, দুনিয়াতে উন্নতি পাবে। আলেমসমাজ যেদিন খিদমতে খালক ও মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ হবে সেদিন পৃথিবীতে মুসলিম জাতির উন্নতি ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।'

ছদর ছাহেবের কথা তখনকার মত এখনো সমান সত্য; কারণ তা চিরকালের সত্য। এবং এটাই আমাদের বুনিয়াদি কাজ। আর বুনিয়াদ থেকে শুরু না করলে ঢেউ জাগবে, ঢেউ মিলিয়ে যাবে, আমরা যেখানে আছি সেখানেই পড়ে থাকবো।

***

হোটেলে ফিরে কিছু খাবার ও কিছু বিশ্রাম গ্রহণের পর হযরত রওয়ানা হলেন ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রহ)-এর মাযার যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে। এলাকাটির নাম হলো আ'যামিয়া। সবুজ গাছের ছায়ায় ছায়ায় আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম। পায়ে হেঁটে নয়, গাড়ীতে করে; তবু গাছের ছায়ার কথা এজন্য যে, বাগদাদে সবুজ গাছের স্নিগ্ধ ছায়া গাড়ীর ভিতরে থেকেও অনুভব করা যায়।

আ'যামিয়া এখন বেশ জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, কিন্তু ইমাম ছাহেবের যামানায় তা ছিলো সুনসান এক কবরস্তান। বহু বিখ্যাত আলিম, ফকীহ, মুহাদ্দিছ ও বুযুর্গানে দ্বীন এখানে দাফন হয়েছেন। এখন তার নামচিহ্ন পর্যন্ত নেই। পুরো কবরস্তান গ্রাস করে ফেলেছে মানুষের বসতি। অবশিষ্ট আছে শুধু ইমাম আ'যমের মাযার। বিলুপ্ত কবরস্তানের কথা শুনে ব্যথিত চিত্তে মনে পড়লো দিল্লীর কবরস্তান সম্পর্কে মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহ)-এর সেই বিখ্যাত মন্তব্য–

'দিল্লীর কবরস্তান আজ হারিয়ে গেছে। কারণ জীবনের কাছে মৃত্যুর কোন মূল্য নেই এবং জীবিতদের প্রয়োজনের মোকাবেলায় মৃতদের প্রয়োজন অর্থহীন।'

তবে এটাও সত্য যে, প্রসারমান জনপদ যেমন গ্রাস করে ফেলে কবরভূমি, তেমনি সমৃদ্ধ জনপদ কখনো হয়ে পড়ে বিরানভূমি। কিন্তু দুনিয়ার খেলাঘরে মগ্ন মানুষ সব দেখেও চোখ বন্ধ করে রাখে। জীবনের মোহ এত প্রবল যে, জীবন্ত শিক্ষা থেকেও সে শিক্ষা গ্রহণ করে না, করতে পারে না।

আগে কবরস্তানের নাম ছিলো মাকবারায়ে খায়যুরান। কারণ খলীফা হারুন রশীদের 'মুক্ত দাসী' এবং আলমামুনের জননী খায়যুরান এখানে সমাধিস্থ হয়েছেন। পরবর্তীতে ইমাম আবু হানীফার মাযার থেকে তা আ'যামিয়া নাম গ্রহণ করে, যা এখনো বহাল রয়েছে। কারণ মৃত্যু ঘটে শুধু ব্যক্তির, ব্যক্তিত্ব থাকে অমর!

মাযারের পাশে রয়েছে জামিউল ইমাম আবী হানীফা নামে বিশাল মসজিদ। কে জানে কেমন ছিলো সে যুগের মসজিদ, তবে বর্তমান ভবনটি আধুনিক নির্মাণশৈলীর আশ্চর্য এক নিদর্শন। ইমাম ছাহেবের ইনতিকালের পর তাঁর নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রদের উদ্যোগে এ মসজিদের প্রতিষ্ঠা এবং একে কেন্দ্র করে শুরু হয় ইলমচর্চার নতুন সিলসিলা, যা অতি ক্ষীণ ধারায় এখনো অব্যাহত রয়েছে।

মসজিদের বর্তমান ইমাম, যিনি এই ক্ষীণ ধারাটি এখনো জীবন্ত রেখেছেন, তিনি 'তারীখু জামিইল ইমাম আবী হানীফা' নামে একটি সুন্দর কিতাব লিখেছেন এবং

তাতে এই মসজিদের এবং এখান থেকে উৎসারিত ইলমী ধারার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। কিতাবটি আমার সংগ্রহে ছিলো, হারিয়ে গেছে। কিতাব হারিয়ে যাওয়া আমার জীবনের বড় বেদনাদায়ক একটি অধ্যায়।

দামেস্কের প্রাচীনতম মসজিদ 'আলজামিউল উমাবি'-এর ইতিহাস লিখেছেন আল্লামা আলী তানতাবী। সেটি অবশ্য এখনো আমার সংগ্রহে রয়েছে।

সম্প্রতি 'তারীখুল মাসাজিদ' নামে একটি মূল্যবান কিতাব আমার সংগ্রহে এসেছে। তাতে মুসলিম জাহানের বড় বড় মসজিদ এবং সেখান থেকে উৎসারিত ইলমী ধারার ইতিহাস খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এখন সেই সব মসজিদ তো আছে, কিন্তু ইলমচর্চার ধারাগুলো শুকিয়ে গেছে। মিশরের জামে আযহার শুধু ব্যতিক্রম। যেমনই হোক, জামে আযহার এখনো একটি স্রোতধারারূপে প্রবহমান রয়েছে।

***

আছরের পর মসজিদ থেকে মাযারের মূল অংশে উপস্থিত হলাম। মাযারের উপর শানদার গম্বুজ ও ইমারত শরিয়তসম্মত কি না তা অবশ্যই চিন্তার বিষয়, তবে সান্ত্বনা এই যে, বিদ'আত এখানে অনেক কম। বহু লোকসমাগমের মাঝেও রয়েছে নৈশব্দের প্রশান্তি, যা যিয়ারাতকারীর হৃদয়কেও স্পর্শ করে।

যিয়ারাতের পর হযরত এখানেও মোরাকাবায় নিমগ্ন হলেন, আর আমি ইতিহাসের মহাসড়ক ধরে রওয়ানা হলাম দূর অতীতে।

কুফার বাজারে কে এই নূরানি মানুষটি? কেউ যেন বললো, ইনি ইমাম আবু হানীফা! আমি অবাক হয়ে ভাবি, ইলমের ইমাম তিজারাতেরও ইমাম! মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যেমন তাঁর কাছে আসছে তেমনি আসছে ব্যবসায়ের হালাল-হারাম জানার জন্য! কিছুক্ষণ পর বাজার ছেড়ে তিনি প্রবেশ করলেন কুফার মসজিদে! ইলমের পিপাসুরা জড়ো হলো তাঁর হালকায়। শুরু হলো ইলমের চর্চা, মাসেয়েলের ইজতিহাদ ও গবেষণা। ইমামের পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপূর্ব এক জ্যোতির্ময়তা! পুরো হালকা যেন নূরানিয়াতের এক জ্যোতির্বলয়! ভিতরে আমার লজ্জা ও কুণ্ঠা ছিলো, ভয় ও ভীতি ছিলো, কিন্তু হৃদয়ের গভীরে ছিলো আশ্চর্য এক ব্যাকুলতা! তাই কুণ্ঠিত পদক্ষেপে আমিও গিয়ে শামিল হলাম সবার পিছনে, নিজেকে আড়াল করে। আহ, কী সৌভাগ্য!

হঠাৎ যেন দৃশ্যের পরিবর্তন হলো! কুফার পরিবর্তে বাগদাদ দেখা গেলো। এই যে বাগদাদের যিন্দানখানা, মযলুম ইমাম যেখানে আজ বন্দী। তাঁর অপরাধ, খলিফার অনুরোধে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণে তিনি রাজি নন। কারণ তাঁর আশংকা, শরীয়তের আদেশ এবং খলীফার নির্দেশ কখনো মুখোমুখি হয়ে যেতে পারে। এমনকি চাবুকের কঠিন আঘাতও তাঁকে টলাতে পারেনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে। শেষে মযলূম ইমামকে বিষপ্রয়োগ করে শহীদ করা হলো। এমন কিছু হবে তিনি জানতেন, তবু

রাজরোশের ভয়ে রাজদাবীর কাছে তিনি মাথা নত করেননি। ইমামের মতই মাথা উঁচু রেখেছেন, নিজের এবং শরীয়াতের।

কোথায় আজ খলীফা আলমানছূর! কোথায় তার রাজপ্রাসাদ ও রাজকীয় প্রতাপ! তিনি নেই, ইমাম আছেন। আছে তাঁর জিহাদ ও মুজাহাদার এবং ইলমসাধনার মহা-বিস্ময়কর ইতিহাস।

***

শৈশবে একটি সুন্দর বই পড়েছিলাম, 'ছোটদের ইমাম আবু হানীফা'। তাতে তাঁর জীবনের সুন্দর সুন্দর অনেক ঘটনা ছিলো, যা এখনো আমাকে গভীরভাবে আপ্লুত করে।

ইরাকের কুফা শহরে তাঁর জন্ম, যা তখন ইলম ও ফিকাহর কেন্দ্র ছিলো। কারণ কুফা ছিলো হযরত আলী (রা)-এর খেলাফাতে রাশেদার রাজধানী। বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এখানেই ফিকাহচর্চার সিলসিলা জারি করেছিলেন।

প্রথম জীবনে ইমাম ছাহেব তিজারাত করতেন এবং অবসর সময়ে ইলমের হালকায় হাযির হতেন। পরবর্তীতে ইলমসাধনায় এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেন যে, তিনি ইমামরূপে বরিত হন। মুসলিম জাহানের প্রায় অর্ধেক জনপদ কোরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা এবং আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে তাঁকেই অনুসরণ করে। সেযুগে যেমন হানাফী ফিকাহ ছাড়া খেলাফত পরিচালনা করা কঠিন ছিলো, তেমনি এযুগে আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থাও হানাফী ফিকাহ ছাড়া কল্পনা করা সম্ভব নয়।

তিনি ছিলেন বিপুল সম্পদের অধিকারী, তবে তা ব্যয় হতো জ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন আহলে ইলমের খিদমতে। তাছাড়া অভাবী ও বিপদগ্রস্ত মানুষকেও তিনি অকাতরে দান করতেন।

তাঁর আমানতদারি ও সততা সে যুগেও ছিলো প্রবাদতুল্য। এঘটনা তো খুবই প্রসিদ্ধ যে, তাঁর অধীন ব্যক্তি ক্রেতাকে খুঁত সম্পর্কে অবহিত না করায় পুরো মূল্য তিনি ছাদাকা করে দিয়েছিলেন। কেননা তাঁর দৃষ্টিতে এটা ছিলো আমানতের খেয়ানত!

আরেকবার এক মহিলা তাঁকে অনুরোধ করে বললো, আমি বিধবা, তাই অনুগ্রহ করে এই শালটি আমার কাছে সামান্য মুনাফায় বিক্রি করুন। ইমাম ছাহেব বললেন, আচ্ছা, বিশ দিরহাম দিন।

শালটির বাজারমূল্য ছিলো দু'হাজার দিরহাম। তাই বিধবা ভাবলো, তার সঙ্গে কৌতুক করা হচ্ছে। তখন ইমাম ছাহেব বুঝিয়ে বললেন, ঘটনা এই যে, একজোড়া শাল ছিলো। একটি দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রি হওয়ার কারণে পুরো মূলধন উঠে গেছে। এখন বিশ দিরহাম মুনাফায় শালটি আপনাকে দিচ্ছি।

এখানে মাযার-প্রাঙ্গনে ক্রুদ্ধ ঝগড়ার একটি দৃশ্য চোখে পড়লো এবং লজ্জায় বিষয়. সেটা ছিলো প্রবাসী দুই বাংলাদেশীর মাঝে, যারা তাদের প্রিয় মাযহাবী ইমামের

যিয়ারাতে এসেছেন! আল্লাহর শোকর, আমি তাদের শান্ত করতে পেরেছিলাম এই কবরের বাসিন্দার যিন্দেগীর একটি ঘটনা বলে–

কূফার মসজিদে এক ব্যক্তি বললো, কঠিন থেকে কঠিন অসদাচরণের মুখেও ইমাম আবু হানীফাকে কেউ কখনো ক্রুদ্ধ হতে দেখেনি। একথা শুনে একজন বললো, আমি দেখতে চাই।

তখন ইমাম ছাহেবের দিন-রাতের কর্মসূচী ছিলো এরকম–

সারা রাত তিনি যিকির-ইবাদত ও ইলমচর্চায় মশগুল থাকতেন। ইশরাকের পর থেকে যোহর পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করে নিজের হালকায় দরস দিতেন। তারপর মানুষের বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান দিতেন। যোহর থেকে আছর পর্যন্ত বিশ্রাম নিতেন। দিন-রাতে ঐটুকুই ছিলো তাঁর ঘুম ও বিশ্রামের সময়।

একদিন ইমাম ছাহেবের মাত্র চোখ লেগে এসেছে, এমন সময় ঐ লোকটি দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করলো। ঘরে কেউ ছিলো না। তিনি উঠে এসে দরজা খুললেন এবং হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কী প্রয়োজন ভাই?

লোকটি বললো, একটি মাসআলা জানতে চাই।

ইমাম ছাহেব বললেন না যে, অসময়ে কেন? যখন মসজিদে ছিলাম তখন কোথায় ছিলে? বরং মুখের হাসি বজায় রেখে বললেন, বলো, কী মাসআলা?

লোকটি বোকার মত হাসি দিয়ে বললো, ভুলে গিয়েছি!

ইমাম ছাহেব অম্লান মুখে বললেন, আচ্ছা যখন মনে পড়বে, এসো।

দ্বিতীয় বার চোখ লেগে আসামাত্র লোকটি দরজায় হাযির! তৃতীয়বারেও যখন ইমাম ছাহেবের সহনশীলতা ক্ষুণ্ন হলো না, এমনকি মুখের হাসিটিও ম্লান হলো না তখন লোকটি তাঁর পায়ে পড়ে বললো, মাফ করুন, আসলে আমি আপনার ক্রোধ দেখতে চাচ্ছিলাম। আপনার সহনশীলতার সত্যি কোন তুলনা নেই।

সেদিন আমি আমার প্রিয়তম ইমামের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে ইলমের নূর যেমন চেয়েছিলাম তেমনি চেয়েছিলাম সহনশীলতার পাথেয়; যাতে অসংযত ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

হঠাৎ আমার অন্তরে একটি কথা উদিত হলো, আর আনন্দে ও প্রশান্তিতে হৃদয় আপ্লুত হলো।

কোথায় ইমাম আবু হানীফা, আর কোথায় বহু শতাব্দীর ব্যবধানে তাঁর এক অধম অনুসারী! কিন্তু মনের উপর তো কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং কীভাবে বাধা দেবো মনের কল্পনাকে! এই কবরের বাসিন্দার সঙ্গে আমি অত্যন্ত একাত্মতা অনুভব করলাম একথা কল্পনা করে যে, তিনি তো জীবনে বহু হজ্ব করেছেন, আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করেছেন, মুলতাযামে বুক লাগিয়ে চোখের পানি ফেলেছেন, মিনা-আরাফায় হাযির হয়েছেন; নবীর রাওযা শরীফ যিয়ারত করেছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করেছি, মুলতাযামে কেঁদেছি, মিনা-আরাফায় হাযির হয়েছি; আমিও

পেয়ারা হাবীবের রাওযায় দুরূদ ও সালামের নাযরানা পেশ করেছি! এর চেয়ে বড় একাত্মতা আর কী হতে পারে!

শুধু ইমাম আবু হানীফা কেন! জোনায়দ-জীলানী, মারূফ কারখী, সিররে ছিকতী, এবং এই বাগদাদের মাটিতে আরো যারা শুয়ে আছেন, তাঁরা সবাই তো ছিলেন বাইতুল্লাহর মুসাফির! দুনিয়াতে আল্লাহ যেমন এ অধম বান্দাকে তাঁর নূরানী বান্দদের কাতারে শামিল করেছেন, আশা তো করা যায়, কিয়ামতের ময়দানেও তিনি তাঁদের কাতারে শামিল করে নেবেন!

***

হযরতের মোরাকাবা শেষ হলো। আমরা মাযার থেকে বের হলাম। এখানেও ভক্তি-ভালোবাসার সেই একই দৃশ্য! একটু মুছাফাহার এবং একটু ছোঁয়া পাওয়ার কী অপূর্ব আকুতি! হযরত তাদের সঙ্গে হাসিমুখেই মুছাফাহা করলেন। ভক্তির শত অসংযমের মুখেও তাঁর নূরানী চেহারায় বিরক্তির প্রকাশ ছিলো না, সেদিন তিনি আজীবন মনে রাখার মত একটি কথা বলেছিলেন এবং আমি তা মনে রাখার চেষ্টা করছি। তিনি বলেছিলেন, বালবাচ্চার জন্য রিযিকের তালাশে যারা এত কষ্ট করে আল্লাহর কাছে তাদের মরতবা অনেক উঁচা। আমার দ্বারা তাদের দিলে যদি কিছুটা খুশি আসে, সেটা তো আমার খোশকিসমত!

আমরা বাংলাদেশের মানুষ বুযুর্গি তালাশ করি কারামাত ও অলৌকিকতার মাঝে। আমরা ভুলে যাই যে, ঈমান ও ইনসানিয়াত এবং আমল ও আখলাকিয়াত হলো বুযুর্গির আসল প্রকাশক্ষেত্র। এজন্যই আমাদের দেশ ধর্মীয় প্রতারণার এমন উর্বর ক্ষেত্র।

***

রাতে জানানো হলো, পরদিন সকালে মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হযরতের সাক্ষাৎ। যথাসময়ে সরকারী গাড়ী এলো। আমরা মন্ত্রণালয়ে গেলাম। মাননীয় মন্ত্রী, মনে হলো অমায়িক মানুষ। আমি সরকারী বা কূটনৈতিক শিষ্টাচারের কথা বলছি না। মানুষের বিভিন্ন পরিচয় থাকে, যা সে জীবনের বিভিন্ন স্তরে নানাভাবে অর্জন করে। কিন্তু সবার ভিতরে রয়েছে পরিচয়মুক্ত একটি মানুষ। কোন পরিচয় যদি সেই মানুষটিকে আড়াল করতে না পারে, সবকিছুর আড়াল থেকে যদি সেই মানুষটির দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয় তবেই বলবো, তিনি ভদ্র মানুষ। তো মাননীয় তথ্যমন্ত্রীকে এবং পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে আমার সেই রকম ভদ্রমানুষ মনে হয়েছে। লোকচরিত্রের এ মানদণ্ডটি যারা বোঝে না তারা ভালো-মন্দ ও মন্দ-ভালো চিনতে ভুল করে। এ সম্পর্কে আমার জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরা যায়, কিন্তু তাতে প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটার আশংকা রয়েছে।

মাননীয় তথ্যমন্ত্রী তাঁর কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে হযরতকে স্বাগত জানালেন। তাঁর অভিব্যক্তি বলছে, হযরতকে তিনি মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করছেন। আলোচনা শুরু হলো. একপর্যায়ে হযরত আবেগ-উদ্বেলিত কণ্ঠে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে সর্বনাশের এ যুদ্ধ

বন্ধ করুন। এটা যদি চলতে থাকে, ইরাক, ইরান কেউ বাঁচবে না। মুসলমানদের জানমাল শুধু বরবাদ হবে, আর দুশমন খুশী হবে।

হযরত বলছেন, আর চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরছে, এমনকি উদ্গাত কান্না রোধ করতে গিয়ে তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। মন্ত্রীমহোদয়ও বিচলিত হলেন। নিন্দা-সমর্থনের জোশ ও জযবার অনেক মহড়া হয়ত তিনি দেখেছেন, কিন্তু ইসলামী দরদ ও ভ্রাতৃমমতার এমন দৃশ্য সম্ভবত কখনো দেখেননি। রীতি ভঙ্গ করে তিনি উঠে গিয়ে হযরতের খুব কাছে বসলেন এবং তাঁর হাত ধরলেন।

তিনি বলতে চাইলেন, প্রথম হামলার জন্য ইরান দায়ী এবং শাতিল আরবের উপর ইরাকের অধিকার অনস্বীকার্য। এ সম্পর্কে ইরাকের কাছে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে, ইরাকের অভ্যন্তরে ইরানের উপর্যুপরি নাশকতামূলক তৎপরতার ফলে বাধ্য হয়েই বাগদাদ আত্মরক্ষার যুদ্ধে নেমেছে।

এরই মাঝে আমাদের বিভিন্ন চলমান চিত্র দেখানো হলো যে, কীভাবে বিভিন্ন ইরাকী জনপদ ধ্বংস করা হয়েছে এবং নিরপরাধ বেসামরিক লোকজনের প্রাণহানি ঘটেছে।

যুদ্ধরত উভয় পক্ষই এধরনের প্রচারণার ব্যবস্থা করে থাকে। এর দ্বারা সত্যমিথ্যা নির্ধারণ করা কঠিন। কারণ সবাই জানে, যুদ্ধের মাঠে সর্বপ্রথম যা নিহত হয় তা হলো সত্য। যার প্রচারণা যত শক্তিশালী তার দাবী তত আনুকূল্য ও সমর্থন লাভ করে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক স্বার্থের বিষয়টিও বড় অনুঘটকরূপে কাজ করে থাকে।

মন্ত্রীর বক্তব্য শেষে হযরত আমাকে বললেন, আর কিছু বলার জরুরত নাই, তুমি বলো, অবিলম্বে ছদরের সাথে মোলাকাতের ইনতিযাম যেন করা হয়।

হযরতের বক্তব্য তরজমা করতে গিয়ে আমি একথাও জানালাম যে, ইরানের আধ্যাত্মিক নেতা খোমেনি আমাদের হযরতকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন এবং যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দেখলাম, মন্ত্রী নড়ে চড়ে বসছেন। যখন বললাম, এমনকি তিনি হযরতের যুদ্ধবন্ধের আবেদনে সাড়াও দিয়েছেন, মন্ত্রী তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন এবং আলোচনার ফলাফল জানতে ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। হযরতের পক্ষ হতে বলা হলো, এ বিষয়ে তিনি সরাসরি প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলতে চান।

মাননীয় মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, যথাসম্ভব দ্রুত বৈঠকের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এভাবে বৈঠকের দিনক্ষণ অনিশ্চিত রেখেই আমাদের হোটেলে ফিরতে হলো। গাড়ীর দিকে হেঁটে আসার সময় হযরত আমার ডান হাত নিজের হাতে নিলেন এবং বুকের সঙ্গে ধরে রাখলেন। এভাবে গাড়ী পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। আমার তখনকার মনের অবস্থা কলমের ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। নিজের বুকে তখন কোন স্পন্দন যেন ছিলো না, শুধু তাঁর বুকের স্পন্দন 'পরিবাহিত' হয়েছিলো! তিনি বললেন, তুমনে বহুত আচ্ছা কিয়া, জাযা'কাল্লাহ।

আনন্দে বিহ্বল হয়ে আমি শুধু আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। আসলে শুরু থেকেই আমি তাঁর অন্তর্জালা অনুভব করছিলাম এবং সে অনুভবের আবেদনেই মাননীয় মন্ত্রীকে কথাগুলো বলেছিলাম। সবই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ।

***

হোটেলে ফেরার পথে সেদিন মহারহস্যপূর্ণ এক ঘটনা ঘটলো, যার অন্তর্নিহিত কোন ব্যাখ্যা আজো আমি বুঝতে পারিনি। হযরতকেও জিজ্ঞাসা করিনি। কারণ পর্দাবৃত রহস্যকে পর্দার আড়ালেই থাকতে দেয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। এটাও ভেবেছি, অসঙ্গত কৌতূহল তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে।

আমি হযরতের গাড়ীতে ছিলাম। সামনে চালকের পাশে আমাদের গাইড মুহসিন। গাড়ী চলছে স্বাভাবিক গতিতে। আমি দেখছি আধুনিক বাগদাদের নগরসৌন্দর্য ও স্থাপত্যসৌকর্য; সর্বোপরি সবুজ বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়া। এগুলো দেখছি চোখের দৃষ্টিতে, আর ভিতরে দগ্ধ হচ্ছি ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি চিন্তা করে। কে জানে এ যুদ্ধ কবে বন্ধ হবে, কিংবা আদৌ বন্ধ হবে কি না! আরো সত্য করে বলা যায়, বন্ধ হতে দেয়া হবে কি না!

ষাঁড়ের লড়াই দেখিনি, শুনেছি। সেটা কি ষাঁড়ের লড়াই, না মানুষের লড়াই! একটি ষাঁড়ের মৃত্যু ছাড়া সে লড়াই নাকি থামে না, নেপথ্যের মানুষরূপী পশুরা থামতে দেয় না। কারণ তাদের পাশবিক আনন্দ দরকার; দরকার জুয়াড়ীদের স্বার্থ উদ্ধার। একটি ষাঁড় যখন মারা যায়, আর অন্যটি আধমরা হয়ে পড়ে যায় তখন লড়াই থামে, আর নরপশুরা আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে। কিন্তু কে জবাব দেবে, এই খুনি লড়াইয়ে ষাঁড়দু'টির কী লাভ, শক্তিক্ষয়, রক্তক্ষয় ও প্রাণক্ষয় ছাড়া? তবু দুই পশু লড়াই করে, কারণ নরপশুরা এ লড়াই দেখতে চায়। পশুদের তো বুদ্ধি নেই! তাদের চলতে হয় নরপশুদের বুদ্ধিতে।

ইরাক-ইরান যুদ্ধও কি শেষ পর্যন্ত একটির ধ্বংস এবং একটির বিপর্যস্ততার মাধ্যমেই শেষ হবে? তখন মুসলিম বিশ্ব কি শুধু নরপশুদের উল্লাসধ্বনি শোনবে? খোমেনি এবং সাদ্দাম কেন বুঝতে পারছেন না, এ যুদ্ধে তারা কেউ জয়ী হবেন না! এ যুদ্ধের একমাত্র ভাগ্যলিপি উভয়েরই চরম পরাজয়! জয় যদি হয়, হবে শুধু পর্দার আড়ালে হাততালি দেয়া নরপশুদের!

আশ্চর্য! একজন পাগল ধর্মের নামে, আর একজন উন্মাদ 'আরববাদ'-এর নামে কী উন্মত্ত জিঘাংসায় মেতে উঠেছে!

হঠাৎ জোরে ব্রেক কষে গাড়ী থেমে গেলো। আমি চমকে উঠলাম, হাত বাড়িয়ে নিজেকে আঘাত থেকে রক্ষা করলাম, অবাক হয়ে দেখি, হযরত নিজের আসনে শান্ত স্থির। উজ্জ্বল দৃষ্টি তাঁর সামনে। সে দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, গাড়ীর একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আরবী জুব্বা ও শুভ্র দাড়ির শান্ত সৌম্য এক আলোকিত বৃদ্ধ! ঘটনার আকস্মিকতায় আমি নির্বাক! সামনের আসন থেকে মুহসিন বের হতে যাবেন,

তখন শুনলাম হযরতের শান্ত অবিচল কণ্ঠে এক শব্দের একটি আরবী বাক্য, 'লা তাখরুজ!'

আমার মনে হলো, তথ্যমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মুহসিন তো মুহসিন, স্বয়ং সাদ্দাম হোসাইনের সাধ্য ছিলো না এ আদেশ লঙ্ঘন করেন! হাঁ, এমনই কিছু ছিলো সে আদেশের কণ্ঠস্বরে!

মুহসিনের হাত সরে এলো দরজার হাতল থেকে। তিনি বের হলেন না, হযরত বের হলেন এবং নিজের হাতে দরজার হাতল ঘুরিয়ে। এতদিন জানতাম, কীভাবে গাড়ীর দরজা খুলতে হয়, তাঁর জানা নেই!

সময় ছিলো ঠিক দুপুর। রাস্তায় গাড়ী খুব একটা ছিলো না, পথচারী তো ছিলোই না। সাতাশ বছর পর সেই দুর্লভ দৃশ্য এখনো আমার সামনে একই রকম উজ্জ্বল। দুই 'ফিরেশতা' মাঝ রাস্তায় মুছাফাহা ও মু'আনাকা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে পাশের খেজুরবাগানের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সবুজ ঘাসের উপর বসলেন।

কতকটা অবচেতনভাবে দরজা খুলে বের হতে যাচ্ছিলাম, তখন কানে বেজে উঠলো সেই 'লা-তাখরুজ'! এবং ভাগ্য ভালো, মাদরাসার মাওলানাদের 'সাম্বাটি মেযাজ' তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেনি এবং মনে হয়নি যে, এ নিষেধের সম্বোধন আমার দিকে ছিলো না। আমি সরলভাবেই বুঝলাম, লা-তাখরুজ মানে, বের হয়ো না। এখানে নিষেধই মুখ্য, নিষেধের পাত্র নয়।

খুব সামান্য সময়। হযরত ফিরে এলেন, ধীরে ধীরে এবং একা একা! তিনি কোথায় গেলেন? দেখিনি। তিনি কে ছিলেন? জানি না। কী কথা হয়েছে দু'জনের? শুনিনি। ঘটনার রহস্য কী ছিলো? বুঝিনি। তবে কেন লিখলাম? জানি না! আমি কিচ্ছু জানি না!!

হযরত তাঁর আসনে বসলেন; গাড়ী চলতে শুরু করলো। আমার মনে হলো, চালকের হাত কাঁপছে! মুহসিনের অন্তর কিছু ভাবছে। হযরত যেমন ছিলেন তেমনি প্রশান্ত, তবে সেই প্রশান্ততায় যেন অন্য কিছুর হালকা একটি ছাপ ছিলো। ভিতরে যেন কোন আলোড়ন চলছে এবং প্রবল কোন ঝড় বইছে। কিছু একটা হয়েছে! কিছু একটা ঘটেছে!

দূর ও নিকট অতীতে আল্লাহর ওলীদের জীবনে এমন বহু ঘটনা আছে বলে কিতাবে পড়েছি। আমার সৌভাগ্য যে, কিতাবের পাতা থেকে আজ তা দেখতে পেলাম জীবনের পাতায় এবং জোনায়দ-জীলানীর বাগদাদের পথে!

অন্যরা আগেই হোটেলে ফিরে এসেছিলেন এবং মনে হলো কিছুটা চিন্তিত ছিলেন। নিজের কামরায় এসে হযরতের ভিতরের অস্থিরতা বাইরেও কিছুটা প্রকাশ পেলো। আমি শুধু অবাক বিস্ময়ে দেখলাম সেই অস্থির আচরণটুকু!

যোহরের নামায হলো এবং আশ্চর্য, পুরো সফরে এই একবার মাত্র তিনি নিজে নামায পড়ালেন। আরো আশ্চর্য, শায়খ জীলানীর মসজিদে জুমুআর জামাতে শরিক না হওয়া মুহসিন, আজ যোহরের জামাতে শামিল হলেন! নামাযের পর বিদায় নিতেও বেশ

বিলম্ব করলেন। যতক্ষণ ছিলেন নীরব দৃষ্টিতে শুধু হযরতকে দেখলেন। সে দৃষ্টিতে আচ্ছন্নতা ছিলো, তন্ময়তা ছিলো এবং আত্মনিবেদন ছিলো। আমার বিশ্বাস, মুহসিনকে তার মা এখন দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন, তার বেটা এখন অন্য এক আলোকিত মুহসিন! তিনি তো জীলানী ও জোনায়দ বোগদাদীর ইরাকের আরব নারী! তার হৃদয় ও আত্মা অবশ্যই শান্তি লাভ করবে পুত্রের এই নবজন্মে! হয়ত মুহসিন নিজেই একদিন তার মাকে বলবেন, মা, এক যিন্দা জীলানী এসেছিলেন বাগদাদে। তোমার সন্তান তাঁর আলোক-স্পর্শ লাভ করেছে মা! তাই অন্তর্দৃষ্টিতে এখন আমি দেখতে পাই, যা আগে দেখতে পাইনি!

মায়ের কথা কেন ভাবলাম! শুক্রবারে মুহসিনকে নামাযের কথা বলেছিলাম। তিনি কুণ্ঠিত হেসে বলেছিলেন। মা তাকে নামাযের কথা বলেন, আর চোখের পানি ফেলেন। তার বাবা গ্রামের স্বনিযুক্ত ইমাম ও মুআয্যিন। পাঁচ-সাতজন বুড়ো ও বয়স্ক মানুষ নিয়ে জামাত করেন।

মুহসিনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইরাকের যুবসমাজ কি নামায পড়েই না! তার জবাব ছিলো, পড়ে, শয়ে দশ পনেরো; মসজিদে যায় আরো কম।

মাত্র একদিন আগে হাসতে হাসতে তিনি বলেছিলেন, আমিও নামায পড়বো চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে, বুড়ো হয়ে।

আজ তিনি অদৃশ্য কোন শক্তির আকর্ষণে নিজেই এসে দাঁড়ালেন হযরতের পিছনে নামাযের কাতারে।

মুহসিন আরো বলেছিলেন, নামায পড়ি না, তবে মায়ের মুছল্লা বিছিয়ে দেই।

তাহলে কি এটাই সত্য, মায়ের মুছল্লা বিছানোর খিদমতই আজ তাকে টেনে এনেছে নামাযের মুছল্লায়! জানি না, গায়বের পর্দায় কখন কী ঘটে, কেন ঘটে, মানুষ জানতে পারে না। মানুষ পারে শুধু বিশ্বাস করতে এবং অবিশ্বাস করতে!

ইচ্ছে হলো, হাসতে হাসতে বলি, এই দেখো মুহসিন, একদিনেই তুমি কেমন বুড়ো হয়ে গেছো! বললাম না, কারণ মনে হলো, এমন সময় এমন কথা বলা হয় না।

***

দুপুরের খাবার গ্রহণের জন্য সবাই জনাব আখতার ফারূক ও খান ছাহেবের কামরায় গেলেন। হযরতের দস্তরখান হতো তাঁর কামরায়। মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেব দস্তরখানের খেদমত করতেন।

নাস্তাটা হতো নিজ নিজ কামরায়। মেনুকার্ডে পছন্দ মত টিকচিহ্ন দিয়ে রাখতাম। ব্যস, সকালে যার যার মনপসন্দ নাস্তা হাযির! আমি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নতুন নতুন টিকচিহ্ন দিতাম। মাঝে মাঝে উপস্থিত হতো নাম না জানা কোন 'পদার্থ'। কোনটা বেশ স্বাদের; নাম না জানা স্বাদ! কোনটা আবার বেজায় বিস্বাদ। একদিন হাযির দুই কুসুমের এক ডিম! আমি তো অবাক! জীলানীর বাগদাদের কারামত না তো! কিন্তু না, হোটেলের বাংলাদেশী পাচকের সূত্রে জানা গেলো, এটা রন্ধনশিল্পের কারসাজি।

দুপুর ও রাতের খাবার খেতাম একসঙ্গে জনাব আখতার ফারূক ও খান ছাহেবের কামরায়। আরবের খানা ভালোই লাগছিলো; সবসময় ভালো লাগে। কিন্তু সবার আবদারে মেযবান আমাদের জন্য আদি ও অকৃত্রিম বাংলাদেশী খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেক দিন পর শাকসব্জী, ডাল-ভাত ও পাবদা-কাচকির চেহারা দেখে সবার চেহারায় খুশির কী ঝিলিক! সেদিন সত্যি করে বুঝেছিলাম, চেটেপুটে খাওয়া বাঙ্গালীর শাকে মাছে ও ডালে ভাতে যে তৃপ্তি তা অন্যকিছুতে নয়। বিদেশীদের যদি বোঝানো যেতো, সরকারী মেহমান হোক আর যাই হোক বাঙ্গালীকে শাক-মাছ, আর ডাল-ভাত দিয়ো, দিলের দোয়া পাবে! আর যদি আখতার ফারূক থাকেন, বাবা জর্দার একখিলি পান দিয়ো, চিরকাল তোমাকে মনে রাখবে!

হোটেলের পরিবেশগত কারণে ডাইনিং হলে গিয়ে খাওয়া আমাদের জন্য ছিলো অস্বস্তিকর, আর চেয়ার টেবিল তো ছিলো বিরক্তিকর। তার চেয়ে নানা রকম খোশগল্প -সহযোগে একসঙ্গের খাওয়াদাওয়া বেশ আনন্দের। দস্তরখানের সময়টুকুর জন্য বয়স ও মর্যাদার পার্থক্য মুলতবী রাখা হতো। হাস্যরসের এমন সব গল্প হতো যে, হাসতে হাসতে...

ঐ দস্তরখান থেকেই আমি পূর্ণরূপে বুঝেছিলাম, হযরতের জন্য আমরা কতটা আজনবী ছিলাম। দিনে অন্তত দু'বার আমরা যেন ভুলে যেতাম, মুসলিম উম্মাহর এক ভয়াবহ যুদ্ধের আগুন নেভাতে আমরা এসেছি এবং যে কোন সময় আমরা মুখোমুখি হবো এমন এক লৌহকঠিন ব্যক্তির, যুদ্ধের খেলা যার পছন্দ, যিনি অতি সাহসী, কিন্তু পরিণতি সম্পর্কে চূড়ান্ত নির্লিপ্ত।

দস্তরখানের হাসির গল্পগুলো থাক; হযরত মাওলানা আযীযুল হক ছাহেব তাঁর জোয়ানকালের হজ্বসফরের যে ঘটনাটি শুনিয়েছিলেন সেটি অন্তত বলি। যদিও তা 'কাঁচা মরিচের ঘটনা' তবে শিক্ষণীয় ঘটনা।

হোটেল মেরিডিয়ানে আমরা সব পেয়েছিলাম, পাইনি শুধু কাঁচামরিচ। আর তাতেই সবাই যেন শোকে কাতর! কাঁচা মরিচের বিরহ থেকেই তাঁর মনে পড়েছিলো হজ্বের কাঁচা মরিচের ঘটনা।

এখন যেমন 'পাটশাক থেকে কাঁচা মরিচ' যা কিছু বাংলাদেশে পাওয়া যায় এবং যা কিছু না পাওয়া যায় তা সবই মক্কা-মদীনায় পাওয়া যায় তখন অবস্থা এমন ছিলো না। তো সেবার তিনি কাঁচা মরিচের ভীষণ কষ্টে পড়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে অসম্ভব কী, ভেবে একদিন তিনি আল্লাহর কাছে কাঁচা মরিচ চেয়েই বসলেন! এবং আশ্চর্য! হারাম শরীফের একেবারে দরজায় কাঁচা মরিচ পেয়ে গেলেন!

তিনি বলেন, আসলে সেটা ছিলো দু'আ কবুলিয়াতের সময়! আমি তখন আফসোস করলাম যে, চাইলাম তো চাইলাম কাঁচা মরিচ! জান্নাত চাইতে পারলাম না!

কিছুক্ষণের জন্য কলমের নিয়ন্ত্রণ মনে হয় শিথিল হয়ে পড়েছিলো। যাক, ফিরে আসি মূল কথায়। সবাই চলে যাওয়ার পরো হযরত নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিলেন জায়নামাযে।

নিশ্চুপ, তবে নিশ্চিন্ত নয়। অনেক্ষণ পর তিনি মাথা তুলে বললেন, 'মৌলভী আবু তাহের, আমি তো কোন ছূরত দেখতে পাইতেছি না!'

কত ব্যথা ও বেদনা এবং কত কাতরতা ও অস্থিরতা নিয়ে তিনি কথাটি বলেছেন তা বোঝার যোগ্যতা আমার ছিলো না! তবে আমিও আমার মত করে ব্যথিত হলাম এবং অসহায় বোধ করলাম। আমার মনে হলো 'আগামী দিন' সম্পর্কে তিনি কোন ইশারা পেয়েছেন!

মানুষের ভিড়ে একজন বড় মানুষ যে কত একা ও নিঃসঙ্গ এবং কত অসহায় ও নিরুপায় হতে পারেন তা এ ক্ষুদ্র জীবনে দু'একবার আমি অনুভব করেছি। হযরতকে সান্ত্বনার কথা বলার ভাষা আমার জানা ছিলো না। তাই আমি নীরব থাকলাম।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের সাথে বৈঠকের আগ পর্যন্ত একই রকম অস্থিরতায় কেটেছে তাঁর দিনরাত; যে অস্থিরতা বাইরে দেখা যায় না, কিন্তু ভিতরকে দগ্ধ করে। আমার ধারণা, এ অস্থিরতা কেউ বুঝতে পারেননি মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিছবাহ ছাড়া। এজন্য তিনিও খুব চিন্তিত ছিলেন।

আমি ভাবতাম, আমাদের অস্থিরতা নেই কেন? আমরা না যুদ্ধের আগুন নেভাতে এসেছি! সে আগুন কেমন দাউ দাউ করে জ্বলছে তা তো অন্তত পত্রিকার পাতায় দেখতে পাই! আসলে হযরত হলেন 'কা-জাসাদিন ওয়াহিদিন'-এর মারীয, তাই তাঁর এত অস্থিরতা! আর আমরা ...।

মাওলানা হামীদুল্লাহ ছাহেব জানালেন দস্তরখান তৈয়ার। হযরত আবার মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে খাও।

আমার মনে হলো, হযরত বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে জান্নাতে চলো! আনন্দের আতিশয্যে শব্দ করেই বলে উঠলাম, আলহামদু লিল্লাহ!

হযরত নিজের হাতে একটি লোকমা আমার মুখে তুলে দিলেন। মনে হলো, এটা খাবারের লোকমা নয়, অন্যকিছু! শুধু খাবারের লোকমায় কি এত স্বাদ থাকে এবং এত বছর পর তা মনে থাকে!

***

পরদিন তথ্যমন্ত্রণালয় থেকে কর্মসূচী দেয়া হলো মাদায়েন পরিদর্শনের। হযরত অস্থির হয়ে বললেন, তাহলে কি ছদরের সাথে মুলাকাত হবে না? আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আশা করি, দু'একদিনের মধ্যেই হবে।

হযরত শুধু বললেন, আচ্ছা, দেখা যাক।

মাদায়েনে ঐতিহাসিক স্থান হলো 'কাখে কিসরা' এবং রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় ছাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা) এবং আরো দু'জন ছাহাবীর মাযার। এছাড়া মাদায়েনের মাটিতে আছে নাম না জানা বহু ছাহাবী ও মুজাহিদীনের কবর। কারণ কাদেসিয়ার যুদ্ধ তো ছিলো শুধু রক্তের স্রোত! মাদায়েনে, ইরাকে, ইরানে, ইস্পাহানে এবং মুসলিম জাহানের সবখানে রক্তের স্রোত পার হয়েই তো আমরা পৌঁছেছিলাম।

এখন মাদায়েন খুব ছোট শহর, কিন্তু দূর অতীতে ছিলো পারস্যের রাজধানী। পারস্য-সম্রাট কিসরা এখানেই বাস করতেন। পারস্যের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষই এখন 'কাখে কিসরা'।

মাদায়েনের আবহাওয়া, পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থান ছিলো খুবই উপযোগী। দজলানদী তখন শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিলো। দজলার পূর্ব-পশ্চিম উভয় তীরে শহরের জনপদ ছিলো, তবে শুধু পূর্ব-অংশকে মাদায়েন বলা হতো; অর্থাৎ শহরের মূল জনপদ ছিলো পূর্বতীরে। এখন অবশ্য নদী শহর থেকে বেশ দূরে।

মাদায়েন ছিলো এত সুরক্ষিত যে, এর দুর্গকে মনে করা হতো অপরাজেয়। কেননা দুর্গের নিকট দিয়ে প্রবাহিত দজলা ছিলো একটি অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক পরিখা। তাই কাদেসিয়ার চূড়ান্ত যুদ্ধে পরাজিত পারসিকরা মাদায়েনে আশ্রয় নেয়ার পর কল্পনাও করেনি যে, মুসলিম বাহিনী দজলা পার হয়ে দুর্গে চড়াও হতে পারে! কিন্তু আল্লাহর গায়বী মদদ যাদের সঙ্গী, প্রকৃতির কোন বাঁধা কি পারে তাদের গতি রোধ করতে! পাহাড়, নদী, মরুভূমি!

ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে মাদায়েনজয়ের অবিশ্বাস্য ঘটনা। মুসলিম বাহিনী যখন দজলার তীরে এসে দাঁড়ালো, দজলা তখন সমুদ্রের মত উত্তাল। কিন্তু মুসলিম সিপাহসালারের ঈমানী জোশে ভরপুর বয়ান মুজাহিদীনের দিলের দজলাতেও পয়দা করলো বিরাট মউজ! ঘোড়ার পিঠে বসে আল্লাহু আকবার বলে তারা ঝাঁপ দিলো দজলার পানিতে! মউজের সাথে খেলা করে ছেলেখেলার মতই তারা পার হয়ে গেলো দজলানদী! অপর তীরে দাঁড়িয়ে এ অভাবনীয় দৃশ্য দেখে পারসিক বাহিনী উদ্ভ্রান্তের মত পালাতে লাগলো। তাদের ধারণা হলো, এরা মানুষ নয়, দেওদানো! আল্লাহর নবীর ছাহাবাদের হাতে সেই যে মাদায়েনের পতন হলো, আজো মাদায়েন মুসলিম ভূখণ্ডরূপে মুসলিম উম্মাহর হাতে রয়েছে। পার্থক্য শুধু এই, মুসলিম ভূখণ্ড রয়ে গেছে, সেই মুসলিম বাহিনী আর নেই। তাই সেদিন তারা ভয় করতো, আজ আমরা ভয় করি! সেদিন আমরা মেরেছি, আজ নিজেরা মারামারি করে মরছি!

সকালে নাস্তার পর আমরা হোটেল থেকে রওয়ানা হলাম। বাগদাদের রাস্তা মানেই সবুজ গাছের ছায়া! ছায়ায় ছায়ায় চলে যাওয়া যায় যত দূর মন চায়!

পঞ্চাশ কিলোমিটার দীর্ঘ বাগদাদ-মাদায়েন সড়কের উভয় পার্শ্বে শুধু খেজুরবাগান, আর খেজুরবাগান। ইরাক খেজুরের দেশ জানতাম; এখানে এসে জানলাম, মানুষের জনসংখ্যার চেয়ে খেজুরের 'জনসংখ্যা' দ্বিগুণেরও বেশী!

দু'পাশের খেজুরবাগানের শোভা দেখে দেখেই পথ ফুরিয়ে গেলো। মাদায়েন ইরানের সীমান্তবর্তী এলাকা। কিন্তু সেখানে যুদ্ধের কোন চিহ্ন ছিলো না কিছু সৈন্যের চলাচল এবং দু'একটি সেনা চৌকি ছাড়া।

মূল শহরের আগেই মাদায়েনের হালকা জনবসতি শুরু হলো এবং অল্প পরেই আমরা শহরে প্রবেশ করলাম। প্রথমেই দেখা যায় সালমানপাক, অর্থাৎ হযরত সালমান

ফারসী (রা)-এর মাযার ও মসজিদ। কিন্তু এখানে না থেমে গাড়ী এগিয়ে গেলো শহরের অন্য প্রান্তে, কিসরার রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ যেখানে।

ইতিহাস বলে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবকালে এ রাজপ্রাসাদের চৌদ্দটি মিনার ধ্বসে পড়েছিলো। কিছুই এখন নেই, ধ্বংসস্তূপ ছাড়া। শুধু একটি সুউচ্চ প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী এবং শিক্ষার উপকরণ হয়ে। সে যুগে এত উঁচু প্রাচীর তৈরী হয়েছে, ভাবতে অবাক লাগে! প্রাচীর-গাত্রের ফাটল সম্পর্কে বলা হয়, সেটা গম্বুজ ধ্বসে পড়ার সময়ের সৃষ্টি। বিভিন্ন সময় বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ফাটল সংস্কারের চেষ্ট করা হলেও তা নাকি ব্যর্থ হয়েছে। এই ভগ্ন- প্রাচীরের সামনে কিছুক্ষণের জন্য আমি স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। এটা যেন চৌদ্দশ বছরের ঝড়ঝাপটা সহ্য করে এখনো দাঁড়িয়ে আছে শুধু আমারই শিক্ষার জন্য। এ প্রাচীর যেন নীরব ভাষায় বলছে, হকের মোকাবেলায় এভাবেই গুঁড়িয়ে যায় বাতিলের মজবূত কেল্লা। কোরআনের বাণী–

جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

'আপনি বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবেই।'

ভগ্নপ্রাচীর যেন বলছে, 'যদি বুঝতে চাও, আমাকে দেখো। আমার ভগ্ন ইটগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।'

প্রাসাদের এ প্রাচীরটিও হয়ত গুঁড়িয়ে যেতো, কিন্তু আল্লাহ তাঁর কুদরতের নিদর্শনরূপে এখনো তা বাকি রেখেছেন। যত দিন আল্লাহর ইচ্ছা, তা বাকি থাকবে পরবর্তীদের শিক্ষার জন্য। ফির'আউন সম্পর্কে যেমন আল্লাহ বলেছেন–

اَلْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

'আজ তোমাকে নাজাত দেবো, তোমার দেহযোগে, যাতে তুমি হতে পারো তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন।'

আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি, কিন্তু আমাদের হযরতের যেন এখানে দেখার কিছু নেই। হয়ত তাঁর দেখার বিষয় আরো উর্ধ্বের কিছু এবং তাঁর শিক্ষা গ্রহণের বিষয় অন্য-কিছু! তাই কিছুক্ষণ হেঁটে, কিছু কিছু দেখে তিনি একপাশে মুছল্লা বিছিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন নামাযে। এসব ধ্বংসাবশেষ যার কুদরতের নিদর্শন তাঁর সমীপে আত্মনিবেদন করাই তো তাঁর প্রিয় বান্দাদের শান! হযরত নামায পড়লেন, আমরা ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। প্রাচীর-সংলগ্ন কিছু কক্ষ এখনো অক্ষত রয়েছে, আর মাঝখানে রয়েছে সুউচ্চ তোরণ; সম্ভবত প্রাসাদের প্রধান তোরণ। সেটা অতিক্রম করে সামান্য এগুলেই একটি সুপ্রশস্ত কক্ষের কিছু চিহ্ন। সম্ভবত কিসরার দরবার কক্ষ। ভগ্নাবশেষের যে প্রতাপ তাতে সহজেই বোঝা যায়, যৌবনে কেমন ছিলো রাজপ্রাসাদ ও তার সম্রাটদের প্রতাপ-পরাক্রম!

কে জানে, এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইটপাথরের মাঝে লুকিয়ে আছে মানুষের ভাগ্যের ভাঙ্গা-গড়ার কত করুণ ইতিহাস! ধ্বংসাবশেষের ইটপাথর যদি কথা বলতে

পারতো, তাহলে জানা যেতো ইতিহাসের কত অজানা কাহিনী! শোনা যেতো কত অট্টহাসি, কত আর্তনাদ! শোনা যেতো কখনো নুপুরের ঝংকার, কখনো জল্লাদের হুঙ্কার!

প্রবেশদ্বারের ঝুলন্ত পর্দায় স্বর্ণের কারুকাজের পরিমাণই নাকি ছিলো দশলাখ ভরি! তাহলে রাজপ্রাসাদে সম্পদের পরিমাণ ছিলো কত? এই যে বিশাল ভগ্নপ্রাচীর, এটা যেন ইতিহাসের চলমান স্ক্রীন, যাতে একের পর এক ভেসে উঠছে ঘটনার জীবন্ত ছবি। আমি যেন দেখতে পেলাম সেই নরাধম সম্রাটকে, ক্রোধান্ধ হয়ে ছিঁড়ে ফেলছে দরবারে নবুয়তের প্রেরিত পত্র। বস্তুত সেদিনই হয়ে গিয়েছিলো বিশাল বিস্তৃত পারস্য -সাম্রাজ্যের ভাগ্যের ফায়ছালা। কেননা আল্লাহর নবী এই বলে তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন–

مَزَّقَ اللّٰهُ مُلْكَه

'আমার পত্র সে ছিঁড়ে ফেলেছে! আল্লাহ যেন তার রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন।

আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, অহঙ্কারী সম্রাটের উদ্ধত মস্তক থেকে লুটিয়ে পড়া রাজমুকুট গড়াগড়ি খাচ্ছে মুসলিম সেনাপতির পদপ্রান্তে!

আবার দেখি, পারস্যের সেনাপতি মহাবীর রুস্তমের সুসজ্জিত দরবারে প্রবেশ করছেন মুসলিম দূত ছাহাবী হযরত রাবঈ ইবনে আমির (রা)! ঠিক সেই জীর্ণ পোশাক, শীর্ণ বাহন ও সাধারণ ঢাল-তলোয়ার, যা পড়েছি ইতিহাসের পাতায়! ঘোড়ার পিঠে চড়েই তিনি এলেন ভরা দরবারে! ঘোড়া থেকে নামলেন এবং ঘোড়াসহ মূল্যবান গালিচা মাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। একটি তাকিয়ার সাথে ঘোড়া বাঁধলেন ...।

ঐ তো বজ্রদৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বলছেন, আমি নিজে আসিনি, এসেছি তোমাদের ডাকে। আমার পোশাক, আমার পদক্ষেপ তোমাদের পছন্দ হয় তো ভালো, নচেৎ আমি ফিরে যাই।

সেনাপতি রুস্তম কিছুটা ক্রোধের ভান করে ভীত কম্পিত কণ্ঠে বললেন, কী জন্য এসেছো তোমরা?

হযরত রাবঈ বিন আমিরের ঠোঁটে যেন নূরের হাসি! তিনি বললেন, 'আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন যেন তোমাদের বের করে আনি মানবের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে এবং জাগতিক সংকীর্ণতা থেকে পরকালীন প্রশস্ততার দিকে এবং সকল ধর্মের অনাচার থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে।'

এভাবে ভগ্নপ্রাচীরের ধূসর স্ক্রীনে ইতিহাসের নানা চিত্র ভেসে উঠছে, আর আমি দেখে চলেছি; হঠাৎ থেমে গেলো সবকিছু! এখন ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান উড়ছে! ট্যাংক-কামানের গোলার আওয়ায আসছে! কেন, কার বিরুদ্ধে! দাউ দাউ আগুন জ্বলছে এ কোন্ শহর! অপরিসীম বেদনায় মনটা আমার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

***

এখানে সরকারী খেজুরবাগান ছিলো। গাছে গাছে বড় বড় পাকা খেজুর ঝুলছে। তাতে অতি বড় নির্লোভেরও জিভে পানি আসে! মাটিতেও পড়ে আছে অনেক। এভাবেই পড়ে থাকে। কুড়িয়ে নেয়ার কেউ নেই। আমি এবং মাওলানা মেছবাহ কিছু দ্বিধা-সংকোচের পর একটা দু'টো খেজুর মুখে দিলাম। অপূর্ব! সত্যি অপূর্ব এর স্বাদ ও গন্ধ! মুহসিন এমন অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন যে, দেশে ফেরার সময় আমাদের তিনি এক ছড়া করে খেজুর উপহার দিয়েছিলেন। ঢাকা বিমানবন্দরের ভদ্রলোক প্রথমে আইনের কী একটা ফ্যাকড়া তুললেন, তারপর বড় পীরের 'বরকত' বলে অর্ধেকটা রেখে বাকি অর্ধেকটা দয়া করে ছেড়ে দিলেন। আমিও অনেক কষ্টে কৃতার্থের হাসি হাসলাম। আমাদের দেশে আইন যেমন অদ্ভুত তেমনি অদ্ভুত সে আইনের প্রয়োগ! অদ্ভুত হবে না কেন! ভৌগোলিক জাতীয়তার বর্তমান পৃথিবীতে আমরাই যে একমাত্র জাতি, যাদের পরিচয়সত্তা এখনো অনির্ধারিত। তাই অর্ধেক ভোটার বাঙ্গালী, অর্ধেক বাংলাদেশী। সত্যি অদ্ভুত! এদেশের সবকিছু বড় অদ্ভুত! নেতা, জনতা, নদী-নারী, মৃত্তিকা, বৃক্ষলতা! চাকুরিজীবী এবং বুদ্ধিজীবী!

যাক, ফিরে যাই মাদায়েনের সরকারী খেজুরবাগানে। একটা দু'টো খেজুর খেয়ে ভিতরের সেই চিরবাঙ্গালীটা বোধ হয় জেগে উঠলো; ভাবলাম, কয়েকটা পকেটে পুরি; হোটেলে বসে খাবো। হাবীবুল্লাহ মেছবাহ বাঁধা দিলেন; তাও একেবারে বনী ইসরাইলের মান্না-সালওয়ার হাওয়ালা দিয়ে। আমি শরমিন্দা হয়ে সে ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। হজ্বের সফরটুকুই ছিলো হাবীবুল্লাহ মেছবাহ ছাহেবের সঙ্গে আমার সঙ্গ। সফরের আগে বা পরে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো, দেখা ছিলো, সঙ্গ ছিলো না। জীবনের ব্যস্ততার স্রোতে আমরা এমনই ভেসে যাই যে, মন চায়, তবু প্রিয় মানুষদের সঙ্গ আর লাভ করা হয় না। তিনি আজ জীবনের অন্য পারে। এমনকি তাঁর জানাযারও সঙ্গ আমি গ্রহণ করতে পারিনি। তবে সফরের ঐ পবিত্র সময়ের সঙ্গটুকু এখনো মনে রেখেছি। আল্লাহ তো সত্যবাদীদের সঙ্গ গ্রহণ করতে বলেছেন। আমার অভিজ্ঞতায় তিনি ছিলেন তেমনই একজন সত্যবাদী। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নছীব করুন।

খেজুরবাগানে হযরত নামাযের স্বাদ গ্রহণ করছেন, আমরা গ্রহণ করছি খেজুরের স্বাদ। এদিকে আখতার ফারূক ছাহেব করে বসলেন আরেক কাণ্ড! খেজুরকাণ্ড বেয়ে তর তর করে উঠে গেলেন উপরে। শুধু খেজুর উদ্দেশ্য হলে প্রয়োজন ছিলো না। গাছের গোড়ায় মাটিতেই পড়ে ছিলো দেদার। ইরানসীমান্ত অবশ্য খুব কাছে। ভাবতে পারতাম, প্রিয় ইরানকে আরেকবার দেখতে চান, কিন্তু ঐটুকু উচ্চতা থেকে তো ইরানের মাটি দেখা যাওয়ার কথা নয়! তাহলে কেন গাছ বাওয়া! তিনি কি ভুলে গিয়েছিলেন যে, ইরাক-ইরান যুদ্ধবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ মিশনের তিনি সদস্য! অনেক সময় আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই। যেমন খেজুর পকেটে পোরার সময় আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। অনেক সময় অকারণেই আমরা শৈশবে ফিরে যেতে চাই। তখন সেটা হয়ে পড়ে দৃষ্টিকটু। কারণ শৈশবের যে পবিত্র সত্তা সেটা তো আমরা বলি দিয়ে ফেলি

অনেক আগেই যৌবনের বেদিতে, থেকে যায় শুধু শৈশবের খোলসটুকু। আর এত বড় মানুষ কি ঐ ছোট্ট খোলসে ফিরে যেতে পারে!

আমার পাশে দাঁড়িয়ে মুহসিন দৃশ্যটি দেখে মিটিমিটি হাসছিলেন। সে হাসির তরজমাটি আমার কাছে মনে হলো এরকম, 'দেখা হলো তোমাদেরকে এবং তোমাদের শায়খকে'। মুখে শুধু বললেন, বাগদাদভ্রমণ তোমরা উপভোগ করছো দেখে ভালো লাগছে।

আমার খটকা লাগলো। মুহসিনের ভাবনায় আমাদের ইরাকসফর কি তাহলে নিছক 'ভ্রমণ'! এবং সে ভ্রমণ আমরা উপভোগ করছি! মুহূর্তের আচরণ অনেক সময় দীর্ঘদিনের 'ভাবচিত্র' মুছে ফেলে।

আমাদের ঘুরে বেড়ানো, কাখে কিসরা দেখা, খেজুর খাওয়া এবং হযরতের জায়নামাযের স্বাদগ্রহণ করা সমাপ্ত হলো। গাড়ীতে করে ফিরে আমরা এলাম শহরের প্রবেশ পথের কাছে সালমানপাকে।

বোঝাই যায়, ফারসী নাম। আব্বাসী আমলে পারস্যবংশোদ্ভূতদের প্রাধান্য ছিলো, সম্ভবত তখন থেকেই এ নামের প্রচলন। শিয়ারা আহলে বাইত ছাড়া যে অল্পক'জন ছাহাবীর প্রতি তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ভক্তি পোষণ করে তাঁদের অন্যতম হলেন হযরত সালমান ফারসী (রা)। একারণেই মাযারের নাম 'সালমান পাক'। 'সালমান শরীফ' হতে পারতো, যেমন ওরা বলে, মাযার শরীফ, নজফ শরীফ, ইত্যাদি।

মসজিদটি তেমন বড় নয়, শানদারও নয়। অতি সাধারণ, তবে অতি ভাবগম্ভীর। মসজিদে প্রবেশ করার পর নিজের অজান্তেই কেমন একটি ভাবতন্ময়তা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করলো। মসজিদের সীমানার ভিতরেই মাযার। এ মহান ছাহাবীর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ভিতরে আমি অন্যরকম একটি পরিবর্তন অনুভব করলাম। ভক্তি ও মুহব্বতের অপূর্ব এক তরঙ্গ যেন আমার সমগ্র সত্তাকে দোলা দিতে লাগলো। কবরের শিয়রে প্রস্তরফলকে যখন দেখলাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বিখ্যাত উক্তি, سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ (সালমান তো আমাদের আহলে বাইতের একজন) তখন মুহব্বতের তরঙ্গদোলা হৃদয়ে আরো গভীর হলো।

সম্ভবত গাযওয়াতুল আহযাবের সময় ঘটেছিলো সেই মধুর ঘটনাটি। ছাহাবা কেরামের মাঝে সালমান ছিলেন সালমানেরই মত। আল্লাহর নবী তাঁকে এত ভালোবাসেন, তাই সবাই তাঁকে আলাদা করে ভালোবাসেন। পরিখাখনন চলছে, তখন কোন প্রসঙ্গে আনছার বলে উঠলেন, 'সালমান আমাদের' (কারণ হিজরতের পূর্ব থেকেই তিনি মদীনায় বাস করেন।)

মুহাজির বলে উঠলেন, 'সালমান আমাদের' (কারণ তিনিও দ্বীনের জন্য স্বদেশ-স্বজন ত্যাগ করে এসেছেন)

এরপর এলো সালমানের জীবনে মহাসৌভাগ্যের সেই দুর্লভ মুহূর্তটি। আল্লাহর নবী ভালোবাসার এই অপূর্ব প্রতিযোগিতার কথা শুনে মৃদু হেসে বললেন, সালমান তো আমাদের আহলে বাইতের একজন।

কল্পনায় অনেকবার দেখতে চেয়েছি, নবীর যবানে খোশখবর শুনে হযরত সালমান (রা)-এর মুখমণ্ডল পুলকে, আনন্দে, শিহরণে কেমন উদ্ভাসিত হয়েছিলো! কিছু দেখতে পাইনি। হয়ত তাঁর আনন্দ-উদ্ভাস ছিলো অকল্পনীয় এবং সেটাই স্বাভাবিক। যদি তাঁর দেশের সম্রাট বলতো, 'এর বিনিময়ে তোমাকে দেবো পারস্যের সিংহাসন ও রাজমুকুট', তিনি কী বলতেন! কিছুই বলতেন না, ফিরেও তাকাতেন না। এর বিনিময়ে তো পৃথিবীর সব সিংহাসন এবং সকল রাজমুকুটও ফিরে তাকাবার যোগ্য নয়!

তাঁকে পারস্যের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছিলো। তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান (রা)-এর যামানায় তিনি ইন্তিকাল করেন এবং এখানে 'মাদফূন' হন। তাঁর জীবন-ইতিহাস যেমন মর্মস্পর্শী তেমনি শিক্ষণীয়। পারস্য থেকে এসেছেন, তাই তিনি সালমান ফারসী। জীবনের শুরুতেই সত্যের সন্ধানে বের হয়েছিলেন পারস্য থেকে 'মাটি ও মায়ের বন্ধন' ছিন্ন করে। ঘরে শিকল-বাঁধা করেও তাঁকে রাখা যায়নি। তারপর শামদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সাধু-রাহিবের সংস্পর্শে ধর্মচর্চা ও 'সাধু-চরিত্র' পর্যবেক্ষণ করে অতিবাহিত হলো জীবনের দীর্ঘ সময়। একজনের মৃত্যুর পর তার উপদেশ মত হাযির হতেন অন্যজনের কাছে। প্রথমজন সাধুর বেশে অসাধু হলেও পরবর্তীরা ছিলেন পবিত্র মানুষ। তারা সালমানের 'সত্য-পিপাসায়' মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ভালোবেসেছিলেন। শেষ রাহিবের কাছে তিনি জানতে পারেন, শেষনবীর আগমন আসন্ন এবং তিনি আসবেন হিজাযের ভূমিতে, খেজুরের দেশে। সালমান হিজাযে এলেন এবং অগ্নিপরীক্ষায় পতিত হলেন। আমরা যারা আযান শুনে মায়ের কোলে এসেছি, আমরা বুঝতে পারবো না, কীভাবে সত্যের সন্ধান করতে হয় এবং সত্যের জন্য কতকিছু ভোগ করতে হয়। স্বাধীন সালমান হিজাযে এসে হলেন এক ইহুদীর ক্রীতদাস! তিনি হাসিমুখেই মেনে নিলেন ক্রীতদাসের জীবন, তবু যদি দেখা পাওয়া যায় সেই মহামানবের, যিনি আসবেন সত্যের আলো নিয়ে তাঁকে পথ দেখাতে!

সালমান ইয়াছরিবের উপকণ্ঠে ইহুদী মনিবের খেজুরবাগানে কাজ করেন, আর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় জীবনের দিন পার করেন। একসময় তাঁর জীবনব্যাপী 'সত্যসন্ধান' পরিণতি লাভ করলো এবং 'সত্যমানবের' জন্য তাঁর ব্যাকুল প্রতীক্ষার অবসান হলো। আল্লাহর নবী ইয়াছরিবে এলেন এবং তিনি তাঁর দীদার লাভ করলেন। তাঁর নতুন পরিচয় হলো, আল্লাহর নবীর ছাহাবী এবং .. এবং 'সালমানু মিন্না আহলিল বাইত'!

মদীনা শরীফে হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর সেই খেজুরবাগান দেখার সৌভাগ্য আল্লাহ দান করেছেন, যেখানে আল্লাহর নবী নিজ হাতে খেজুর-চারা রোপণ করে তাঁর দাসমুক্তি ত্বরান্বিত করেছিলেন।

কবরের সামনে দাঁড়িয়ে সত্যের এই মহান সাধকের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অন্তরের পর্দায় জীবন্ত ছবির মত ভাসমান হলো।

সত্যের সন্ধানে তাঁর জীবনব্যাপী ত্যাগ যেমন অতুলনীয় তেমনি আল্লাহর নবীর কাছ থেকে পাওয়া পুরস্কারও ছিলো তুলনাহীন।

'সালমানু মিন্না', এই মহাসম্মাননা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামের জাতীয়তা ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে নয়, নয় ভাষা ও বর্ণের ভিত্তিতে। ঈমান এবং একমাত্র ঈমানই হলো ইসলামের জাতীয়তার ভিত্তি। আফসোস, যে ইরাকের মাটিতে শুয়ে আছেন পারস্যের সালমান, যার কবরের প্রস্তরফলকে এখনো জ্বলজ্বল করছে 'সালমানু মিন্না'-এর আলোকরশ্মি, সেই ইরাকে আজ ধ্বনিত হয় আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগান! ইরাক-ইরান যুদ্ধকে বলা হয় পারসিকদের বিরুদ্ধে আরবদের যুদ্ধ। এই মাদায়েনে ইতিহাসের কাদেসিয়ায় ছাহাবী হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রা) যে জিহাদ পরিচালনা করেছেন ইসলামের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে, সেটাকে এখন বলা হয় 'সিয়াদাতুল আরব আলাল ফুরস' (পারসিকদের উপর আরববিজয়)। সাদ্দাম কি জানেন নিজের অজ্ঞাতে কত বড় অপরাধ তিনি করছেন এবং কী সর্বনাশ ডেকে আনছেন নিজের ও মুসলিম উম্মাহর। সম্প্রদায়প্রীতিকে আল্লাহর নবী বলেছেন, জাহেলিয়াতের দুর্গন্ধ; তো কী ভয়ঙ্কর হতে পারে এই দুর্গন্ধ গায়ে মাখার পরিণতি!

কবর যিয়ারাত হয়ে গেছে, কিন্তু সরতে মন চাইছে না। কারণ, হতে পারে হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর কবরে এটা আমার প্রথম সালাম এবং এটাই আমার শেষ সালাম।

শৈশব থেকেই সালমান আমার হৃদয়ের ভালোবাসা, এখনো সালমান আমার কলবের মুহাব্বাত। তাঁর নূরানী চেহারার একটি উদ্ভাসিত ছবি ছিলো আমার শিশুহৃদয়ে, এখনো আছে। এখানে দাঁড়িয়েও আমি দেখতে পাই সেই নূরানী ছবি। আল্লাহর নবী যাকে এত ভালোবেসেছেন তাঁকে ভালোবাসবে না কোন্ সে মানুষ?! তাকে শ্রদ্ধা করবে না কোন্ সে হৃদয়?! তবে ইসলামের ভালোবাসা হলো আদর্শের এবং আদর্শের প্রতি আনুগত্যের ভালোবাসা।

হযরত ওমর (রা)-এর যামানায় পারস্যের সালমান ছিলেন আরবের সিপাহসালার। দুশমনের কেল্লায় হামলা চালাতে গিয়ে তিনি বলতেন, 'দেখো, ইসলাম আমাকে কত মর্যাদা দিয়েছে! পারস্যের 'আমি' আজ আরবের আমীর!'

এটাই ইসলাম ও ইসলামী চেতনা। তাই হে ইরাক, শোনো মুসাফির ভাইয়ের ডাক। ফিরে এসো তোমার কোলে শুয়ে থাকা সালমানের কাছে এবং আরব-পরিচয় ভুলে গ্রহণ করো ইসলামের পরিচয়।

হে সালমান, জানি না, ইরাক এ আওয়ায শোনবে কি না! ইরাকের সাদ্দাম তোমার কাছে আসবে কি না! কিন্তু আমি হে পেয়ারা সালমান, চৌদ্দশ বছর দূর থেকে তোমার কবরে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পরিচয় আমি স্বীকার করি না! ইসলাম ছাড়া অন্য কোন বন্ধন আমি মানি না!

মানুষ এখান থেকে মাটি নেয়, আমি তোমার কবরের মাটি চাই না হে সালমান, শুধু চাই ইসলামের পরিচয়-বন্ধনের শিক্ষাটুকু নিয়ে যেতে। আমার দেশ যেন গ্রহণ করে তোমার কবরের শিক্ষা!

যিয়ারাতের পুরো সময় হযরতের পাশে ছিলাম। মোরাকাবায় তাঁর সেই শান্ত-সমাহিত রূপ এখনো আমার চোখে ভাসে, এখনো আমার বুকে জাগে। মোরাকাবার রহস্য তখনো বুঝিনি, এখনো না; শুধু ভাবি, কিছু একটা আছে! মক্কা শরীফে জান্নাতুল মুআল্লায় ইচ্ছা হয়েছিলো, জিজ্ঞাসা করি, মোরাকাবার হাকীকত কী? মোরাকাবায় কী দেখা যায়? কী পাওয়া যায়? জিজ্ঞাসা করা হয়নি। কারণ হযরতের কাছে আমার কখনো ছিলো সাহস, কখনো ভয়। তখন ভয় ছিলো, জিজ্ঞাসা করিনি; এখন সাহস হলো, জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আলতো করে আমার মাথাটা বুকে টেনে নিলেন। আবার শুনতে পেলাম তাঁর কলবের ধড়কন এবং হৃদয়ের স্পন্দন!

তিনি বললেন, 'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রা) বলেছেন–

فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ

আখের সেইটার কিছু হাকীকত তো আছে! আসলে অনুসরণের জন্য জীবিতদের চেয়ে মৃতরাই নিরাপদ। তো আল্লাহর নেক বান্দাদের রূহানী ফয়য তাদের মৃত্যুর পরও জারি থাকে। সেখানেও রয়েছে ফয়যের সিলসিলা। মোরাকাবায় কিছু দেখা যায় কি না, জানি না, তবে কিছু পাওয়া যায়। রূহানী ফায়যের সিলসিলা থেকে কিছু ফায়য পাওয়া যায়, যদি বিদ'আতের যুলমাত থেকে কলবকে পাক রাখা যায়।'

আমার প্রিয় হযরত এখন দুনিয়াতে নেই। এখন আমি তাঁর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়, কিছু যেন দেখা যায়! কিছু যেন পাওয়া যায়! আলোর কোন বন্ধন যেন সৃষ্টি হয়! আত্মা থেকে আত্মায় আত্মিকতার কোন প্রবাহ যেন তরঙ্গায়িত হয়! তবে এ বিশ্বাস অন্তরে অবিচল থাকে যে, এ প্রবাহ এখান থেকে নয়, 'সেখান' থেকে, কলবের সিলসিলা শুরু হয়েছে যেখান থেকে।

***

একটু দূরে রয়েছে দুই ছাহাবীর আরো দু'টি কবর। একটি হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-এর, অন্যটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাবির (রা)-এর।

হযরত হোযায়ফা (রা) হলেন অতি উচ্চ মর্যাদার ছাহাবী। আল্লাহর নবী তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে, অনেক গোপন কথা তিনি তাঁর কাছে আমানত রেখে গেছেন। বিশেষ করে মুনাফিকদের নাম ও পরিচয়। তাই তাঁকে বলা হতো 'ছাহিবুস্-সির' (আল্লাহর নবীর ভেদের ধারক।)

সুপ্রিয় পাঠক, আমি, তুমি– আমরা তো 'সাচ্চা' মুসলমান এবং সেজন্য আমাদের অন্তরে রয়েছে পুলক-অনুভূতি। এটা অবশ্য ভালো। ঈমানের গৌরব করা অবশ্যই ভালো। তবে একটা কথা বলো; হযরত ওমর (রা), যার ভয়ে শয়তান পথ এড়িয়ে চলতো, তিনি একবার এই হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামানের কাছে ভয়ে ভয়ে জানতে

চাইলেন, মুনাফিকদের যে তালিকা তোমার কাছে রয়েছে, আল্লাহর কসম করে বলো, তাতে আমার নাম তো নেই!

বলো তো, ওমরের দিলে কেন এত ভয়! আমি, তুমি কেন এত নির্ভয়!

হযরত হোযায়ফা (রা)-এর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি প্রার্থনা করলাম, হে আল্লাহ, ঈমানের সঙ্গে যেন মৃত্যু হয়, আমার এবং আমার প্রিয় সকলের। মুনাফিকের দফতরে যেন নাম না থাকে, আমার এবং আমার প্রিয় সকলের।

হযরত ওমর (রা)-এর যামানায় তিনি মাদায়েনের প্রশাসক নিযুক্ত হন। তিনি এসেছিলেন গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে। মাদায়েনেই হয়েছে তাঁর মৃত্যু ও কবর।

তাঁর পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করে কত অগ্নিপূজক আগুনের 'অন্ধকার' থেকে নূরের আলোতে প্রবেশ করেছে তার সংখ্যা ইতিহাসের পাতায় নেই, রয়েছে তাঁর আমলনামায়। এভাবে যদি ছাহাবাগণ দেশে দেশে ছড়িয়ে না পড়তেন; ইস্তাম্বুলের নগরপ্রাচীর, আর চীনের মহাপ্রাচীরের কাছে যদি তাঁদের কবর না হতো তাহলে হে বন্ধু, ইসলামের আলো হিজাযভূমির বাইরে কীভাবে ছড়াতো! এমন 'কষ্টহীন' ইসলাম কীভাবে আমরা পেতাম! সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কিছু কি দায় নেই আমাদের!

পাশের কবরটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাবির (রা)-এর। ইনি বিখ্যাত আনছারী ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাবির নন। তাঁর কবর মদীনায়, জান্নাতুল বাকীতে। ইনি অন্য কোন ছাহাবী।

আজ থেকে বায়ান্ন বছর আগে এ দুই ছাহাবীর কবরকে কেন্দ্র করে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিলো, যা তখন বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। এঘটনা আমি প্রথম পড়েছিলাম ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিকে। তাতে তথ্যসূত্রের বিস্তারিত উল্লেখ ছিলো। আমাদের গাইড মুহসিন বললেন, ইরাকের তথ্যমন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ বিভাগে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং পত্র-পত্রিকার বেশকিছু কাটিং সংরক্ষিত রয়েছে।

কবরদু'টি তখন এখানে সালমানপাকে ছিলো না; ছিলো বেশ কিছু দূরে দজলা নদীর কাছে। ইরাকের তৎকালীন শাসক একদিন স্বপ্নে দেখেন, ছাহাবীদ্বয় বলছেন, কবরে পানি আসছে, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নাও। সরকারীভাবে কবরের আশেপাশে খনন করে দেখা গেলো, মাটিতে আর্দ্রতা থাকলেও পানি নেই। নিছক স্বপ্ন ভেবে শাসক বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু পরপর দু'বার তিনি পেলেন একই স্বপ্নে একই আদেশ। তখন বিচলিত হয়ে বিশিষ্ট আলিমদের মতামত চাইলেন। তারা সম্মিলিত ফতোয়া দিলেন যে, কবর খনন করা হোক এবং (স্বপ্নের সত্যতা পাওয়া গেলে) কবর স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হোক।

ইসলামের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ ঘটনা হিসাবে ইরাকসরকার ব্যাপক প্রচার করেছিলো এবং হজ্বের মৌসুম বলে মক্কা-মদীনায়ও ঘোষণা করা হয়েছিলো। নির্দিষ্ট তারিখে বহু দেশ থেকে এত মানুষ এসেছিলো যে, দৃশ্য প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে বড় বড় বিশেষ স্ক্রীন স্থাপন করা হয়েছিলো। বহু অমুসলিমও ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে ছুটে এসেছিলেন।

কবর খনন করে দেখা গেলো মাটি একেবারে কাদা-কাদা। আলিমদের তত্ত্বাবধানে দুই ছাহাবীকে কবর থেকে 'উত্তোলন' করার পর দেখা গেলো, হাজার বছরের ব্যবধানেও তাদের পবিত্র দেহ অক্ষত ও জীবন্ত রয়েছে। মানুষের আবেগ তখন যেন অশান্ত এক সমুদ্র। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ প্রকম্পিত হলো।

এ দৃশ্য দেখে জার্মানির এক চক্ষুচিকিৎসক কালিমা উচ্চারণ করে তাওহীদের উম্মায় শামিল হয়ে গেলেন। তাঁর মন্তব্য ছিলো, তাঁদের চোখের দৃষ্টিতে জীবিত মানুষের জ্যোতি বিদ্যমান রয়েছে, যা মৃত্যুর অল্প পরেই নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহর কী শান! সারা জীবন যিনি মানুষের চোখে 'আলো দিয়েছেন', তার অন্তর্চক্ষু ছিলো আলোহীন। বহু শতাব্দীর কবর-শয্যা থেকে উঠে আসা দুই ছাহাবীর জ্যোতির্ময় চক্ষু থেকে আজ তিনি লাভ করলেন অন্তর্চক্ষুর জ্যোতি!

জানাযার খাটিয়ার সাথে যুক্ত লম্বা হাতলের সাহায্যে বহু মানুষ পবিত্র জানাযা বহন করার সৌভাগ্য অর্জন করলো এবং অবশেষে তাঁদেরকে এখানে সালমানপাকে দাফন করা হলো। অনেকে স্বচক্ষে, আর অনেকে বড় স্ক্রীনে এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলো।

কিন্তু আশ্চর্য! নিকট অতীতের এমন বিস্ময়কর ও ঈমানোদ্দীপক ঘটনা যেমন ব্যাপক প্রচার পাওয়ার কথা, পায়নি। প্রচারমাধ্যমের শক্তি ইসলামী উম্মাহর হাতে এখনো নেই, তখনো ছিলো না। এখন তো এর গুরুত্ব কিছুটা হলেও অনুভব করা হয়, তখন তাও করা হতো না। লালকেল্লায় যখন শরাব ও শাবাবের মাহফিল জমতো ইউরোপে তখন পত্রিকার যুগ শুরু হয়ে গেছে। আজো বিশ্বের প্রচারমাধ্যমের প্রায় সবটুকু ইহুদীদের দখলে। মুসলিম জাতি এখনো টিকে আছে কীভাবে! শুধু আল্লাহর রহমত ও কুদরতে। শেষদিকে মুসলমানরা জ্ঞানসাধনা করেছে বিজ্ঞানসাধনা ছেড়ে দিয়ে এবং 'যুক্তিচর্চা' করেছে প্রযুক্তির চর্চা ছেড়ে দিয়ে। এই এক ভুলেরই মাশুল দিতে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। জানি না, এ দুর্গতির শেষ কোথায়?

পাকিস্তানের স্বনামধন্য আলিম মাওলানা তাকী উছমানী তার ইরাকের সফরনামায় লিখেছেন, 'মাওলানা জা'ফর আহমদ আনছারী বলেন, ১৯২৯ সালের সে ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে, যা ঐ সময়ের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় এক সাহিত্যিকদম্পতি তখন ইরাকে ছিলেন। তারাও ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তারা তাদের ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন, বহু বিদেশী পর্যটক ক্যামেরায় ঐ দুর্লভ দৃশ্য ধারণ করেছেন। মাওলানা আনছারীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে নাকি, ঐ ভ্রমণকাহিনীর একটি কপি রয়েছে।'

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের প্রকাশ এবং দ্বীনের সত্যতার উদ্ভাস মাঝে মাঝে এভাবে ঘটিয়ে থাকেন। যার কিসমত ভালো সে তো সত্যের আলো পেয়ে যায়; যার কিসমতের দুয়ার বন্ধ সে তা পায় না, যদিও জন্মের পর বাবা তার নাম রাখে 'মুজাহিদুল ইসলাম'!

স্বয়ং আল্লাহর নবীর চাঁদ দু'টোকরো করার মু'জিযা! মক্কার কোরাইশ কি ইসলাম গ্রহণ করেছিলো? কিংবা আরবের অন্যান্য গোত্র! অথচ সুদূর হিন্দুস্তানের এক রাজা ঐ 'অবিশ্বাস্য' দৃশ্য দেখে বিশ্বাস করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে পড়ছি, তবু লোভ সংবরণ করা গেলো না; এধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটেছে দূর অতীতে খলীফা হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর যামানায়। অহুদযুদ্ধের প্রথম শহীদ ছিলেন হযরত জাবির (রা)-এর আব্বা হযরত আব্দুল্লাহ। তাঁকে এবং হযরত আমর বিন জামূহকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিলো। যাদের ধারণা, অর্থের অভাবই আমাদের মূল সমস্যা, তারা শুনুন, অহুদে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের পর্যাপ্ত কাফন ছিলো না। হযরত আব্দুল্লাহ (রা)-এর কাফন ছিলো একটি মাত্র চাদর। তাতেও শুধু চেহারা ঢাকা হয়েছে, পা ঢাকতে হয়েছে ঘাস দ্বারা।

অহুদের চল্লিশ বছর পর এক বড় পাহাড়ি ঢলে কবরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাছাড়া সেখানে একটি খাল খননেরও প্রয়োজন দেয়া দেয়। তখন হযরত জাবির (রা)-এর উপস্থিতিতে কবর খনন করা হলো; দেখা গেলো, উভয় ছাহাবীর পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত ও জীবন্ত; এমনকি বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ (রা)-এর চেহারার যখমে তাঁর হাত রাখা ছিলো। হাতটি সোজা করার পর চেহারার যখম থেকে তাজা খুন ঝরতে লাগলো। যখন হাতটি আবার যখমের উপর রাখা হলো তখন খুন ঝরা বন্ধ হলো।

১৯২৯ সালের ঘটনা হযরতের জানা ছিলো না। শুনে খুব অবাক হলেন এবং আমাকে জাযাকাল্লাহ বললেন। তাঁকে আরো বললাম, জিলানীর মাদরাসায় যার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে, শায়খ আব্দুল কারীম, তিনি তখন যুবক ছিলেন এবং সেই জানাযা বহন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এবিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

***

তখনো যথেষ্ট সময় ছিলো, কিন্তু হযরত বললেন, তিনি সালমান ফারসী (রা)-এর মসজিদে যোহর আদায় করে বাগদাদ ফিরবেন। পুরো সফরে দেখেছি, হোটেলে জামাত করার চেয়ে তিনি কোন না কোন মসজিদে নামায পড়ার চেষ্টা করতেন এবং তাতে খুব রূহানী সুকূন অনুভব করতেন।

এভাবেই একদিন তিনি পুরোনো বাগদাদে এক মসজিদ দেখে নামায আদায় করার কথা বলেছিলেন। মুহসিন কেন জানি হোটেলে ফিরে নামায পড়ার উপর জোর দিচ্ছিলেন। শেষে মসজিদেই যাওয়া হলো। ইমাম-মুআয্‌যিন নেই, মুছল্লীও নেই। দু'জন কি তিনজন বুড়ো জামাতে শরীক হলেন। নামাযের পর, 'বাংলাদেশের শায়খ' জানতে পেরে অনেকে জড়ো হলো এবং খেজুর দ্বারা আমাদের আপ্যায়ন করলো। আপ্যায়নের এই স্বভাবসরলতা আরব ছাড়া আর কোথাও তুমি পাবে না। হযরত তাদেরকে অত্যন্ত দরদের সাথে কিছু নছীহত করলেন এবং নামাযের তারগীব দিলেন। মুহসিন নামায পড়েছেন, কিন্তু নছীহতের সময় তার চেহারায় খুব অস্বস্তি লক্ষ্য করলাম। এই চেহারা ও তার অস্বস্তি আমার জন্য ছিলো সাদ্দামের আধুনিক ইরাকের জীবন্ত রাজনৈতিক মানচিত্র। তথ্যমন্ত্রণালয় থেকে প্রচারকৃত 'নামাযী'

সাদ্দামের অনেক ছবি ও পোস্টার আমাদের দেখানো হয়েছে। সেগুলোর সঙ্গে এই জীবন্ত মানচিত্রটিও আমার দেখার প্রয়োজন ছিলো। মুহসিন নিজের অজ্ঞাতে তার চেহারার মানচিত্র দ্বারা আমার উপকার করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, আমাদের পুরোনো ঢাকায় যেমন মসজিদ, আর মসজিদ, বাগদাদের পুরোনো এলাকায় তা নয়। মসজিদ খুব কম। নতুন বাগদাদে একটা কি দু'টো। জনসংখ্যার ব্যবধান একটি কারণ হলেও মূল কারণ আরো গভীরে। অবশ্য নতুন বাগদাদের মসজিদগুলোর স্থাপত্যসৌকর্য ও অন্যান্য সৌন্দর্য থেকে চোখ ফেরানো যায় না। 'মাসাজিদুহুম আমিরাহ'-এর একেবারে যিন্দা নমুনা। তার চেয়ে মসজিদ যদি হতো খেজুরপাতা ও খেজুরডালের, আর তা আবাদ হতো নামাযে, ইবাদতে ও তিলাওয়াতে!

অনেক দূর চলে গিয়েছি, ফিরে আসি সালমানপাকে। মুহসিনকে জানালাম হযরতের ইচ্ছার কথা। তিনি ছোটাছুটি করে দজলার তীরবর্তী একটি সুন্দর হোটেলে হযরতের আরাম ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। দজলা বলতে গেলে হোটেলের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত। আমরা হোটেলের খোলা চত্বরে কফির পেয়ালা হাতে দজলার বয়ে যাওয়া দেখছিলাম। নদীর স্রোত ছিলো সামনের দিকে, সাগরের পানে, কিন্তু চিন্তার স্রোত আমাকে নিয়ে গেলো পিছনের দিকে, অতীতের মাদায়েনে। ধীরে ধীরে ঝাপসা অতীত সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, ঠিক যেন বর্তমান! ঐ যে দজলানদীর তীরে ছাহাবা কেরামের জামাত! সালারে লশকর একবার দেখেন দজলার ঢেউ, একবার দেখেন মাদায়েনের দুর্গ, যেখানে পাচিলের উপর তীর-ধনুক হাতে শত শত সিপাহী। ঘোড়া ও সরঞ্জামসহ পুরো বাহিনীর দজলা পার হওয়া একে তো অসম্ভব, তদুপরি তারা হবে পাহারাদারদের বেপরোয়া তীর বর্ষণের শিকার। চিন্তিত সালার যেন আসমানের দিকে তাকালেন এবং দু'হাত তুলে মুনাজাত করলেন, আর তাঁর অন্তরে জাগ্রত হলো গায়বী মদদের একীন ও বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যখন জাগ্রত হয়, আল্লাহর মদদ তখন অবশ্যই নেমে আসে।

গায়বি মদদের সেই একীন ও বিশ্বাসে বলীয়ান সালারে লশকর ঘোষণা করলেন, শাহাদাতের তামান্না আছে যাদের তারা আল্লাহর নামে দজলার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ো। স্থল যিনি সৃষ্টি করেছেন দজলার ঢেউ তাঁরই সৃষ্টি। স্থলে যিনি রক্ষা করেন, দজলার ঢেউ থেকে তিনিই তোমাদের রক্ষা করবেন।

আমি যেন শুনতে পেলাম আল্লাহু আকবারের বজ্রধ্বনি; আমি যেন দেখতে পেলাম দজলার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার অচিন্তনীয় সেই দৃশ্য! এমন দৃশ্য দু'একবার যা ঘটেছে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসেই ঘটেছে। আমি যেন দেখতে পেলাম মুজাহিদীনের ভয়-ভাবনাহীন নূরানী চেহারা। নদীর বুকে নৌকা চলে, কিন্তু সেদিন, দজলা নিজেই যেন নৌকা হয়ে পার করে দিয়েছিলো মুজাহিদ-বাহিনীকে।

ঐ যে 'আগুন-পূজার সেপাহী'রা পানি পার হওয়া তাওহীদের পূজারীদের ভয়ে তীর-ধনুক ফেলে প্রাণহাতে পালাচ্ছে! ঐ যে মুজাহিদীনের সালার দুর্গের সামনে লুটিয়ে পড়েছেন শোকরানার সিজদায়।

কোথায় আজ দজলা পাড়ি দেয়া মুজাহিদীনের উত্তরসূরীরা! যাদের ভয়ে বিশ্ব কেঁপেছে তারা কেন কাঁপে আজ বিশ্বের ভয়ে! স্পেনজয়ী তারিকের বংশধর কেন স্পেন থেকে বিতাড়িত! ফিলিস্তিন ও বাইতুল মুকাদ্দাস উদ্ধারকারী ছালাহুদ্দীনের অনুসারীরা কেন ফিলিস্তিন থেকে উৎখাত হলো? বাইতুল মুকাদ্দাস কেন হাতছাড়া হলো। মুসলিম বিশ্বের একইঞ্চি ভূমিও কি আমরা অর্জন করেছি? এমনকি রক্ষা করতে পেরেছি তাদের রেখে যাওয়া সবটুকু ভূখণ্ড? তারপরো তারা পশ্চাদপদ, আমরা প্রাগ্রসর?

তন্ময় হয়ে দেখছি প্রবহমান দজলার ঢেউ। প্রতিটি ঢেউ যেন প্রশ্নবোধক চিহ্ন এবং তা আমারই উদ্দেশ্যে! দজলার অধিকার ছিলো আমাকে প্রশ্ন করার। কেননা মেঘনার দেশে জন্ম হলেও দজলা আমার স্বপ্ন! পদ্মার ঢেউয়ে দোল খেলেও দজলা আমার বুকের তরঙ্গ। দজলা হয়ত ভেবেছে, আমি বোঝবো তার ঢেউয়ের ভাষা এবং তার বুকের ব্যথা! কিন্তু আমার কাছে কোন জবাব ছিলো না এসব প্রশ্নের। আমি শুধু মিনতি জানালাম আমার প্রিয় দজলাকে, তোমার বুকের প্রতিটি ঢেউ যেন প্রার্থনা করে তোমার স্রষ্টার কাছে, মুসলিম উম্মাহর অন্তরে আবার যেন ঢেউ জাগে, জিহাদের, আবার যেন জোশ ওঠে শাহাদাতের! আবার যেন ওড়াতে পারে তারা ঝাণ্ডা বিজয়ের! তাদের ঘোড়া আবার যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে নতুন দেশের নতুন দজলার বুকে! আবার যেন তারা জয় করে নতুন মাদায়েনের নতুন কেল্লা। তাদের পায়ের তলা থেকে আর যেন সরে না যায় নতুন কোন ভূখণ্ড!

***

যোহরের সময় হযরতের সঙ্গে আমরা মসজিদে হাযির হলাম। হয়ত এটা সালমানপাক মসজিদে আমার একমাত্র নামায, একথা ভেবে আবেগ আমার আবারো উদ্বেলিত হলো এবং রুকু-সিজদায় হৃদয় আমার আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিগলিত হলো। আমি যেন নামায পড়ছি বাইতুল্লাহর ছায়ায়! সিজদায় আমার কপাল যেন স্পর্শ লাভ করছে হারামের পবিত্র ভূমির।

নামাযের পর রওয়ানা হলাম। যে পথে দু'পাশের খেজুর-বাগান দেখে দেখে মাদায়েন এসেছিলাম, সেই একই পথে একই সৌন্দর্য উপভোগ করে করে মাদায়েন থেকে বাগদাদ ফিরে এলাম।

***

দজলার পূর্বতীরে কারখ অঞ্চলে বাগদাদের প্রাচীন কবরস্তান। নাম বাবুদ-দায়ের। আত্মিক দিক থেকে বাবুদ-দায়েরের যিয়ারাত আমার জন্য ছিলো খুবই ফলদায়ক। যুগে যুগে কত মানব-মহামানব এই প্রাচীন কবরস্তানে শেষশয্যা গ্রহণ করেছেন; এই মাটির নীচে লুকিয়ে আছে ইলমের কত 'বেশ কীমত' খাযানা; মা'রিফাতের কত

অমূল্য রত্ন; ইতিহাস তার কতটুকু খবর রাখে! ইতিহাস তো ব্যস্ত শুধু রাজপ্রশস্তি ও বীরবন্দনায়। তারপরো ক'জন বেঁচে আছে ইতিহাসের পাতায়!

অথচ আল্লাহর বান্দারা, কবরের চিহ্ন মুছে গেলেও, জীবন্ত আছেন মানুষের ভক্তি-ভালোবাসায় এবং নিজেদের 'জারিয়ান' আমলনামায়।

বাবুদ-দায়েরে কারো কবরের সন্ধান জানার কোন উপায় নেই, তবে একটি সুন্দর বেষ্টনীর মাঝে সংরক্ষিত রয়েছে তিনটি কবরের মাযার। সেখানে শুয়ে আছেন হযরত মা'রূফ কারখী, হযরত সারী সাকাতী ও হযরত জোনায়দ বোগদাদী (রহ)। আমরা হযরতের সঙ্গে আল্লাহর এই তিন পেয়ারা বান্দার কবর যিয়ারাত করলাম এবং জানা-অজানা অন্যসব কবরবাসীর জন্যও মাগফিরাতের দু'আ করলাম।

হযরত মা'রূফ কারখীর জন্ম এক খৃস্টান পরিবারে, কিন্তু গায়বের ইশারায় শৈশবেই তাঁর অন্তরে তাওহীদের চেতনা এমন জাগরূক ছিলো যে, তিনি বলে উঠতেন, 'আল্লাহু আহাদ', আল্লাহ এক। এজন্য পরিবারের সকলে বিচলিত ছিলো। বাবা কখনো শাসন করতেন, কখনো করতেন কঠিন তিরস্কার। কারণ এটা ছিলো পারিবারিক সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্ন।

হাদীছ বলে, মায়ের হক তিনবার, বাবার হক একবার, মা ও বাবার এ পার্থক্য চিরসত্য। যুগে যুগে তা প্রমাণিত হয়েছে; মারূফ কারখীর জীবনেও প্রমাণিত হলো। পারিবারিক মর্যাদার প্রশ্নে বাবা হলেন পাষাণ, কিন্তু সন্তান হারিয়ে মা হয়ে গেলেন লবেজান। সকাল-সন্ধ্যা তিনি কাঁদেন, আর কাঁদেন। রাতে ঘুম থেকে জেগে চিৎকার করে ওঠেন, মারূফ, কোথায় তুমি বাপ! অভাগিনী মায়ের কথা একবারও কি মনে পড়ে না বাপ!

কখনো বলতেন, কাজ নেই আমার তিন খোদায়, মারূফ যদি এক খোদায় খুশী, আমিও খুশী। শুধু আমার মারূফ ফিরে আসুক আমার বুকে।

মারূফ কারখী একসময় ফিরে এসেছিলেন মায়ের বুকে অন্য এক মারূফ হয়ে, যাকে দেখে সত্যের প্রতি বিশ্বাস জাগে, যাকে পেয়ে সত্যকে পাওয়ার ব্যাকুলতা আসে। মারূফের আম্মা তো 'মুসলিম' ছিলেনই, পরিবারের অন্যরাও ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন।

মানুষের প্রতি হযরত মারূফ কারখীর দরদ-ব্যথা ছিলো অন্যরকম। নবীর উম্মতি নাফরমান হলেও তাকে তিনি ভালোবাসতেন এবং তার হিদায়াতের দু'আ করতেন। এই দজলা নদীর পারের ঘটনা; ভক্ত-মুরীদান নিয়ে এক সন্ধ্যায় তিনি বসে আছেন। কিছু যুবক নৌকায় গান-বাজনায় মত্ত। একজন বললো, দেখুন হযরত, নদীর বুকেও এরা নাফরমানিতে লিপ্ত; আপনি বদদু'আ করুন, আল্লাহ যেন তাদের নৌকা দজলায় ডুবিয়ে দেন। হযরত মারূফ শান্ত কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ যদি তাদেরকে রহমতের দরিয়ায় ডুবিয়ে দেন, তোমার আপত্তি আছে? তাতে তোমার কোন ক্ষতি আছে? তিনি দু'হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ, দুনিয়ার আনন্দের পরিবর্তে এদের তুমি আখেরাতের স্বাদ দিয়ে দাও।

দুনিয়ার আনন্দ-বাজনায় মত্ত এই যুবকদল সত্যি একদিন আখেরাতের আনন্দ-সাধনায় মগ্ন হলো কারখীর দরদভরা দু'আর বদৌলতে।

দু'শ হিজরীতে তিনি যখন ইন্‌তিকাল করেন, গোটা বাগদাদ ভেঙ্গে পড়েছিলো তাঁর জানাযায়, আর খলীফার তামান্না ছিলো, এর অর্ধেক মানুষও যেন হয় তার জানাযায়!

এখানে এই মাটির নীচে তিনি শুয়ে আছেন; আমি যেন তাঁর সান্নিধ্যের উষ্ণতা অনুভব করছি। একসময় নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এখান থেকে কী আমি পেলাম? ভিতর থেকে যেন আওয়ায এলো, এখান থেকে তুমি শিক্ষা পেলে অন্তরে তাওহীদের অবিচল বিশ্বাস লালন করার এবং তাওহীদের জন্য জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করার, আর শিক্ষা পেলে মানুষের জন্য দরদ-ব্যথায় উদ্বেলিত হওয়ার এবং শুধু মানুষের কল্যাণ-কামনায় দু'হাত উপরে তোলার।

***

হযরত মারূফ কারখীরই বিশিষ্ট খলীফা হলেন সারী সাকাতী (রহ)। তাঁর মাটির উপরের জীবন কেটেছে মুরশিদ কারখীর আলোকিত সান্নিধ্যে, মাটির নীচের জীবনেও তিনি ধন্য হয়েছেন সেই সান্নিধ্যে। প্রার্থনা করলাম, কবরের সঙ্গী এঁরা জান্নাতেও যেন হন পরস্পরের সঙ্গী; তাদের আলোকিত জীবনের পথ ধরে আমরাও যেন পৌঁছে যেতে পারি, জান্নাতের দরজায়, বেহেশ্‌তের অফুরন্ত নেয়ামতের বাগিচায়।

হযরত সারী সাকাতী বলেন, আমি যা কিছু পেয়েছি মারূফ কারখীর একটি দু'আর বরকতেই পেয়েছি। এক ঈদের দিনে দেখি, তিনি ছিন্নমলিন কাপড়ের এক দুঃখী বিষণ্ণ বালককে নিয়ে বাজারে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, দেখো, এই এতীম ঈদের আনন্দের দিনে কাঁদছে। আমি এর মলিন মুখে ঈদের হাসি ফোটাতে চাই।

আমি বললাম, হযরত, আমাকে এর প্রতিপালনের সুযোগ দিন।

তিনি বললেন, সত্যি করবে! তাহলে নিয়ে যাও, আল্লাহ তোমার অন্তরকে ধনী করে দিন।

হযরত সারী সাকাতী বলেন, তারপর থেকে দুনিয়া আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে।

দু'শ একান্ন হিজরীতে বাগদাদে এই মহান সাধকের মৃত্যুতে এক অন্তর্জ্ঞানী মন্তব্য করেছেন, 'ভালো মানুষের সংখ্যা মাটির উপরে আজ কমে গেলো এবং মাটির নীচে বেড়ে গেলো।'

হযরত সারী সাকাতী বলতেন, কেউ যদি শরীয়তের যাহেরী ইলমের খেলাফ কোন বাতেনী ইলমের দাবী করে, তাহলে সে গোমরাহ।

বাগদাদের বাজারে তাঁর দোকান ছিলো। একবার আগুন লেগে সব দোকান পুড়ে গেলো; শুধু তাঁর দোকানটি বেঁচে গেলো। তিনি আলহামদু লিল্লাহ বলে শোকর আদায় করলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, আমি তো আমার ভাইদের মুছীবতে খুশী হলাম! এবার তিনি ইস্‌তিগ্‌ফার করলেন এবং সব সামান ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন, আর বললেন, এখন আমিও তোমাদের মত হয়ে গেলাম।

আসলেই কি তিনি তাদের মত হলেন! তিনি কি তাদের মত হতে পারেন! তারা কি পারতো, যা তিনি করেছেন তা করতে! তিনি তো হয়েছেন তাঁর নিজের মত! সবাই যদি হতে পারতো তাঁর মত তাহলে তো এই দুনিয়া হয়ে যেতো 'রাশ্‌কে জান্নাত', জান্নাতেরও ঈর্ষার পাত্র!

আরো কত ঘটনা মনে পড়লো আজ এই কবরওয়ালার সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে! একসময় নিজেকে আমি প্রশ্ন করলাম, এখান থেকে কী আমি পেলাম? ভিতর থেকে আওয়ায এলো, এখানে তুমি পেয়েছো, এতীমের চোখের পানি মুছে দেয়ার এবং মানুষের বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়াবার শিক্ষা, আর এ শিক্ষা তোমার নবীর শিক্ষা!

***

জোনায়দ বিন মুহম্মদ আলবোগদাদী হলেন হযরত সারি সাকাতীর ভাগিনা এবং তাঁর বিশিষ্ট খলীফা। তিনি যেমন ইলমে মা'রেফাতের শীর্ষে উপনীত হয়েছিলেন তেমনি আরোহণ করেছিলেন ইলমে যাহিরেরও উচ্চস্তরে। তিনি বলতেন, ইলমে ফিকহর গভীরতায় যে পৌঁছতে পারেনি সে অনুসরণযোগ্য নয়। তিনি আরো বলতেন, যে মনে করে, নিজের চেষ্টায় আল্লাহকে পাবে, আর যে মনে করে, বিনা চেষ্টায় আল্লাহকে পাবে, তারা উভয়ে গোমরাহ। (অর্থাৎ আমল না করে শুধু রহমতের আশায় বসে থেকো না, আবার আমলের কারণে রহমতের উপর ভরসা করা ভুলে যেয়ো না।)

তিনি আরো বলতেন, গোনাহের পর যদি অনুতাপ জাগে তাহলে নিরাশ হয়ো না। (কেননা এটা ঈমানের আলামত এবং তাওবা নছীব হওয়ার উপায়।)

এক হজ্বের সফরে মক্কায় আরেফীনদের জলসায় হযরত সারী সাকাতীর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, শোকর হলো আল্লাহর নেয়ামতকে আল্লাহর নাফরমানির কাজে ব্যবহার না করা।

২৯৭ হিজরীতে শয্যাশায়ী অবস্থায়ও নামাযের হালাতে তিনি ইন্তিকাল করেন। এখানে দাঁড়িয়েও নিজেকে প্রশ্ন করলাম, জোনায়দ বোগদাদীর যিয়ারাতে কী আমি পেলাম? ভিতর থেকে আওয়ায এলো, এখানে তুমি পেয়েছো ইলমে যাহির ও ইলমে বাতিনের মাঝে সমন্বয় সাধনের শিক্ষা, আর পেয়েছো মৃত্যু পর্যন্ত 'লা-তাকনাতূ'-এর রজ্জু ধরে রাখার শিক্ষা।

প্রথম কবরের একান্ন বছর পর দ্বিতীয় কবর এবং দ্বিতীয় কবরের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর তৃতীয় কবর। এভাবে একটির পর একটি কবর তৈরী হচ্ছে, হতেই থাকবে। তারপর একদিন খুলে যাবে সব কবরের দরজা। মানুষ পিপিলিকার মত উঠে আসবে কবর থেকে; রওয়ানা হবে হাশরের মাঠে; দাঁড়াবে গিয়ে মীযানের সামনে। হে আল্লাহ, আমার জন্য যে কবরটি তৈরী হবে তাকে তুমি করে দিয়ো জান্নাতের বাগিচা। হে আল্লাহ, এটা প্রাপ্তির দাবী নয়, রহমতের আবদার! হে আল্লাহ, যারা আমীন বলে, তাদেরও।

যিয়ারাত শেষে হযরতের পাশে দাঁড়ালাম। তাঁর আলোকিত ও পরিতৃপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে নিজেরও অন্তরে আশ্চর্য এক আলোকময়তা এবং তৃপ্তির স্নিগ্ধতা অনুভব

করলাম। তিন কবরের তিন শিক্ষার কথা তাঁকে আরয করলাম। তিনি খুব খুশী হলেন এবং কারখী, সাকাতী ও বোগদাদীর পবিত্র মাযারপ্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আমার জন্য এমন এক দু'আ করলেন, যা আমি মনে করি, আমার জীবনের অনেক বড় সম্পদ।

***

হোটেলে ফিরে হযরত আমাকে তাঁর কামরায় ডাকলেন। গিয়ে দেখি, তিনি অস্থির অবস্থায় পায়চারি করছেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সালাম দিলাম। তিনি তাকালেন। ভিতরের অস্থিরতার ছাপ চেহারায় সুস্পষ্ট। তিনি বললেন, মৌলভী আবু তাহের, তুমি কোশিশ করতে পারো না, ছদরের সাথে জলদি যেন মোলাকাত হয়?

কী বলবো? এখানে তো আমি হযরতের সঙ্গে আসা এক আজনবী মুসাফির, কারো সঙ্গে যার কোন পরিচয় নেই!

হঠাৎ যেন বিজলি চমকের মত মনে পড়লো ইরাকের ধর্মমন্ত্রীর কথা। দু'বছর আগে তিনি বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে তার সম্মানে নৌবিহারের আয়োজন করা হয়েছিলো। ফাউন্ডেশনের তখনকার মহাপরিচালক জনাব সামসুল আলম সাহেব অনুগ্রহ করে আমাকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং মন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে আমার অতি মার্জিত, ভদ্র ও আন্তরিক মনে হয়েছিলো। ইরাক-ইরান যুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে মাত্র। নৌবিহারের প্রায় পুরোটা সময় তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমার আরবী বলা তার ভালো লেগেছিলো। বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন, আরবদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা-পড়া করেছি; বললাম, এখনো আমি কোন আরবদেশ দেখিনি। তিনি অবাক হয়ে বললেন, কোন আরবদেশ দেখোনি, অথচ এমন বিশুদ্ধ আরবী!

একপর্যায়ে হাসতে হাসতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী ধারণা, এ যুদ্ধে কে জয়ী হবে?

যেমন আচমকা প্রশ্ন, আল্লাহর রহমতে তেমনি আচমকা ছিলো আমার জবাব, বললাম, আমার ধারণা এ যুদ্ধে জিতবে আমেরিকা এবং ইসরাইল।

জবাব শুনে মন্ত্রী স্তব্ধ হয়ে গেলেন এবং দীর্ঘ সময় আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কোন কথা না বলে।

নৌবিহার শেষে বিদায়কালে তিনি নিজে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে মুছাফাহা করে বললেন, তোমার কথা মনে থাকবে, বিশেষ করে তোমার ঐ জবাবের জন্য, তোমাকে ধন্যবাদ।

এ সব কথা মনে পড়ে একটু আশা হলো যে, হয়ত চেষ্টা করার সুযোগ আছে। অন্তত নিজেকে প্রবোধ দিতে পারবো যে, হযরতের পেরেশানির সময় কিছু একটা করেছি। ফোনে মুহসিনকে পেলাম। বেচারা মাত্র বাসায় পৌঁছেছেন আমাদের হোটেলে রেখে। বললাম, তুমি কি তোমাদের ধর্মমন্ত্রীর সাথে আমার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারো। বাংলাদেশের সফরে এক নৌবিহারে তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো। এ সাক্ষাৎ আমার জন্য খুব জরুরী।

মুহসিন বললেন, 'চেষ্টা করছি, ফলাফল তোমাকে জানাবো।'

একঘণ্টা পর মুহসিনের ফোন পেলাম। তিনি, আমাকে নিতে আসছেন, বলেই ফোন রেখে দিলেন।

শুনে হযরত খুশী হলেন, আমাকে জাযাকাল্লাহু বললেন, আর বললেন কাউকে জানানোর দরকার নেই।

কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আমি আগে থেকেই পেরেশান ছিলাম। প্রথমত হযরতের সফরসঙ্গী যারা, সফরের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি তারা কতটা নিবেদিত? একজন বাঙ্গালীর জন্য মাযার যিয়ারাত অবশ্যই পুণ্যকর্ম, কিন্তু হযরতের শান্তিমিশন! এ বিষয়টি কি কাউকে বিচলিত করছে? অন্তত আমি তো মনে করতে পারছি না। হযরত তাকিদ করেই যাচ্ছেন ছদরের সঙ্গে মোলাকাতের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানোর। অথচ জোর, অ-জোর কিছুই দেখি না; দেখি শুধু পান ও কাঁচা মরিচ– এ দুই 'মূল্যবান' বস্তুর জন্য আফসোস!

দ্বিতীয়ত এটা যদি হয় শান্তি ও সন্ধির সফর তাহলে সফরসঙ্গী নির্বাচনের এ পদ্ধতি কেন? তোয়াহা বিন হাবীব শুধু ইরানে এবং মুহিউদ্দীন খান শুধু ইরাকে কেন? আমার বিষয়টি অবশ্য আলাদা। আমি মূলত এ সফরের অংশ নই। আমার সফর ইরাকী দূতাবাসের দাওয়াতে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আমি নিজের আগ্রহে ও প্রয়োজনে হযরতের সঙ্গ গ্রহণ করেছি।

এত দিন ধারণা ছিলো শান্তিমিশনে হযরত নিঃসঙ্গ। অন্যরা সফরসঙ্গী হলেও 'মিশনসঙ্গী' বোধ হয় নন। আজ হযরতের শেষ কথায় নিশ্চিত হলাম, আমার ধারণা ভুল নয়।

আমাদের গাইড মুহসিন উপরের দিক থেকে আমার কাছাকাছি বয়সের হলেও অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'যদি কিছু মনে না করো তাহলে একটা কথা বলতে চাই। তোমাদের শায়খ শুধু বাংলাদেশের নন, মুসলিম উম্মাহর সম্পদ, কিন্তু তোমাদের কাছে তিনি অপরিচিত।'

মাত্র তিন দিনের পরিচয়ে ইরাকের একজন মুসলিম ভাই হযরত ও তার সফরসঙ্গীদের সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছিলেন। প্রায় একই মন্তব্য করেছিলেন ঢাকা বিমানবন্দরে আমাদের দেশের একজন সুপরিচিত সাংবাদিক।

হযরতের ইরান-ইরাক সফর সম্পর্কে দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমি কিছু বলিনি, না মুখে, না কলমে। সফরের পরপর জনাব আখতার ফারূক সাহেব (আল্লাহ তাকে জান্নাত নছীব করুন) যখন কলম ধরলেন, আর দেশব্যাপী 'ঝড়' উঠলো, এমনকি হযরতের ব্যক্তিত্বও মারাত্মক আহত হলো, 'শিয়া' অপবাদ পর্যন্ত দেয়া হলো 'অতি নিকট' থেকে তখন কলম ধরার অদম্য ইচ্ছা হয়েছিলো, কিন্তু প্রাণপ্রিয় হযরত পাহাড়পুরী হুযূর (আল্লাহ তাঁকে পূর্ণ শিফা দান করুন, আমীন) বললেন, 'অনুমতি নেই', আর অনুমতি ছাড়া কিছু করা এখনকার 'সাহসী' তরুণদের জন্য সহজ হলেও তখন আমাদের জন্য ছিলো কঠিন আমরা এটাকে 'অকল্যাণকর' ভাবতাম। আজ পঁচিশ

বছর পর ঘটনার একটি অংশের নীরব দর্শক হিসাবে আগামী দিনের জন্য একথাগুলো লিখে রাখলাম। কারণ আমার মনে হয়, হযরতের জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা, সর্বোপরি তাঁর নিঃসঙ্গতার বেদনা উপলব্ধি করার জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে। সারা জীবন একই রকম নিঃসঙ্গতার বেদনা বহন করেছেন 'সত্যের সূর্য' নামের আরেকজন মানুষ। সে সূর্য আলো ছড়িয়েছে অন্তহীনভাবে, তবে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে; মেঘমুক্ত আকাশ ছিলো না তাঁর জীবনে। আমি মনে করি, এদু'জন বড় মানুষ আমাদের মত ছোটদের ব্যর্থ জীবনের জন্য বড় সান্ত্বনা।

মুহসিন এলেন এবং আমাকে নিয়ে বের হলেন। আমরা গেলাম মন্ত্রণালয়ে নয়, ধর্মমন্ত্রীর বাসভবনে। মন্ত্রী আমাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন, আর বললেন, আমার সেই জবাব এখনো তার মনে আছে এবং সেকারণেই আমাকেও মনে আছে। আমি খুব অবাক হলাম যখন যুদ্ধরত দেশের একজন মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন তোমার 'ইকরা' কেমন চলছে? আরো অবাক হলাম যখন দেখি, তার টেবিলে ইকরা পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার সেই নোসখাটি, যা তাকে নৌবিহারে হাদিয়া দিয়েছিলাম। একজন মেহমানকে সন্তুষ্ট করার এটাই হলো আরবীয় তরীকা।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললাম, আপনি হয়ত জানেন, আমাদের শায়খ ইরাক সফরে এসেছেন শুধু শান্তির অন্বেষণে। এ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ তাঁর অন্তরে স্থায়ী রক্তক্ষরণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবিলম্বে এবং যে কোন মূল্যে এ যুদ্ধ বন্ধ হোক, এটা তাঁর আন্তরিক কামনা। এ উদ্দেশ্যে হজ্বের আগে তিনি ইরান সফর করেছেন এবং ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব খোমেনীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আমাদের শায়খ যুদ্ধবন্ধের সুনির্দিষ্ট একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। তিনি চান অবিলম্বে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে বসতে। এ বিষয়ে আমি আপনার সহযোগিতা কামনা করি।

তথ্যমন্ত্রীর মত ধর্মমন্ত্রীরও একই অবস্থা; তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। খোমেনী তোমাদের শায়খের সাথে দেখা করেছেন, এটা সত্যি!

আমি মৃদু হেসে বললাম, একটি মিথ্যা বহন করে আমরা জিলানীর দেশে আসবো কেন?

আসলে ইরাকী নেতাদের এমন বিস্ময়বোধের পিছনে যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। খোমেনী এ পর্যন্ত কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে পর্যন্ত সাক্ষাৎ প্রদান করেননি। আমাদের দেশের শহীদ প্রেসিডেন্ট যিয়াউর-রহমান যখন শান্তিমিশনে ইরান গিয়েছিলেন তখন তিনি আছরের পর খোমেনীর সঙ্গে শুধু মোছাফাহা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই খোমেনী বাংলাদেশের একজন 'সাধারণ' মানুষের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করবেন এবং যুদ্ধবন্ধের বিষয়ে আলোচনা করবেন তা বিশ্বাস করা কঠিন বৈকি।

যাই হোক, মন্ত্রী আশ্বাস দিলেন, তিনি সম্ভাব্য চেষ্টা করবেন। তবে অভিব্যক্তিতে মনে হলো, যুদ্ধ ও যুদ্ধবন্ধ, দু'টি বিষয়েই তার ভিতরে রয়েছে হতাশা। অন্তত তথ্যমন্ত্রীর মত তাকে যুদ্ধের প্রতি অতটা উদ্দীপ্ত মনে হয়নি।

হোটেলে ফিরে হযরতকে ধর্মমন্ত্রীর আশ্বাসের কথা শুনালাম। তিনি, মনে হলো কিছুটা স্বস্তি লাভ করলেন, আর আমি তাঁর দিলের দু'আ লাভ করলাম।

পরদিন সকালে অন্যরা বের হলেন মাযার যিয়ারাতে। হযরত অসুস্থতার জন্য যিয়ারাতে গেলেন না, আমারও আগ্রহ হলো না হযরতকে ছাড়া মাযার যিয়ারাতে। আমাদের গাইড মুহসিন যখন জানলেন, হযরত যাচ্ছেন না, তখন তিনি অধঃস্তন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিলেন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ হযরতের কাছে বসলেন, নছীহত শুনলেন। তারপর আমার কামরায় কিছু সময় কাটিয়ে চলে গেলেন। মুহসিনকে আমার খুব বিষণ্ন মনে হলো, অথচ গতরাতেও স্বাভাবিক ছিলেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, গতরাতে গ্রামের বাড়ী থেকে খবর এসেছে, সীমান্তের যুদ্ধে আমার দুই বন্ধু 'শহীদ' হয়েছে। গ্রামের কবরস্তানে গতকাল তাদের দাফন করা হয়েছে। মুহসিন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'বিশ্বাস করো, তারা খুব সৎ ছিলো। গ্রামে যুবকদের মধ্যে তারাই শুধু নামায পড়তো। তারা তো এ যুদ্ধ চায়নি, তবু তাদের প্রাণ দিতে হলো।'

আসলে কোন দেশেই সৈনিকরা যুদ্ধ চায় না, যুদ্ধ করেও না। কারণ যুদ্ধে তাদের কোন স্বার্থ নেই। যুদ্ধ হয় রাজায় রাজায়। ঢাল-তলোয়ার এবং বন্দুক-কামানের মত সৈনিকরাও যুদ্ধের সরঞ্জাম মাত্র। অস্ত্র ছাড়া যেমন যুদ্ধ হয় না, তেমনি সৈনিক ছাড়াও যুদ্ধ চলে না। তাই অস্ত্রের চাহিদা এবং সৈনিকের প্রয়োজন। পার্থক্য এই যে, যুদ্ধে প্রাণহীন অস্ত্রের কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু সৈনিকের সমস্যা এই যে, তার প্রাণ আছে, আবেগ-অনুভূতি আছে। সে যখন প্রাণ হারায় তখন তার স্ত্রী বিধবা হয়, সন্তান এতীম হয়। তার মা পুত্রশোকে পাথর হয়। তার মৃত্যুতে একটি পুরো পরিবার বিপর্যস্ত হয়। এভাবে হাজার হাজার সৈনিকের মৃত্যুতে নেমে আসে সামাজিক বিপর্যয়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ও দেখা যায়, রাজা বের হয়েছেন শিকারভ্রমণে। কারণ যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য মন প্রফুল্ল রাখার প্রয়োজন আছে!

এমন অর্থহীন যুদ্ধ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে হতে পারে এবং হয়, কিন্তু দুটি মুসলিম দেশের মাঝে, ভাইয়ে ভাইয়ে কীভাবে হয়, হতে পারে?!

***

হোটেল কক্ষে আমি তখন একা। ফোন বেজে উঠলো। অভ্যর্থনা থেকে বলা হলো, কেউ দেখা করতে চায়। একটু অবাক হলাম। কে হতে পারে এখানে আমার পরিচিত! বললাম, নীচে আসছি। গিয়ে তো আরো অবাক! মুহম্মদ! বাংলাদেশে ইরাকী দূতাবাসের 'ফার্স্ট সেক্রেটারী' ছিলেন। যেমন অমায়িক তেমনি আন্তরিক। ঢাকায় আমাদের বাড়ীতেও এসেছিলেন। আমার সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক ছিলো। তাই বলে এখানে এ অবস্থায় দেখা হবে, কল্পনা করিনি। তাছাড়া আমার জানা ছিলো না, তিনি এখন কোথায়! উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, আমাকে মনে আছে তোমার!

হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে বললেন, তোমাকে কি ভুলতে পারি! ওখানে তুমিই তো ছিলে আমার অন্তরঙ্গ! বাংলাদেশের 'বীতা' খেয়েছিলাম না তোমার বাড়ীতে! তোমার মায়ের হাতের তৈরী 'বীতা' কত স্বাদের ছিলো! কেমন আছেন তোমার মা-বাবা?

'বীতা' মানে পিঠা! তিনি এবং তার বন্ধু আব্দুল মজীদ আমাদের বাড়ীতে খেয়েছিলেন পাটিসাপটা পিঠা এবং মুগডাল বেটে বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন নকশা করে তৈরী চিনির সিরায় ভেজানো 'ফুলপিঠা'। সেই পিঠার কথা এমনভাবে বললেন, যেন স্বাদটা এখনো লেগে আছে তার জিভে; আমার বড় ভালো লাগলো।

মুহম্মদ বেশ আন্তরিকভাবে বললেন, 'তুমি আমার দেশে এসেছো, আর আসা হবে কি না, হলেও আমার সঙ্গে দেখা হবে কি না, জানি না। তাই তোমার জন্য ছোট্ট একটি 'প্রোগ্রাম' তৈরী করতে চাই, যাতে বাগদাদে তোমাকে দেখার স্মৃতি জাগরূক থাকে।'

মানুষ মানুষকে আরো সুন্দর কথা বলতে পারে এবং বলে, কিন্তু এর চেয়ে আন্তরিক-ভাবে, এমন হৃদয় ছুঁয়ে খুব কম মানুষই বলতে পারে।

হযরতের অনুমতি নিয়ে আমরা হোটেল থেকে বের হলাম। মুহম্মদকে জানালাম, বিকাল তিনটায় আমাকে ফিরতে হবে পরবর্তী কর্মসূচীতে শরীক হওয়ার জন্য।

মুহম্মদের বাড়ী বাগদাদের উপকণ্ঠে। অল্প সময়ের পথ, কিন্তু তিনি বাগদাদের বিপুল ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যে আমাকে মুগ্ধ করার জন্য বিভিন্ন পথ ঘুরে তারপর শহর থেকে বের হলেন।

মাঝশহরে আমাদের রমনার মত বিরাট উদ্যান, তবে সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত। মাটিতে সবুজের চাদর, তাতে বিভিন্ন ফুলের কারুকাজ! উপরে সবুজের শামিয়ানা, ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ। এককথায় মন স্নিগ্ধ করা পরিবেশ। সেখানে আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। কফি ও খেজুরের বিস্কিট খেলাম। গাছের ছায়ায় জুটি বেঁধে বসে আছে বিভিন্ন বয়সের ছেলে-মেয়ে ও নারী-পুরুষ। পর্দাহীনতা আছে, নগ্নতা নেই। এদিক থেকে আমরা মনে হয় একধাপ এগিয়ে গেছি। পর্দাহীনতার সীমানা ছাড়িয়ে আমরা এখন নগ্নতার সীমানায় চলে এসেছি। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 'বর্জ্য'রূপে প্রতিটি মুসলিম দেশেই এর অনুপ্রবেশ ঘটছে; পার্থক্য যা তা হলো গতি ও মাত্রায়।

উদ্যানে একটি সুন্দর লেক রয়েছে। খুব প্রশস্ত নয়, তবে এঁকে বেঁকে উদ্যানের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত গিয়েছে। দু'পাশে বৃক্ষের পরিকল্পিত সারি। লেকের পানিতেও পড়েছে গাছের ছায়া। সত্যি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! ছোট ছোট প্লাস্টিকের নৌকায় তরুণ-তরুণীরা ভেসে বেড়াচ্ছে। একদিকে তাদের কলহাস্য, অন্যদিকে পাখীদের কলরব। তাতে যেন মানুষে ও প্রকৃতিতে একটা মাখামাখি ভাব তৈরী হয়েছে!

এখানে যতক্ষণ ছিলাম, মনে হয়েছে কোথাও কোন যুদ্ধ নেই; হানাহানি, রক্তপাত নেই; এমনকি নেই হিংসা-বিদ্বেষ। আহা, সত্যি যদি এমন হতো! ইরান-ইরাক বুকে বুকে আলিঙ্গন করতো!

আখতার ফারূক সাহেবের মতে, ইরানে দৃশ্য অন্যরকম। শোকের, ক্রোধের ও প্রতিশোধের ছাপ রয়েছে মানুষের চেহারায়। এতে আমার দু'টি ধারণা হয়েছে; লোকক্ষয় ইরানে বেশী হচ্ছে, আর ইরাকের জনগণ যুদ্ধে আগ্রহী নয়। যুদ্ধটা চলছে

মূলত ইরাকের সুসজ্জিত ও সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী এবং ইরানের বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ ও স্বল্প প্রশিক্ষিত তরুণদের মাঝে, যাদের বলা হয় পাসদারানে ইনকিলাব। যুদ্ধের আগেই ধরা পড়ে গিয়েছিলো যে, বহু ইরানী জেনারেল আসলে সিআইএ-র অনুগত এজেন্ট। ফলে বাধ্য হয়ে তাদের সরিয়ে দিতে হয়েছে, কিংবা দিতে হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। ফলে সেনাবাহিনী হয়ে পড়েছে প্রায় নেতৃত্বহীন ও দক্ষতাশূন্য। তাছাড়া সমরাস্ত্রের মার্কিন সরবরাহ ছিলো বন্ধ, এমনকি যন্ত্রাংশের অভাবে ইরানের অধিকাংশ যুদ্ধবিমানই ছিলো অচল। সর্বোপরি যুদ্ধের সময় গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে জড়িত প্রেসিডেন্ট বনী ছদরের দেশ ছেড়ে পালানোর ঘটনা তো পৃথিবীর ইতিহাসেই বিরল। এ অবস্থায় এ যুদ্ধ যে চলছে এবং ইরান যে টিকে আছে সেটাই হলো বিস্ময়। এর একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে ইরানের তরুণসমাজের বিপ্লব-উন্মাদনা। তারা যুদ্ধ করতো শহীদ হওয়ার জন্য এবং আয়াতুল্লাহদের ভাষায় জান্নাতের টিকেট পাওয়ার জন্য। তাদের নীতিবোধও ছিলো অনেক উঁচু। যুদ্ধকালের একটি খবর পড়েছিলাম দৈনিক ইত্তেফাকে। একটি ইরানী বিমান পোল ধ্বংস করার জন্য 'ডাইভ' দিয়ে বোমা না ফেলেই উপরে উঠে এসেছিলো। কিছুক্ষণ পর পাইলট আবার 'ডাইভ' দিতে গেলে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়, আর পাইলট বন্দী হন।

তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি তো বোমা বর্ষণ করে নিরাপদে চলে যেতে পারতে। তুমি এমন করলে কেন?!

পাইলট বললেন, প্রথমবার যখন নীচে নেমে আসি তখন একটি গরুরগাড়ী পোল পার হচ্ছিলো!

যুদ্ধের অভিধানে এর নাম আত্মঘাতী ভাবাবেগ হলেও এটা ঘটেছিলো এবং বিশ্ব-প্রচারমাধ্যমে তা ব্যাপক প্রচার পেয়েছিলো।

এককথায় ইরান নেমেছে 'ধর্মযুদ্ধে', পক্ষান্তরে ইরাকের যুদ্ধ হলো শাতিল আরবের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য। ইরাক লড়ছে সমরশক্তির উপর, আর ইরান লড়ছে 'ইসলামী' বিপ্লবের শক্তির উপর। তাই ইরানকে এখনো কাবু করা সম্ভব হয়নি এবং হয়ত সম্ভব হবেও না। মাঝখানে শত্রুর হাতে পরাজিত হবে ইরাক, ইরান ও মুসলিম উম্মাহ।

আজ যখন এ সফরনামা লিখছি তখন ইরাক তো জ্বলে পুড়ে সারখার, ইরানেরও টুটি চেপে ধরার আয়োজন সম্পন্নপ্রায়। তখন না আরব জাতীয়তাবাদের পূজারী সাদ্দাম তা বুঝতে পেরেছিলেন, না ইসলামী বিপ্লবের উন্মাদনায় আত্মহারা খোমেইনী। হযরত হাফেজ্জী হুযূর উভয় নেতার সামনে শুধু চোখের পানি ফেলে এসেছিলেন।

***

মুহম্মদের বাড়ী দেখে আমি সত্যি অভিভূত! বাড়ী তো নয় যেন সুন্দর ছবি! চারপাশে খেজুরগাছ তো আছেই, আরো আছে ফল ও ফুলের বাগান। মধ্যখানে আকাশের শুভ্র মেঘের মত সুন্দর দ্বিতল বাড়ী। এখনো আমি এমন একটি সুন্দর বাড়ীর স্বপ্ন দেখি। কোন নদীর তীরে এমনই বাগানঘেরা একটি বাড়ী, যেখানে বসে আমি সাহিত্যের

সাধনায় নিমগ্ন হবো। আমার লেখার কামরাটি হবে নদীর দিকে। জানালাপথে দেখা যাবে নদী এবং নদীর ঢেউ, আর দেখা যাবে পাল তোল নাও। বাগানে পাখীর কোলাহল থাকবে, কিন্তু মানুষের শোরগোল থাকবে না। এ স্বপ্ন আমার পূর্ণ হয়নি, তবে সাহিত্যসাধনার আত্মিক আনন্দ আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। সেজন্য আল্লাহর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মুহম্মদের পরিবারের সবাই উষ্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করলো। মুহম্মদের বিধবা আম্মা বড় নেক খাতুন। সামনে এলেন না, পর্দার আড়াল থেকে সালাম ও কুশল বিনিময় করলেন এবং খুব স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, এ বাড়ীতে আমি আগন্তুক নই, পরিবারেরই একজন। মুহম্মদের স্ত্রী ও এক বোন, তাদের অবশ্য পর্দার 'বাধা' ছিলো না; থাকার কথাও নয়। কারণ তিনি হলেন প্রাচীন ইরাকের বাসিন্দা, আর এরা হলো আধুনিক ইরাকের সুশীল নাগরিক। এদিক থেকে অবশ্য ইরাক ও বাংলাদেশের মাঝে গুণগত তেমন কোন পার্থক্য নেই, বরং প্রতিটি মুসলিম দেশের চিত্রই মোটামুটি অভিন্ন।

মুহম্মদের ছেলে-মেয়ে সবাই ছোট। নতুন মেহমান পেয়ে ওরা খুব হৈচৈ করলো।

আমার অন্তরে একটি সুপ্ত ইচ্ছে ছিলো, ইরাকের দু'একটি পরিবারকে নিকট থেকে দেখবো এবং ইরাকের পারিবারিক জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করবো। এখানে সেই ইচ্ছেটা পূর্ণ হলো। আমার যদ্দুর মনে হয়েছে ইরাকী পরিবারে (এবং সম্ভবত অন্যান্য আরবদেশেও) ভাই-বেরাদরির সম্পর্ক এখনো যথেষ্ট মজবূত। চাচা ও চাচাতো ভাই এখনো তাদের কাছে অধিক আপন। পরিবারের বৃদ্ধ সদস্যরা খুব সম্মানিত। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও মতামতের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে পারিবারিক সিদ্ধান্তগুলোতে। দুপুরের খাবার ঘরে হবে না, বাড়ীর বাগানে, মুহম্মদের আধুনিকা স্ত্রী সে বিষয়ে মতামত নিলেন বিধবা শাশুড়ির এবং তার কথায় ছিলো শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি।

অপরিসীম আনন্দের মাঝে কেটে গেলো সময়। ছায়াঘেরা বাগানে বড় চাদর বিছিয়ে দুপুরের খাবার একসঙ্গে খাওয়া হলো। বয়ামে খেজুরের সিরা সেই প্রথম দেখলাম; ভেবেছিলাম মধু। দস্তরখানে এটার যথেষ্ট কদর ছিলো। বেশ আনন্দ ও তৃপ্তির সঙ্গেই আহারপর্ব সমাপ্ত হলো।

সামান্য সময়ের আতিথ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এই আরব পরিবারটি থেকে বিদায় নিতে অন্তরে আমি ব্যথার টান অনুভব করলাম। আজ পঁচিশ বছর পর জানি না বাগদাদের সেই সুখী পরিবারটির কী অবস্থা? সে বাড়ীতেও কি আগুন লেগেছে? পশুদের হিংস্র থাবা কি সেই পরিবারটিকেও ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে? জানি না; আমি শুধু শুভ কামনা করতে পারি।

ফেরার পথে মুহম্মদ আমাকে নিয়ে গেলেন বাগদাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ে । প্রথমে দেখলাম কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। বিশাল সংগ্রহ। আরবী, ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষার প্রচুর বই। বিষয়ভিত্তিতে সাজানো। ক্যাটালগব্যবস্থা অত্যাধুনিক। জিরাক্স মেশিন এর আগে দেখিনি। কীভাবে পুরোনো বই জিরাক্স করা হয় তা আমাকে দেখানো হলো।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে যা দেখলাম তা এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ইসলামী কুতুবখানার প্রতিনিধিত্ব ছিলো খুবই দুর্বল। পুস্তক সংগ্রহের ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বই সর্বাধিক। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাম্প্রতিকতম প্রকাশনা যেখানে গ্রন্থতালিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে সেখানে অনেক পুরোনো ইসলামী পুস্তকও দেখা গেলো অনুপস্থিত।

দুপুরের 'অসময়েও' অধ্যয়নকারী ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি ছিলো যথেষ্ট। শিক্ষকদের অধ্যয়ন-ব্যবস্থা আলাদা। মুহম্মদ আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। তার পরিচিত একজন বয়স্ক অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের প্রধান। নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করছেন। আমার বিঘ্ন ঘটানোর ইচ্ছা ছিলো না। মুহম্মদ সেটাই করে বসলেন। যদিও একজন জ্ঞানবৃদ্ধের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার আন্তরিক ইচ্ছা থেকেই তিনি তা করেছেন, তবু কাজটা ঠিক হয়নি।

তিনি বই থেকে মুখ তুলে তাকালেন, যেন অনেক কষ্ট করে, মৃদু হেসে মুছাফাহা করলেন যেন আরো কষ্ট করে। আমার এখনো মনে হয়, তার দৃষ্টিতে ছিলো নীরব তিরস্কার। আমি খুব কুণ্ঠিত হলাম। অল্পক্ষণেই কুশল বিনিময় ও বিদায়পর্ব সমাপ্ত হয়ে গেলো। আমি তার অধ্যয়নে বিঘ্ন ঘটায় দুঃখ প্রকাশ করলাম। তিনি সৌজন্য প্রকাশ করে বললেন, 'লা-হারাজ'! কিন্তু তার দৃষ্টির ভাষা পরিষ্কার বলছিলো, 'বিরাট হারাজ'!

মনে পড়লে এখনো লজ্জা বোধ করি যে, যে বিষয়টি আমার নিজেরই অত্যন্ত অপছন্দ সেটারই উপলক্ষ হয়ে গেলাম আমি দূর বিদেশে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জ্ঞানবৃদ্ধের সামনে।

মুহম্মদ আগেই যোগাযোগ করেছিলেন ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে। সেখানে কোন সমস্যা হয়নি। কারণ তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং আমরা সময়মত পৌঁছতে পেরেছিলাম। বাংলাদেশে আমি আরবী ভাষার খেদমত করি শুনে তিনি খুশী হলেন। আধুনিক আরবী সাহিত্যে আমার পড়াশোনার পরিধি জানার জন্যই যেন তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। ডঃ তোয়াহা হোসাইন আমার পছন্দের লেখক নয়, কথাটা তার পছন্দ হলো না। আমি তাকে শুনালাম সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবীর সেই বিখ্যাত মন্তব্য, তোয়াহা হোসাইন সর্বঅর্থেই 'আদব' থেকে মুক্ত।

তিনি জানতে চাইলেন, 'এমন অদ্ভুত মন্তব্যের কারণ?' আমি বললাম, 'একজন সাহিত্যিক হিসাবে তিনি কোরআনের সাহিত্য-সমালোচনা করবেন এবং কোরআনের সাহিত্যিক ত্রুটি চিহ্নিত করবেন, এটা হয়ত বরদাশত করা যায়, কিন্তু শালীনতা বর্জন করলে বলতেই হয়, তিনি 'বে-আদব'।'

তিনি আমাকে তার নিজের রচিত 'তাতাওউরুর-রিওয়ায়াতিল আরাবিয়্যাহ ফিল ইরাক' নামে একটি মোটা সমালোচনা গ্রন্থ উপহার দিলেন, এবং যথারীতি সেটা এখন আমার কাছে নেই।

***

ঠিক সময়েই আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। যারা মাযার যিয়ারাতে গিয়েছিলেন তারাও ফিরে এসেছেন কিছুক্ষণ আগে। হযরতের সঙ্গে আমরা কাযিমিয়্যা-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। হযরত জা'ফর ছাদিক (রহ)-এর পুত্র হযরত মূসা আলকাযিম-এর মাযার এখানে বলে পুরো এলাকার এ নাম। এটি দজলা নদীর পশ্চিম অংশ রাছাফায় অবস্থিত; তাই এবার আমাদের দজলা নদীর পোল পার হওয়ার সুযোগ হয়নি। আলাদা করে কথাটা বললাম এজন্য যে, দজলা নদীর পোল যতবার পার হয়েছি ততবারই প্রবহমান নদীর দিকে নতুন পুলক, নতুন শিহরণ ও নতুন আবেগ অনুভব করেছি। আজও মুহম্মদের সঙ্গে দু'বার দজলা নদী পার হয়েছি এবং একবার গাড়ী থামিয়ে পোলের উপর দাঁড়িয়ে বয়ে যাওয়া নদীর সৌন্দর্য এবং হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের বেদনা অনুভব করেছি। আজ এত বছর পর এত দূর থেকে দজলা নদীর বেদনা আবার আমাকে ভীষণভাবে দগ্ধ করছে। কারণ তাতারী বর্বরতার পর এই প্রথম আবার দজলার পানিতে ইরাকী মুসলমানদের লাশ ভেসে যাওয়ার খবর শুনতে পাচ্ছি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা হযরত মূসা আলকাযিম (রহ)-এর মাযারে পৌঁছে গেলাম। মাযারের সৌধ খুব জাঁকজমকপূর্ণ। সেটা না হয় মেনে নেয়া গেলো, কিন্তু আফসোস, সেখানে এমন সব প্রকাশ্য শিরক ও বিদ'আত ছিলো যা এই মাযারের বাসিন্দার রূহকে নিঃসন্দেহে কষ্ট দেয়। আমাদের কিছুই করার ছিলো না। শিরক-বিদ'আতের সর্বনাশা সায়লাবের মুখে আমরা তো নিজের দেশেও অসহায়।

তাকওয়া ও ধার্মিকতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং উন্নত নৈতিকতা ও চারিত্রিক পবিত্রতায় মহান নবীপরিবারের তিনি ছিলেন উজ্জ্বল তারকা এবং সমকালীন মুসলিম উম্মাহর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কেন্দ্র। ইলমে হাদীছেও তিনি ছিলেন বরেণ্য ইমাম। তাঁর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আমি বেদনায় স্তব্ধ হয়ে থাকলাম, তাঁকে যখন মদীনা ছেড়ে বাগদাদে আসতে বাধ্য করা হয়, তাঁর অন্তর তখন কেমন বেদনাদগ্ধ হয়েছিলো! মদীনায় নানাজানের রওযা শরীফ ছিলো তাঁর সান্ত্বনা; বাগদাদে ছিলো শুধু নিঃসঙ্গতা। বিদ্রোহের অমূলক আশংকায় খলীফা আলমাহদী তাঁকে বাগদাদে নিয়ে আসেন। পরে স্বপ্নযোগে হযরত আলী (রা)-এর তিরস্কারে ভীত হয়ে তাঁকে মুক্তি দেন এবং সসম্মানে মদীনায় পৌঁছে দেন। পরবর্তীতে একই অন্যায় করেন খলীফা হারূনুর-রাশীদ। দ্বিতীয়বার তাঁকে আনা হয় বন্দীবেশে। বাগদাদের বন্দীজীবনেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর অন্তরে তখন ব্যথা-বেদনার কেমন ঢেউ ছিলো তা কিছুটা বোঝা যায় মৃত্যুর পূর্বে খলীফার নামে লেখা তাঁর সংক্ষিপ্ত, অথচ সারগর্ভ সেই ঐতিহাসিক পত্র থেকে, যা আরবী সাহিত্যের অনন্য সৃষ্টিরূপে স্বীকৃত, যাতে একদিকে রয়েছে গভীর মর্মবেদনার 'শান্ত' প্রকাশ, অন্যদিকে রয়েছে যালিমের প্রতি কঠিন সতর্কবাণী। তিনি বলেন–

'আমার দুঃখের প্রতিটি দিন তোমার সুখের একটি করে দিন সঙ্গে করে বিদায় হচ্ছে। সুতরাং দুঃখেরও শেষ হবে এবং সুখেরও অবসান হবে। তারপর আমাদের সামনে আসবে এমন এক সময়, যা কখনো শেষ হবে না। সেদিন ধ্বংস তাদের জন্য যারা অন্যায়ের উপর রয়েছে।'

৫ই রজব ১৬৩ হিজরীতে তাঁর ইনতিকালে বাগদাদ যেভাবে শোক প্রকাশ করেছিলো, আকাশে বাতাসে কান্নার যে রোল উঠেছিলো তা প্রমাণ করে যে, মূসা আলকাযিম বন্দী ছিলেন না, বন্দী ছিলেন খলীফা হারূন রাশীদ নিজেরই হাতে নিজে।

যিয়ারাতের পর অন্তরের অন্তস্তল থেকে আল্লাহর দরবারে এই মুনাজাত করলাম, হে আল্লাহ! আমার কলবে তুমি তোমার পেয়ারা হাবীবের মুহাব্বাত দান করো; তোমার নবীর আহলে বাইতের প্রতি মুহাব্বাত দান করো এবং সেই মুহাব্বাতের সঠিক প্রকাশ আমার জীবনে দান করো। নবী ও নবীপরিবারের মুহাব্বাত যেন হয় আখেরাতে আমার নাজাতের ওয়াছীলা।

হযরত মূসা আলকাযিম (রহ)-এর কবর যিয়ারাতের পর আমাদের হযরত আশ্চর্য এক মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন, 'আমার দিল বলছে, এটা যেন জান্নাতুল বাকীর একটি হিস্‌সা। জান্নাতুল বাকীর সঙ্গে যেন এই কবরের নিসবত রয়েছে।'

যিয়ারাতের পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম বেদনাদায়ক সব দৃশ্য। শিয়াসম্প্রদায় মূসা আলকাযিমকে মনে করে তাদের বারো ইমামের একজন। তাই মাযারে সবসময় তাদের হুজুম লেগেই আছে। উচ্চস্বরে ক্রন্দন তো স্বাভাবিক, কিন্তু কেউ জালি চুম্বন করছে, কেউ উপুড় হয়ে সিজদা করছে, আর মাযারের ভিতরে লাগাতার 'মুদ্রাবর্ষণ' করছে। যেন মাযারওয়ালার রূহকে কষ্ট দিয়েই তারা রূহানি ফয়েয হাছিল করবে। হায়, এখানে শায়িত মহান ব্যক্তির যদি কথা বলার শক্তি থাকতো!

***

হযরত মূসা আলকাযিম (রহ)-এর মাযার-সীমানায় যে মসজিদ তার নাম জামে আবু ইউসুফ। মসজিদের একপার্শ্বে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ)-এর মাযার। হযরতের অনুগমন করে আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। মানুষ যেভাবে ফুলের ঘ্রাণ নেয়, হযরত যেন ইমাম আবু ইউসুফ (রহ)-এর কবর থেকে সেভাবে ইলমের ঘ্রাণ নিলেন। তাঁর হালাত দেখে এ উপমাটাই আমার মনে হলো।

ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর পর ইসলামী উম্মাহ ইমাম আবু ইউসুফ (রহ)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মহাঋণ থেকে কখনো মুক্ত হতে পারবে না। এই মহান ছাত্রের মাধ্যমেই ইমাম আ'যম ছাহেবের ফিকহী মাযহাব সুসংহত রূপ লাভ করেছে এবং মুসলিমবিশ্বে তা এমন ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। সর্বোপরি সুদীর্ঘ কাল ইসলামী জাহানের প্রধান বিচারপতিরূপে হানাফী ফিকাহকে তিনি তাত্ত্বিকতার স্তর থেকে বাস্তবতার মজবুত বুনিয়াদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ) তো ভবিষ্যতের ইমামরূপে নিজ হাতে তাঁকে গড়ে তুলেছিলেন।

ইলমে ফিকাহর পর ইলমুল হাদীছেও তাঁর উচ্চ মরতবা ছিলো সর্বস্বীকৃত। এমনকি অজ্ঞতাবশত যারা ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর হাদীছজ্ঞান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন তারা পর্যন্ত হাদীছের ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ)-এর অগাধ জ্ঞানের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়েছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তো এত দূর বলেছেন যে, তাঁর হাদীছ-শিক্ষার বিসমিল্লাহই হয়েছে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ)-এর হাতে।

আপ্লুত হৃদয়ে আমি যখন এই মহান ইমামের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো তাঁর জীবনের স্মরণীয় বিভিন্ন ঘটনা। আমি যেন দেখতে পেলাম সেই এতীম বালককে যার হাতে দিরহামভর্তি থলিয়া দিয়ে স্নেহশীল উস্তায ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলছেন, নাও খরচ করো, শেষ হলে আবার চেয়ে নিয়ো। কিন্তু চাওয়ার প্রয়োজন হয়নি কখনো। কারণ শেষ হওয়ার আগেই উস্তায আবার তা পূর্ণ করে দিতেন।

আমি যেন দেখতে পাচ্ছি সেই দৃশ্য যখন এতীম বালকের উৎকণ্ঠিতা মাকে সান্ত্বনা দিয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলছেন, 'তোমার পুত্র তো একদিন পেস্তা ও ঘী দ্বারা তৈরী ফালুদা খাবে।'

ফালুদা ছিলো খলীফা হারূন রাশীদের দস্তরখানের দুর্লভ খাদ্য। ইমাম আবু ইউসুফ একদিন সেই ফালুদা দেখে খলীফাকে বললেন, আজ আল্লাহ আমার উস্তাযের কথা পূর্ণ করেছেন।

ঘটনা শুনে বিস্মিত খলীফা বললেন, ইমাম আবু হানীফাকে আল্লাহ রহম করুন। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যা দেখতেন মানুষ তাদের স্থূল চোখে কীভাবে তা দেখতে পাবে!

এখানে দাঁড়িয়ে আমি যেন সেই ঐতিহাসিক বিচার দরবার দেখতে পেলাম যেখানে খলীফাতুল মুসলিমীনের পুত্র মূসা ইবনুল মাহদীকে তলব করা হলো আসামীরূপে এবং সন্দেহবশত রদ করা হলো খলীফার পক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্য। ফলে খলীফাকে মেনে নিতে হলো বাদীপক্ষের দাবী।

আমি যেন দেখতে পেলাম মৃত্যুশয্যায় শায়িত ইমাম আবু ইউসুফকে, যিনি তখনো একটি মাসআলা আলোচনা করছেন, আর বলছেন, 'না জেনে কবরে যাওয়ার চেয়ে জেনে কবরে যাওয়া ভালো।' যার সঙ্গে মাসআলা আলোচনা করছিলেন তিনি দরজা পর্যন্ত না যেতেই ইমাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

ইসলামী জাহানের সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রধানবিচারপতির কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি লজ্জিত মনে ভাবলাম, আজ যারা ইমাম আবু ইউসুফের উত্তরসূরী তাদের কি রয়েছে ইসলামী বিচারব্যবস্থা পরিচালনার ন্যূনতম যোগ্যতা! আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কি পেরেছে এমন যোগ্যতা অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে!

বড় স্থানে দাঁড়ালে ছোট মনেও বড় চিন্তা করার সাহস জাগে। আর আল্লাহর রহমত তো অনেক সময় বড়-ছোটর সীমারেখাও মুছে ফেলে। এই মহান ইমামের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাই আমি সাহস পেলাম এই প্রতিজ্ঞা করার, সারা জীবন সাধনা

করবো আমি আমার দেশে শিক্ষাব্যবস্থার এমন সংস্কারের যা উম্মাহকে উপহার দিতে পারে যুগের ইমাম আবু ইউসুফ! হে আল্লাহ! তুমি তাওফীক দাও, শক্তি দাও।

জামে আবু ইউসুফে আছর পড়ে হযরতের সঙ্গে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

***

মুহম্মদ বললেন, চলো তোমাকে দজলা নদীর সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য দেখাবো। আমার মনের ইচ্ছেটাই যেন তার মুখে উচ্চারিত হলো। তাই স্বানন্দে রাজী হলাম। হযরতও খুশিমনে ইজাযত দিলেন।

দজলার উভয় তীরে বহু বিনোদনকেন্দ্র। গভীর রাত পর্যন্ত এসকল স্থানে বিনোদন প্রেমিকদের সমাগম থাকে। দজলা-তীরের বিনোদন অবশ্য শুধু আধুনিক বাগদাদের নয়, প্রাচীন বাগদাদেরও বৈশিষ্ট্য ছিলো। আব্বাসী যুগের সাহিত্যে এবং বিশেষত আবু নাওয়াসের কাব্যসমগ্রে এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

এখানে শিশুদের জন্য আছে শিশু-উদ্যান, তাতে খেলাধুলার এমন সব বিচিত্র উপকরণ, আমাদের দেশে যা কল্পনাও করা যায় না।

কিছু কিছু স্থান অপেক্ষাকৃত নির্জন। একটু দূরে হলেও নির্জনতা যাদের ভালো লাগে তারা সেখানে চলে যায়। নিরাপত্তা ও শান্তিশৃঙ্খলা এখানে, বাগদাদে এবং সমগ্র ইরাকে এত সুসংহত যে, সাধারণ অপরাধও শূন্যের কোঠায়। তাই গভীর রাত পর্যন্ত নারী-পুরুষ ও তরুণ-তরুণীরা এখানে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ায়।

সবচে' আনন্দের বিনোদন হলো ছোট ছোট স্পীডবোটে দজলার বুকে ছুটে বেড়ানো। প্রতিটি বিনোদনকেন্দ্রেই রয়েছে স্পীডবোট ভাড়া নেয়ার ব্যবস্থা। যারা স্থায়ী সদস্য এবং স্পীডবোট চালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তারা নিজেরাই চালাতে পারে, অন্যথায় সঙ্গে চালক নিতে হয়। মুহম্মদ দুই সিটের একটি বোট ভাড়া নিলেন এবং আমরা দজলার পানিতে ভাসলাম। দজলার বুকে তখন বিদায়ী সূর্যের সোনালী আলো পড়েছে। অসংখ্য স্পীডবোট ছোটাছুটি করছে। কোনটা ধীর গতিতে, কোনটা দ্রুত গতিতে, আর কোনটা তীরবেগে। দীর্ঘস্থায়ী এবং অনিশ্চয়তাপূর্ণ একটি যুদ্ধের দেশে এমন আনন্দমুখর পরিবেশ কল্পনাও করা যায় না। এটা ভালো, না মন্দ, বলা সহজ নয়, তবে বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক।

মুহম্মদ ধীরে ধীরে গতি বাড়াতে লাগলেন এবং একসময় গতি এমন তীব্র হলো যে, আমার রীতিমত ভয় ধরার অবস্থা। চালকের আসনে মুহাম্মদ কিন্তু বেশ হাসিমুখ। বোঝা গেলো, এ বিষয়ে তিনি অভ্যস্ত এবং সিদ্ধহস্ত। ইরাকে সরকারী কর্মকর্তাদের শুনেছি সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে আমি বেচারা মাদরাসার নিরীহ এক 'হুজুর'। আগে জানলে হয়ত পানিতেই নামতাম না, কিন্তু এক বিদেশীর সামনে এখন তো আর ভীরুতা প্রকাশ করা চলে না; তাই চেহারায় যথাসম্ভব 'কুছ নেহী' ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম। তাতে ভয়টা কেটে গিয়ে একধরনের রোমাঞ্চের অনুভূতি সৃষ্টি হলো। এদিকে গতি আরো বাড়লো। লক্ষ্য করলাম, অনেকেই যেন অলিখিত এক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। মুহম্মদ জানালেন, এভাবে মাঝে মধ্যে দুর্ঘটনাও

ঘটে। তবে তার ভাষায়, ঘটনা ও দুর্ঘটনাই তো জীবন। আমি মৃদু হেসে বললাম, বরং ঘটনা ও দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণই হলো জীবন।

নদীতে আমি নৌকা ভ্রমণ করেছি, লঞ্চে পদ্মা-মেঘনা পাড়ি দিয়েছি, বড় জাহাজেও চড়েছি। সে সবই ছিলো আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। কিন্তু আজকের আনন্দ এবং অভিজ্ঞতা দু'টোই অন্যরকম। ভয়, শিহরণ, পুলক, উৎকণ্ঠা সবকিছুর অদ্ভুত একটা মিশেল। এটা শুধু অনুভব করা যায়, শব্দে প্রকাশ করা যায় না।

প্রাচীন বাগদাদে আমীর-ওমরারা নাকি দজলার বুকে শানদার বজরায় ঘুরে বেড়াতেন। চাঁদনি রাতে শাহী মহলের শাহযাদিরাও নাকি দজলার ঝিলমিল পানিতে নৌবিহার করতেন। কিন্তু এখনকার এই যে গতির আনন্দ, সেটা ছিলো তাদের কল্পনারও অতীত। আবার আগামী যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষকে যে গতি দান করতে যাচ্ছে তার তুলনায় আজকের গতিকেও হয়ত মনে হবে শম্বুক গতি। অথচ প্রত্যেক যুগের মানুষ নিজের গতি ও শক্তি নিয়ে কত না গর্বিত! এটা হয় শুধু আগামী দিন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে। দজলার বুকে আজ এই যে গতির ঢেউ, নীলনদের ফিরআউন কি তা কল্পনাও করতে পেরেছিলো! কতটুকু উচ্চতায় সে খুঁজতে গিয়েছিলো মূসার ইলাহকে? এখন তো আমরা আরো অনেক উচ্চতা থেকে দেখতে পাই পৃথিবীকে! মানুষ তো এখন মহাশূন্যের অভিযাত্রী! অজ্ঞতা ছাড়া আর কী কারণ ছিলো ফির'আউনের 'আনা রাব্বুকুমুল আ'লা' দাবীর পিছনে, যার আস্পর্ধা এযুগের মহাশূন্যচারী মানুষ পর্যন্ত করতে পারে না! অজ্ঞতা, শুধু অজ্ঞতা!

একসময় খেয়াল হলো, আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। নদীর উভয় তীরে এখন আর শহরের চিহ্ন নেই। সূর্য এখন একটি লাল থালা। দজলার পানিতেও সেই লালের আভা। স্পীডবোটের সংখ্যা এদিকে অনেক কম। প্রকৃতির এমন সুন্দর দৃশ্য জীবনে খুব কম দেখেছি। অন্তত আজকের এ আনন্দঘন মুহূর্তটির জন্য দজলাকে আমার মনে পড়বে। মুহম্মদ ধীরে ধীরে গতি কমালেন; আমরা নদীর তীরে নামলাম। তিনি বললেন, এখান থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য খুব সুন্দর উপভোগ করা যায়। আসলেও তাই। নদী এখানে বাঁক নেয়ার কারণে মনে হয় সূর্যটা যেন নদীতে ডুবে যাচ্ছে। অপূর্ব! সত্যি অপূর্ব! এমন একটি সুন্দর দৃশ্যের জন্য সূর্যের স্রষ্টার উদ্দেশ্যে আমার সিজদায়ে শোকর।

সুবহানাল্লাহ! পরের দৃশ্য যে আরো সুন্দর! অর্ধেকটা সূর্য যেন পানিতে ডুবে আছে, বাকি অর্ধেকটা জেগে আছে পানির উপরে! একসময় পুরো সূর্যটাই ডুবে গেলো দজলার পানিতে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আমি উপভোগ করলাম সে দৃশ্য। যে সূর্যের অস্ত যাওয়ার দৃশ্য দেখে আমরা এত মুগ্ধ সে সূর্য নিজেও তো আল্লাহর তাসবীহ পড়ে! যে দজলার বুকে গতির ঢেউ তুলে আমাদের এত আনন্দ তার স্রোতে তরঙ্গেও তো শোনা যায় সুবহানাল্লাহর সুমধুর ধ্বনি! 'ওয়ালাকিন লা তাফকাহূনা তাসবীহাহুম।' তাহলে সৃষ্টির সৌন্দর্য অবলোকন করে কেন আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করবো না! কেন আল্লাহর নামে তাসবীহ পাঠ করবো না!

বিশ পঁচিশজন মানুষ আমরা সেখানে মাগরিব আদায় করলাম। দজলা নদীর তীরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে সবুজ ঘাসের জায়নামাযে সেটাই ছিলো আমার জীবনের একমাত্র সিজদা। নামাযের পর প্রায় নির্জন সেই নদীর তীরে মুক্ত নির্মল বাতাসে আমরা অনেক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। মুহম্মদ তখন তার জীবনের অনেক কথা বলেছিলেন আমাকে। সেসব কথা এখন আর মনে নেই, সেই সব অনুভূতিও স্মরণে নেই। স্মৃতিতে রয়ে গেছে শুধু ঝাপসা কিছু ছবি। কিন্তু দজলার স্রোত যেন এখনো আমি দেখতে পাই; এখনো শুনতে পাই দজলার তরঙ্গ ধ্বনি। আর সুন্দর মনের সেই মানুষটির ভালোবাসার উষ্ণতা এখনো আমি অনুভব করি।

রাতের দজলা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপ ধারণ করেছে। চারদিকে শুধু আলোর ছোটাছুটি। মানুষ দেখা যায় না, শুধু যেন আলোরা মেতে উঠেছে আনন্দে! বড় সুন্দর দৃশ্য! দজলা কত দিন ধরে বয়ে চলেছে; কত দিন ধরে বয়ে যাবে! নদীও থেমে নেই, মানুষও থেমে নেই। নদীর গতি সাগর-অভিমুখে, মানুষের গতি! দজলাতীরের সমৃদ্ধ বাগদাদ নগরীতে যারা বাস করে কোন্ দিকে তাদের গতি? রক্তের স্রোতে কোথায় ভেসে চলেছে তারা? তেহরানের পাশেও কি আছে কোন নদী?

সন্ধ্যার বেশ পরে আমরা বিনোদনকেন্দ্রে ফিরে এলাম এবং একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন রেস্তোঁরায় খোলা চত্বরে বসলাম। মুহম্মদ বললেন, তোমাকে দজলা নদীর সুস্বাদু মাছ খাওয়াবো। এ মাছ শুধু দজলাতেই পাওয়া যায়। তোমাদের দেশের 'ইলছা' অবশ্য আরো সুস্বাদু, তবে দজলার স্বাদও তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

তিনি আরো বললেন, এক্ষেত্রে রান্নার বিষয়টি অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ। ইলছা আমি অনেক খেয়েছি, কিন্তু তোমার আম্মার হাতের রান্না ছিলো অন্যরকম! যদি সুযোগ পাই, অন্তত ইলছার স্বাদ গ্রহণের জন্য আবার বাংলাদেশে যাবো এবং তোমার আম্মার হাতের রান্না খাবো।

পঁচিশ বছর পর আমার আব্বা এখন দুনিয়াতে নেই; আম্মা আছেন, কিন্তু তাঁর হাতের রান্না নেই। দজলার মুহম্মদকে আবার যদি পদ্মার ইলিশের স্বাদ চাখাতে পারতাম, ভালো লাগতো; কিন্তু এসব কল্পনাও এখন রীতিমত পরিহাস। এখন তো বাগদাদ জ্বলছে এবং সে আগুনের ধোঁয়া এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ রক্ষা করুন বাগদাদকে এবং মুসলিম জাহানকে যামানার হালাকু খানের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আগুনে সেঁকা সেই মাছ এসে গেলো। নামটা এখন মনে নেই। তবে মোটামুটি সুস্বাদুই ছিলো। খেলামও মজা করে। তারপর কিছু সুন্দর সময়ের কিছু সুন্দর স্মৃতি বুকে ধারণ করে ফিরে এলাম হোটেলে।

***

পরদিন সকালে হঠাৎ জানানো হলো, ধর্মমন্ত্রী জরুরী বৈঠকের জন্য অপেক্ষা করছেন। এখনই যেতে হবে। এই তাড়াহুড়া আমার কাছে অদ্ভুত মনে হলো। কারণ তাদের জানা ছিলো আমাদের হযরত বয়োবৃদ্ধ মানুষ। অন্তত শারীরিক দিক থেকেও প্রস্তুতির জন্য তাঁর কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। যাই হোক, হযরত সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হলেন।

মাননীয় মন্ত্রী হযরতকে স্বাগত জানালেন এবং কুশল বিনিময়ের পর ফলফলাদি দ্বারা আপ্যায়ন করলেন।

রাজনীতি বা কূটনীতি আমার বিষয় নয়, তবু মন্ত্রীর আচরণে আমি একটা 'গন্ধ' পেলাম। কেন জানি মনে হলো, কোন কারণে তিনি অস্বস্তিতে আছেন। এর মধ্যে আচমকা প্রশ্ন করে বসলেন, জনাব আব্দুল মান্নান সম্পর্কে আপনাদের কী মতামত? অদ্ভুত প্রশ্ন! তার চেয়ে যদি জিজ্ঞাসা করতেন, হোটেল মেরিডিয়ান কত তালা, এতটা অবাক হতাম না। ভাবতাম, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার আগে খোশমেজাজের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর এ কেমন উদ্ভট প্রশ্ন! আরো বেশী অবাক হলাম হযরতের পক্ষ হতে যিনি জওয়াব দিলেন তার কথায়! তিনি বললেন, ইরাকে থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। বাংলাদেশের জনগণ তার কীর্তিকর্ম সম্পর্কে অবগত।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কারণ এ জবাব ছিলো হযরতের উপস্থিতিতে এবং তাঁর পক্ষ হতে। স্বভাবতই পরিবেশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো। আশ্চর্য, এটাই কি ইরাকের মাননীয় ধর্মমন্ত্রীর জরুরী বৈঠকের নমুনা! আর এটাই কি হযরতের সফরসঙ্গীদের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার নমুনা!

কিছুক্ষণ পর মন্ত্রীমহোদয় ঘড়ি দেখে বললেন, আমরা এখন কাছরে জামহুরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো। মহামান্য প্রেসিডেন্ট শায়খের জন্য অপেক্ষা করছেন।

আবার অবাক হওয়ার পালা। এভাবে ঘোর পথের কী প্রয়োজন ছিলো? হযরতকে সরাসরি কেন বৈঠকে নেয়া হলো না এবং বৈঠকের কথা আগে কেন জানানো হলো না? বাংলাদেশে হযরতের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে ইরাক সরকার কি অবগত নয়?

যাই হোক ঘটনা নিজস্ব গতিতেই এগিয়ে চললো। গাড়ী-বহর রওয়ানা হলো কাছরে জামহূরিয়ার উদ্দেশ্যে। সুরক্ষিত বিশাল প্রাসাদ। অনেকগুলো নিরাপত্তা-বেষ্টনী পার হয়ে আমরা পৌঁছলাম প্রাসাদের অভ্যন্তরে। সেখানেও অতিক্রম করতে হলো অত্যন্ত নিবিড় পর্যবেক্ষণ। তারপর অপেক্ষা-কক্ষ। সেখানে এক নতুন বিস্ময়! জনাব আব্দুল মান্নান বসে আছেন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে। হযরতকে দেখে নড়লেন-চড়লেন না। হয়ত শারীরিক কষ্ট ছিলো, কিন্তু আমাদের বিস্ময়ের কারণ হলো, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হযরতের বৈঠকের মুহূর্তে তিনি এখানে কেন? মাননীয় ধর্মমন্ত্রী কি আসলে তাঁর সীমাবদ্ধতার ভিতরে থেকে আমাদের কোন বার্তা দিতে চেয়েছিলেন? কেন জানি মনে হলো, বড় কোন দুর্ঘটনা অপেক্ষা করছে, যা হযরতের জন্য সুখকর হবে না। পুরো সফরে হযরতের মুখপাত্ররূপে যিনি দায়িত্ব পালন করেছেন, মাওলানা আযীযুল হক ছাহেব, তাঁকে আমার আশঙ্কার কথা জানালাম। তিনি বললেন, কিছু না। হয়ত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাদের বৈঠক আমাদের আগে বা পরে হওয়ার কথা আছে। আমি বললাম, 'তারা' কোথায়? এখানে তো শুধু 'তিনি'! মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ছাহেব আমাকে সমর্থন করে বললেন, 'আগেই বিষয়টির ফায়ছালা হওয়া উচিত। মনে হয়,

এটা বৈঠক বানচাল করার কোন ষড়যন্ত্র। কিন্তু আশ্চর্য, হযরতের সফরসঙ্গীদের কেউ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেন না।

সভাকক্ষে প্রবেশের জন্য নাম ঘোষণার সময় আবার তাজ্জব হওয়ার পালা। প্রথমে জনাব আব্দুল মান্নান, তারপর হযরত হাফেজ্জী হুযূর। খান ছাহেব তখন আবার জোর দিয়ে বললেন, আমাদের উচিত এভাবে সভাকক্ষে না যাওয়া। কিন্তু মাওলানা আযীযুল হক ছাহেব বললেন, এখন এসব চিন্তা করার সময় না।

বুঝতে পারলাম না, চিন্তা করার সময়টা তাহলে কখন? আমরা চিন্তা না করেই প্রবেশ করলাম। বসার ব্যবস্থা হলো নাম ঘোষণা অনুযায়ী। অর্থাৎ প্রতিনিধিদলের অঘোষিত প্রধান হয়ে গেলেন জনাব আব্দুল মান্নান! ইরাকী কর্মকর্তারা যখন গ্রুপফটো তোলার আয়োজন করলেন তখন মাওলানা আযীযুল হক ছাহেব এই বলে প্রতিবাদ করলেন, 'ঐ লোক' আমাদের 'শান্তিমিশনের' সদস্য নয়, সুতরাং তার সঙ্গে গ্রুপফটোতে আমরা রাজী নই।

বুঝলাম না, এটা কেমন বেমক্কা প্রতিবাদ! আমরা তো নাম ঘোষণা অনুযায়ী প্রবেশ করেছি এবং সেভাবেই আসন গ্রহণ করেছি। তাহলে সেভাবে ফটো তুলতে আপত্তি কেন? তাছাড়া এবং সেটা আরো গুরুত্বপূর্ণ। ছবি সম্পর্কে শরীয়াতের মাসআলা এবং উলামায়ে হিন্দের মাসলাক কী? থানবী (রহ)-এর সিদ্ধান্ত এবং আমাদের হযরতের আচরণ কী? আর আমরা কী করছি? এর জবাব সুখকর নয়, সুতরাং তা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

পরিস্থিতি সম্পর্কে হযরত ছিলেন অনবগত। কিন্তু যখন দেখলেন ক্যামেরা প্রস্তুত তখন এখানেও তিনি সেই প্রিয় দৃশ্যটির অবতারণা করলেন যা সারা বিশ্বকে মুগ্ধ করেছে, বরং বিশ্ব শুধু এই একটি দৃশ্য থেকে হাতে কলমে জানতে পেরেছে, ছবি সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান কত কঠোর! তিনি রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। কর্মকর্তারা তখন অবাক হয়ে তাদের যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিলেন।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইন সদলবলে সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণের জন্য আমি সবকিছু ভুলে এই আশ্চর্য মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচে' আলোচিত ব্যক্তিদের একজন তিনি। সৈনিকসুলভ সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন। প্রতিটি পদক্ষেপে সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও আভিজাত্যের বিচ্ছুরণ। তার সম্পর্কে যা যা বলা হয়েছে তার কিছুই দেখা গেলো না তার অভিব্যক্তিতে। দাম্ভিকতার লেশমাত্র নেই, না চলায়, না বলায়; না আচরণে, না উচ্চারণে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট তোয়াহা ইয়াসীন রামাযান এবং তথ্যমন্ত্রী ও ধর্মমন্ত্রী। আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, যেভাবে আসন সাজানো হয়েছে সেভাবে নয়, বরং প্রেসিডেন্ট প্রথমে মোছাফাহা করলেন হযরত হাফেজ্জী হুযূরের সঙ্গে এবং বেশ কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন। তার অভিব্যক্তিতে ভক্তি ও শ্রদ্ধার অভিপ্রকাশই দেখতে পেলাম। তারপর তিনি সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময় করলেন মাওলানা আযীযুল হক, জনাব আব্দুল মান্নান ও অন্যান্যের সঙ্গে।

আলোচনার শুরুতেই প্রেসিডেন্ট যুদ্ধের প্রচণ্ড ব্যস্ততার কারণে সাক্ষাতের জন্য সময় দিতে বিলম্ব ঘটায় দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং জানতে চাইলেন, ইরাক সফরের দিনগুলো কেমন কাটছে।

প্রেসিডেন্টের কথার সূত্র ধরে হযরত তাঁর আলোচনা শুরু করলেন এভাবে, 'সফরের দিনগুলো সুন্দর কাটছে এবং আপনার আন্তরিক মেহমানদারির জন্য শুকরিয়া। তবে যেহেতু আমার আসল উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করা, সেহেতু আমি আজকের বৈঠকের জন্য বেচায়ন ছিলাম।

প্রেসিডেন্ট বললেন, দেখুন, আমি তো যুদ্ধ বন্ধ করতে চাই। সেজন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সকল ফোরামে নিঃশর্ত যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব দিয়ে আসছি। ইরান তো কোন প্রস্তাবেই সাড়া দিচ্ছে না। তাদের এক কথা, সাদ্দামের পতন ছাড়া যুদ্ধ বন্ধ হবে না। এ অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমি কী করতে পারি?

হযরত বললেন, আমরা সবাই মুসলমান। আমাদের শাসনব্যবস্থা হলো কোরআন ও সুন্নাহ। আপনি আপনার দেশে কোরআন ও সুন্নাহর শাসন ঘোষণা করুন; ইরান তার ক্ষতিপূরণের দাবীসহ সমস্ত শর্ত প্রত্যাহার করে নিঃশর্ত যুদ্ধ বন্ধে প্রস্তুত আছে।

এ পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, দেখুন, ইরানের খোমেইনীর আদেশে আমি ইসলামী হুকুমত কায়েম করবো না। আমাদের শাসনব্যবস্থা আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়। তাতে হস্তক্ষেপের অধিকার কারো নেই।

হযরত কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, আমি আপনার দ্বীনী ভাই এবং আমি শুধু সেই দৃষ্টিতেই কথা বলছি। আমি যা বলছি তা ইরানের বা খোমেইনীর শর্ত নয়। এটা আমার নিজের প্রস্তাব এবং খোমেইনী তা গ্রহণ করেছেন। এখন আপনি কবুল করলেই আমি আগে বাড়তে পারি। আমি উভয় দেশকে আল্লাহর রজ্জু ধরে এক হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছি।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম বললেন, যুদ্ধ বন্ধের জন্য আমার প্রস্তাব হলো, ইরান এবং ইরাক পরস্পরের স্বার্বভৌমত্ব স্বীকার করবে। একে অপরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না এবং কেউ কারো উপর নিজের শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দেবে না। ইরান এই তিন শর্ত মেনে নিলে যুদ্ধ বন্ধ করতে আমার কোন আপত্তি নেই। আপনি ইরানকে এই তিন শর্তে রাজী করাতে চেষ্টা করুন।

হযরত বললেন, দেখুন, আমি কারো শর্ত কাউকে মানাতে এই সফরে বের হইনি। আমার বয়স দেখুন। তা এমন সফরের উপযোগী নয়। আমি উভয়কে ইসলামের হুকুমত কবুল করার দাওয়াত দিয়েছি এবং আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধারার আহ্বান জানিয়েছি। আমি আবারো আমার দরদভরা আবেদন পেশ করছি। আপনি এবিষয়ে কিছু বলুন।

প্রেসিডেন্ট বললেন, ইসলামী হুকুমত কায়েম করবো কীভাবে? শিয়ামতে, না সুন্নীমতে? হানাফীমতে, না হাম্বলীমতে?

সাদ্দামের মত একজন আরব রাষ্ট্রনায়কের এমন সরল চিন্তা আমাকে অবাক করলো। এগুলো তো সাধারণ মানুষের কথা। তাঁর তো আরো গভীর চিন্তার অধিকারী হওয়ার কথা। যাই হোক, হযরত জবাবে বললেন, আপনি তো ইসলামী হুকুমত করবেন কোরআন-সুন্নাহমতে। তাতে শিয়া-সুন্নী তো দূরের কথা, তাতে তো অমুসলিমরাও নিজ নিজ ধর্মীয় অধিকার ভোগ করবে।

প্রেসিডেন্ট এবার আরো লঘু কথা বললেন। তিনি বললেন, ইসলাম কায়েম করার চেষ্টা তো আমি করছি এবং এক্ষেত্রে বেশ সফলতাও অর্জিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথমে তিনি তার মাযারসংস্কারবিষয়ক কর্মকাণ্ডের কথা বললেন, আর বললেন এতীম-বিধবাদের কল্যাণভাতা ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের কথা।

হযরত একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনি ভালো করেই জানেন, আমি কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক দেশ শাসনের কথা বলছি। আর একমাত্র এপথেই আমাদের কামিয়াবি, দুনিয়াতে এবং আখেরাতে।

প্রেসিডেন্ট তখন মৃদু হেসে বললেন, শায়খে মুহতারাম, আপনার দেশে কি সেই ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে গেছে যে, ইরাকে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন?

মনে হলো হযরত ব্যথা পেলেন। তিনি বড় দরদের সাথে বললেন, আমার দ্বীনী ভাই! বাংলাদশে ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য আমি সারা জীবন মেহনত চালিয়ে আসছি। আপনি এবং এরশাদ দু'জনই আমার ভাই। আমি দু'জনকেই দাওয়াত দিয়েছি। যে কবুল করবে সেই কামিয়াব হবে।

এতক্ষণ পর প্রেসিডেন্ট একটি 'সানজীদা' ও প্রাজ্ঞ কথা বললেন। তিনি বললেন, ইসলামী হুকুমত কায়েম করা তো একদিনের কাজ নয়; তাছাড়া আমার বাস্তব কিছু সমস্যাও রয়েছে। তবে আমি কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে যুদ্ধ বন্ধের আলোচনায় বসতে সম্মত আছি।

হযরত বললেন, এটা যে একদিনের কাজ নয় তা আমি জানি এবং বাস্তব সমস্যা সম্পর্কেও আমার ধারণা রয়েছে। তাই আমি সে দাবীও জানাচ্ছি না। শুধু বলছি, আপনি কোরআন-সুন্নাহর শাসন জারির ঘোষণা দিন। তারপর ধীরে ধীরে আগে বাড়ুন এবং নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আল্লাহ গায়ব থেকে মদদ করবেন। যেগুলোকে আপনি সমস্যার পাহাড় মনে করছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় সেগুলো রাস্তা থেকে সরে যাবে। আপনি এককদম আগে বেড়ে তো দেখুন, আল্লাহ আপনার দিকে দৌড়ে আসবেন। এটা তো আল্লাহর ওয়াদা।

এপর্যন্ত সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই অগ্রসর হচ্ছিলো এবং আলোচনা চলছিলো হযরত ও প্রেসিডেন্ট-এর মাঝে। মাওলানা আযীযুল হক ছাহেব শুধু তরজমার দায়িত্ব পালন করছিলেন। আমরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে আলোচনার গতিবিধি অনুসরণ করছিলাম। এবার ছিলো প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের পালা। এবং মনে হলো তিনি কিছু বলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। আর তখনই ঘটলো সেই বিস্ফোরণ, যার আশঙ্কা ছিলো প্রতিমুহূর্তে। জনাব আব্দুল মান্নান প্রেসিডেন্টের ডান পাশের আসনটি দখল করে

চুপচাপ বসে ছিলেন এবং বেশ নিরীহভাবেই ছিলেন। এবার তিনি স্বমূর্তি ধারণ করে প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'খোমেইনী কাফের, দজ্জাল, শয়তান। এরা সব খোমেইনীর দালাল। সুতরাং এসব বেহুদা আলোচনায় আপনার মূল্যবান নষ্ট করা উচিত নয়। বাংলাদেশের জনগণ সবসময় ইরাকের পাশে ছিলো, থাকবে। আমিই বাংলাদেশের জনগণের আসল প্রতিনিধি, এরা নয়।'

এটা ছিলো ঘটনার শুরু, শেষ নয়। প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় আমরা যে কত দরিদ্র তা এবার বোঝা গেলো আমাদের আচরণে। মাওলানা আযীযুল হক ছাহেব হলেন হযরত হাফেজ্জী হুযূরের মুখপাত্র। সুতরাং তার জন্য এটাই শোভনীয় ছিলো যে, তিনি শান্ত ভাবে প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করে বলবেন, তৃতীয় কোন ব্যক্তি যেন আলোচনায় বিঘ্ন না ঘটায়। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে তিনি সম্বোধনপাত্র পরিবর্তন করে ফেললেন। তাছাড়া এতক্ষণ তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযূরের বক্তব্য তরজমা করছিলেন, এবার তিনি সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে নিজের পক্ষ হতে বলা শুরু করলেন। প্রেসিডেন্টের পরিবর্তে তিনি জনাব আব্দুল মান্নানকে সম্বোধন করে খাছ বাংলায় বলতে লাগলেন, আপনি কে? আপনি কোন্ অধিকারে কথা বলছেন? আপনি তো আমাদের লোক নন। আমরা সবাই জানি, আপনি তো ...।

জনাব আব্দুল মান্নান যা চাচ্ছিলেন তাই হলো। তিনি আরো জোরে চিৎকার করে আরো 'খাছ' বাংলায় বলতে লাগলেন, যার যে কাজ সাজে তার সেটাই করা উচিত। আমি রাজনীতি করি আইয়ূবের আমল থেকে, তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? আপনারা তো ...।

এভাবে চলতে থাকলো 'আপনি তো...', আর 'আপনারা তো...।' সে বড় লজ্জাজনক পরিস্থিতি। সম্ভবত আধুনিক কূটনীতির ইতিহাসে কোন রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে এমন ঘটনার নযির নেই। আর সেটা ঘটলো হযরতের উপস্থিতিতে, আমাদেরই বিচক্ষণতার অভাবে।

সভাকক্ষে প্রবেশের পরই মাওলানা আযীযুল হক ছাহেবকে আমি বলেছিলাম, যেহেতু অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেহেতু এটাই নিরাপদ যে, প্রেসিডেন্টকে হযরতের পক্ষ হতে প্রস্তাব দেয়া হবে, এ আলোচনা যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং এর উপর যুদ্ধরত দু'টি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সেহেতু আমরা চাই এ আলোচনা রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হোক এবং উভয় পক্ষে তিনজন করে সাহায্যকারী উপস্থিত থাকুক। কিন্তু তিনি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলেন।

আমার বিশ্বাস, সবটা বিষয় প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের অগোচরে ঘটেছে। তাকে বেশ বিব্রতই মনে হলো, আর আমাদের হযরত তো একেবারে এতীমের মত বসে থাকলেন।

অনেক্ষণ পর মাওলানা আযীযুল হক ছাহেব বাংলাভাষা ত্যাগ করে প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে সম্বোধন করে বললেন, আপনি এই লোককে থামতে বলুন। তার উপস্থিতিতে আমরা কোন আলোচনা করতে রাজী নই।

বাংলাদেশের বহু প্রাচীন প্রবচন, সময়ের এক কোপ, অসময়ের দশকোপ। এখন তিনি যা বললেন সেটাই যদি আলোচনার শুরুতে বলা হতো, কিছুতেই এমন ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। বিব্রত প্রেসিডেন্ট বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করে উঠে গেলেন, আর আমাদের 'এতীম' হযরত অসহায়ভাবে তাঁর মাকছাদের জানাযা কাঁধে নিয়ে ফিরে এলেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইরাকের প্রেসিডেন্ট এবং সাদ্দাম হোসাইনের মত প্রেসিডেন্ট হযরত হাফেজ্জী হুযূরের সঙ্গে অযথা দীর্ঘ দেড়ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে বসেননি। একথা যেমন সত্য যে, যুদ্ধ ইরাক শুরু করেছে এবং আমেরিকার প্ররোচনায়, তেমনি একথাও সত্য যে, ইরাক যে কোন উপায়ে যুদ্ধ থেকে বের হয়ে আসার একটা সম্মানজনক পথ তালাশ করছিলো। কারণ সাদ্দামের মার্কিন 'বন্ধুরা' তাকে বুঝিয়েছিলো যে, যেহেতু ইরানের সেনাবাহিনী এখন ভঙ্গুর অবস্থায় সেহেতু এ যুদ্ধ মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হবে না, বরং ইরাকী বাহিনীর প্রথম ঝড়ো হামলার মুখেই ইরানের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়বে। তখন শাতিল আরবের দাবী আদায় করে সাদ্দাম নিজের সুবিধা মত যুদ্ধ বন্ধ করার সুযোগ পাবেন। সাদ্দাম সাহসী হলেও নির্বোধ। তিনি মার্কিন বন্ধুদের টোপ গিলেছিলেন এবং নিজের সৃষ্ট অজুহাতের ভিত্তিতে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, আর শুরু করেই যা বোঝার বুঝে গিয়েছিলেন। আসলে তিনি ধারণাই করতে পারেননি যে, শাহের ইরানকে খোমেইনী কোথায় নিয়ে গিয়েছেন। গোটা জাতির অন্তরে মৃত্যুর এমন এক উন্মাদনা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন যার নযির পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশী নেই। ইরানে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি পাসদারানে ইনকিলাবও লড়াই করছিলো। আর প্রশিক্ষণে দুর্বল হলেও তারা ছিলো মৃত্যুভয়হীন। কারণ তাদের বিশ্বাসে মৃত্যু মানেই ছিলো জান্নাতের টিকেট। তাই ইরানের লোকক্ষয় এবং সম্পদক্ষয় অনেক বেশী হলেও যুদ্ধের পাল্লা শেষ পর্যন্ত ইরানের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিলো। সুতরাং পরিস্থিতির বিচারে সাদ্দাম যুদ্ধবন্ধের বিষয়ে অবশ্যই আন্তরিক ছিলেন। পক্ষান্তরে ইরানের শিয়া নেতাদের বিশ্বাস ছিলো, সাদ্দামের শুরু করা যুদ্ধ তারা নিজেদের ইচ্ছা মত শেষ করতে পারবেন। তারাও ভুলে গিয়েছিলেন যে, এ যুদ্ধ ইরাকের নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার এবং ইহুদিবাদী ইসরাইলের। প্রয়োজনে আমেরিকা ইরাককে মারণাস্ত্র সরবরাহ করবে এবং ইরানকে হাঁটু গেড়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে।

পরবর্তীতে তাই ঘটেছিলো। ইসরাইল যখন বিমান হামলা চালিয়ে ইরাকের পারমাণবিক কেন্দ্র ধ্বংস করে দিলো তখন আমেরিকা টু শব্দটি না করলেও ইরাককে রাসায়নিক অস্ত্র সরবরাহ করেছিলো যার মোকাবেলায় ইরানের কিছুই করার ছিলো না. নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়া ছাড়া। তার পরেও কি মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের বোধোদয় ঘটেছে?! না।

সাদ্দামের সঙ্গে হযরতের বৈঠক যদি স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যেতো তাহলে ফলাফল কী দাঁড়াতো তা আমি জানি না। এ বৈঠক ভণ্ডুল করার পেছনে পর্দার আড়ালে কারা

কাজ করেছে তা জানার উপায় নেই। আব্দুল মান্নান তো ক্রীড়নক মাত্র। তিনি সম্ভবত বহু দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত ছিলেন, এমনকি হতে পারে যে তিনি তাদের চিনতেনও না।

সাদ্দাম হোসায়ন কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে যুদ্ধ বন্ধের ফায়সালার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য ছিলো। এর ভিত্তিতে অনেক কিছুই হতে পারতো। হয়ত হাফেজ্জী হুযূর উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য মুসলিম বিশ্বের নির্বাচিত আলিমদের নিয়ে সালিস মজলিস গঠন করতেন। উভয় পক্ষ যদি মজলিসের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার পূর্বপ্রতিশ্রুতি প্রদান করতো, আর সালিস মজলিস যদি মক্কায় আল্লাহর ঘরের ছায়ায় বসে ইনছাফপূর্ণ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতো এবং এভাবে দু'টি মুসলিম দেশের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ হতে পারতো তাহলে মুসলিম জাহান, এমনকি সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে তা হতো নযিরবিহীন এক ঘটনা। এতে ইরান-ইরাক উভয়ের মর্যাদা যেমন উঁচু হতো তেমনি বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে ইসলামী খিলাফাত কায়েমের কাজও অনেক দূর এগিয়ে যেতো।

কিন্তু আল্লাহ জানেন খোমেইনীর মাথায় কী ভূত সওয়ার হয়েছিলো। যুদ্ধ বন্ধের জন্য ইসলামী হুকুমত কায়েমের শর্ত আরোপ করাকে 'তামাশা' ছাড়া আর কী বলা যায়? এটা কি ইসলামী হুকুমত কায়েমের তরীকা? এটা কি যুদ্ধ করে চাপিয়ে দেয়ার বিষয়? আজ খোমেইনী পৃথিবীতে নেই, নেই হযরত হাফেজ্জী হুযূরও। এমনকি সাদ্দাম হোসায়নও অনেক ঘটনার নায়ক ও খলনায়ক হয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছায় শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছেন।

রূহের জগতে আজ যদি হযরত হাফেজ্জী হুযূর জিজ্ঞাসা করেন খোমেইনীকে, শেষ পর্যন্ত আপনি তো যুদ্ধবন্ধ মেনে নিয়েছিলেন আমেরিকার আদেশে; তাহলে আপনার এক দ্বীনী ভাইয়ের কথা মেনে নিতে দোষ কী ছিলো? আমি তো আপনাকে সতর্ক করেছিলাম! এ প্রশ্নের কী জবাব দেবেন খোমেইনী?

তদ্রূপ যদি তিনি সাদ্দামকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তো ইরাকের জাতীয় পতাকায় 'আল্লাহু আকবার' যুক্ত করে মৃত্যুর আগে কোরআন হাতে নিয়েছিলেন; তাহলে ইরাকের শাসক অবস্থায় কোরআন হাতে নিতে বাধা ছিলো কোথায়? আমি তো আপনাকে বলেছিলাম, আল্লাহর গায়বি মদদের কথা! কী জবাব দেবেন সাদ্দাম হোসাইন?

***

ফিরে আসি আগের জায়গায়। হযরত ক্লান্ত শ্রান্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় হোটেলে ফিরে এলেন। কেউ তাঁকে সামান্য একটু সান্ত্বনার কথাও বললো না। যে যার কামরায় চলে গেলো। যেন কিছুই ঘটেনি। কারো মাঝে কোন প্রতিক্রিয়াই দেখা দিলো না আব্দুল মান্নান সম্পর্কে দু'একটি কটূক্তি ছাড়া। তাদের ওঠা-বসা, কথা-বার্তা সবই ছিলো স্বাভাবিক। এমনকি দুপুরের খাবার গ্রহণের পর তারা পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী কাদেসিয়া যুদ্ধের প্যান্যারোমা দেখতে মাদায়েন রওয়ানা হয়ে গেলেন। হযরতের

কাছে এসব বিষয় তখন ছিলো অর্থহীন। তাই তিনি গেলেন না। আমার একে তো ইচ্ছে ছিলো না, তদুপরি হযরত বললেন, তুমি আমার কাছে থাকো।

সবাই বের হয়ে যাওয়ার পর হযরত বললেন, আমি সাদ্দাম হোসাইনের কাছে একটি চিঠি লিখতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে কাগজ-কলম হাযির করলাম। তিনি বিষয়বস্তু বলে গেলেন, আমি আরবীতে লিখে নিলাম। চিঠিটি মোটামুটি এরকম ছিলো–

আমার দ্বীনী ভাই সাদ্দাম হোসাইন!

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আদ্দীনু আন্নাছীহাতু' –দ্বীন হচ্ছে হিতাকাঙ্ক্ষা। সুতরাং মুসলমানদের শাসকের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা হলো দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ হুকুম। সেই হুকুম পালন করার নিয়তে আপনাকে আমি এই পত্র লিখছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনের উপর চলার এবং দ্বীন কায়েম করার তাওফীক দান করুন, আমীন। কারণ এটাই হলো দুনিয়াতে কামিয়াবি এবং আখেরাতে নাজাতের একমাত্র পথ।

আপনার সঙ্গে আমার একটি একান্ত বৈঠক হলে খুব ভালো হতো, কিন্তু সে সুযোগ পাবো কি না, জানি না। আমি আপনাকে ইহুদি-নাছারাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করতে চাই। আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন, কোরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ, ইহুদি ও নাছারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আসলে তারা পরস্পর বন্ধু।'

সুতরাং ইহুদি-নাছারাদের পরামর্শে কখনো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। আপনি মুসলমান, সুতরাং তারা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না। তদ্রূপ তাদেরকে আপনি ভয় করবেন না, একমাত্র আল্লাহকে ভয় করবেন। কারণ সারা দুনিয়া যদি একত্র হয়ে আপনার কোন উপকার করতে চায়, আল্লাহর হুকুম ছাড়া আপনার কোন উপকার করতে পারবে না। তদ্রূপ সারা দুনিয়া যদি একত্র হয়ে আপনার কোন ক্ষতি করতে চায়, আল্লাহর হুকুম ছাড়া আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং আপনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ভরসা করে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার ঘোষণা দিয়ে দিন এবং পর্যায়ক্রমে আগে বাড়তে থাকুন, আর প্রশাসনের বুনিয়াদি স্থানগুলো থেকে ইহুদি-নাছারাদের অবশ্যই দূরে রাখুন। আল্লাহ আপনার সহায় হবেন ইনশাআল্লাহ।

যুদ্ধ বন্ধের আলোচনায় আপনার কথাবার্তা আমার কাছে আন্তরিক মনে হয়েছে। এজন্য আমি আপনার শোকরগুজার। আমি আমার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো, ইনশাআল্লাহ। আশা করি আপনার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। ইরাক, ইরান ও পুরা মুসলিম জাহানকে আল্লাহ হিফাযাত করুন, আমীন।

আপনার দ্বীনী ভাই

মুহাম্মাদুল্লাহ

আরবী তরজমা শুনে হযরত খুশী হলেন, অনেক দু'আ দিলেন এবং চিঠিতে দস্তখত করে বললেন, 'এই চিঠি সরাসরি সাদ্দাম হোসাইনের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করো, অন্য কারো হাতে নয়।'

আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ।

আমার চিন্তায় দু'টি মাধ্যম ছিলো, মুহসিন ও মুহম্মদ। মুহম্মদ পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। কিন্তু অনেক চিন্তাভাবনার পর মুহসিনের সহযোগিতা গ্রহণ করাই ভালো মনে হলো। মুহসিনের গ্রামের বাড়ীতে যাওয়ার ওয়াদা ছিলো। হযরতের অনুমতি নিয়ে তার সঙ্গে রওয়ানা হলাম। বাগদাদ থেকে পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটার দূরে তার গ্রাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম। সুন্দর গ্রাম। বাগদাদের সঙ্গে ঢাকার যেমন পার্থক্য, দু'দেশের গ্রামের মধ্যেও তেমনি পার্থক্য। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রায় সবই বিদ্যমান। তবে মুহসিন জানালো, সব গ্রামের অবস্থা এমন নয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো এখনো অনেক অনুন্নত। অবশ্য সরকার গ্রাম উন্নয়নে খুবই আন্ত রিক, যদিও যুদ্ধের কারণে উন্নয়ন প্রচেষ্টা এখন অনেকটাই থেমে গেছে।

আমরা প্রথমেই গেলাম গ্রামের শেষ প্রান্তে কবরস্তানে। পাশাপাশি দু'টি নতুন কবর। একটি কবরের সামনে কালো চাদর-আবৃত একজন বয়স্কা মহিলা এবং তার বারো তেরো বছরের বালক পুত্র দাঁড়িয়ে ছিলো। আমরা কবর যিয়ারাত করলাম। আমার অন্তরে তখন ছিলো অন্তহীন বেদনার ঢেউ। এরা দু'জন মৃত্যুবরণ করেছে কোন কাফিরের গুলিতে নয়, তাদেরই মত কোন মুসলমান ভাইয়ের গুলিতে। একই ভাবে তাদের হাতে সীমান্তের ওপারে যারা নিহত হয়েছে তারাও মুসলমান। কে জানে পৃথিবীতে এপর্যন্ত যত মুসলমান নিহত হয়েছে তাদের কত ভাগ কাফির-মুশরিকের হাতে, আর কত ভাগ মুসলমানের হাতে! সঠিক একটা পরিসংখ্যান পাওয়া গেলে ভালো হতো।

এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের বলি কিন্তু সাদ্দাম বা খোমেইনী নন; নন যুদ্ধের জেনারেলরাও। তারা তো নিরাপদ দূরত্বে বাগদাদের প্রাসাদে এবং কুমের আস্তানায় বসে যুদ্ধের নকশা তৈরী করেন, রক্ত ঝরে সাধারণ সৈনিকদের। বিধবা হয় ইরাকী মা, এতীম হয় ইরানী বালক। এ যুদ্ধ বন্ধের জন্য আমাদের হযরতের মত অস্থির হয়েছেন মুসলিম বিশ্বের আর ক'জন!

এদু'টি কবর যিয়ারাতের মাধ্যমে আমি যেন যিয়ারাত করলাম এ যুদ্ধে নিহত সকল মুসলমানের কবর। হোক সে ইরাকী বা ইরানী, শিয়া বা সুন্নী। আমি কল্যাণ ও নিরাপত্তা কামনা করলাম সকল এতীম ও বিধবার, হোক তারা ইরাকের বা ইরানের। কারণ সবার রক্ত অভিন্ন, সবার অশ্রু অভিন্ন; ইসলামের সূত্রে যেমন তেমনি মানবতারও সূত্রে।

নিহত সৈনিকের সেই এতীম পুত্রটির কথা আজ এত বছর পরও আমার মনে পড়ে। সে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে বলেছিলো, কাফের খোমেইনী আমার বাবাকে খুন করেছে, আমি এর বদলা নেবো।

তার কথা শুনে আমি হেসেছিলাম বড় বেদনার হাসি। 'কাফের' খোমেইনীর হাতে খুন হচ্ছে ইরাকের নিরীহ মুসলমান, আবার 'কাফের' সাদ্দামের হাতে খুন হচ্ছে ইরানের নিরীহ মুসলমান। মাঝখানে কাফির আমেরিকা হাসছে হায়েনার হাসি। মুসলিম জাহানের এ বড় করুণ ট্রাজেডি। মুসলমান 'কাফেরদের' পরিবর্তে আমাদের বন্দুকের নল কবে ঘোরবে আসল কাফেরদের দিকে! সবসময় আমাদের তলোয়ারের পিয়াস কি মিটবে শুধু নিজেদেরই খুনে! কবে বন্ধ হবে এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ?

কিন্তু তখন যদি জানতাম, আগামী দিনের গর্ভে কী ভয়াবহ ঘটনা লুকিয়ে আছে আমাদের জন্য তাহলে হয়ত কামনা করতাম, শুধু ইরাক-ইরান যুদ্ধ চলতে থাকুক, এর বেশী আর কিছু না হোক।

মুহসিনের আব্বার সঙ্গে দেখা হলো গ্রামের মসজিদে নামাযের সময়। তিনিই মসজিদের ইমাম ও মুআযযিন। নূরানী চেহারার বড় নেক ছুরত ইনসান। ছেলেকে নামায পড়তে দেখে খুব খুশী হলেন। যাকে বলে, একেবারে আবেগাপ্লুত হলেন। তার চোখে তখন আনন্দাশ্রু চিকচিক করছে। তিনি ভেবে পেলেন না কীভাবে তার পুত্রের এ অভাবনীয় পরিবর্তন! হযরতের কথা তিনি আগেই শুনেছেন; এখন আরো বিশদ শুনে বললেন, যার সামান্য সংস্পর্শে আমার ছেলের এমন পরিবর্তন তিনি নিশ্চয় অনেক উঁচু দরজার অলী, বুযুর্গ! তিনি অনুগ্রহ করে আমাদের দেশে এসেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ এবার আমাদের উপর অনুগ্রহ করবেন। এ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ এবার অবশ্যই বন্ধ হবে।

হায় বৃদ্ধ যদি জানতেন, তার এবং তার মত বহু নেক মানুষের নেক তামান্না একটু আগে কীভাবে খুন হয়ে গেছে!

***

ফেরার পথে মুহসিনকে বললাম, 'আমাদের শায়খ একটা বড় দায়িত্ব আপনার কাঁধে অর্পণ করতে চান!'

তিনি কিছুটা পেরেশান দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার কাঁধ তো এত মজবূত নয় যে, শায়খের দেয়া দায়িত্ব বহন করতে পারে, তবে সৌভাগ্য মনে করে চেষ্টা অবশ্যই করবো।'

আমি বললাম, জাযাকাল্লাহ। আমার কাছে প্রেসিডেন্টের নামে শায়খের একটি ব্যক্তিগত পত্র রয়েছে। তিনি চান, এটি আমি নিজে প্রেসিডেন্টের হাতে পৌঁছে দেই। আপনি ব্যবস্থা করতে পারলে শায়খ খুশী হবেন এবং দু'আ করবেন।

আমার কথা শেষ হলো না, মুহসিন বলে উঠলেন, 'আমি চেষ্টা করবো এবং মনে হয়, অসম্ভব হবে না। প্রেসিডেন্টের দুই পুত্র আদী ও কুসাঈ-এর গৃহশিক্ষক আমার বিশেষ বন্ধু। তার মাধ্যমে ঘরোয়াভাবে সময় নেয়া যেতে পারে, অবশ্য প্রেসিডেন্ট যদি ইতিমধ্যে বাগদাদ ত্যাগ না করে থাকেন।

আল্লাহর শোকর, বিষয়টি এত আসান হবে, ভাবতে পারিনি। যা হয় তা সহজেই হয়, যা হয় না, প্রাণপণ করেও হয় না। আসলে সবকিছু পর্দার আড়াল থেকে সম্পন্ন হয়, অথচ আমরা বিভ্রান্ত হই নিজেদের কল্পিত যোগ্যতার মায়াজালে।

মনে মনে কামনা করলাম, মুহসিনের চেষ্টা যেন সফল হয়। তাহলে হযরত অন্তত সান্ত্বনা পাবেন যে, শেষ কর্তব্যটুকু তিনি করতে পেরেছেন।

গাড়ী হোটেলের কাছাকাছি এসেছে, এমন সময় হঠাৎ মুহসিন জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'আজকের আলোচনার ফল কী?'

আমি কিছুটা অপ্রস্তুত। বুঝতে পারছি, এ প্রশ্নের কারণ, যুদ্ধবন্ধের বিষয়ে তার ব্যাকুলতা। এটা শুধু তার নয়, ইরাকের বহু মানুষেরই কামনা; বিশেষ করে ইরাকের প্রবীণ শ্রেণীর। ক'দিনের সফরে অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, যুদ্ধ সাধারণ ইরাকীদের কাম্য নয়। আজ যদি যুদ্ধবন্ধের ঘোষণা আসে, নিশ্চিত করেই বলা যায়, ইরাকে উৎসবের আনন্দ হবে। আমি ইরান সফরে ছিলাম না, কিন্তু আমার সাধারণ বোধ বলে, সেখানেও একই অবস্থা হবে। কোন দেশের সাধারণ মানুষ কখনো যুদ্ধ চায় না; বিশেষত যুদ্ধ যদি হয় এমন দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী।

মুহসিনকে কী উত্তর দেবো? কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, দেখুন মুহসিন, আমি আপনার অনুভূতি বুঝতে পারি এবং এ প্রশ্ন আপনি করেছেন বন্ধুত্বের ভিত্তিতে, কিন্তু শায়খের অনুমতি ছাড়া তো আমি কিছু বলতে পারি না।

মুহসিন বিচক্ষণ ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, অবশ্যই! তোমাদের শায়খের তারবিয়াত এমনই হওয়ার কথা।

হোটেলে ফিরে হযরতকে জানালাম মুহসিনের কথা। তিনি মুহসিনকে কাছে ডেকে কপালে চুমু খেলেন এবং দু'আ দিলেন। মুহসিনের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বেচারা হয়ত এতটা আশা করেননি। আমি অবাক হয়ে দেখলাম এবং দৃশ্যটি এখনো আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে, মুহসিন হোটেলের লিফ্‌টের দিকে যাচ্ছেন, আর কপালে আলতো করে হাত বুলাচ্ছেন। লিফট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আমি কামরায় ফিরে এলাম, আর ভাবলাম, যারা বুঝতে পারে তাদের কাছে একটি চুম্বনের এত মূল্য, আর ...।

মাগরিবের পরপর মুহসিনের ফোন পেলাম। তার কণ্ঠের উচ্ছ্বাস থেকেই বুঝলাম, খবর ইতিবাচক। 'এক্ষুণি আসছি' বলেই তিনি ফোন রেখে দিলেন।

হযরতের দু'আ নিয়ে আমরা বের হলাম। মুহসিন বললেন, আমরা প্রেসিডেন্টের বাসভবনে যাচ্ছি। আদী ও কুছাঈ-এর গৃহশিক্ষক সেখানে আছেন। তিনি আপনার জন্য পাঁচ মিনিট সময় নিয়েছেন।

আমরা প্রেসিডেন্টের বাসভবনে পৌঁছলাম। অবাক হওয়ার বিষয়, এখানে আমাদেরকে সকালের মত কোন রকম নিরাপত্তা-পর্যবেক্ষণের সম্মুখীন হতে হলো না। আমাদের বসতে দেয়া হলো যে কামারায় আদী ও কুছাঈ গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ছিলো। তাদের ছবি দেখেছি গত বছর ইরাকী পত্রিকা 'আলিফ-বা'-এর একটি সংখ্যায়। আজ

সরাসরি দেখলাম। আলিফ-বায় প্রেসিডেন্টের ছেলেমেয়েদের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিলো। তাতে পিতার প্রতি সন্তানদের অভিযোগ ছিলো যে, বাবাকে তারা অনেক সময় চোখের দেখাও দেখতে পায় না। সেদিক থেকে ঐ ইরাকী শিশুরা তাদের চেয়ে ভাগ্যবান যারা সবসময় বাবার সান্নিধ্য লাভ করে এবং যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াতে পারে।

আমি তাদেরকে সাক্ষাৎকারটির কথা স্মরণ করালাম। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে শুধু মৃদু হাসলো; কিছুটা লাজুক প্রকৃতির মনে হলো। কতই বা বয়স, কাছাকাছি দশবারো। কিন্তু মনে হলো, এখন থেকেই সুনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে গড়ে ওঠছে। কথা, হাসি সবকিছু পরিমিত। গৃহশিক্ষকের সঙ্গে আচরণ সম্ভ্রমপূর্ণ। আমার ভালো লাগলো।

আজ সাতাশ বছর পর যখন এ সফরনামা লিখছি তখন আমার স্মৃতিপটে বারবার ভেসে ওঠছে আদী ও কুছাঈ নামের সেই বালক দু'টির ছবি, যারা মৃদু হেসে আমাকে বলেছিলো, বাংলাদেশ ইরাকের বন্ধুদেশ। আমি বলেছিলাম, শুধু বন্ধুদেশ নয়, ভ্রাতৃদেশও। আমরা সকলে 'আল-উখুওয়াতুল ইসলামিয়্যা'-এর বন্ধনে আবদ্ধ। তখন তারা লাজুক হেসে বলেছিলো, 'অবশ্যই'। সেদিন আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম তাদের বালক বয়সের ব্যক্তিত্বে এবং সাহসিকতার অভিব্যক্তিতে।

তারপর দজলা-ফোরাতের বুক দিয়ে অনেক পানি গড়িয়েছে। আদী ও কুছাঈ ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। পিতার হাত ধরে ইরাকের শাসনক্ষমতায় জড়িয়েছে। পিতার মত তাদেরও হয়ত ভুলবিচ্যুতি ছিলো, তারাও হয়ত বুঝতে পারেনি, ক্ষমতার প্রাসাদে কত ফাঁক-ফোকর ছিলো; মার্কিন গোয়েন্দাচক্রের জাল কত গভীরে বিছানো ছিলো। শেষ মুহূর্তে যখন 'পিতা ও পুত্রদ্বয়' রিপাবলিকান গার্ডের মাধ্যমে চূড়ান্ত হামলার স্বপ্নে বিভোর, তখনো তারা বুঝতে পারেনি, যুদ্ধের মাথাগুলো আগেই কেনা হয়ে গেছে। সময় পার হওয়ার পর হয়ত তারা বুঝতে পেরেছিলো, ইরানের 'মোল্লা' কত বিচক্ষণ। ইরানের 'সম্পদ' এবং মার্কিনীদের ক্রীতদাস জেনারেলদের ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করা কতটা সাহসী ও বিচক্ষণ পদক্ষেপ। শিয়াদের ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেইনী তখন আশ্চর্য একটি কথা বলেছিলেন, 'লোকেরা বলে, মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলতে নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, অনেক সময় মাথা কেটে ফেললে ধড় বেঁচে যায়।'

ইরানের মোল্লা যা বুঝেছিলেন বিশ শতকে, ইরাকের 'মিস্টার' তা বুঝতে পেরেছিলেন একুশ শতকে।

প্রাণরক্ষার জন্য পিতা ও পুত্রদ্বয় যখন আত্মগোপনে যেতে চাইলেন তখন দেখা গেলো, তাদের সাধের ও স্বপ্নের ইরাকে তাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। একসময় পুত্রদের বিচ্ছিন্ন হতে হলো পিতা থেকে। তখন তিনি শুধুই পিতা ছিলেন; একজন অসহায় পিতা! পুত্রদের বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি কেঁদেছিলেন, নিজের জন্য নয়, পুত্রদের নিরাপত্তার চিন্তায়। তখনো তিনি পুত্রদের একটি উপদেশ দিতে ভুলেননি, 'ধরা যদি পড়ো, শৃগালের মত পড়ো না, সিংহের মত পড়ো।'

দুই পুত্র পিতার নির্বুদ্ধিতা যেমন পেয়েছিলো তেমনি পেয়েছিলো পিতার শৌর্য ও সাহস। আদীর বার বছরের বালক মুস্তফা যেন বাবা, চাচা ও দাদাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো বীরত্বে ও সাহসিকতায়। বিশ্বাস করা যায়, আত্মগোপনে থাকা অসহায় তিনজন (একজন বালক) মানুষকে ধরার জন্য বাড়ীটি ঘেরাও করেছিলো তিনহাজার মার্কিন সেনা! বাবা ও চাচার সঙ্গে বার বছরের বালকও সেদিন লড়াই করেছিলো বন্দুকের শেষ গুলিটি পর্যন্ত। তিন হাজার মার্কিন সেনা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো দুই শার্দুল ও একটি শাবকের গর্জনে। হায়েনার দল জীবিত পাকড়াও করতে পারেনি তাদের। বুশ সিনিয়র হয়ত সেদিন আক্ষেপ করেছেন তার সন্তানদের সম্পর্কে। তবে তিনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, হায়েনার ঔরস থেকে হায়েনাই জন্মলাভ করে, শার্দুল নয়। কত বড় বুকের পাটা নিয়ে আত্মগোপন করে থাকা পিতা সাদ্দাম দুই পুত্রের ও বালক পৌত্রের শাহাদাতের সংবাদ গ্রহণ করেছিলেন! ভীরুতার লেশমাত্র আছে যার মধ্যে তার পক্ষে কি আদৌ তা সম্ভব!

মার্কিন হায়েনাদের হাতে শাহাদাত বরণকারী আদী ও কুছাঈ-এর দোষত্রুটি ও অপরাধ কতটুকু ছিলো জানি না। দুই বোনের স্বামীদের কৌশলে ধরে এনে কেন হত্যা করা হয়েছিলো তাও জানা নেই, তবে আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করা সেই বালকদু'টির ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আল্লাহ তাদের সব অপরাধ ক্ষমা করুন এবং তাদের শহীদের মর্যাদা দান করুন, আমীন।

সাদ্দামের পুত্রদ্বয়কে তো আমি দেখেছি, তার নাতি শহীদ মুস্তফাকে দেখিনি; দেখার প্রশ্নও আসে না। বার বছরের বালক তো বলা যায় নিষ্পাপই ছিলো। তাকে দেখিনি, কিন্তু তার একটি ছবি আছে আমার বুকে, আমার কল্পনায়। বেলকনীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো সে বুক ফুলিয়ে। গুলি তার বুকে লেগেছিলো, পিঠে নয়। শুধু এই একটি কারণে, জীবনে আবার কখনো যদি ইরাক যেতে পারি, আর আমাকে শুধু একটিমাত্র কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়, আমি বলবো না, আমাকে আব্দুল কাদীর জিলানীর মাযারে নিয়ে চলো; আমি বলবো, আমাকে শহীদ মুস্তফার কবরে নিয়ে চলো; আমি শুধু তার কবর যিয়ারাত করবো। আমার চোখে তখন যদি পানি আসে, চোখের পানিতে ওর কবরের মাটি ভেজাবো।

প্রিয় পাঠক, দেখো না, আবেগের তোড়ে কোত্থেকে কোথায় ভেসে গিয়েছি! অক্ষম মানুষের আসলে আবেগ ছাড়া আর থাকেই বা কী! ফিরে যাই প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের বাসভবনে। যথাসময়ে ডাক এলো। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের সামনে। এটা তার নিজস্ব পড়াশোনার কামরা। বিরাট কামরা। তাকে তাকে অসংখ্য বই। প্রথম দর্শনেই অভিভূত হলাম। প্রেসিডেন্ট কিছু পড়ছিলেন। তিনি চেয়ার থেকে উঠে মুছাফাহা করলেন। আমি প্রেসিডেন্ট বলে সম্বোধন করে কথা শুরু করতেই, তিনি আন্তরিক হাসির সঙ্গে বললেন, তুমি এখন ইরাকের রাষ্ট্রীয় মেহমান নও, সাদ্দাম হোসায়নের ঘরের মেহমান।

সকালের বৈঠকে সামরিক পোশাকে প্রেসিডেন্টের গর্বিত আসনেও তাকে মার্জিতরুচি ও সুশীল ব্যক্তি মনে হয়েছিলো, এখন ঘরোয়া পরিবেশে তাকে আরো খোলামনের, আরো আন্তরিক মনে হলো। হায়, এ মানুষটি যদি অতীতের দিল্লীর শাসকদের মত কোন শায়খের ছোহবত লাভ করতেন, যদি সঠিক পথের সন্ধান পেতেন, তাহলে আরব ও মুসলিম জাহানের দুর্ভোগের কারণ না হয়ে হতে পারতেন গর্ব ও গৌরবের সম্পদ।

তিনি যে আরব আভিজাত্যের অধিকারী সেটি প্রমাণ করতেই যেন এই সামান্য সময়ের ফাঁকেও আমার সামনে পরিবেশিত হলো তাজা খেজুর ও ধূমায়িত কফি। আমি হযরতের পত্র অর্পণ করলাম। তিনি তখনই খুলে পড়লেন। তারপর বললেন, 'শায়খকে আমার সালাম বলো, আর বলো, তাঁর ইখলাছ ও আন্তরিকতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আজকের ঘটনার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। তাঁর উপদেশ আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করছি। যুদ্ধবন্ধের বিষয়ে তাঁর যে কোন উদ্যোগের প্রতি আমার যুক্তিসঙ্গত সহযোগিতা থাকবে, 'যুক্তিসঙ্গত' শব্দটি আমি পুনরুক্ত করছি।'

বিদায়ের সময় প্রেসিডেন্ট আমার হাত ধরে, সেই কামরা পর্যন্ত এলেন যেখানে আদী ও কুছাঈ পড়ছিলো এবং মুহসিন আমার অপেক্ষায় ছিলেন। প্রেসিডেন্ট আমাকে তার পুত্রদ্বয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি হাসির ছলে তাদের সাক্ষাৎকারের কথা বললাম। প্রেসিডেন্ট অবাক হয়ে বললেন, আচ্ছা, আমি জানি না তো!

আদি, অথবা কুছাঈ, এখন মনে নেই; আমাকে ওর হাতের কলমটি উপহার দিয়েছিলো। শিস কলম, মাথায় ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি ছিলো। আমি অবাক হলাম, প্রেসিডেন্ট তার পুত্রের পিঠ চাপড়ে বললেন, শোকরান! অর্থাৎ মেহমানের ইকরাম করায় তিনি খুশী হয়েছেন। আরব পিতার তারবিয়াত দেখার এটা ছিলো এক দুর্লভ সুযোগ। পরবর্তীতে অবশ্য এসুযোগ আরো অনেক হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের বাসভবন থেকে বের হওয়ার আগে একটা কথা আমি বলতে চাই। সারা বিশ্বের আলোচিত সমালোচিত এবং এখন পশ্চিমাবিশ্বের কাছে ধিকৃত প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের বাসভবনে আসবাবপত্রের কোন বাহুল্য দেখিনি। তাঁর ধার্মিকতা প্রচারের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অনেক পোস্টার ও বুকলেট প্রকাশ করা হলেও আমি তা দ্বারা প্রভাবিত হইনি, কিন্তু আমাকে কেউ বলে না দিলেও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, রাষ্ট্রীয় সম্পদে তার সামান্যতম হস্তক্ষেপও ছিলো না, পরবর্তীতে যা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। কারণ সারা ইরাক চষে ফেলেও মার্কিনীরা দু'টি জিনিস পায়নি। গণবিধ্বংসী অস্ত্র এবং সাদ্দামের আর্থিক দুর্নীতি। অস্ত্রের 'অ' এবং দুর্নীতির 'দ'ও যদি তারা পেতো, বিশ্বমিডিয়া তোলপাড় করে ছাড়তো। আসলে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধই সাদ্দামকে ফাঁসির রজ্জুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলো। নইলে আমরা সাদ্দামের যেসব দোষের সমালোচনা করি, আমেরিকার চোখে সেগুলো তো সাদ্দামের গুণ। একথা হয়ত পৃথিবী কোনদিন জানতে পারবে না, বন্দী সাদ্দামকে কতভাবে প্রলুব্ধ করা হয়েছিলো এই বলে যে, এখনো তুমি ইরাকের তেল আমাদের হাতে তুলে

দাও, ইরাকের ক্ষমতা আমরা তোমার হাতে তুলে দেবো। তখন তোমার চেয়ে পছন্দের মানুষ আমাদের কাছে আর কেউ হবে না।

কিন্তু সাদ্দাম মুসলমান যতটুকুই ছিলেন, আরব ছিলেন পুরো মাত্রায়, আর ইরাকী ছিলেন আরো বেশী মাত্রায় এবং সেটাই হয়েছে তার জন্য কাল।

মুহসিন আমাকে হোটেলে ফিরিয়ে দিয়ে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে চলে গেলেন। হযরতকে আমি পুরো বিষয় অবহিত করলাম। তিনি নীরবে শুনলেন এবং গভীরভাবে 'জাযাকাল্লাহ' বললেন। মনে হলো, তার অন্তর থেকে কোন চাপ সরে গেলো।

***

হযরতের সফরসঙ্গীরা কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। ক্লান্ত হলেও তাদের বেশ আনন্দিত মনে হলো। আখতার ফারূক সাহেব তার কামরা-কাঁপানো হাসিসহযোগে বললেন, আজকের প্রোগ্রাম মিস করে তুমি ভালো করোনি। ইরাকের সবচে' দর্শনীয় বস্তুটি তোমার হাতছাড়া হয়েছে।

আমি মৃদু হেসে বললাম, আমার এবং হযরতের হাতছাড়া হয়েছে। আর দর্শনীয় বস্তু 'চোখছাড়া' হতে পারে, হাতছাড়া হয় কীভাবে!

গুণী মানুষের সঙ্গে এই একটি সুবিধা, তারা কথার রসটুকু গ্রহণ করেন, অন্যকিছু এড়িয়ে যান। তিনিও তাই করলেন।

ব্যক্তিজীবনে তিনি বড় দিলখোলা মানুষ ছিলেন। রাজনীতিতে যেহেতু দিলটা খোলা রাখার কোন সুযোগ নেই সেহেতু সেখানে তিনি ছিলেন অন্য অনেকের মত, আলাদা কিছু নন।

তাকে বললাম, ঘ্রাণে অর্ধভোজন বলে কথা আছে, যদিও আমার অভিজ্ঞতা অন্য রকম, তো শ্রবণে কি অর্ধ অবলোকন হতে পারে না!

তিনি হাসতে হাসতে 'আলবৎ হতে পারে' বলে শোনালেন। তার বিবরণ থেকে মোটামুটি যা বুঝলাম তা এই যে, ইরাক সরকার মাদায়েনে ঐতিহাসিক কাদেসিয়া যুদ্ধের দৃশ্যাবলী বিশাল এক সাততলা ভবনের দেয়ালে, ছাদে ও মেঝেতে চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে এবং তা এমন বিস্ময়কর শিল্পচাতুর্যের মাধ্যমে যে, মনে হবে সবকিছু জীবন্ত। দর্শক ভাববে, যেন সে রণাঙ্গনে উপস্থিত থেকে বাস্তব যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছে।

সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঁচু এক মিনারে গিয়ে উঠতে হয়। সেখানে গম্বুজের আকৃতির একটি বিরাট কক্ষ। মনে হবে যেন সুউচ্চ কোন দুর্গের উপর তুমি দাঁড়িয়ে আছো। সামনে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত রয়েছে একটি প্রান্তর। তার শেষ মাথায় একটি প্রাচীন দুর্গ বা দুর্গের ভগ্নাবশেষ। এর নাম কাদীকা দুর্গ। এ দুর্গের ছাদে বসেই অসুস্থ ও চলৎশক্তিরহিত কাদেসিয়ার সেনাপতি হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রা) যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। পরপর তিনদিন তিনরাত্রির ভয়াবহ যুদ্ধের যাবতীয় দৃশ্য পর্যায়ক্রমে দেয়ালচিত্রের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গম্বুজ কক্ষের দেয়াল থেকে ছাদ পর্যন্ত তিন স্তরে চিত্র তৈরী করা হয়েছে। রণাঙ্গনের ভূমি যেন প্রকৃত ভূমি এবং আকাশ যেন প্রকৃত আকাশ। চিত্রগুলোতে রঙের প্রয়োগ এমনই কুশলী যে, দৃশ্যাবলীর দূরত্বকে মনে হবে একেবারে বাস্তব!

এখানে পারসিকদের হস্তিবাহিনীর আক্রমণ যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি দেখানো হয়েছে সে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মুসলিম বাহিনীর সাহসী সৈনিকদের ছুটে গিয়ে হাতির সুঁড় ধরে ঝুলে পড়ার এবং সুঁড় কেটে ফেলার যেন জীবন্ত দৃশ্য।

আখতার ফারূক সাহেবের ভাষায়, শব্দের বর্ণনা দিয়ে প্যানারোমার সৌন্দর্য বোঝানোর উপায় নেই। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর একটা কথা আছে, কিন্তু এখানে শব্দের বর্ণনা ঘোলের চেয়েও কম। এটা শুধু দেখার জিনিস, বলার বা শোনার জিনিস নয়। এধরনের প্যানারোমা পৃথিবীতে মাত্র তিনটি রয়েছে। একটি আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর, দ্বিতীয়টি জাপানে জাপান-যুদ্ধের উপর, আর তৃতীয়টি এখানে কাদেসিয়া-যুদ্ধের উপর।

ইরাক সরকারের এত বিপুল অর্থ ব্যয় করে এত গুরুত্বের সাথে প্যানারোমা তৈরী করার রহস্য এই যে, কাদেসিয়া যুদ্ধকে তারা মনে করে পারসিকদের বিরুদ্ধে আরবদের জয়। অর্থাৎ এটা হলো তাদের আরবজাতীয়তাবাদের চেতনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা। সুতরাং মহৎ প্রচেষ্টা!

আমাদের চার বছর পর ইরাক সফরে মাওলানা তাকী উছমানী এই প্যানারোমা পরিদর্শন করে মন্তব্য করেছেন, 'এটা যারা তৈরী করেছে অজ্ঞানে, কিংবা সজ্ঞানে একথা ভুলে গিয়েছিলো যে, কাদেসিয়াযুদ্ধের সিপাহসালার ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশছাহাবীর অন্যতম হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রা), তদুপরি এ যুদ্ধের অধিকাংশ মুজাহিদ ছিলেন ছাহাবী। সুতরাং তাদের কাল্পনিক চিত্র অংকন করা যেমন শরী'আতবিরোধী তেমনি তা ছাহাবা কেরামের শান ও মর্যাদার জন্যও হানিকর।

***

রাতে ইরাকের বহুলপ্রচারিত ইংরেজী দৈনিক বাগদাদ ডেইলী এবং আরবী দৈনিক আছ-ছাওরাহ-এর সাংবাদিকবৃন্দ হোটেলে এলেন হযরতের সাক্ষাৎকার নিতে। এসব বিষয়ে তাঁর কোন আগ্রহ ছিলো না। তিনি বলে দিলেন, তোমরা যা ভালো বোঝো, করো। সকলে যা ভালো বুঝলেন তা এই যে, তারা জনাব আব্দুল মান্নানকে আচ্ছারকম হাজামত করলেন। আমি সবিনয়ে নিবেদন করেছিলাম, এ নোংরা বিষয় আলোচনায় না আনাই ভালো। এতে আমাদেরই ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পাবে। তদুপরি বিভিন্ন বাস্তব কারণে এসব কথা পত্রিকায় আসবে না, কিন্তু তা ইরাক সরকারের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পৌঁছবে।

পরদিন হযরতের সফরসঙ্গিগণ ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে দেখলেন, 'সৌভাগ্যক্রমে' পত্রিকার পৃষ্ঠা ছিলো 'খালি'! আর সেটাই ছিলো স্বাভাবিক। হযরতের শান ও মান সম্পর্কে আমাদের

অজ্ঞতা থাকতে পারে, কিন্তু নিজেদের প্রেসিডেন্টের মর্যাদা সম্পর্কে ইরাকীরা অসচেতন হবে কেন?

***

আর একটি মাত্র দিন আমাদের হাতে ছিলো এবং কুফা, নজফ ও কারবালা যিয়ারাত করা বাকি ছিলো। খুব ভোরে যাত্রা শুরু হলো। বাগদাদ থেকে কুফার দূরত্ব প্রায় দেড়শ কিলোমিটার। খুব কাছেই নজফ শহর।

মানববসতির ক্রমসম্প্রসারণের স্বাভাবিক ধারা এই যে, দুটি জনপদ প্রথমে আলাদা থাকে। তারপর উভয় জনপদ সম্প্রসারিত হতে হতে অভিন্ন জনপদে রূপান্তরিত হয়। যেমন মক্কা ও মিনা ক্রমসম্প্রসারিত হয়ে এখন অভিন্ন জনপদে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কুফা ও নাজাফ ব্যতিক্রম। এখন উভয় জনপদ আলাদা; মাঝখানে কয়েক কিলোমিটার একেবারে অনাবাদ। কিন্তু অতীতে কুফার জনপদ নজফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো এবং বলা চলে, নজফ কুফারই অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এজন্য নজফকে বলা হতো 'যাহরুল কূফাহ' বা কুফার পৃষ্ঠদেশ।

নাজাফে শিয়াসম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র অবস্থিত। আজকের খোমেইনী একসময় তার দীর্ঘ নির্বাসিত জীবনের বিরাট অংশ নাজাফেই কাটিয়েছিলেন ইরাকের রাষ্ট্রীয় মেহমানের মর্যাদায়। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস, একসময়ের মেহমান এখন জানি দুশমন!

নাজাফ থেকে কারবালার দূরত্ব যথেষ্ট। হোসায়নি শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনাকালের কারবালা ছিলো জনমানবহীন এক মরুভূমি। সেই কারবালা এখন এক সমৃদ্ধ জনপদ। এ কারবালায় দাঁড়িয়ে কল্পনাও করা যায় না সেই কারবালার রুক্ষ-কঠিন মরুদৃশ্য!

বাগদাদ থেকে কুফা পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত সড়কপথ, তার দু'দিকে শুধু খেজুরবাগান। বলা যায়, পথের দু'দিকে খেজুরবাগান নয়, বরং খেজুরবাগানের মধ্য দিয়ে চলে গেছে পিচঢালা পথ। খেজুরের ছায়া-ঢাকা সেই বাগদাদ-কুফা মহাসড়কের এখন কী অবস্থা! এখন তো নিশ্চয় হানাদার বাহিনীর সাজোয়াবহর সেই সড়কপথে চলাচল করে, আর ইরাকীদের গাড়ী পথের বিভিন্ন চেকপোস্টে থামিয়ে রাখা হয়!

কুফার কাছাকাছি এসে ইরাকের ঐতিহাসিক শহর হিল্লা, আর সামান্য দূরত্বে কালদানীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম বাবেল নগরি। কালদানীয়রা আদজাতির উত্তরপুরুষ। তারাই পূর্ব থেকে বিদ্যমান শহরটির নাম রেখেছে 'বাবেল'– বৃহস্পতি গ্রহ।

বাবেল এখনো আবাদ শহর। এখানেই ছিলো পৃথিবীবিখ্যাত ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান, যা আজ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কোরআনে বাবেল-এর নাম এসেছে। জাদুবিদ্যার জন্য এ শহরের খ্যাতি ছিলো হযরত সোলায়মান (আ)-এর যুগে। বাবেলীদের পরীক্ষার জন্য হযরত হারূত ও মারূত নামে দুই ফিরেশতাকে পাঠানো হয়েছিলো মানুষের বেশে।

দূর থেকেই শুধু দেখা হলো বাবেল শহর এবং তার শূন্যোদ্যানের ধ্বংসাবশেষ। আমাদের মেযবান ঐ স্থানটিকে 'পরিদর্শনের' অন্তর্ভুক্ত করেননি হয়ত একথা ভেবে যে, নিছক ঐতিহাসিক স্থানের প্রতি আমাদের আগ্রহ থাকবে না।

কুফা ও নাজাফ অতিক্রম করে গাড়ী এগিয়ে চললো, কারবালার উদ্দেশ্যে। উন্নত সড়কপথ, কিন্তু এখানে খেজুরগাছের ছায়া নেই। যত দূর দৃষ্টি যায়, শুধু বালুর সাগর, আর প্রস্তরময় মরুভূমি।

আমার জিজ্ঞাসার জবাবে মুহসিন বললেন, মদীনা থেকে কারবালার দূরত্ব প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার। আজকের মানুষের পক্ষে কি কল্পনা করা সম্ভব, নবীজীর প্রিয় দৌহিত্র, মা ফাতেমার কলিজার টুকরা ইমাম হোসায়ন (রা) পরিবার-পরিজনের কাফেলা নিয়ে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে কীভাবে এ দীর্ঘ কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছিলেন! কী ভীষণ ধৈর্যের বিষয় ছিলো তা! কেন তিনি বেছে নিয়েছিলেন এমন মোজাহাদা ও কোরবানির পথ?!

কারবালার কাছাকাছি পৌঁছে আমরা ছোট্ট একটি উটের কাফেলা দেখতে পেলাম। ইরাকে এখানেই উটের সঙ্গে প্রথম ও শেষ মুলাকাত! মরুভূমির বালুসাগর পাড়ি দিয়ে উটের কাফেলা চলেছে কারবালারই দিকে। জানি না, কারা ছিলো উটের সেই কাফেলায়। কিন্তু দূর থেকে তাদের পথচলা দেখে আমার হৃদয় আন্দোলিত হলো আবেগের উত্তাল তরঙ্গে; চোখের পাতা হলো অশ্রুসিক্ত। আজকের উটের কাফেলায় আমি যেন দেখতে পেলাম সেই নূরানী কাফেলার দৃশ্য।

নানাজানের রওযা শরীফের সান্নিধ্য ত্যাগ করে ইমাম হোসায়ন (রা) কেন এসেছিলেন মদীনা থেকে এই কারবালায়? এসেছিলেন যালিম শাসকের কবল থেকে উম্মাহকে উদ্ধার করার জন্য; নানাজানের প্রিয় দ্বীনের হিফাযতের জন্য। আর তিনি তো নিজে আসেননি; এসেছিলেন কুফা থেকে হাজার চিঠির আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে! কুফাবাসীর প্রতিশ্রুতি ছিলো যালিম শাসকের বিরুদ্ধে ইমামের হাতে বাই'আত গ্রহণের, যা কবুল না করা ইমামের দৃষ্টিতে ছিলো জিহাদ থেকে পলায়নের শামিল, আর তা কীভাবে সম্ভব শেরে খোদা হযরত আলী (রা)-এর পুত্রের পক্ষে! পরিণাম পরিণতি থেকে বেপরোয়া হয়ে এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ উপেক্ষা করে তাই তিনি প্রিয় মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন সুদূর কুফার উদ্দেশ্যে।

কীভাবে তিনি কল্পনা করবেন, কুফার লোকেরা তাঁর সাথে গাদ্দারি করতে পারে! তারা তো প্রিয় নানাজানের প্রিয় উম্মত! কিন্তু তাঁর কল্পনায় যা ছিলো না তাই ঘটে গেলো! পথেই পাওয়া গেলো কুফার বিশ্বাসভঙ্গের খবর, কিন্তু জিহাদের পথ থেকে ফিরে যাওয়া তো ইমামের পক্ষে সম্ভব নয়! তবে অন্যদের তিনি বললেন, যার ইচ্ছা, ফিরে যেতে পারে। অনেকেই ফিরে গেলো। একসময় রয়ে গেলো শুধু পরিবারের আপনজনেরা। শিশু-নারী-পুরুষ মিলিয়ে সত্তরজন। নিরস্ত্র অসহায় উটের কাফেলা এসে পৌঁছলো ফোরাত নদীর তীরে, এই কারবালার মাঠে। কিছুটা দূরে সরে গেলেও সেই ফোরাত আজো আছে। এখনো ফোরাত বয়ে যায় কুল কুল রবে কান্নার সুর

তুলে। এ কান্না মহাকালের কান্না। যুগ যুগ ধরে ইমাম হোসায়নের শোকে উম্মাহর চোখ থেকে যত অশ্রু ঝরেছে সব তো এসে মিশেছে এই ফোরাতের পানিতে!

কারবালার প্রান্তরে আমি যেন দেখতে পেলাম হোসায়নী কাফেলার অসহায়ত্বের মর্মবিদারক দৃশ্য! যিয়াদের প্রেরিত বাহিনী ঘিরে ফেলেছে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও নিরস্ত্র ইমামের কাফেলাকে, আর ঘিরে রাখা হয়েছে ফোরাত নদী। কেন? কারবালার মরুভূমিতে ইমাম ও তাঁর পরিবার যেন পিপাসায় কাতর হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। হায়, এ যমীন, এ আসমান আর কখনো কি দেখেছে এমন নির্মম নিষ্ঠুর দৃশ্য! প্রিয় নবীর প্রিয় দৌহিত্র, মা-ফাতেমার কলিজার টুকরা, জান্নাতের যুবকদলের সরদার ইমাম হোসায়ন পিপাসায় কাতর! পিপাসায় কাতর শিশু আছগর! পিপাসায় কাতর বিবি সাকীনা! ইমাম নিজের জন্য নয়, শিশু আছগরের জন্য এককাতরা পানির আবেদন জানালেন। কিন্তু এই উম্মতেরই একদল নরাধম দিলো না ইমামকে ফোরাত নদীর এককাতরা পানি! আগে তলোয়ার ছাড়ো, নিজেকে সোপর্দ করো, তারপর পানি। পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়, তাই বলে এমন যিল্লতির পানি মুখে দেবেন ইমাম হোসায়ন ও তাঁর পরিবার! না, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, যিল্লতির পানি নয়, তারা পান করবেন শাহাদাতের শারাবান তাহূরা!

কাকে জিজ্ঞাসা করবো? পশুর অধম সেই মানুষগুলো তো এখন নেই দুনিয়াতে! আছে ফোরাত নদী; ইচ্ছে হলো তাকেই জিজ্ঞাসা করি, কেমন লেগেছিলো তখন তার! ইচ্ছে কি হয়েছিলো পশুগুলোকে ডুবিয়ে মারার? ইচ্ছে কি হয়েছিলো নিজে এগিয়ে গিয়ে ইমামকে আঁজলা ভরে পানি পেশ করার। কিন্তু ফোরাত নিজেও যে অসহায় ছিলো নরপশুদের উদ্ধত তলোয়ারের সামনে। তাই দুঃখে লজ্জায় ও বেদনায় হয়ত ফোরাতের পানি সেদিন শুকিয়ে গিয়েছিলো। এখন আমরা যা দেখি, তা ফোরাতের পানি নয়, ফোরাতের অশ্রু!

ইমাম হোসায়ন তলোয়ার হাতে লড়াই করলেন, জখমী হলেন; তাঁর বুকের খুনে লাল হয়ে গেলো কারবালার তপ্ত বালু। লুটিয়ে পড়লেন জান্নাতের যুবকদলের সরদার। তাঁর শহীদী রূহ রওয়ানা হয়ে গেলো ফিরেশতাদের মিছিলে আল্লাহর আরশের উদ্দেশ্যে। ইমামের পবিত্র মস্তক .. নাহ, থাক!

আগেও আমার মনে হয়েছে, এখনো মনে হলো। নবীর সারা জীবনে দুশমন যত যুলুম করেছে তাঁর উপর, তার চেয়ে বেশী যুলুম করেছে উম্মত নিজে একদিনে কারবালায় ফোরাত নদীর তীরে! উম্মতের একদল অপরাধ করেছে নবীর প্রিয় দৌহিত্রকে পিপাসায় কষ্ট দিয়ে হত্যা করে, আরেকদল অপরাধ করেছে তাঁকে পরিত্যাগ করে এবং নীরব দর্শক সেজে। আজ আমরা অপরাধ করছি ইমামের রক্তভেজা মাকছাদকে ভুলে গিয়ে।

মরুকারবালা পার হচ্ছি, আর বিভিন্ন মর্মান্তিক দৃশ্য ভাসছে আমার অশ্রুঝাপসা দৃষ্টির সামনে। বেদনাহত হৃদয় বিভিন্ন ভাব ও ভাবনার তরঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছে। এরই মধ্যে আমাদের গাড়ী প্রবেশ করলো আজকের কারবালা শহরে। হযরত প্রথমে হাযির

হলেন সাইয়েদেনা ইমাম হোসায়ন (রা)-এর পবিত্র মাযারে। এখানে মহান ইমামের পাশে শুয়ে আছেন শিশু আছগরসহ অন্যান্য শহীদানে কারবালা।

এখানে কারবালায় কাঁদতে হয় না, কান্না এসে যায়! এখানে ইমাম হোসায়নের মাযারে আপনা থেকেই অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে। কারবালার কান্না ও অশ্রু ঝরা তো আজকের নয়, যুগ যুগের। এখানে আকাশে বাতাসে সবসময় শোনা যায় কান্নার ধ্বনি এবং পাওয়া যায় নোনা অশ্রুর স্বাদ!

আমরা কাঁদছিলাম, আর আমাদের হযরত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিলেন, তবে তাঁর কান্না এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়া সবই ছিলো আত্মিক সংযমে পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। কান্নার অদম্য আবেগ এবং আত্মসংযমের অপূর্ব এক সঙ্গম যেন দেখতে পেলাম তাঁর মাঝে। তাঁর কান্না ও অশ্রুবর্ষণের মাঝে যেন দেখা গেলো এখানে ইমামের শোকে যুগে যুগে উম্মতের 'বরগুযীদা' মানুষের কান্না ও অশ্রুবর্ষণের দৃশ্য!

ইমাম হোসায়ন (রা)-এর মাযারে বারবার আমার মনে পড়ছিলো হিন্দুস্তানের মর্দে মুমিন মাওলানা মুহম্মদ আলী জাওহার (রহ)-এর সেই অমর কবিতাপংক্তি– কাতলে হোসায়ন আছল মেঁ মুরগে ইয়াযীদ হায়/ ইসলাম যিন্দা হোতা হায় হার কারাবালা কে বা'দ

(হোসায়নের শহীদী খুনে লেখা হয় ইয়াযীদী মওতের পরওয়ানা/ ইসলাম জীবন্ত হয় যত বার আসে কারবালা।)

হাঁ, ইসলামের জীবনে কারবালা একবার আসেনি এবং রক্তের স্রোত শুধু একবার প্রবাহিত হয়নি। যুগে যুগে বিভিন্ন ফোরাতের তীরে কারবালা বারবার এসেছে ফিরে। যখন যেখানে ডাক এসেছে নয়া কারবালার, তখনই যামানার হোসায়ন বুক পেতে দাঁড়িয়েছেন যামানার ইয়াযীদ-শিমারের খুনপিয়াসী খঞ্জরের সামনে। সেই রক্তের ফোয়ারায় স্নাত হয়ে ইসলাম আবার নবজীবন লাভ করেছে।

হে কারবালা, হে অশ্রুর ফোয়ারা! হে কারবালা, হে হোসায়নি রক্তের স্রোতধারা! তোমার পুণ্যস্মৃতির পবিত্র স্পর্শ জীবনে আমার এই প্রথম, হয়ত জীবনে এই শেষ; কিন্তু আল্লাহর কাছে মিনতি জানাই, কখনো যদি আসে নতুন কারবালার ডাক, আমি যেন হতে পারি মুসাফির হোসায়নি কাফেলার! জানি, রক্ত আমার না-পাক; তবু হে মাওলা, আমার বুকের রক্ত তোমারই সৃষ্টি, সুতরাং তোমারই কাছে আমার মিনতি, আমার বুকের রক্তে ইসলাম যেন আবার নতুন জীবন লাভ করতে পারে। আমি চাই না ফোরাতের পানি, আমি চাই কাউছারের পেয়ালা।

ফোরাত নদীর তীরে যখন দাঁড়ালাম, মনের তখনকার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই। হাঁটু জলে নেমে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে থাকলাম স্বচ্ছ পানির দিকে। চোখের পানি গিয়ে মিশলো ফোরাতের পানিতে। কোন কবি বলেছিলেন–

সাদা চোখে ফোরাতের পানি হয়ত সাদা/ আছে যাদের দৃষ্টি জানে তারা কত লাল তা!

আমার সাদা চোখে যদিও সাদা পানি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাইনি, তবু মনে হয়েছে, এ পানিতে মিশে আছে হোসায়নের পবিত্র রক্ত এবং তার ঘ্রাণ।

কারবালা থেকে বিদায়ের সময় হযরতের যে অবস্থা হয়েছিলো, আজ এত বছর পরো তা স্পষ্ট মনে পড়ে। বাইরে সম্পূর্ণ শান্ত স্থির, ভিতরে যেন বইছে ঝড়; সেই কারবালার সেই মরুঝড়! বাইরে তার যা কিছু প্রকাশ তা হলো চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত! তিনি ফোরাত নদীর তীরে গেলেন, আমরাও গেলাম। তিনি হাঁটু পানিতে নামলেন, আমরাও নামলাম। বিশ্বাস করো পাঠক, আমি দেখেছি, এখনো দেখছি, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ফোঁটা ফোঁটা রক্ত হয়ে পড়ছে ফোরাতের পানিতে।

আগে শুনেছি, কিন্তু বুঝিনি, আজ বুঝলাম নিজের চোখের অভিজ্ঞতা দিয়ে, কারবালায় এমনি এমনি অশ্রু ঝরে, ঝরতেই থাকে। যেন অশ্রু দিয়ে লেখা এ নাম– কারবালা! প্রতিটি হরফ থেকে যেন অশ্রু ঝরে, থামাতে চাইলে আরো বেশী ঝরে। রোধ করতে চাইলে ঝরঝর করে ঝরে। সেই ঝরঝর অশ্রু ঝরা চোখে বিদায় নিলাম কারবালা থেকে। তখন মনে হয়েছে, এখনো মনে হয়, কারবালা আমাকে বিদায় দেয়নি। কারবালা যেন আমাকে বারবার বলেছে, 'বিদায় চেয়ো না, বিদায় নিয়ো না। থেকে যাও আমার বুকে ফোরাতের তীরে। অন্তত বুকে করে নিয়ে যাও আমার মরুভূমির ঝড়!'

সেই ঝড় এখনো যেন বইছে আমার বুকে! কারবালার স্মৃতি এখনো জ্বলজ্বল আমার হৃদয়ে! বাংলাদেশের বাতাসে, বৃক্ষের পত্রধ্বনিতে এখনো আমি শুনতে কারবালার কান্না! ভোরে সবুজ ঘাসের ডগায় যে শিশিরবিন্দু তাতে আমি দেখতে পাই কারবালার অশ্রু। এই যে আমাদের গ্রামের কোল ঘেঁষে বয়ে যাওয়া নদী, আমার কাছে এ যেন ফোরাত নদীরই ছবি!

কারবালা থেকে আমরা এসে পৌঁছলাম নাজাফে, শেরে খোদা হযরত আলী (রা)-এর মাযার-প্রাঙ্গনে। ভাব ও আবেগের তরঙ্গদোলায় হৃদয় এখানে এমনই উদ্বেলিত হলো যে, অতীত-বর্তমান যেন একাকার হয়ে গেলো! কোথায় নজফ, কোথায় ইরাক! আমার চোখের তারায় যে শুধু মক্কা, শুধু মদীনা! এখানে যিনি শুয়ে আছেন তিন তো মক্কার সেই দশবছরের বালক, নির্জন পাহাড়ের পাদদেশে আল্লাহর নবীর সঙ্গে যিনি নামায পড়তেন! তিনি তো সেই বিশবছরের যুবক, হিজরতের রাতে আল্লাহর নবীর শয্যায় চাদরমুড়ি দিয়ে যিনি শুয়ে ছিলেন! তিনি তো মদীনার সেই বীর যোদ্ধা যার হাতে আল্লাহর নবী যুদ্ধের ঝাণ্ডা তুলে দিয়েছিলেন, আর খাইবার-দুর্গের দরজা ভেঙ্গে ঢাল বানিয়ে যিনি লড়াই করেছিলেন!

মদীনা থেকে এত দূরে এই নাজাফে কেন তাঁর মাযার? কারণ বড় ফেতনার যুগে তাঁর কাঁধে এসেছিলো খেলাফাতের দায়িত্বভার। তিনি চাননি ফেতনার সায়লাব আসুক এবং বিনষ্ট করুক মদীনার পবিত্রতা। তাই তিনি নবীজীর বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করে মদীনা থেকে চলে এসেছেন কুফায়। আল্লাহর নবী যার হাতে তুলে দিয়েছিলেন আপন

কলিজার টুকরা ফাতেমাকে, বড় কষ্ট দিয়েছে উম্মত তাঁকে, তাঁর জীবনের সায়াহ্নে। শাহাদাতের আগে এক স্বপ্নে আল্লাহর নবীর কাছে শেকায়াত করে তিনি বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার উম্মত আমাকে বড় কষ্ট দিচ্ছে।

তিনি শত্রুর আঘাত যেমন সয়েছেন, তেমনি সয়েছেন আপনজনদেরও আঘাত। তিনি বলতেন ডানে চলো, তারা চলতো বাঁয়ে। তিনি বলতেন, বাঁয়ে চলো সবাই চলতো ডানে। চরম কঠিন ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে একে একে ছয় বছর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। কীভাবে করেছেন তা আল্লাহ জানেন। তবে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে কীভাবে মুসলিম উম্মাহকে সিরাতুল মুসতাকীমের পথে পরিচালিত করতে হবে, তার সর্বোত্তম আদর্শ পাওয়া যাবে একমাত্র তাঁরই পবিত্র জীবনে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে চতুর্থ খলীফারূপে নির্বাচন করেছেন।

ফজরের নামাযে যাওয়ার পথে গুপ্তঘাতকের হাতে তিনি শহীদ হয়েছেন। আশ্চর্য! ইসলামের চার খোলাফায়ে রাশেদীনের তিনজনই শাহাদাত বরণ করেছেন আততায়ীর হামলায়। এভাবে খেলাফাত ও শাহাদাত একাকার হয়ে গিয়েছিলো তাঁদের পবিত্র জীবনে।

তাযকিয়া ও ইহসান এবং আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার যে পুণ্যধারা চলে আসছে উম্মাহর মাঝে যুগ যুগ ধরে তার পুরোধা হলেন হযরত আলী (রা)। তাই যাদের দিল আছে তারা এখানে এসে লাভ করে থাকেন দিলের সুকূন ও সাকীনাহ এবং কলবের ফায়য ও ফায়যান।

হযরত এখানে প্রাণভরে যিয়ারাত করলেন এবং দিলভরে দু'আ করলেন। তারপর রওয়ানা হলেন হযরত আলী (রা)-এর দারুল খিলাফাত কুফার উদ্দেশ্যে। নাজাফ থেকে বিদায় নেয়ার সময় কলবের গভীরে তৃপ্তি ও প্রশান্তির অভূতপূর্ব এক অনুভূতি যেন দোলা দিলো। সেই পবিত্র অনুভূতির দোলায় আমি যখন মাতোয়ারা তখন হঠাৎ হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, 'মওলবী আবু তাহের, তোমার কলবে সাকীনা মাহসূস হইছে নি?' আমি অবাক হলাম এবং রোমাঞ্চিত হলাম। আমার সর্বসত্তায় যেন অজানা অচেনা একটি কম্পন অনুভূত হলো, আমি আরয করলাম, হযরত, কিছু একটা হয়েছে, সেটার নাম কি, জানি না।

হযরত আলহামদু লিল্লাহ, বারাকাল্লাহ বলে...।

প্রিয় পাঠক, এখানে এসে আবার মনে হলো কলম আমার সংযমের সীমা অতিক্রম করছে; আবার আমি অনুভব করলাম, বলার চেয়ে না বলার জন্য কত বেশী শক্তির প্রয়োজন। শুধু দু'আ করি, আমার কলবকে এবং মুহাব্বাতের সঙ্গে যারা এ লেখা পড়ছে তাদের কলবকে আল্লাহ যেন তার মা'রিফাত দ্বারা চিরআলোকিত করে দেন। আমীন।

প্রিয় পাঠক, এতদিন ধরে আমরা একসঙ্গে আছি। আমি লিখছি, তুমি পড়ছো। হৃদয়ে হৃদয়ে একটা কিছু বন্ধন তো অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছে। সেই বন্ধনের দাবীতে বলছি, এসো আমরা একসঙ্গে বলি, আমীন। আমি তোমার জন্য দু'আ করি, তুমিও আমার

জন্য দু'আ করো, আল্লাহ যেন আমাদের মাফ করে দেন, ঈমানের সঙ্গে, আসানির সঙ্গে আমাদের মউত নছীব করেন, আমাদের কবরকে যেন জান্নাতের টুকরো করে দেন, হাশরে যেন আরশের ছায়া দান করেন, হাউযে কাউছারের তীরে, নবীর সান্নিধ্যে যেন একত্র করেন। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে বেলাহিসাব জান্নাত দান করেন। আমীন।

এমন একটা সময় আসবে যখন আমি থাকবো না, তুমি থাকবে না। তখন যারা আসবে, তাদেরও জন্য এসো আমরা এ দু'আ করে যাই; আশা করি, তারাও আমাদের জন্য দু'আ করবে। কেন করবে না? আমরা তো মাটির উপরে তাদের বসবাস সুন্দর হওয়ার জন্য মাটির নীচে চলে যাচ্ছি!

***

গাড়ীতে ওঠার সময় অবচেতন ভাবেই যেন ফিরে তাকালাম মাযারে হযরত আলী (রা)-এর দিকে, হয়ত জীবনে শেষ বারের জন্য। তখন তৃপ্তির তরঙ্গকে ছাপিয়ে উঠলো যেন অতৃপ্তি ও বেদনার ঢেউ। প্রশান্তির সোনালী মুহূর্তগুলোর স্বর্গীয় স্বাদ পূর্ণরূপে অনুভব করার আগেই যেন তা অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে চায়। সময় কি ক্ষণিকের জন্যও স্থির হতে পারতো না এখানে এই পবিত্র মাযারপ্রাঙ্গনে!

একটা কথা বলবো না ভেবেছিলাম। কিন্তু মনের কষ্টটা চেপে রাখা আর সম্ভব হলো না। নাজাফে হযরত আলী (রা)-এর মাযারের পার্শ্ববর্তী কামরায় একটি বেদনাদায়ক বিষয় দেখতে পেলাম। একটি ছবিতে হযরত ইমাম আলী এবং ইমাম হাসান-হোসায়নকে দেখানো হয়েছে। জানি না, এমন বে-আদবির ধৃষ্টতা কে করেছে! কীভাবে করেছে! গতকাল তো সাদ্দাম বলেছিলেন, তিনি ইরাকে ইসলাম কায়েম করছেন, আর সেটা হচ্ছে মাযারের ইসলাম, তখন ভাবতে পারিনি, সেটা এত বড় মন্দ ইসলাম!

কুফা ও বছরা– এ দুই শহরের নাম শুনে আসছি সেই শৈশব থেকে। নাহবের কিতাবে সেই যে, পড়েছিলাম, 'সিরতু মিনাল বাছরাতি ইলাল কুফাতি', তারো বেশ আগে থেকে। পরবর্তীতে কুফার সঙ্গে গড়ে উঠেছে হৃদয়ের গভীর এক সম্পর্ক এবং মযবূত ইলমী বন্ধন। কারণ প্রথমত কুফা ছিলো হযরত আলী (রা)-এর দারুল খিলাফাহ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)সহ বহু ছাহাবীর অবস্থানকেন্দ্র।

দ্বিতীয়ত এই কুফাতেই জন্মগ্রহণ করেছেন হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রহ)। জন্মগ্রহণ করেছেন জানা অজানা আরো অসংখ্য ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ভাষাবিদ; ইলমের জগতে যারা ছিলেন একেকটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। সুতরাং ইলমের কেন্দ্রভূমি এই কুফা নগরীতে অন্তত কিছু সময়ের জন্য উপস্থিত হতে পারা একজন তালিবে ইলমের জন্য অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয়। তাই কুফা শহর দেখার এবং কুফার সেই জামে মসজিদে সামান্য সময় অতিবাহিত করার আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে ছিলো সবসময়। তাছাড়া আরেকটি বেদনাদায়ক ইতিহাস আমার হৃদয়ের এক কোমল অংশে ছিলো চিরজাগরূক সেজন্য ব্যাকুলতা

ছিলে', অন্তত একবার হলেও 'বিশ্বাসভঙ্গের' এই শহরকে এবং শহরের মানুষগুলোকে দেখবো; দেখে শিক্ষা লাভ করবো।

এ শহরেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন হযরত আলী (রা)-এর ভাতিজা, ইমাম হোসায়নের উৎসর্গিতপ্রাণ অনুসারী হযরত মুসলিম বিন আকীল। ইতিহাসের কিতাবে যতবার তাঁর শাহাদাতের করুণ কাহিনী পড়েছি শুধু চোখের পানিতে ভিজেছি, আর কুফার মাটি ও মানুষকে ধিক্কার দিয়েছি, তাদেরকে ছাড়া যাদের জন্ম কুফায় হলেও কুফার 'কুফা' থেকে ছিলেন মুক্ত।

ইমাম হোসায়ন তাঁর এই উৎসর্গিতপ্রাণ ভাইকে অগ্রগামী সদস্যরূপে কুফায় পাঠিয়েছিলেন সরেজমিন অবস্থা জানার জন্য। কুফার দুর্ভাগা সন্তানেরা প্রথমে তাঁকে সাদরে বরণ করেছিলো এবং এক বিরাট বাহিনী তাঁর হাতে জিহাদ ও শাহাদাতের বাইআত গ্রহণ করেছিলো। ফলে ইমাম হোসায়নকে তিনি লিখেছিলেন, 'চলে আসুন, কুফার জানবায জোয়ানরা আপনার ইনতিযার করছে।'

হায়, দুর্ভাগা কুফা, কেন তুমি ডেকেছিলে! কেন তুমি ত্যাগ করেছিলে! কেন তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে! কেন তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিলে! তুমি কি জানো, কাকে তুমি ডেকেছিলে! কাকে তুমি ত্যাগ করেছিলে! তুমি ডেকেছিলে তোমার মহাসৌভাগ্যকে; তুমি ত্যাগ করেছিলে তোমার মহাসৌভাগ্যকে!

আমি ব্যাকুল ছিলাম প্রাচীন কুফার সেই গলিপথগুলো দেখার জন্য যেখানে নিঃসঙ্গ অসহায় মুসলিম বিন আকীল লক্ষ্যহীনভাবে হাঁটছিলেন আশ্রয় ও নিরাপত্তার আশায়। কত ঘরের দরজায় আওয়ায দিয়েছিলেন, দুয়ার খোলো, আমি তোমাদের ভাই! আমি নবীজীর নাতি ইমাম হোসায়নের প্রতিনিধি। খুলেনি কোন ঘরের দুয়ার। কারণ দুর্ভাগা কুফার কোন ঘর এত প্রশস্ত ছিলো না যেখানে ইমাম হোসায়নের প্রতিনিধি প্রবেশ করতে পারেন; যেখানে হযরত আলীর ভাতিজা আশ্রয় নিতে পারেন।

একটি ঘরের দরজা খুলেছিলো, আশ্রয় দেয়ার জন্য নয়, যালিমের হাতে মাযলূমকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য; দুনিয়ার কুকুর দুনিয়ার পুরস্কার পাওয়ার জন্য। মুসলিম বিন আকিল তখন কেঁদেছিলেন, হয়ত কালিমায় বিশ্বাসী মানুষের এই নীচতা দেখে, কিংবা এই অনুতাপে যে, ইমাম হোসায়নকে কোথায় কাদের কাছে আসতে তিনি খবর পাঠিয়েছেন! কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে মোটেই নয়। হযরত আলীর ভাতিজা ভয় পাবেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে! ইমাম হোসায়নের 'ভাই' শাহাদাতের পেয়ালায় ঠোঁট লাগাতে! ছি!

আমাদের গাড়ী যখন কুফা শহরে প্রবেশ করলো এবং বিভিন্ন শহর ও পথ অতিক্রম করতে লাগলো তখন ইতিহাসের উজানে সাঁতার কেটে আমি পৌঁছে গেলাম সেই সুদূর অতীতে। আমার ঝাপসা দৃষ্টির সামনে আমি যেন দেখতে পেলাম, হযরত মুসলিম বিন আকীল ঐ যে খোলা মাঠে নামায পড়ছেন! তখনো তার সঙ্গে রয়েছে কয়েকজন মানুষ, কিন্তু সালাম ফিরিয়ে দেখেন, কেউ নেই। লক্ষ মানুষের কুফা শহরে তিনি সম্পূর্ণ একা। আমি যেন দেখতে পেলাম, শিহরিত হয়ে আমি চোখ বন্ধ করে

ফেললাম। ঐ যে এক নরাধম ধরিয়ে দিলো তাঁকে ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের হাতে! ঐ যে নিষ্ঠুর জল্লাদের খুনপিয়াসী তলোয়ার নেমে এলো তার গর্দানের উপর। মাথাটা .. উহ! আর পারি না! হায়, অন্তত একজন মানুষও যদি তাঁর সঙ্গে থাকতো এই দুর্ভাগা শহরের! তাহলে হযরত আলীর কুফা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কূফা এবং হযরত ইমাম আবু হানীফার কুফা বেঁচে যেতে ইতিহাসের বুকে লজ্জা ও কলঙ্ক থেকে।

আমাদের গাড়ী এসে থামলো কুফার জামে মসজিদের সামনে। পৃথিবীর প্রাচীনতম মসজিদগুলোর একটি। ১৯ হিজরীতে হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাছ এটি নির্মাণ করেছেন। ক্রমসম্প্রসারিত এই মসজিদে আশী হাজার মুছল্লী একসাথে নামায পড়তে পারে। কিন্তু শহর ও তার জনসংখ্যা এখন এমনই ম্রিয়মাণ যে, জুমার দিনেও মুছল্লী পাঁচ হাজার হয় কি হয় না। অথচ একসময় এই মসজিদে ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিছীনের মজলিসে ইলম ও হালকায়ে দরস ছিলো জমজমাট। হাজার হাজার তালিবে ইলম দিন-রাত মশগুল থাকতো ইলমের মধু আহরণে। মসজিদের খোলা চত্বরে চারদিকে দুর্গের মত মজবুত দেয়াল এখন কালের থাবায় জীর্ণদশায় উপনীত।

প্রাচীরসংলগ্ন শত শত কক্ষ এবং সেগুলোর দরজা মসজিদের আঙ্গিনামুখী। একসময় এখানে বাস করতো ইলমের পিপাসায় দূর দূরান্ত থেকে আগত মুসাফির তালিবানে ইলম। কল্পনার চোখে আমি তো দেখছি ইলমের ঐসব জমজমাট মজলিস এবং তালিবানে ইলমের নূরানী চেহারা, কিন্তু আমার সামনে ছিলো ছোট ছেলেদের খেলাধুলা ও ছোটাছুটির বাস্তব চিত্র! কোথায় গেলো হায়, ইলমের বাগানে ফুটে থাকা শত শত ফুলের সৌন্দর্য ও সুবাস! ঝরে যাওয়া ফুলের শুকনো পাপড়িগুলো, তাও বুঝি উড়ে গেছে যামানার ঝাপটায়!

মসজিদের আঙ্গিনায় মাঝখানে ছোট ছোট কিছু মেহরাব; সেগুলোতে লেখা আছে, এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) নামায পড়েছেন, এখানে হযরত নূহ (আ) নামায পড়েছেন। এভাবে আরো কয়েকটি নাম; অবশ্যই ভিত্তিহীন। কিন্তু যা কিছু ভিত্তিহীন তাতেই মানুষের উপচে পড়া ভক্তি, সবযুগে সবদেশে। তাই আগত পর্যটকরা ভক্তিগদগদ হয়ে ওখানে নামায পড়ে, দোয়া করে। কিন্তু দ্বীনের যা আসল বিষয় তাতে মানুষ আশ্চর্যরকম উদাসীন।

কুফার জামে মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও দ্বীনী ফযীলতের জন্য এতটুকুই তো যথেষ্ট যে, তা ছাহাবা কেরামের স্মৃতিধন্য এক প্রাচীন মসজিদ। এখানে নামায পড়েছেন হযরত আলী (রা) ও হযরত সা'আ বিন আবী ওয়াক্কাছ। এখানে সিজদা করেছেন জান্নাতের যুবকদলের সরদার হযরত ইমাম হাসান ও হোসায়ন (রা)। এখানে কোরআন ও সুন্নাহর ইলম বিতরণ করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা), হযরত মুগীরা বিন শো'বা এবং আরো অসংখ্য ছাহাবা কেরাম। এখানে একসময় ইলমের ঝর্নধারা প্রবাহিত হয়েছিলো ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মজলিসে। এখানে

হাদীছ বয়ান হতো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক, হযরত সুফয়ান ছাওরী এবং নাম না জানা অসংখ্য মুহাদ্দিছীনের মজলিসে। আমাদের যারা গাইড তারা এসব জানবে কোত্থেকে! তাই ভিত্তিহীন কাহিনী ছাড়া তাদের আর কোন পুঁজি নেই!

মসজিদ-প্রাঙ্গনে একটি গম্বুজের নীচে রয়েছে শহীদে কুফা হযরত হযরত মুসলিম বিন আকীলের মাযার। পাশের আরেকটি গম্বুজের নীচে রয়েছে হযরত হানী বিন ওরওয়ার মাযার, যিনি কিছু সময়ের জন্য মুসলিম বিন আকীলকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

হযরতের সঙ্গে আমরা আযমত ও ভক্তি-মুহাব্বাতের সঙ্গে মসজিদের আঙ্গিনা থেকে ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং হযরত আলী (রা)-এর মেহরাব অবলোকন করলাম, যেখানে দাঁড়িয়ে খলীফাতুল মুসলিমীন হিসাবে তিনি ইমামত ও খোতবা প্রদান করতেন। এই মেহরাবেই জীবনের শেষ ফজরে ইমামত করার জন্য তিনি ঘর থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন, আর পথে ওত পেতে ছিলো অভিশপ্ত ঘাতক। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো ঘরে। এই মেহরাবে তাঁর আর দাঁড়ানো হলো না। সেই ফজর তাঁর আর পড়ানো হলো না। হযরত আলী (রা)-এর মেহরাব এখন সংরক্ষিত, পাশে রয়েছে আলাদা মেহরাব। মসজিদের ভিতরে অত্যন্ত ভাবগম্ভীরতা ও নূরানিয়াত ছিলো। এ নূরানিয়াত ছাহাবা কেরামের নামায ও সিজদার এবং যিকির ও ইবাদাতের নূরানিয়াত; এ নূরানিয়াত খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী (রা)-এর ন্যায় ও ইনছাফপূর্ণ শাসনের নূরানিয়াত; এ নূরানিয়াত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদের ইলম ও ফিকাহর নূরানিয়াত, যুগ যুগের শত শত ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিছীনের ইলমী মাজালিসের নূরানিয়াত।

মাগরিবের আযান হলো, যেমন বিশুদ্ধ তেমনি হৃদয়স্পর্শী। হবে না কেন! এ আযান তো এখানে একসময় ধ্বনিত হতো স্বয়ং খলীফাতুল মুসলিমীন আলী বিন আবু তালিবের উপস্থিতিতে! এ আযানের ধ্বনি শুনেই তো জামাতে শামিল হতেন ছাহাবা কেরাম এবং পরবর্তী যুগের ইমাম, ফোকাহা ও মুহাদ্দিছীন।

মাগরিবের নামায আদায় করলাম একশ'র কম মানুষের এক জামাতে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র জামাতেও আমি যেন অনুভব করলাম সেই পুণ্যাত্মাদের উপস্থিতি, যারা আল্লাহু আকবার বলতেন আল্লাহকে সর্বশক্তিমান মনে করে; যারা সিজদায় মাথা রাখতেন বন্দেগির বিনয়ে বিগলিত হয়ে; যারা সিজদা থেকে মাথা তুলতেন আল্লাহ ছাড়া মাথা নত না করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। মাগরিবের পর আমরা দেখলাম প্রাচীন কুফার প্রশাসনিক কার্যালয়ের জীর্ণভবন ও তার ভগ্নাবশেষ। মসজিদের দক্ষিণ দিকে কেবলার দেয়ালসংলগ্ন, দেখতে দুর্গের মত একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। প্রথম হিজরী শতকে এটাই ছিলো কুফার প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র। এই ধ্বংসাবশেষ সে যুগের বহু উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী। হাজার বছরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের নির্বাক ভাষা যদি বুঝতে পারো তাহলে এখানে তুমি শুনতে পাবে এই আর্তনাদ–

'আমি ধ্বংস হয়েছি অনেক পরে; আমার বাসিন্দারা ধ্বংস হয়েছে অনেক আগে। আমি জানতাম একদিন আমি ধ্বংস হবো, কিন্তু আমার নির্বোধ বাসিন্দারা জানতো না, তারা ধ্বংস হবে এবং মাটির নীচে মাটির সাথে মিশে যাবে। তাই তারা কায়েম করেছিলো অনাচার-স্বেচ্ছাচারের রাজত্ব এবং গরম করেছিলো যুলুম ও ফেতনার বাজার। এখানে আমি দেখেছি জল্লাদের তলোয়ারের নীচে বহু মযলূমের গর্দান। এখানে আমি দেখেছি যিয়াদ ও ইবনে যিয়াদের গর্ব ও অহঙ্কার। এখানে আমি শুনেছি হাজ্জাজ বিন ইফসুফের সদম্ভ হুংকার। হাজ্জাজ নেই, সাঈদ বিন জোবায়র আছেন। ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ নেই, ইমাম হোসায়ন আছেন।

শোনো হে বাংলাদেশের আজনবী মুসাফির! এত সহজে কলজে ফেটে আমার দেহ এমন চৌচির হতো না, যদি সেই মর্মন্তুদ দৃশ্য আমাকে দেখতে না হতো! একটু কাছে এসো হে মুসাফির! তাহলে এখনো আমার ভগ্নাবশেষেও তুমি অনুভব করবে সেই কম্পন! আমি থরথর কর কেঁপে উঠেছিলাম যেদিন আমার এখানে আনা হয়েছিলো তোমাদের পেয়ারা নবীর প্রিয় নাতির কর্তিত মস্তক। তা দেখে উল্লাসে ফেটে পড়েছিলো নরাধম ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ও তার অনুচরেরা। আমার সেদিন ইচ্ছে হয়েছিলো, এই নরপশুদেরসহ মাটির নীচে ধ্বসে যাই। তারপর বেশী দিন যায়নি, ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাটা কল্লাও আমি এখানে মুখতার ছাকাফীর সামনে পরিবেশিত হতে দেখেছি।

হে আজনবী মুসাফির! আমার বিধ্বস্ত বুকের কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস তোমার কাছে আমানত রাখলাম। তোমার দেশের মানুষকে শুনিও তা।

প্রশাসনিক ভবনের ভগ্নাবশেষের ডান দিকে একটি প্রাচীন জীর্ণ বাড়ী। প্রসিদ্ধ এই যে, এটি হযরত আলী (রা)-এর বাসগৃহ। খুব সাধারণ ঘর। উত্তর দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেই অপরিসর আঙ্গিনা। পূর্বদিকে দু'টি কামরা, ইমামভ্রাতৃদ্বয়ের বলে কথিত। বাড়ীর পশ্চিম দিকে সুড়ঙের মত একটি সরু পথ, যার শেষ মাথায় একটি কামরা এবং তাতে একটি কূপ। বলা হয়, এ কূপের পানি হযরত আলী (রা) ব্যবহার করতেন। কামরার দক্ষিণ দিকের দরজা পার হয়ে অপেক্ষাকৃত বড় একটি কামরা। বলা হয়, এটি হযরত আলী (রা)-এর শয়নকক্ষ। ছাদ এত নীচু যে, প্রায় ছোঁয়া যায়। বাড়ীটি বারবার মেরামত করা হলেও এর আদল-আকৃতি অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। এই হলো মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলীফার 'বালাখানা', যিনি বিশ্বাস করতেন, দুনিয়া হলো আখেরাতের মুসাফিরখানা। এখানে বসে আমরা তৈরী করবো আখেরাতের আবাদুল আবাদ যিন্দেগির বালাখানা। কিন্তু আমাদের অবস্থা! ইয়া আলী, ইয়া আলী বলেই শেষ হয়ে যায় ভক্তি-ভালোবাসার উচ্ছ্বাস। ইয়া হাসান, ইয়া হোসায়ন বলেই আমরা সাঙ্গ করি কারবালার মাতম। কিন্তু তাঁদের জীবন ও জীবনযাত্রা! তাদের যিন্দেগি ও তরযে যিন্দেগি: যে কান্নায় আত্মনিবেদনের আকুতি নেই, যে অশ্রুফোঁটায় পথচলার মিনতি নেই সে কান্নায় হে মিথ্যা প্রেমিক, আমার কোন প্রয়োজন নেই। সে অশ্রুর ফোঁটায় আমার কোন আগ্রহ নেই।

কারবালায় আমি কাঁদতে পারিনি, কিন্তু আমার হযরতের কান্না দেখেছি! ফোরাতের হাঁটুজলে দেখেছি তাঁর অশ্রুনিবেদন!

নাজাফে হযরত আলীর মাযারে আমি তন্ময় হতে পারিনি, কিন্তু হযরতের ভাবতন্ময়তা দেখেছি। ছাহাবা-তাবে'ঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের স্মৃতিধন্য কুফার জামে মসজিদে আমি সিজাদায় লুটিয়ে পড়তে পারিনি, কিন্তু খুব নিকট থেকে দেখেছি হযরতের সিজদায় লুটিয়ে পড়া। এভাবে আজকের সারাটি দিন ছিলো শুধু দেখার সৌভাগ্য অর্জনের দিন। এ দেখা যেন আমার হৃদয়ে গভীরে রেখা হয়ে চিরঅম্লান থাকে, সেই কামনা করে হযরতের সঙ্গে রওয়ানা হলাম বাগদাদের পথে।

***

বাগদাদ! মুসলিম উম্মাহর হাজার বছরের ইতিহাসে অনেক উত্থান-পতনের এবং অনেক আনন্দ-বেদানার নীরব সাক্ষী বাগদাদে আজ আমার শেষ রাত, এই সফরের, কিংবা সারা জীবনের। তাই অনেক রাত পর্যন্ত হোটেলে কামরার ছোট্ট বারান্দায় বসে প্রাণভরে আমি আমার প্রিয় বাগদাদকে দেখলাম। বাগদাদের বাইরের সৌন্দর্য যেমন উপভোগ করলাম তেমনি চেষ্টা করলাম বাগদাদের ভিতরের সৌন্দর্য অনুভব করার। বাগদাদের যে সৌন্দর্য চোখের দৃষ্টিকে বিমুগ্ধ করে তা তৈরী করেছেন যুগে যুগে হারুন রশীদ ও তার উত্তরসূরীরা, আর তা ধ্বংস করেছে হালাকু খানেরা। আধুনিক বাগদাদের সৌন্দর্য, স্বীকার করতেই হবে সাদ্দাম হোসায়নের কীর্তি। বাগদাদ সুন্দর যেমন দিনের আলোতে সবুজের শামিয়ানার নীচে, তেমনি সুন্দর রাতের আলোতে তারকাখচিত আকাশের নীচে। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে বাগদাদের যে সৌন্দর্য আমি উপভোগ করেছিলাম তা ধ্বংস হয়ে গেছে নয়া যামানার হালাকু খানের হাতে। বাগদাদ আজ সারখার হয়ে গেছে মার্কিন হায়েনার বোমাবর্ষণ ও অগ্নিবৃষ্টিতে। আজ হয়ত আমার দেখে আসা বাগদাদকে চিনতেই পারবো না। হয়ত আমাকে আর বাগদাদে যেতেই দেয়া হবে না! সেদিনের রূপসী বাগদাদ আজ শুধুই মৃত্যুর উপত্যকা। হয়ত বাগদাদ এখন ডুবে আছে রক্তের সাগরে। কিন্তু বাগদাদের ভিতরের সৌন্দর্য! যার স্রষ্টা ইমাম গায্যালী, শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী ও তাঁদের উত্তরসূরীরা। সে সৌন্দর্য তো অমর অক্ষয়! সে সৌন্দর্য বিনাশ করতে পারে না যামানায় কোন হালাকু খান। এমনকি আজো যদি যেতে পারি বাগদাদ নামের ভয়ঙ্কর মৃত্যু-উপত্যকায় এবং দাঁড়াতে পারি মারূফ কারখী, জোনায়দ বোগদাদী, শায়খ জিলানী ও ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফের মাযারে তাহলে হৃদয় ও আত্মায় এখনো আমি অনুভব করবো বাগদাদের অন্তর্সৌন্দর্য। হয়ত সেখানে আমি শুনতে পাবো এই আশ্বাসবাণী– 'হালাকু খান ধ্বংস হয়েছে, ধ্বংস হবে; বাগদাদ বেঁচে ছিলো, বেঁচে থাকবে। আ-সাঁ নেহী মিটানা নামো নিশান হামারা।'

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাগদাদের তারাভরা আকাশের দিকে বিদায়ের বিষণ্ন দৃষ্টি বুলিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আমি শুয়ে পড়লাম হোটেলের সুসজ্জিত কামরায় পরিপাটি কোমল শয্যায়। বিদায়ের রাতে মেযবানের পক্ষ হতে কামরায় ফুলের তোড়া

রেখে যাওয়া হয়েছে। কামরাটা এমন সুবাসিত ছিলো যে, বিষণ্নতার মাঝেও মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। মেযবানকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

***

আজ আমাদের শেষ কর্মসূচী বাগদাদের জাদুঘর পরিদর্শন। হযরত থেকে গেলেন। আমার কেন যেন ইচ্ছে করছিলো না জাদুঘরের মৃত অতীতের অন্ধকারের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু হযরত বললেন, 'তুমি যাও। ইবরতের নযরে দেখলে ইবরতের বহু সামান পাবে সেখানে।'

এই ছিলেন আমাদের তাসবীহওয়ালা হযরত। যারা তাঁকে দেখেনি তারা ভাববে একরকম, যারা দেখেছে কিন্তু বুঝেনি তারা ভাববে অন্যরকম এবং অনেক রকম। যারা দেখেছে এবং কিছুটা বুঝেছে তাদের সংখ্যা কত কে জানে! কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তারা কেউ সংরক্ষণ করে রাখেননি তাঁর জীবন, চরিত্র, কর্ম, চিন্তা ও বেদনার সঠিক চিত্র। এটা হযরত হাফেজ্জী হুযূরের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে তেমনি হয়েছে হযরত ছদর ছাহেবের ক্ষেত্রে; তেমনি হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে, অল্পক'জন ক্ষণজন্মা পুরুষ, যারা এসেছিলেন এদেশে; দেশ ও জাতির প্রতি যাদের অবদান ছিলো অসামান্য, কিন্তু তাদেরকে ধারণ করা হয়েছে খুব সামান্য।

বাগদাদের পথে বের হবো, আর সবুজের ছায়া পাবো না তা হতে পারে না; এবারও হলো না। সকালের সোনালী রোদ, আর সবুজ গাছের ছায়া; এর মাঝে সুপ্রশস্ত মসৃণ পথ। গাড়ী আছে, নিয়ন্ত্রিত গতি আছে; ধোঁয়া নেই এবং ভেঁপুর শব্দদূষণ নেই। এমন পথ যত দীর্ঘ হয় তত আনন্দ। আমাদের পথ অবশ্য দীর্ঘ হলো না। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেলাম। বিশাল জাদুঘর, বিশাল সংগ্রহ এবং আধুনিক তার সুবিন্যাস। বড় দু'টি ভাগ হলো ইসলামপূর্ব যুগ এবং ইসলামপরবর্তী যুগ। আমাদের হাতে সময় ছিলো না, আসলে প্রয়োজনও ছিলো না। শিক্ষা তো জাদুঘর থেকে হয় না, হয় জীবন থেকে। আর আমার জীবন সবসময় আমার সঙ্গে আছে এবং চারপাশে ছড়িয়ে আছে জীবনের উপাদান। প্রতি মুহূর্তে আমি শিখতে পারি জীবন থেকে এবং জীবনের উপাদান থেকে, যদি শিখতে চাই।

খলীফা হারুন রশীদের মোহর দেখলাম। এই মোহরাংকিত পত্র তদানীন্তন পৃথিবীর সম্রাটগণ কম্পিত হাতে খুলতেন। কী আছে এই পত্রে! কোন দাবী! কোন অসন্তুষ্টি! উত্তরসূরীরা ঐ মোহর তো সংরক্ষণ করতে পেরেছে, মোহরের সেই প্রভাব ও প্রতাপ!

এ সফরনামা লেখার সময় শুনেছি, মার্কিন হায়েনাদের হাতে বাগদাদ জাদুঘর লুণ্ঠিত হয়েছে এবং মূল্যবান সব প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ চুরি হয়ে গেছে। চোর ও ডাকাত যখন ঢুকেছে চুরি ও লুণ্ঠন তো হবেই। হারুন রশীদের সেই মোহরও হয়ত চুরি হয়ে গেছে। তার অর্থ কি এই যে, আমাদের শেষ যোগ্যতাটুকুও বিলুপ্ত হয়ে গেছে! না, ঈমান যদি লুণ্ঠিত না হয়, জাদুঘর বা তেলের খনি লুণ্ঠিত হলেও কোন ভয় নেই। ঈমান আবার জাগবে এবং জাগবে মুসলিম উম্মাহ। এমনকি ঝড়ো হাওয়ায় ঈমানের

উদ্যান তছনছও যদি হয়ে যায়, আবার তাতে বসন্ত আসবে। কবি ইকবাল তাই তো বলেছেন, বলতে পেরেছেন– 'বহুবার পরীক্ষা নিয়েছে যামানা আমাদের।'

খলীফা আলমু'তাছিমের তলোয়ার দেখলাম; যে তলোয়ার হাতে একদিন তিনি ছুটে গিয়েছিলেন দূর দারাযের অভিযানে শুধু এক মুসলিম নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য; কাফিরদের হাতে লাঞ্ছিত যে নারী 'ওয়া মু'তাছিমাহ' (কোথায় তুমি হে মু'তাছিম) বলে ফরিয়াদ করেছিলো, একই সঙ্গে দেখলাম খলীফা আলমু'তাছিমের সেই দোররা যা একদিন ক্ষতবিক্ষত করেছিলো সত্যের প্রতি অবিচল ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের পবিত্র দেহ। উত্থান ও পতনের উভয় কার্যকারণের একত্র অবস্থান সত্যি আমাকে স্তম্ভিত করলো! হায় মু'তাছিম, আজ তোমাকে ভালোবাসবো, না ঘৃণা করবো! যে হাতে তরবারি তুলে নিয়েছিলে অসহায় মুসলিম নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, সে হাতেই কেন তুমি তুলে নিলে যুলুমের দোররা! আসলে এ দোররাই কি সেদিন ফায়ছালা করে দিয়েছিলো তোমার উত্তরসূরীদের ভাগ্য! এ দোররাই কি ডেকে এনেছিলো হালাকু খানের বরবাদি!

আজ এ সফরনামা লেখার সময় এখানে এসে ভাবছি, সাদ্দাম নিজেই কি তার কর্মফলরূপে ডেকে এনেছিলেন বাগদাদের বরবাদি! কেন তিনি ইরানের উপর হামলা চালাতে গেলেন? কেন তিনি কুয়েতের উপর আগ্রাসন চালালেন? কেন তিনি মুসলিম বিশ্বের সমঝোতা প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে আমেরিকা ও তার 'কুকুরসংঘ'কে সুযোগ করে দিলেন তাকে টুটি চেপে ধরার? মানুষ নির্বোধ হয়, কিন্তু একজন রাষ্ট্রনায়ক এত নির্বোধও হয়!

জাদুঘরে সবচে' বেদনাদায়ক যা দেখলাম তা হলো, আব্বাসী খেলাফতের এমন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যেন ভোগ-বিলাস ও নাচগান ছাড়া আর কোন শোগল ছিলো না তাদের। হারুন রশীদের 'বিনোদনমাইফেল' দেখানো হয়েছে চিত্রকর্মে। অথচ এই হারুন রশীদ সম্পর্কে ইতিহাস বলে, একবছর তিনি যেতেন হজ্বের সফরে, একবছর বের হতেন জিহাদের অভিযানে! আরো দেখানো হয়েছে, ধর্মভিত্তিক পুরোনো সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে কীভাবে গড়ে তোলা হয়েছে কল্যাণকর আধুনিক সমাজব্যবস্থা। এসব দেখে ইরাকের তরুণসমাজ অবচেতনভাবেই ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। তারা ভাবতে বাধ্য হবে, ধর্ম মানেই শোষণ, নিপীড়ন। ধর্ম মানেই অন্ধতা ও পশ্চাদ্‌পদতা। হায়, সাদ্দাম! তুমি ফিরে এসো এবং দেখে যাও তোমার সাধের ধর্মনিরপেক্ষ বাগদাদ!

***

জাদুঘর থেকে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ছাহেবের সঙ্গে গেলাম তথ্যমন্ত্রণালয়ের 'দাইরাতু ছাকাফাতিল আতফাল' বিভাগে। আমার ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণে খান ছাহেব সময়সংকীর্ণতার মধ্যেও ব্যবস্থাটা করেছিলেন এবং আমাকে সঙ্গ দান করেছিলেন। হজ্বের সফর থেকে শুরু করে পুরোটা সময় তিনি আমার ইচ্ছা ও আগ্রহের প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি রেখেছেন, যদিও এখন আমি আমার কর্মপরিসরে

এমনভাবে আবদ্ধ যে, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় না, তবু তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জাগরূক রয়েছে আমার অন্তরে।

শিশুসংস্কৃতি বিভাগ থেকেই ইরাকের শিশু-কিশোরদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখান থেকে শিশু ও কিশোরদের জন্য দু'টি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয় যথাক্রমে মাজাল্লাতী ও আল-মিযমার নামে। আমার বিশেষ আগ্রহ দেখে বিভাগীয় প্রধান পত্রিকার অনেকগুলো সংরক্ষিত কপি এবং শিশু-কিশোরদের জন্য প্রকাশিত বেশ কিছু বই উপহার দিলেন। সেগুলো এখনো আছে আমার সংরক্ষণে। শুধু এই পত্রিকাগুলো দেখেও বোঝা যায় সাদ্দাম তার ইরাককে কোন পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যে পথের পরিণতি এখন আমাদের চোখের সামনে।

তখন একটি প্রশিক্ষণশিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। দেখে শুনে মনে হলো, ইরাকের শিশু-কিশোরদের সম্পূর্ণ ধর্মমুক্ত সংস্কৃতির ছায়ায় গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে এবং এর 'সুফল'ও তারা পেতে শুরু করেছে। এদের কাঁধে আসবে আগামী দিনের ইরাকের দায়িত্বভার। সুতরাং বাগদাদের খোদা হাফেয!

এর পর আমরা গেলাম ইরাকী এয়ার ওয়েজের দফতরে আমাদের বিমানযাত্রা নিশ্চিত করতে। সঙ্গে ছিলেন মুহসিন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানালেন, বিমানের ফ্লাইট এখন অনিশ্চিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ; তদুপরি সেজন্য তিনচার দিন অপেক্ষা করতে হবে।

অভাবনীয় এক অবস্থার সম্মুখীন হলাম। বিলম্ব করা হযরতের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তিনি যত দ্রুত সম্ভব দেশে ফিরতে চাচ্ছেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। তাই বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতেই হলো। তখন আমাদের জানানো হলো, সড়কপথে আমরা কুয়েত যেতে পারি; সেখান থেকে বিমানযোগে ঢাকা। আগামীকাল রাত দশটায় ফ্লাইট। জানতে চাইলাম সড়কপথে কুয়েত পৌঁছতে সময় লাগবে কত? বলা হলো, ছয় থেকে সাত ঘণ্টা। বাস ছাড়বে আজ বিকেলে। এত দীর্ঘ বাসযাত্রা হযরতের জন্য খুব কষ্টকর হবে, কিন্তু উপায়! মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সম্মতি দিলেন। একটি বিষয় বুঝতে পারলাম না; আমাদের মেযবান তো সরকারী বিশেষ গাড়ীর ব্যবস্থা করতে পারতেন, যাতে আগামীকাল রওয়ানা হয়ে যথাসময়ে বিমানে ওঠা যায়! কুয়েতের বিমানবন্দরে কোন হোটেলে অপেক্ষা করার চেয়ে সেটাই তো ভালো! খান ছাহেব বললেন, 'এখানে অপেক্ষা করা যা, কুয়েতেও তা। নিজেদের পক্ষ হতে ওদেরকে অন্য ব্যবস্থার কথা বলা ভালো দেখায় না।' আমি আর দ্বিমত করলাম না।

বিকেলে আছর পড়ে আমরা হোটেল ত্যাগ করলাম। মানুষের চারিত্র বড় বিচিত্র! মাত্র কয়েকটি দিন হোটেলের যে কক্ষে অবস্থান করলাম তা ছেড়ে যেতে মায়া হলো! এই মায়াটাই সব অনিষ্টের মূল। সম্পদের মায়া, সন্তানের মায়া, জীবনের মায়া– এই সব মায়াজাল আমাদের ছিন্ন করতে হবে। শুধু আখেরাতের মায়ায় আবদ্ধ থেকে আমাদের দুনিয়ার জীবন অতিক্রম করে আখেরাতের সফর অব্যাহত রাখতে হবে। মুসাফিরকে

পথের যাবতীয় মায়া থেকে মুক্ত থেকে স্বদেশের গন্তব্যে অবিচল থাকতে হবে। আর আখেরাত এবং জান্নাতই তো মুমিনের স্বদেশ! গত রাতে যে কোমল শয্যায় শেষ শয়ন করেছিলাম তার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো ভাবলাম। যত সহজে ভাবলাম এবং এখন বললাম তত সহজ নয় হৃদয়ের গভীরে তা বদ্ধমূল করে নেয়া। এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘ ছোহবত ও মোজাহাদা।

বাসের 'মাওকিফে' পৌঁছলাম। মুহসিন এই প্রথমবার নিজেকে হযরতের বুকে সঁপে দিলেন এবং বুক উজাড় করে কাঁদলেন, যেন তিনি তার সবচে' আপনজনকে আজ হারাতে বসেছেন। সে দৃশ্য এখনো আমার মনে আছে, বহুদিন মনে থাকবে। দ্বীনের পথে তার অভিযাত্রা সফল হোক, সার্থক হোক। দুনিয়ার মায়াজাল যেন তাকে দ্বীনের পথ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। আমার সঙ্গেও কোলাকুলি হলো মুহসিনের। আমি কি ভেবেছিলাম বাগদাদের সফরে কারো সঙ্গে হৃদয়ের এমন সম্পর্ক হবে যে, বিদায়ের সময় তাতে টান পড়বে এবং ব্যথা জাগবে! আমি কি ভেবেছিলাম, বাগদাদ থেকে বিদায়কালে দু'টি ছলছল চোখ আমাকে এই বলে মিনতি জানাবে, 'বাগদাদে তোমার একটি ভাই আছে, কখনো ভুলে যেয়ো না'!

গাড়ী ছাড়ার দুই তিন মিনিট আগে অভাবনীয় এক বিস্ময় ও আনন্দ আমাকে বিহ্বল করলো; ফুলের তোড়া হাতে মুহম্মদ এসে হাজির! বেচারা প্রথমে হোটেলে গিয়েছেন, সেখান থেকে এখানে ছুটে এসেছেন! তিনিও বিদায় জানালেন অশ্রুসিক্ত চোখে। মানবচরিত্র সত্যি বড় বিচিত্র! আমার ভালো লাগলো একথা ভেবে যে, মুহম্মদের ফুলের তোড়াটি ছিলো আমার জন্য, শুধু আমার জন্য।

গাড়ী রওয়ানা হলো। বিদায় হে প্রিয় বাগদাদ! বিদায় হে মুহসিন! বিদায় হে মুহম্মদ! সঙ্গে থাকুক শুধু বাগদাদের স্মৃতি! সঙ্গে থাকুক শুধু তোমাদের হৃদয়ের ভালোবাসা, তোমাদের চোখের অশ্রু এবং তোমাদের বুকের স্পন্দন!

***

জীবনে এই প্রথম এমন কঠিন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম। এমনকি এখনো পর্যন্ত এটাই আমার জীবনের কঠিনতম অভিজ্ঞতা। সাত ঘণ্টার বাসের সফর দীর্ঘ হলো পঁচিশ ঘণ্টা! কীভাবে পার হলাম এ সুদীর্ঘ পথ। আমাদের কথা থাকুক, অশীতিপর বৃদ্ধ হযরত! তাঁর জন্য কেমন মহাকষ্টের ছিলো এ সফর! অথচ সারা পথে তিনি কষ্টের একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি; যা কিছু হায় আফসোস তা ছিলো আমাদের মুখে।

বাগদাদ থেকে কুয়েত পর্যন্ত দীর্ঘ পথের সুদীর্ঘ সফরের সব কথা যদি লিখতে যাই, সেটাই হয়ে যাবে আলাদা এক সফরনামা এবং হয়ত তাতে শিক্ষার কিছু এবং আনন্দের প্রচুর উপকরণ থাকবে। কিন্তু প্রিয় পাঠক, আমিও যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি! আমিও যে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে চাই সফরনামার শেষ শব্দটির কাছে! নইলে লিখতে পারতাম, বাসের এই দীর্ঘ পথে হযরতের পাশের আসনে বসে তাঁকে কেমন দেখেছি! তিনি কী করেছেন, কী বলেছেন। সব মনে নেই, যা আছে তাও কম নয়।

তিনি বলেছিলেন, মওলভী আবু তাহের, আমার ইচ্ছা হয়, তোমাকে খেলাফতের কাজে নিয়ে আসি, কিন্তু তা'লীমের কাজ যে আরো আহাম কাজ! তুমি তা'লীমের কাজে 'হামাতন' মশগুল থাকো। তুমি দোয়া করো, দেশে যাওয়ার পর নতুন কোন ফেতনা যেন খাড়া না হয়! আমার তো বড় আশংকা 'হইতেছে'!'

তিনি বলেছিলেন, 'সবাই মুহব্বতের লম্বাচওড়া দাবী করে। কিন্তু চাহাতের খেলাফ কিছু হইলে ছাড়িয়া চলিয়া যায়! সবাইকে একসঙ্গে রাখা খুবই কঠিন। তুমি কখনো নূরিয়া মাদরাসা তরক করবা না।'

আমি বলেছিলাম, হযরত, নূরিয়া যদি আমাকে তরক করে? হযরত কোন উত্তর না দিয়ে অনেক্ষণ আমার মাথায় তাঁর হাত রেখেছিলেন। এখন চিন্তা করে দেখছি, সম্ভবত সেটাই ছিলো আমার মাথায় হযরতের শেষ হাত রাখা!

এখানে আমি লিখতে পারতাম, ইরাক ও কুয়েত সীমান্তে যে তিনঘণ্টা সময় আমরা কাটিয়েছি শুধু কথা বলে, আর আমাদের হযরত শুধু নামায পড়ে, সে সময়ের অনেক কথা।

মাওলান আযীযুল হক ছাহেব সে সময় আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়েছিলেন। অনেক কথা বলেছিলেন, আমার কিছু কথা শুনেছিলেন। আমার তালিমের তারীকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এমনকি বর্তমান সফর সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন। আমি কিছু কথা বলেছিলাম দ্বিধা-সংকোচ ও দায়িত্ববোধের মধ্যবর্তী একটি অবস্থান থেকে। পুরো সফরে হযরতের ছায়ায় থেকে অন্যদিকে তাকাবার সুযোগ ছিলো না। এখানে এই তিনঘণ্টা সময় তাঁকে আমি খুব কাছে থেকে এবং গভীরভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি নিজেই আমাকে কাছে ডেকে নিয়েছিলেন। আমি অবাক হয়েছিলাম, নুরীয়ায় আমার তা'লীমী শোগোল সম্পর্কে তিনি এত বিস্তারিত জানেন দেখে।

সেসব কথা যদি এখানে লেখা যেতো হয়ত অনেকের জন্য খুব শিক্ষণীয় হতো।

সীমান্ত থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত বাসের জানালা থেকে ছবির মত কুয়েতকে যেমন দেখেছি এবং যে অনুভূতি অর্জন করেছি তাও যদি লিখতে যাই কম চিত্তাকর্ষক হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু থাক সে কথা।

কুয়েত বিমানবন্দরে পৌঁছার পর নতুন বিড়ম্বনা। হযরতের এবং মাওলানা আযীযুল হক ছাহেবের পাসপোর্ট পাওয়া গেলো না। যদিও এটা নিছক দুর্ঘটনা। কিন্তু এজন্য দায়ী আমরা নই। পাসপোর্ট নিয়ে এমন ছেলেখেলা কোন সভ্য দেশে কল্পনাও করা যায় না। আমার পাসপোর্ট থাকবে আমার কাছে, কিন্তু এখানে সে উপায় ছিলো না। সীমান্ত চেকপোস্টে সবার পাসপোর্ট নিয়ে গেলো বাসের চালক। ফেরত পাবো বিমানবন্দরে প্রবেশ করার পর। মানতেই হলো এ অদ্ভূত নিয়ম। বিমানবন্দরে এসে পাসপোর্ট নাম ডেকে হাতে দেয়া হলো না; একটা বাক্সে স্তূপ করে ফেলা হলো, আর সবাই তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ঘাঁটাঘাঁটি হুড়াহুড়ি করে সবাই যার যার পাসপোর্ট নিলো। এই হলো ব্যবস্থা, যার দুর্গতি এখন পোহাতে হবে আমাদের।

কেন? জবাব নেই। দুর্গতির দীর্ঘ বিবরণ এখানে তুলে ধরে কী লাভ। তার চেয়ে দু'আ করি। এই জাতিটাকে আল্লাহ অতীতের সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং মেধা ও যোগ্যতা আবার ফিরিয়ে দেন।

আল্লাহর মেহেরবানি, কুয়েতের রেফাঈ সাহেব ছিলেন হযরতের গুণমুগ্ধ। বাংলাদেশের সফরে তিনি নূরিয়া এসেছেন কয়েকবার। হযরতের মাকাম ও মর্তবা সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। একসময় তিনি কুয়েতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন। তিনি হযরতকে নিয়ে গেলেন। হযরত এক সপ্তাহের মত তাঁর মেহমান ছিলেন। বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে বিকল্প পাসপোর্টের ব্যবস্থা হওয়ার পর হযরত এবং মাওলানা আযীযুল হক ছাহেব দেশে ফিরেছিলেন।

অদ্ভুত এক পরিস্থিতির মধ্যে সবকিছু আল্লাহর হাওয়ালা করে আমরা বিমানে আরোহণ করলাম। বিদায়ের সময় হযরত হাসি মুখে বললেন, 'ফিকর মাত করনা, সবকুছ উনহী কি মারযী সে হো রাহা হায়।'

–চিন্তা করো না, সবকিছু তাঁরই ইচ্ছায় হচ্ছে।

সকাল ন'টায় বিমান ঢাকায় অবতরণ করলো। হযরতের ইসতিকবালে যারা এসেছেন, ঘটনা শুনে তারা হতবিহ্বল হলেন। আমরা সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আল্লাহর রহমতে তিনি নিরাপদে আছেন।

আব্বা এসেছিলেন বিমানবন্দরে। আব্বা আমাকে নিয়ে এলেন আম্মার কাছে; আম্মা আমাকে পাঠালেন আমার মেয়ের কাছে; আমার স্ত্রী কোলে তুলে দিলেন চারমাসের তুলতুলে ছোট্ট মেয়েটিকে। মনে হলো, তিনি আমার কোলে তুলে দিলেন ফুলের সুন্দর একটি তোড়া! পুলকিত চিত্তে আমি সে ফুলের কোমল স্পর্শ এবং স্নিগ্ধ সুবাস নিলাম। আমার লক্ষ্মী মেয়েটিকে কোলে নেয়ার মাধ্যমেই আমার জীবনের প্রথম হজ্বের সফর সমাপ্ত হলো, যার আগমন আমার জীবনে যিয়ারাতে বাইতুল্লাহর মহাসৌভাগ্য বয়ে এনেছিলো।

আমরা ভাবি, সময় থেমে থাকে। আসলে তা নয়। সময় থেমে থাকে না। সময় চলতে থাকে, সময় গলতে থাকে; সেই সঙ্গে আমাদের জীবনও বিন্দু বিন্দু করে গলে যায়। আমরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে আবার ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাই। সেদিন আমি ছিলাম পঁচিশ বছরের যুবক, আজ পঞ্চাশ-উর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। আমার দাড়ি এখন সাদা, আর আমার সেই লক্ষ্মী মেয়ে এখন শুধু আমারই মা নয়, ছোট্ট একটি সন্তানেরও মা! বাবার জন্য আল্লাহর ঘর যিয়ারাতের মহাসৌভাগ্য নিয়ে এসেছিলে যে মেয়ে, এই সেদিন সে নিজেও যিয়ারাত করে এসেছে আল্লাহর ঘর! কত মেহেরবান আমার আল্লাহ

যদি প্রশ্ন করা হয়, এ সফরনামা কাদের জন্য? তাহলে বলবো, এ সফরনামা তাদের জন্য যারা এবার বাইতুল্লাহর মুসাফির হবেন। আশা করি এর মাধ্যমে তাদের দিলের ইশক ও মুহাব্বাত আরো উদ্দীপ্ত হবে এবং তাদের অন্তরে প্রেম ও ভালোবাসার প্রদীপ নতুন করে প্রজ্বলিত করবে, আর নতুন নতুন অনুভব-অনুভূতির তরঙ্গদোলায় তাদের হৃদয় আন্দোলিত হবে।